খাঁটুরার ইতিহাস

ও

কুশদ্বীপকাহিনী।

---

২০২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত

৺ বিপিনবেহারি চক্রবর্ত্তী

প্রণীত।

শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিতের যত্নে সংগৃহীত।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা,

২৫ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট আর্য্যযন্ত্রে,

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৮ সাল।

পরিশিষ্টদ্বয় সমেত মূল্য ৩৲ টাকা।

সূচীপত্র।

১ম অধ্যায় উপক্রমণিকা ১—৬ পৃষ্ঠা।

২য় অধ্যায় কুশদ্বীপ ৭—১৪৫ পৃষ্ঠা।

৩য় অধ্যায় কুশদ্বীপ বাসী ১৪৬—২৫১ পৃষ্ঠা।

৪র্থ অধ্যায় তাম্বুলিগণের পারিবারিক বৃত্তান্ত ২৫২—৩৬০ পৃষ্ঠা।

খাঁটুরার ইতিহাস

ও

কুশদ্বীপকাহিনী।

---

২০২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত

৺ বিপিনবেহারি চক্রবর্ত্তী

প্রণীত।

শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিতের যত্নে সংগৃহীত।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা,

২৫ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট আর্য্যযন্ত্রে,

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৮ সাল।

পরিশিষ্টদ্বয় সমেত মূল্য ৩৲ টাকা।

☞ সংগ্রাহকের অনবধানতা বশতঃ অনেক স্থান ভ্রমসঙ্কুল হইয়াছে।

কুশদহ সমাজপতি

শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

মহাশয়কে

এই গ্রন্থ

উপহার স্বরূপ

উৎসর্গ

করিলাম।

সূচীপত্র।

১ম অধ্যায় উপক্রমণিকা ১—৬ পৃষ্ঠা।

২য় অধ্যায় কুশদ্বীপ ৭—১৪৫ পৃষ্ঠা।

৩য় অধ্যায় কুশদ্বীপ বাসী ১৪৬—২৫১ পৃষ্ঠা।

৪র্থ অধ্যায় তাম্বুলিগণের পারিবারিক বৃত্তান্ত ২৫২—৩৬০ পৃষ্ঠা।

খাঁটুরার ইতিহাস ও কুশদ্বীপকাহিনী।

প্রথম অধ্যায়—উপক্রমণিকা।

দুর্ভাগ্য-পিশাচি! তোর্ অসাধ্য কিছুই নাই! তোর্ প্রভাবে যে কত দে
মরুতে পরিণত এবং কত মরু যে সাগরগর্ভে লীন হইতেছে, তাহা কে বলি
পারে? দুর্বৃত্তে! সম্মুখে ঐ যে বিস্তীর্ণ জনপদ দেখিতে পাওয়া যাইতে
উহাতেও কি তোর্ পরুষ হস্তের পরিণাম দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না?
পাপিয়সি! বল্ দেখি, আজি যশোহরের সেই মহারথ প্রতাপাদিত্য কোথায়
ভূষণার সেই মহামতি মুকুন্দরায়ের বংশধরগণ কৈ?—কন্দর্প-গর্ব্ব-খর্ব্ব চন্দ্র
দ্বীপের সেই কন্দর্পনারায়ণ রায়ের বিমল শোণিত প্রবাহ, আজি নিয়তি
স্রোতের সহিত সংমিশ্রিত হইয়াছে?—ভুলুয়ার দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ অধি
সেই পরমারাধ্য লক্ষ্মণমাণিক্যই বা আজি কোথায়?—লক্ষ্মী ও সরস্
স্পর দ্বন্দ্বভাব পরিত্যাগ করিয়া, যে মহাপুরুষকে সাদরে আশ্রয় করিয়া
যাঁহার অসামান্য প্রতাপে, আজিও পূর্ব্ববঙ্গ সকলের শিরোভূষণ হইয়া
ছেন, বিক্রমপুরের সেই মহাপ্রতাপ কেদারনাথ রায়ই বা কৈ?

পাপিয়সি! একদিকে চন্দ্রদ্বীপ ও অপর দিকে সুদূর যশোহর
বিস্তীর্ণ ভূভাগের মধ্যে, যে বিশাল জনপদ কুশদ্বীপ নামে আখ্যাত হইত,
দিন অধৃষ্যবিক্রম নবদ্বীপও যাহার কুক্ষিগত হইয়া, আপনাকে শ্লাঘাবান্
করিয়াছিলেন,—মহারাজ প্রতাপাদিত্য অগণ্য সৈন্যবল পরিবৃত হইয়া অ
যাহার একজন সামান্য ভূস্বামীর নিকটেও লজ্জিত ও নতশির হইয়া, দ্বিজ
রেণু লেহন করিতে করিতে স্বদেশে প্রস্থান করিয়াছিলেন—যাহার অন্তর্গত
দুই চারিখানি গ্রামের ব্রাহ্মণমণ্ডলীর সুবিমল বিদ্যাজ্যোতিতে ভট্টপল্লী, ন
বিক্রমপুর, এমন কি, দাক্ষিণাত্যনিবাসী দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণগণও একদিন
প্রভ ও নিরুত্তর হইয়া গিয়াছিলেন, সেই মহাদ্বীপ কুশদ্বীপেও কি
দুর্দ্ধর্ষ নিষ্ঠুর হস্তের পরিণাম লক্ষিত হইতেছে না?— উচ্চ সৌধ

মাধি স্থান, সমুচ্চ দোলমঞ্চ, দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত নবরত্ন, যোড়-
াঙ্গালা, নাটমন্দির, মঠমন্দির, প্রশস্ত সরোবর, পরিখাপরিবৃত মনোহর উদ্যান,
াম্য-দেবতার আস্পদীভূত বেদীমণ্ডিত বিশাল বৃক্ষরাজির ভগ্নাবশেষ প্রভৃতি,
থন লোকবিশ্রুত জনশ্রুতির সুখদ পবনহিল্লোলে, ধীরে ধীরে পূর্ব্বস্মৃতির
রঙ্গ উত্তোলন করিয়া, মানবহৃদয়ে অপূর্ব্ব শক্তির বিস্তার করে এবং যখন
প্রাণ একতান হইয়া, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় হেলিয়া দুলিয়া, সেই অপূর্ব্ব শক্তির সহিত
খেলিয়া যাইতে থাকে, তখন বল্ দেখি, দুর্ব্বিনীতে! তোর জঘন্য পাপাচার
রণ করিয়া, কাহার হৃদয় না বিগলিত হয় ও অশ্রুরূপে নয়ন দিয়া প্রবাহিত
হইতে থাকে?

ন্যনাধিক তিন শত বৎসর পূর্ব্বে, কুশদ্বীপসমাজ বিদ্যার বিমল জ্যোতিতে,
াণিজ্যের স্ফুটিত লাবণ্যে, বলবীর্য্যের অমোঘ প্রতাপে এবং দেশীয় ব্রাহ্মণ
...ার ধর্ম্মানুষ্ঠানে, বঙ্গীয় অপরাপর সমাজ অপেক্ষা যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি লাভ
াছিল, সেরূপ আর অন্য কোন সমাজেই পরিদৃষ্ট হয় না। বলিতে কি
লে এই কুশদ্বীপ সকল সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল;
কি, ইহা তখন নবদ্বীপকেও কুক্ষিতলস্থ করিয়া লইয়াছিল। সেই জন্যই,
ীয় নব্য ন্যায়মতের স্থাপয়িতা রঘুনাথ শিরোমণি, মিথিলানিবাসী
পক্ষধর মিশ্রকে যে আত্মপরিচয় প্রদান করেন, তাহাতেও তিনি
কে কুশদ্বীপের অন্তর্গত নবদ্বীপ নিবাসী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।*
তঃ তৎকালে জ্ঞানচর্চ্চায় ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে এতদঞ্চলের ব্রাহ্মণগণ, যেমন
ল সমাজের লোকগণ অপেক্ষা সমুন্নত হইয়াছিলেন, এতদ্দেশীয় শূদ্র-
লীও তেমনই অন্তর্ব্বাণিজ্যে সমধিক শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়া, প্রভূত ধনশালী
দাচারপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তৎপরে, কুশদ্বীপ কিছু দিনের
হীনপ্রভ হইয়া আসিয়াছিল বটে, কিন্তু পরিশেষে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের
য়েও, ইহা এক অতি প্রধান সমাজ বলিয়া পরিগণিত হয় এবং ইহার পার্শ্ব-
ী চক্রদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ ও নবদ্বীপ অপেক্ষা, ইহা অধিক সংখ্যক ব্রাহ্মণ ও
সায়ীর আবাসস্থান হইয়া উঠে।

---

* কুশদ্বীপ মহাদ্বীপ নবদ্বীপ নিবাসিনঃ।
সিদ্ধান্ত তর্কসিদ্ধান্তে শিরোমণি মনস্বিনঃ॥

যখন পূর্ব্বতন হিন্দুগণের কোনও ধারাবাহিক ইতিহাস নাই, তখন কুশদ্বীপ সমাজের কোনও প্রকৃত ইতিহাস আছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে "ক্ষিতীশ বংশাবলি চরিত," অন্যান্য "সরকারী কাগজপত্র" ও ইতিহাসের মূল—"জনশ্রুতি," অবলম্বন করিয়া, আমরা এই কুশদ্বীপের অবধারণ করিতে পারিয়াছি, তাহাই প্রকটন করিতেছি। কিন্তু তাহাও যে দূর প্রামাণিক, তাহা নির্ণয় করা নিতান্ত কঠিন।

কুশদ্বীপের কোন একটী চিহ্নিত সীমা দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে সম্ভবতঃ নবদ্বীপাধিপতিগণের রাজ্যের পূর্ব্বভাগ কুশদ্বীপ বা কুশদহ নামে পরিচিত ছিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ ভবানন্দ মজুন্দারের অভ্যুদয়ের বহুপূর্ব্ব হইতে কুশদ্বীপের অধিকাংশ স্থল সদাচারসম্পন্ন শাস্ত্রজ্ঞ আর্য ব্রাহ্মণমণ্ডলী ও বাণিজ্যপ্রিয় শূদ্রজাতিপরম্পরার আবাসস্থান ছিল। সে সকল স্থানের মধ্যে চালুন্দিয়া, ও ইচ্ছামতীর উপনদী যমুনা, এই নদীদ্বয়ের পার্শ্ববর্ত্তী ও মধ্যগত জলেশ্বর, ইচ্ছাপুর, খাঁটুরা, গোবরডাঙ্গা, গৈপুর প্রভৃতি স্থান সমধিক প্রধান ও একদিন উহাদিগের কীর্ত্তিজ্যোতিতে মহারাজ প্রতাপাদিত্য ও তৎপরে নবদ্বীপ ভূপতিগণের রাজসভাও আলোকিত হইয়াছিল।

কুশদহের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নাই; সুতরাং কোন্ সময়ে এই সমাজ গঠিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে শুনিতে পাওয়া যায় যে, পাদোন-ত্রিশত বৎসর পূর্ব্বে, ভবানন্দ মজুন্দারের অভ্যুদয়ের প্রাক্‌কালে, কুশদ্বীপের অন্তর্গত জলেশ্বরে, কাশীনাথ রায় নামক এক ব্রাহ্মণ ভূস্বামী ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বহুকাল ধরিয়া, জলেশ্বরে বর্ত্তমান ছিলেন এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ সহকারে, সমস্ত নদীয়া পরগণার উপর একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই কারণে রঘুনাথ শিরোমণি মিথিলানিবাসী পক্ষধর মিশ্রকে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতে কুশদ্বীপের বিশেষণ "মহাদ্বীপ" ও নবদ্বীপকে কুশদ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া গিয়াছেন। আজি কালি কুশদ্বীপ নদীয়ার অধীন হইয়াছে বটে, কিন্তু ভবানন্দ মজুন্দারের পূর্ব্বে, উহা যে কুশদ্বীপেরই অন্তর্গত ছিল, তাহা শিরোমণির পরিচয়ে, তাহা স্পষ্টাক্ষরে প্রতিপন্ন হইতেছে। বিশেষতঃ তৎকালে এই কাশীনাথ রায়ের পূর্ব্বপুরুষগণ ব্যতীত, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত অন্য

ভুস্বামী নদীয়া পরগণায় ছিলেন না। তবে, চক্রদ্বীপের অন্যতম ভুঁইয়া কন্দর্প-নারায়ণের বংশীয়গণ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের সহিত নদীয়ার কোনও ...ন্ধ ছিল না। তৎকালে নবদ্বীপও সামান্য গ্রাম মাত্র ছিল, এবং ভবানন্দ ...রের পূর্ব্বে, তদীয় পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত নবদ্বীপের কোনও নিকট ...ও দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের এই ক্ষুদ্র ইতিহাসের ক্রমবিস্তারে, পাঠকগণ তাহা জানিতে পারিবেন।

পূর্ব্বকালে, বৈদ্যবংশীয় রাজগণ, মধ্যে মধ্যে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিতেন। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে, বখ্তিয়ার খিলিজি গৌড় আক্রমণ করিলে, লক্ষ্মণ ...ন খিড়কি দ্বার দিয়া পলায়ন করিয়া, নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। ...ন্তু পূর্ব্বতন নবদ্বীপ, বর্ত্তমান নবদ্বীপের সার্দ্ধ-ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত ...ল। উহার বল্লাল-দীঘী নামক সুদীর্ঘ বাপী ও রাজবাটীর চিহ্নমাত্র বর্ত্তমান ...ছে; কিন্তু প্রকৃত নগর গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইয়াছে। পূর্ব্বতন নবদ্বীপের ধ্বংসের ...রে, অধুনাতন নবদ্বীপ কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত, সামান্য গ্রাম মাত্র ছিল। ...য়োদশ শতাব্দীতে একজন সিদ্ধ পুরুষ, বর্ত্তমান নবদ্বীপে আসিয়া, একটী ...ক্তিঘট স্থাপন করতঃ, দেবী পূজা করিতে আরম্ভ করেন। তদুপলক্ষে, নানা ...নের লোক, সেই মহাপুরুষকে দর্শন ও দেবীর পূজা প্রদান করিতে আসিত। ...হাতেই এই স্থান ক্রমে ক্রমে বিশেষ প্রসিদ্ধ ও এক প্রকার তীর্থ বলিয়া ...রিগণিত হয়। পরিশেষে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান নবদ্বীপবাসী বাসুদেব ...র্ব্বভৌম নামক জনৈক মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক, উহার নিকটস্থ ...দ্যানগর গ্রামে এক চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। চৈতন্য, রঘুনাথ ...রোমণি, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, হরিদাস সার্ব্বভৌম ও শ্রীপদ গোস্বামী প্রভৃতি ...মহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ, এই খ্যাতনামা মহাপণ্ডিতের ছাত্র ছিলেন। ... সমস্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের সময় হইতে, নবদ্বীপ সংস্কৃত ...লোচনার সর্ব্বপ্রধান স্থান হয়। চৈতন্যের জন্মভূমি বলিয়াও, বৈষ্ণব ...দায়ও, ইহাকে এক মহাতীর্থ বলিয়া গণনা করিয়া থাকে। ফলতঃ বাসু-...সার্ব্বভৌমের সময় হইতে, ইহা বিদ্যার জ্যোতিতে সমধিক শ্রীবৃদ্ধি লাভ ...। কিন্তু তৎকালে, উহা কাশীনাথ রায়ের পূর্ব্বপুরুষগণের অধিকারভুক্ত ...এবং স্বকৃত নামে কথঞ্চিৎ বিখ্যাত হইলেও, তৎকালপ্রসিদ্ধ কুশদ্বীপের

নামেই পরিচিত হইত। সেই জন্যই, মহামতি রঘুনাথ শিরোমণি, পরিচয় প্রদান কালে, অগ্রে কুশদ্বীপের নাম গ্রহণ করিয়া, স্বকীয় জন্মভূমি নবদ্বীপের নামোল্লেখ করিয়াছেন। পরিশেষে, কাশীনাথের বংশ লোপ হইলে, যখন কুশদ্বীপ এককালে নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ হইয়া আইসে এবং নবদ্বীপ সমধিক উজ্জ্বল শ্রীধারণ করিতে থাকে, তখন নবদ্বীপ স্বনামেই পরিচিত হইতে আরম্ভ হয় এবং কুশদ্বীপ উহার অন্তর্গত একটী প্রধান স্থান রূপে পরিণত হইয়া আইসে।

ইহার উপর আবার, ভবানন্দ মজুন্দারের বৃদ্ধপ্রপৌত্র রাজা রামকৃষ্ণ, এই সময়ে তদীয় অধিকার মধ্যে নবদ্বীপ সর্ব্বপ্রধান ও সুপ্রসিদ্ধ স্থান দেখিয়া, আপনাকে নবদ্বীপাধিপতি বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহার উত্তর পুরুষেরাও সেই নাম ধারণ করেন। ইহাতেও নবদ্বীপ সমধিক বিখ্যাত হয় এবং কুশদ্বীপ অন্তঃসারশূন্য হইয়া, শুদ্ধ নাম মাত্র অবলম্বন করিয়া, নবদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত থাকে। কিন্তু এ সময়েও কুশদ্বীপ, মধ্যে মধ্যে যে সকল খ্যাতনামা সুধী প্রসব করিতে লাগিলেন, সেই সকল সুপণ্ডিত কুশদ্বীপের সমুজ্জ্বল মুখচন্দ্র নবদ্বীপের স্মৃতিপটে অনুক্ষণ জাগরূক রাখিলেন। তাহাতেই, কুশদ্বীপ তাঁহাদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া, তাঁহারা আপনাদিগকে বিশেষ শ্লাঘাবান্ মনে করিতে লাগিলেন এবং কুশদ্বীপকে আপনাদিগের বিশেষ অন্তরঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করিলেন। ক্রমে এই সম্বন্ধ প্রবল হইয়া, বৈবাহিক সূত্রেও পরিণত হইল এবং উভয় ভূস্বামীতে পরস্পর আদান প্রদান চলিতে লাগিল। এইরূপে, কুশদ্বীপ নবদ্বীপের সহিত ওতপ্রোতোভাবে সংমিশ্রিত হইয়া, নবদ্বীপেরই একাঙ্গ হইয়া আসিল। ফলতঃ, কুশদ্বীপ সমাজ যে অতীব প্রাচীন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ ইহা ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে গঠিত হইয়াছে এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ সহকারে পরিচালিত হইয়া, ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে, কাশীনাথ রায়ের শাসন সময়ে নিস্তেজ ও নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িয়া, নবদ্বীপের কুক্ষিগত হইয়াছে। তৎপরে, ভবানন্দের সময় হইতে, ইহা পুনরায় নবদ্বীপের উন্নতিস্রোত অনুসরণ করিয়া, মহারাজ গিরিশচন্দ্রের সময়ে, এক রম্য কীর্ত্তিনিকেতনে উপনীত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পরেই, উহা যে কি ভীষণ অবনতির পথে ধাবিত হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত।

ইতিহাসেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভবানন্দ মজুমদার ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে, ভারত সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে, নদীয়া, মহৎপুর প্রভৃতি চতুর্দ্দশ পরগণার জমীদারীর ফারমাণ (সনন্দ) প্রাপ্ত হন। ইতিপূর্ব্বে, নদীয়া কাশীনাথ রায় নামক ভূস্বামীর অধিকার ভুক্ত ছিল। কাশীনাথ রায় প্রতি বৎসর ৩৯৪৯।৶৹ টাকা রাজস্ব প্রদান করিতেন। এই কাশীনাথ রায়ের অবর্ত্তমানেই, নদীয়ার জমীদারী ভবানন্দের অধিকার ভুক্ত হইয়াছিল। আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি যে, তৎকালে জীলেশ্বরের জমীদার কাশীনাথ রায় ব্যতীত, দ্বিতীয় কাশীনাথ রায় নদীয়া পরগণার ভূস্বামী ছিলেন না। সুতরাং আমাদের জনশ্রুতির কাশীনাথ রায়ই, যে ইতিহাসের কাশীনাথ রায়, তাহা অবিসম্বাদিত। যাহা হউক, আমরা কাশীনাথের নাম ও অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ ভিন্ন, তাঁহার আর কোনও বিবরণ পাই নাই। সেইজন্য, তাঁহার আর কোনও বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেও পারিলাম না। কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী কুশদ্বীপ ভূস্বামী, তদীয় প্রিয় কর্ম্মচারী রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের বিবরণ অনেক প্রাপ্ত হইয়াছি। সেই কারণ বশতঃ, আমরা সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের সময় হইতে, কুশদ্বীপের ইতিহাস বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ফলতঃ, রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের পূর্ব্বে, কাশীনাথ রায়ের বংশীয়গণ যে বহুকাল ধরিয়া, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে আ-নবদ্বীপ কুশদ্বীপ সমাজ পরিচালন করিয়াছিলেন এবং রঘুনাথ শিরোমণি মহাশয়ও, যে সেই সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা অভ্রান্ত নিত্য সত্য।

বলা আবশ্যক, কুশদ্বীপের আমূল ইতিহাস আমাদিগের একমাত্র লক্ষ্য বটে ; কিন্তু জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়াও, যে অংশের কোনও অনুসন্ধান পাওয়া যায় না, আমরা অগত্যা সে অংশ ত্যাগ করিয়া, জনশ্রুতি ও ইতিহাস অবলম্বন করতঃ, যাহার মূল কিয়ৎ পরিমাণেও অবধারণ করিতে পারিয়াছি, এস্থলে তাহাই প্রকাশ করিতেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কুশদ্বীপ।

জলেশ্বরের কাশীনাথ রায়ের নিকট একজন যোগসিদ্ধ মহাপণ্ডিত কর্ম্মচারী ছিলেন। ইঁহার নাম রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ। ভবিষ্যতে ইঁহার বংশধরগণ চৌধুরীবংশ নামে বিখ্যাত হন। আদিশূর রাজার যজ্ঞকালে, কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আগমন করেন, ইনি তাঁহাদিগের অন্যতম, দক্ষের বংশোদ্ভব। দক্ষের পুত্র হড়োগ্রাম নিবাসী কাকত্য হইতে অষ্টম পুরুষ উত্তীর্ণ হইলে, ইনি জন্মগ্রহণ করেন। যথাস্থানে আমরা ইহার এক বংশতালিকা প্রকাশ করিলাম। ইনিই ইচ্ছাপুরের চৌধুরী জমীদার মহাশয়গণের আদি পুরুষ। ইনি কাশীনাথ রায়ের প্রসাদে ইচ্ছাপুরে বাস করিয়া, স্বকীয় অলৌকিক ক্ষমতা ও সদাচার বলে, ইচ্ছাপুর ও তৎসন্নিহিত স্থানের জমীদারী করায়ত্ত করেন এবং ইহার সন্নিকটবর্ত্তী কয়েক খানি গ্রামের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ গণের সহিত কন্যাপুত্রের আদান প্রদান সম্পাদন ও এক পংক্তিতে আহারাদি সমাপন করিয়া, একটী সমাজের একাধিপতি হন। সাধারণতঃ সেই সমাজকেই কুশদ্বীপ সমাজ কহে। কিন্তু আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না যে, এই সমাজ রাঘব সিদ্ধান্ত বাগীশ মহাশয় কর্ত্তৃক, কি তৎপূর্ব্বে কাশীনাথ রায় মহাশয়ের বংশীয়গণ কর্ত্তৃক, প্রতিষ্ঠিত। ফলতঃ অনেকে অনুমান করেন, সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের পূর্ব্বেও, এই সমাজ বিদ্যমান ছিল। তবে, সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় ইহার অধিপতি হইয়া, ইহার বহুল উৎকর্ষ সাধন করেন এবং তৎপরে তদীয় বংশধরগণ অদম্য চেষ্টা ও যত্ন সহকারে, ইহাকে মহীয়সী কীর্ত্তিমেখলায় পরিবেষ্টিত করিয়া দেন।

কুশদ্বীপের অবস্থান সম্বন্ধে, আবার কেহ কেহ বলেন, নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, সুইজর্লণ্ড অপেক্ষা বৃহত্তর, ৩৮৫০ বর্গক্রোশ পরিমিত যে বিশাল ভূভাগের স্বামিত্ব লাভ করেন, তাহাই চারি সমাজে বিভক্ত হইয়াছিল। এই বিস্তীর্ণ জনপদের কোন্ প্রদেশ কোন্ সমাজের অন্তর্ব্বর্ত্তী, এক্ষণে তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। কিন্তু এই ভূভাগের উত্তর প্রদেশ অগ্রদ্বীপ সমাজ,

মধ্য প্রদেশ নবদ্বীপ সমাজ, দক্ষিণ প্রদেশ চক্রদ্বীপ সমাজ এবং পূর্ব্ব প্রদেশ কুশদ্বীপ সমাজের অন্তর্বর্ত্তী ছিল। সুতরাং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে, তাঁহার জমীদারী যে চৌরাশি পরগণা অর্থাৎ ৪৯ পরগণা ও ৩৫ কিস্মথে বিভক্ত ছিল, উহাদিগের মধ্যে সম্ভবতঃ নাটাগড়ি, আমীর নগর, উখড়া, চারঘাট, খাজরা, আমীরপুর, খোশদহ প্রভৃতি কয়েকটী পরগণা কুশদ্বীপের অন্তর্গত দেখিতে পাওয়া যায়। তথাপি, কি জন্য যে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্যের পূর্ব্বাংশ কুশদ্বীপ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, আমরা তাহা নিশ্চয় বলিতে পারি না। তবে তৎকালে কুশদ্বীপ সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল বলিয়া, কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্যের পূর্ব্বভাগ এই নামে অভিহিত হইয়া থাকিবে। আপাততঃ নিম্নলিখিত কয়েকখানি গ্রামই কুশদ্বীপ সমাজের অন্তর্গত দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও বৃহৎ কর্ম্মকাণ্ডে সমাজের ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিলে, নিম্নলিখিত কয়েকখানি গ্রামের ব্রাহ্মণই সভাস্থ হইয়া থাকেন। উক্ত গ্রাম কয়েকখানির নাম যথা;—ইচ্ছাপুর, খাঁটুরা, হয়দাদপুর গোবরডাঙ্গা, গৌপুর, শ্রীপুর, মাটিকোমরা, নাইগাছি বালিনী, জলেশ্বর, ঘোষপুর, বেড়ী ও রামনগর।

এখনকার অবস্থা যাহাই হউক, ইতিপূর্ব্বে কুশদ্বীপ যে বহুবিস্তীর্ণ, সমধিক সমুন্নত ও নবদ্বীপাধিপতি মহারাজগণের অধিকৃত রাজ্য ছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ ও তদীয় বংশধরগণ ইচ্ছাপুরের জমীদার ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা নবদ্বীপাধিপতিগণেরই অধীন ভূম্যধিকারী ছিলেন। জনশ্রুতি ও ইতিহাস উভয়েই দেখিতে পাওয়া যায়, কুশদ্বীপ ওতপ্রোতভাবে নদীয়ার সহিত সংমিশ্রিত ছিল এবং কি রাজনীতি, কি ধর্ম্মনীতি কি সামাজিক আচার, কি সমাজ শৃঙ্খলা, সকল বিষয়েই কুশদ্বীপ, নবদ্বীপকে যেমন শ্রদ্ধা ও যত্ন সহকারে দেখিতেন, নবদ্বীপও তেমনই কুশদ্বীপকে শ্রদ্ধা ও স্নেহচক্ষে দর্শন করিতেন। ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতে কুশদ্বীপ নামে নবদ্বীপ রাজ্যের একটী প্রধান নগরেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা আজি কালি কুশদ্বীপ মধ্যে "কুশদ্বীপ" নামে কোনও নগরই দেখিতে পাই না। অথচ, যে স্থানে ইচ্ছাপুরের নামোল্লেখ আবশ্যক, আমরা সেই স্থানেই কুশদ্বীপের নাম গৃহীত হইয়াছে, দেখিতে পাই। সুতরাং ইচ্ছাপুরের মেরুদণ্ড বা কেন্দ্রভূমি ইচ্ছাপুর ও তৎসন্নিহিত স্থানের উদ্দেশেই যে সে নাম গৃহীত

হইয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ আজি কালি খাঁটুরা, গোবরডাঙ্গা, ইচ্ছাপুর, গৈপুর প্রভৃতির সাধারণভাবে নামোল্লেখ করিবার সময়ে, কুশদ্বীপ আখ্যাই পরিগৃহীত হইয়া থাকে এবং ঐ সমস্ত গ্রামের অধিবাসিগণকেই আজি কালি সাধারণতঃ "কুশদ্বীপবাসী" বা "কুশদহে বাঙ্গাল" বলা হয়। ইহাতেও স্পষ্ট বোধ হয়, ইচ্ছাপুর ও তৎসন্নিহিত জনপদের সাধারণ নামই তৎকালে কুশদ্বীপ ছিল এবং সেই নাম হইতে ইহার অন্তর্গত, পার্শ্ববর্ত্তী ও সন্নিহিত নবদ্বীপাধিপতি মহারাজগণের পূর্ব্বাঞ্চলস্থ অখিল সাম্রাজ্য কুশদহ সমাজ নামে আখ্যাত হইত।*

---

* নবদ্বীপ রাজগণের অধিকারস্থ উনপঞ্চাশ পরগণা যথা ;—নদীয়া, উখড়া, পাঁচনগর, মানপুর, মুলগড়, বাগোয়ান, মহৎপুর, রায়পুর, সুলতানপুর, সুলতান বেজারপুর, উলা (বীরনগর) সাহাপুর, ফতেপুর, লেপা, মারুপদহ, উমরপুর, গড় ইটবি, রায়সা, জাফরপুর, ভালুকা, সগুণা, মাটিয়ারি, এঙ্গুরিয়া কাশিমপুর, গয়াশপুর, আলানিয়া, মহিষপুর, ইস্‌লামপুর, খাড়িজুড়ি, মামুদপুর, কলারোয়া, এস্‌কহিলপুর, শান্তিপুর, রাজপুর, নাটাগড়ি, আমিরনগর, মগুগু, আলমপুর, কুখরালি, চারঘাট, খাজরা, হলদই, ইন্দুরখালি, খালিশপুর, ভাৎসিংহপুর, বেলগাঁও, আষাঢ়শেনী, বুড়ন ও খানপুর।

৩৫ কিস্‌মথ অর্থাৎ পরগণার কিয়দংশ যথা ;—হালিসহর, হাজরাখালি, পাইকান, মানপুর, কলিকাতা, আমিরাবাদ, আমিরপুর, খোশদহ, আনারপুর, বালিয়া, পাইকহাটি, বালান্দা, কাথুলিয়া, মাইহাটি, জামিরা, পারধুলিয়াপুর, মুর্ব্বই, নমক ও মোন, ধুলিয়াপুর, কুবাজপুর, জয়পুর, ভালুকা, বাগমারি, হোসেনপুর, হিলকি, তালা, কাটশালি, শোভানালী পলাসী, বেহারোল, সহনন্দ, ভাবসিংহপুর, হাট আলমপুর, সিলেমপুর ও আকদহ।

এই রাজ্যের সীমা সম্বন্ধে কবিবর ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন,—

রাজ্যের উত্তর সীমা মুরশিদাবাদ,
পশ্চিমের সীমা গঙ্গা, ভাগিরথী খাদ ?
দক্ষিণের সীমা গঙ্গাসাগরের ধার,
পূর্ব্বসীমা ধুল্যাপুর, বুড়গঙ্গাপার।

বস্তুতঃ নবদ্বীপরাজ্যের সীমা উহাই ছিল। এক্ষণে এই রাজ্য ২৪ পরগণা, মুরশিদাবাদ, যশোহর, বর্দ্ধমান, ও নদীয়া এই পাঁচ জিলায় বিভক্ত হইয়াছে। ইহাতে ভাগিরথী, জলঙ্গী (খড়িয়া), ইছামতী, ভৈরব, রায়মঙ্গল, চূর্ণী, যমুনা এবং আরও কতকগুলি ছোট ছোট নদী ও বাঁওড় আছে। ইহার প্রধান নগর ও গ্রাম শান্তিপুর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, হালি-

এই জনপদ অতীব বিস্তীর্ণ ছিল। ইহার পরিমাণ ফল ১,০৯,৪৪৯ বর্গ বিঘা বা ৫৭ বর্গ মাইল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বোর্ড অব্ রেভিনিউ নদীয়া জেলা ৭২ ভাগে বা পরগণায় বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক পরগণার যে রাজস্ব সংক্রান্ত বিবরণ প্রদান করেন, তদনুসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তৎকালে এই পরগণায় ১৫ খানি গ্রাম বা মৌজা ছিল। যথা; (১) জলেশ্বর (সাতবেড়িয়া সম্বলিত); (২) ইচ্ছাপুর (শ্রীপুর ও মাটিকোমরা সম্বলিত); (৩) মল্লিকপুর, (৪) নাইগাছি, (৫) বালিনী, (৬) গৈপুর, (৭) গোবরডাঙ্গা, (৮) বেড়গুম, (৯) ঘোষপুর, (১০) চারঘাট, (১১) গয়েশপুর, (১২) খাঁটুরা) (হয়দাদপুর সম্বলিত); (১৩) বেড়ী (রামনগর সম্বলিত); (১৪) ভুলোট (রামচন্দ্রপুর সম্বলিত), (১৫) চৌবাড়িয়া। এই সকলের মধ্যে চৌবাড়িয়া গ্রাম খানি মধ্যে কুশদ্বীপের অন্তর্গত ছিল না। কিন্তু বহুপূর্ব্বে উহা কুশদ্বীপের অন্তর্ব্বর্ত্তী ছিল বলিয়া, আজি কালি পুনরায় উহা কুশদ্বীপের অন্তর্গত হইয়াছে। এই কুশদ্বীপ পরগণার বার্ষিক রাজস্ব ১৮,৯৮৭ টাকা। ইহার অধিবাসীর সংখ্যা ন্যূনাধিক ৯,৪১০ মাত্র। অধুনা ইহা নদীয়া ও চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। নদীয়া জেলার প্রধান রাজকীয় স্থান বনগ্রাম; চব্বিশ পরগণা জেলার প্রধান রাজকীয় স্থান বসিরহাট ছিল, কিন্তু আপাততঃ উহা বারাসত হইয়াছে।

প্রাকৃতিক দৃশ্যে, এই অঞ্চল এক সুবিস্তৃত শ্যামল শস্যক্ষেত্র বলিয়া বোধ হয়। প্রকৃতির এই বিশাল শ্যাম প্রাবাবের স্থানে কোন স্থান এক এক খানি গ্রাম ও বিবিধ বৃক্ষরাজির সুমোহন কুঞ্জকাননে পরিশোভিত এবং বহুতর নদী, বিল, খাল ও অন্যান্য জলাশয়ে স্বতঃই বিভাজিত। এ প্রদেশের মধ্যে কোনও পাহাড় বা গিরিমালা দেখিতে পাওয়া যায় না। সকল স্থানই অত্যুচ্চ শ্যামল শস্য ক্ষেত্রে সমাকীর্ণ; মধ্যে মধ্যে নদী, বিল খাল প্রভৃতি এক একটী জলাশয়ে বিভাজিত। বর্ষা হীন সময়ে এখানে প্রায় ত্রিশ

সহর, কলিকাতা, অগ্রদ্বীপ, চক্রদ্বীপ, কুশদ্বীপ, বহিরগাছি, শ্রীনগর, গোপালনগর, প্রভৃতি এবং প্রধান গঞ্জ, শান্তিপুর, কলিকাতা, কৃষ্ণগঞ্জ, হাসখালি, নবদ্বীপ ও চক্রদ্বীপ ছিল। পূর্ব্বে, নবদ্বীপ, কুশদ্বীপ, ভাটপাড়া, কাঁচালপুর, কুমারহট্ট, শান্তিপুর, উলা, বহিরগাছি, বিল্ব পুষ্করিণী, বিল্বগ্রাম প্রভৃতি কতিপয় স্থানে অনেক টোল চতুষ্পাঠী ছিল এবং অনেক মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত এই সকল স্থান হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া, বঙ্গদেশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

ফিট নিম্নে জল পাওয়া যায়। এতদঞ্চলের সাধারণ উচ্চতা সাগরপৃষ্ঠ হইতে অন্যূন ৪৬ ফিট। সিভিল সার্জ্জন সাহেবের বার্ষিক বিবরণীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই স্থানের বার্ষিক তাপ পরিমাণ গড়পড়তা ৭৭° ডিক্রি এবং বারিপাত বা বর্ষাফল গড়পড়তা ৬৫ ইঞ্চি।

নদী।—কুশদ্বীপ সর্ব্বপ্রকারেই নদীয়ার নিকট ঋণী ও সমসূত্রে সম্বন্ধ; সুতরাং প্রকৃতিদেবী নদী সম্বন্ধে যে কুশদ্বীপকে নদীয়ার প্রসাদভোগী করিবেন না, ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়। বোধ হয়, অনেকেই অবগত আছেন যে, ভাগিরথী, খড়িয়া (জলঙ্গী) ও মাথাভাঙ্গা এই তিনটী শাখানদী নদীয়ার নদী বলিয়া সর্ব্বত্র পরিজ্ঞাত এবং এই তিনটী নদীই গঙ্গার মূলশাখা পদ্মা হইতে নিঃসৃতা। আমরা এইস্থানে নদীয়ার অন্তর্গত গঙ্গার মূলশাখা পদ্মা ও উহার তিনটী শাখানদীরই গতি বর্ণন করিতেছি। পাঠকগণ উহা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, কুশদ্বীপের যমুনা নদী ও নদীয়ার শাখানদীত্রয়, গঙ্গার মূলশাখা পদ্মার সহিত কিরূপ সম্বন্ধে সম্বন্ধ এবং ঐ সকল নদী ও উহাদের তীরবর্ত্তী নগর সকল দ্বারা কুশদ্বীপ কিরূপ লাভবান হইয়া থাকে।

পদ্মা।—নদীয়ার উত্তর প্রান্তে, যে স্থানে জলঙ্গী পদ্মা হইতে বিশ্লিষ্টা হইয়াছে, সেই স্থান হইতে পদ্মা পূর্ব্ববাহিনী হইয়া, কুষ্টিয়ার কিছু পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নদীয়ার অভ্যন্তর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

ভাগিরথী।—ভাগিরথী নদীয়ার অন্তর্গত পলাশীর ভীষণ ক্ষেত্র বিধৌত করিয়া, কালিগঞ্জ, কাটোয়া, অগ্রদ্বীপ, স্বরূপগঞ্জ, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কালনা, চাকদহ, সুখসাগর, কাচড়াপাড়া, হালিসহর প্রভৃতির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া, পূর্ব্বতীরে চব্বিশ পরগণা ও পশ্চিমকূলে হুগলী ও মেদিনীপুর জেলা রাখিয়া, সাগরদ্বীপের দক্ষিণে বঙ্গসাগরের সহিত মিলিতা হইয়াছে। ফলতঃ ভাগিরথী নদীয়ার পশ্চিম সীমা বহিয়াই প্রবাহিত হইতেছে।

জলঙ্গী।—জলঙ্গী পদ্মা হইতে নিঃসৃতা হইয়া, অতীব বক্রভাবে কিছুদূর পর্য্যন্ত নদীয়ার উত্তর পশ্চিম প্রান্ত বহিয়া গমন করতঃ, কৃষ্ণনগর ভেদ করিয়া, নবদ্বীপের অপর পারে ভাগিরথীর সহিত মিলিতা হইয়াছে। এই সঙ্গমস্থল হইতেই ভাগিরথী হুগলী নদী নাম গ্রহণ করিয়াছে।

মাথাভাঙ্গা।—যে স্থানে জলঙ্গী পদ্মা হইতে বিশ্লিষ্টা হইয়াছে,

তাহার দশ মাইল দক্ষিণে আসিয়া, মাথাভাঙ্গা পদ্মা হইতে নিঃসারিতা হইয়াছে এবং প্রথমে ইহা কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়া, অবশেষে অতীব তির্য্যকভাব অবলম্বন করতঃ দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখী হইয়া, রামনগরে উপস্থিত হইয়া, পরে, নবদ্বীপ রাজগণের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী মাটিয়ারির নিকটে যে স্থানে মাথাভাঙ্গার অর্দ্ধবৃত্তাকারের বাঁক উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারই পূর্ব্বতীর হইতে কবতক্ষ বা কপোতাক্ষ নামক শাখা দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া যশোহরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং মেকেশপুর, কোটচাঁদপুর ও চৌগাছার মধ্য দিয়া, ঝিঁকারগাছায় হরিহর নদের সহিত মিলিতা হইয়াছে; পরে, গদখালি, ত্রিমোহিনী, টালা, কপিলমুনি, কাটিপাড়া, চাঁদখালি ও প্রতাপনগরের মধ্য দিয়া, সুন্দরবনে প্রবেশ করিয়াছে এবং তথায় নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া, বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। এদিকে, মাথাভাঙ্গা রামনগর হইতে দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখী হইয়া কৃষ্ণগঞ্জে উপস্থিত হইয়াছে। পরে, চূর্ণী ও ইছামতী এই দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। চূর্ণী দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখী হইয়া, মসম-জোয়ানী, উলা ও রাণাঘাটের ভিতর দিয়া হরধামের নিকট ভাগিরথীর সহিত মিলিতা হইয়াছে। এদিকে ইছামতী ক্রমাগত দক্ষিণপশ্চিমবাহিনী হইয়া, গোপালনগর, বনগ্রাম ও চাঁহুড়িয়ার মধ্য দিয়া আসিয়া চারঘাটের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যমুনার সহিত মিলিতা হইয়া ইছামতী নাম পরিগ্রহ করতঃ কলিঙ্গ, বাহুড়িয়া, তারাগণিয়া, বসীরহাট, টাকি, হাঁসানাবাদ ও দেবহাটার মধ্য দিয়া কালিগঞ্জে উপস্থিত হইয়াছে। পরে, উহারই অনতি নিকটে বারকুলিয়া, কালিন্দী ও ইছামতী এই তিন শাখায় বিভক্ত হইয়া, সুন্দরবনে প্রবেশ করিয়াছে; পরে, তথায় নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া. বঙ্গোপসাগরে পতিত হইতেছে।

যমুনা নদী। পৌরাণিক মতানুসারে যমুনা নদী হরিদ্বার হইতে উৎপন্ন হইয়া, উত্তর প্রয়াগে (যুক্তবেণী বা এলাহাবাদে) গঙ্গার সহিত মিলিতা হইয়াছে। পরে দক্ষিণ প্রয়াগে (প্রত্যুম্ন হ্রদের দক্ষিণাংশে মুক্তবেণীতে) গঙ্গা হইতে বিশ্লিষ্টা হইয়া কাচড়াপাড়ার নিকটে বাগের খাল ভেদ করিয়া, ক্রমাগত পূর্ব্বমুখী হইয়া, সোনাখালি, বীরুউ, চৌবাড়িয়া, সাতবেড়িয়া, জলেশ্বর ধর্ম্মপুর, শ্রীপুর, মাটিকোমরা, নাইগাছি, মল্লিকপুর, ইচ্ছাপুর, বালিনী, গৈপুর,

গোবরডাঙ্গা, গয়েশপর, ঘোষপুর ও চারঘাটের নিম্ন দিয়া, চারঘাটের কিছু পূর্ব্বে ইচ্ছামতীর সহিত মিলিতা হইয়াছে। কুশদ্বীপের অনেকগুলি গ্রামই ইহার তীরবর্ত্তী ও নিকটস্থ। কুশদ্বীপে এই যমুনা ব্যতীত নৌকাদি-গমনোপযোগী অন্য কোন নদী দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার সহিত আরও দুইটী নদী সম্মিলিতা হইয়াছে। উহাদের মধ্যে একটীর নাম টেঙ্গরার খাল এবং অপরটী চালুন্দিয়া। টেঙ্গরার খাল আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে; কিন্তু চালুন্দিয়া এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়া বহুতর বিল খালে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে এই উপনদী যেমন খরস্রোতা, তেমনই বৃহৎ বৃহৎ নৌকাদি গমনাগমনের উপ-যোগিনী ছিল। যে অংশ আজিও চালুন্দিয়া নাম্নী জলাভূমিতে পরিণত হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে সময়ে সময়ে অনেক ভগ্ন নৌকাদি পাওয়া গিয়া থাকে। কথিত আছে, পূর্ব্বে এই নদী পার হইবার সময় এক দিনের আহারোপযোগী চাউল ও হাঁড়ি লইয়া যাইতে হইত। তজ্জন্যই ইহার নাম চাউলহাণ্ডিয়া বা চালুন্দিয়া হইয়াছে। খাঁটুরার পূর্ব্ব প্রান্তে যে বামোড় দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকেই বলেন, তাহা এই চালুন্দিয়ারই অংশ বিশেষ এবং উহাই কঙ্কণাকারে মেদিয়া নামক স্থান বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে বলিয়া উহার নাম কঙ্কণা হইয়াছে।

চারঘাটের পূর্ব্বাংশে যমুনা ইচ্ছামতীর সহিত মিলিতা হইয়াছে বটে, কিন্তু পৌরাণিক মতে অনেকের বিশ্বাস যে যমুনা ইচ্ছামতীর সহিত মিলিতা হইয়া গঙ্গার ন্যায় স্বয়ং বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। তজ্জন্য, টাকীর নিম্নে যে স্রোতস্বিনী প্রবাহিতা হইতেছে, তথাকার লোক তাহাকে ইচ্ছামতী না বলিয়া যমুনা বলিয়া থাকে। তত্রত্য অধিবাসিগণের বিশ্বাস যে, টাকী ও শ্রীপুরের নিম্নস্থা নদী, যমুনা ও ইছামতীর সম্মিলিত স্রোত।—শ্রীপুরের নিম্ন দিয়া, যে স্রোত গমন করিয়াছে, তাহাই ইছামতীর স্রোত এবং টাকীর নিম্ন দিয়া যে স্রোত গমন করিয়াছে, তাহাই যমুনার স্রোত। জোয়ারের সময় এই স্রোতস্বিনীর মধ্যস্থলে একটী জলের রেখা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। লোকে উহাকেই উভয় নদীর পার্থক্য-নিরূপিকা রেখা বলিয়া নির্দ্দেশ করে। এতদ্ভিন্ন, শ্রীপুরের কোনও হিন্দুর প্রাণ বিয়োগ হইলে, শ্রীপুরের লোকেরা তাহার সৎকার শ্রীপুরে না করিয়া, তাহার শব নৌকাযোগে টাকীতে লইয়া গিয়া থাকেন এবং টাকীর পারেই তাহার দাহকার্য্য সম্পন্ন করেন। ইহাতেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে

মুক্তবেণীর বিয়োগ স্থল হইতে যমুনা ভাগিরথী হইতে বিশ্লিষ্টা হইয়া, চারঘাটের পূর্ব্বে ইচ্ছামতীর সহিত সম্মিলিতা হইয়া এক যোগে সাগরসঙ্গমে গমন করিলেও, উক্ত সম্মিলিত স্রোতের নাম ইচ্ছামতী হয় নাই। উহা উভয় নদীরই সম্মিলিত স্রোত।

যাহাহউক, আজি কালি নিজ যমুনা অর্থাৎ ভাগিরথী হইতে চারঘাটের পূর্ব্বাংশস্থ নদীর অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। স্থানে স্থানে এতদূর চড়া পড়িয়াছে যে, বর্ষাকালেও নৌকাযোগে এই নদী বহিয়া গোবরডাঙ্গা হইতে ক'চড়াপাড়া বা মদনপুর যাইতে পারা যায় না। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে অনেকেই গোবরডাঙ্গা হইতে নৌকাযোগে এই নদী দিয়া মদনপুরে গমনাগমন করিতেন এবং তথা হইতে ইষ্টার্ণ বেঙ্গলরেলওয়ে দ্বারা যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকেই যাইতে পারিতেন। কলিকাতা হইতে অনেক বাণিজ্য পোতও তখন এই পথে গমনাগমন করিত। এতদ্ভিন্ন, সুন্দরবনের মধ্য দিয়া খাল পথে হাসনাবাদ উত্তীর্ণ হইয়া টাকীর পথেও লোকে কলিকাতা হইতে গোবরডাঙ্গায় আগমন করিত। নানাবিধ পণ্যজাতও তখন এই পথে কলিকাতা হইতে আনীত হইত। কিন্তু আজি কালি এক খানি জেলে-ডিঙ্গীও এই পথে গতায়াত করিতে পারে না।

ভৈরব নদ। আমরা আর একটী নদীর নামও শুনিতে পাইয়া থাকি। সেই নদীতীরস্থ কোন কোন নগরের সহিতও আমাদিগের কুশদ্বীপবাসী ব্যবসায়ী তাম্বুলীগণের অনেক ব্যবসা কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। উক্ত নদী ভৈরব নদ নামে প্রসিদ্ধ। উক্ত নদ চৌগাছার কিছু উত্তরে কবতক্ষ হইতে নিঃসৃতা হইয়া, দক্ষিণপূর্ব্ব মুখে গমন করত যশোহরের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এক সময়ে এই স্রোতস্বতী যশোহর জেলার বাণিজ্যোপযোগিনী প্রধান নদী ছিল; কিন্তু বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে উহার মূলদেশে চড়া পড়িতে আরম্ভ হয়। আজি কালি যদিও ইহাতে জোয়ার ভাঁটা খেলিয়া থাকে, তথাপি বাসন্তিয়ার নিম্ন পর্য্যন্ত উহা গ্রীষ্মকালে এককালে শুষ্ক হইয়া যায় এবং ভীষণ বর্ষাকালে খাল অপেক্ষা অধিক প্রশস্ত থাকে না। যশোহরের অনতি দূরবর্ত্তী বাসন্তিয়ার নিম্নে আজিও ইহা সমধিক প্রবল ও ইহাতে অনেক দেশীয় পণ্যজাতপূর্ণ নৌকাদির সমাগম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার তীরে যে সকল

বন্দর ও বাণিজ্যস্থান আছে, অহাদিগের মধ্যে যশোহর, রাজহাট, রূপদিয়া বাসন্তিয়া, নপাড়া, ফুলতলা, সেনহাটি, খুলনা, সেনবাজার, আলাইপুর, ফকির-হাট, বাগেরহাট ও কচুয়া প্রধান।

হরিহর নদ। যশোহরের আর একটী নদীর সহিতও কুশদ্বীপবাসী ব্যবসায়িগণের বিশেষ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। এই নদ পূর্ব্বে ঝিঁকারগাছার উত্তরে কবতক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া, দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে গমন করতঃ, মণিরামপুর ও কেশবপুরের নিম্ন দিয়া, ভদ্রা নদীতে পতিত হইয়াছে। ইহার মূলদেশও ভৈরব নদের ন্যায় এককালে মজিয়া গিয়াছে এবং মণিরামপুর অঞ্চলে উহাতে এক্ষণে আবাদ হইতেছে। মূল নদীগর্ভ এক্ষণে এক বিলে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু কেশবপুর হইতে দুই তিন মাইল দূরে জোয়ারের সময় এই নদীতে নৌকাদি গমনাগমন করিয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত যমুনা নদী ভিন্ন, কুশদ্বীপে বাঁমোড়, খাল ও বিল অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকলের মধ্যে খাঁটুরার বাঁমোড়, রামনগরের বাঁমোড়, ডুমোর বাঁমোড়, কুল্লের বিল, বায়সার বিল, রুয়ের বিল, রত্নাখাল ও চালুন্দিয়ার বিল প্রভৃতি প্রধান। এই সকল খাল ও বাঁমোড়ে অনেক মৎস্য পাওয়া যায়।

মৎস্যব্যবসা।—এখানকার কোন এক গ্রামের সমস্ত অধিবাসী শুদ্ধ ধীবরের ব্যবসা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে না। প্রায় অধিকাংশ গ্রামেই দুই চারি ঘর ধীবর বাস করিয়া থাকে। কুশদ্বীপের প্রায় সকল বাঁমোড় ও বিল খাল হইতেই মৎস্য ধরা হইয়া থাকে। ইছামতীতে এই কার্য্য অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে এবং বর্ষাকালে তথা হইতে প্রায় প্রতিদিন বহুসংখ্যক ইলিশ মৎস্য এতদঞ্চলে আমদানি হয়। ইলিশ মৎস্যের কার্য্য বর্ষাকালে আরম্ভ হইয়া প্রধানতঃ শীতের প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে। এই প্রদেশের কোন কোন ধীবর শুকৃতি ও লোণা মৎস্যের ব্যবসাও করিয়া থাকে। মৎস্যের ব্যবসার নিমিত্ত প্রত্যেক বাঁমোড় ও বিল খালের অধিস্বামিগণ স্ব স্ব জলকর কোন এক নির্দ্দিষ্ট হারে জমা দিয়া থাকেন। ইহাতেও তাঁহাদের প্রচুর আয় হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে সকল জলাশয়ের জল বহুসংখ্যক জীবের জীবন স্বরূপ ও জমীদারগণের প্রধান আয়ের উপায়ভূত, তাহার প্রতি তাঁহারা বিন্দুমাত্রও দৃষ্টি রাখেন না;

প্রভৃত, এই সকল জলাশয়ের জল অপরিষ্কৃত ও শৈবালময় করিয়া রাখিয়া, বর্ষে বর্ষে অগণ্য জীবের প্রাণবায়ু হরণ করিয়া থাকেন। সেই সকল জলাশয় পরিষ্কার করিবার জন্য একটি পয়সা ব্যয় বা বিন্দুমাত্র আয়াস স্বীকার করিতেও তাঁহারা কষ্ট বোধ করেন।

বন্যজন্তু।—নেকড়ে বাঘ ও বন্য শূকর এতদঞ্চলে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যে মধ্যে শ্রীনগর প্রভৃতির জঙ্গল হইতে বড় বড় ব্যাঘ্রও আসিয়া থাকে। বন্য কুক্কুট ও বন্য রাজহংসও বিল খালে অনেক বিচরণ করে। বিষধর সর্প চারিদিকে অগণ্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং প্রতি বর্ষে দুই দশ জন অধিবাসীর প্রাণবায়ুও হরণ করিয়া থাকে। ইছামতীতে কুম্ভীরাদি অনেক জলজন্তুও আছে। ব্যাঘ্র ও কুম্ভীর মারিয়া শিকারীরা মধ্যে মধ্যে গবর্ণমেণ্ট হইতে বিলক্ষণ পুরস্কার লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সাপুড়েরা বিষধর সর্প ধরিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে একটী পয়সাও পুরস্কার পায় না।

প্রাকৃতিক জাতি বিভাগ।—কুশদ্বীপে কয়টী জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

(১)। বাঙ্গালী জাতি। অধিবাসিগণের মধ্যে ইহাদের সংখ্যাই অধিক এবং ইহারাই প্রকৃত অধিবাসী বলিয়া পরিজ্ঞাত।

(২)। মুসলমান জাতি। ইহাদের মধ্যে কয়েক ঘর পাঠান বংশীয় ব্যতীত অপর সকলেই বাঙ্গালী। অধিবাসিগণের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। সামাজিক অবস্থানে, ইহাদের অবস্থা তাদৃশ উন্নত নহে। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ সামান্য সামান্য তালুকদার ও ব্যবসায়ী। কিন্তু হিন্দুগণের অপেক্ষা মুসলমানগণের অবস্থা অত্যন্ত হীন। এতদঞ্চলে মুসলমানের সংখ্যা অধিক হইবার কারণ এই যে, মোগল সাম্রাজ্যের পূর্ব্বে, পাঠানেরা বলদর্পে অনেক হিন্দুকে মুসলমান করিয়াছিলেন; তাহাদের সন্তান সন্ততিগণ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া, এই শ্রেণী সমধিক সবল করিয়াছে। এ অঞ্চলে মুসলমানগণের যতগুলি সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সকলের মধ্যে 'করাইজি' বা 'সরাই' দল সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত ও পরাক্রান্ত। কিন্তু ইহারাও সাধারণ কৃষিজীবিগণের ন্যায় হলচালন করিয়া, জীবিকা নির্ব্বাহ করে। প্রায় ৫০।৫৫ বৎসর গত হইল, তিতু মিঞা নামক ইহাদের জনৈক দলপতি কতকগুলি সরা একত্র করিয়া,

চব্বিশপরগণার অন্তর্গত নারিকেলবেড়ে নামক গ্রামে বিদ্রোহী হয় এবং অচিরাৎ ব্রিটীশ অগ্নিবাণে ভস্মীভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করে।

(৩)। বুনা জাতি।—বাঙ্গালার পশ্চিমভাগস্থ সাঁওতাল প্রভৃতি বন্য বা পাহাড়ী জাতি। ইহারা সচরাচর বাঁকুড়া, বীরভূম, হাজারিবাগ, ভাগলপুর ও ছোট নাগপুর প্রদেশ হইতে আসিয়া, এ প্রদেশে বাস করিতেছে। যে সময়ে এ প্রদেশে প্রথমে নীলের চাস ইউরোপীয়গণ কর্ত্তৃক বহুলপরিমাণে আরম্ভ হয়, সেই সময় হইতেই ইহারা এদেশে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন, তাহারা প্রধানতঃ মুটিয়া ও কৃষকের কার্য্য করিয়া জীবিকার্জ্জন করে। কিন্তু যাহারা অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থ, তাহারা ঘাসুড়িয়া, ঝাড়ুদার প্রভৃতির কার্য্য করে।

(৪) রাজপুত।—ইহারাও পশ্চিম দেশ হইতে আসিয়া এ প্রদেশে বাস করিতেছেন। সামাজিক অবস্থানে রাজপুতগণ অতীব উচ্চপদবিশিষ্ট এবং উঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ জমীদার। ইহারাও অতি অল্প দিন এ প্রদেশে আগমন করিয়াছেন। ইহারা প্রথমে স্ব স্ব জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় অনুসন্ধান করিবার জন্য, এদেশে আগমন করিয়াছিলেন। আপাততঃ উঁহাদিগের রীতি নীতি ও বেশভূষা বাঙ্গালীর ন্যায় হইয়াছে বটে; কিন্তু আজিও উঁহারা বাঙ্গালীদিগের সহিত এককালে সম্মিশ্রিত হইতে পারেন নাই।

(৫) চামার।—ইহারাও রাজপুতদিগের ন্যায় পশ্চিমদেশীয় লোক। ইহারা অতীব হীনজাতি এবং সংখ্যাতেও নিতান্ত অল্প। উপানৎ প্রস্তুত করাই ইহাদের একমাত্র ব্যবসা। ইহারাও অতি অল্পদিন মাত্র এদেশে আগমন করিয়াছে।

(৬) বেদিয়া।—ইহারা এদেশীয় আদিম জাতিবিশেষ। ইহারা না হিন্দু, না মুসলমান; অথচ, ইহারা হিন্দু মুসলমান কোন দলভুক্ত নহে। ইতিপূর্ব্বে ইহারা ভ্রমণশীল জাতি ছিল। প্রকাশ্যে দিনের বেলায় গণক ও বাজিকার প্রভৃতির বেশ ধারণ করিয়া, জীবিকানির্ব্বাহ করিত; কিন্তু রজনীযোগে চুরী ও ডাকাইতি করিয়া লোকের সর্ব্বনাশ করিত। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে বর্ত্তমান শাসনে যদিও অনেকে তাদৃশ দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে পারে না; কিন্তু আজিও অনেকে নির্দ্দিষ্ট বাসগৃহ প্রস্তুত করে নাই। ইহারা

আজিও গ্রামে গ্রামে সপরিবারে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়—শিবির মধ্যে বাস করে—পশুপাল চারণ করে—বাজিকারের বেশ ধরিয়া নানাবিধ ক্রীড়া কৌতুক দেখায়;—কখন বা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে—এবং সুযোগ পাইলে, দস্যু বা চৌর্য্যবৃত্তি করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

সামাজিক জাতি বিভাগ।—বাঙ্গালীদিগের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে আমরা মুসলমানগণের বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে কুশদ্বীপবাসী হিন্দুগণের তালিকা ও সামাজিক অবস্থানে উহাদের বংশমর্য্যাদা ও ব্যবসায় নিম্নে প্রকটন করিতেছি।

(১) ব্রাহ্মণজাতি।—হিন্দুদিগের মধ্যে এই জাতি সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্তবংশীয় ও উচ্চপদস্থ। এখানে সচরাচর চারি পাঁচ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দৃষ্টিগোচর হয়। উহাদের মধ্যে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র অধিক। দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজা বল্লালসেন এদেশীয় ব্রাহ্মণগণকে যে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ নির্দ্ধারিত করিয়া দেন, সেই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের নামানুসারেই উক্ত দুই শ্রেণীর নামকরণ হইয়াছে। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা প্রথমতঃ ভাগীরথীর পশ্চিম প্রান্তস্থ পরগণা সকল হইতে এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা পদ্মার উত্তর ভূভাগ সকল হইতে আসিয়াছিলেন। হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণজাতিই মহামান্য এবং পৌরহিত্য, শাস্ত্রানুশীলন, শাস্ত্রাধ্যাপনা, ভূস্বামিত্ব, বাণিজ্য ও দাসত্ব প্রভৃতি সকল কার্য্যই করিয়া থাকেন। কোন গ্রামে যত কেন জাতিসংখ্যা থাকুক না, উহাদিগের মধ্যে কিয়দংশ ব্রাহ্মণজাতি থাকিবেই থাকিবে। ইহাদের মধ্যে সর্ব্ববিধ অবস্থাপন্ন লোকই দেখিতে পাওয়া যায়।

(২) বৈদিক ব্রাহ্মণ।—ইহারাও উচ্চপদস্থ ব্রাহ্মণ; ইহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর আচার্য্যগণ ব্রাহ্মণগণের তন্ত্রোক্ত দীক্ষা প্রদান করেন ও অতীব পূজনীয়। ভট্টপল্লীতেই তাদৃশ ব্রাহ্মণগণের সংখ্যা অধিক। ইহাদের অবস্থা, অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগের অবস্থা অপেক্ষা ন্যূন নহে।

(৩) আচার্য্য।—গ্রহবিপ্র, গণক, দৈবজ্ঞ ও জ্যোতিষী প্রভৃতির কার্য্য ইহাদিগের ব্যবসায়। সামাজিক অবস্থানে ইহারা রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা হীনস্থপদস্থ; অবস্থাও তাদৃশ উন্নতনহে। পূর্ব্বকালে ইহারা বৈদিক মন্ত্রের ব্যাখ্যাকর্ত্তা ছিলেন। ইহাদিগকে দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণও বলিয়া থাকে। শাস্ত্রে কথিত আছে—

উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদাধ্যাপয়েৎ দ্বিজঃ।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষ্যতে॥

(৪) ভাট বা ভট্ট।—স্তুতিপাঠ ও কুলপঞ্জিকা কীর্ত্তন প্রভৃতি ইহাদিগের জাতীয় ব্যবসায়। সামাজিক অবস্থানে, ইহাদের অবস্থা তাদৃশ উন্নত নহে। ইহারাও রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, ও আচার্য্য ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা হীনপদস্থ। পূর্ব্বকালে যে ব্রাহ্মণ, বেদচতুষ্টয়ের একখানি কণ্ঠস্থ করিতেন এবং মুখে মুখে উহা আদ্যোপান্ত যথাযথ আবৃত্তি করিতে পারিতেন, তিনিই 'ভট্ট' উপাধি লাভ করিতে পারিতেন। শাস্ত্রে কথিত আছে,

বৈশ্যায়াং শূদ্রবীর্য্যেণ পুমানেকো বভূব হ।
স ভট্টো বাবদূকশ্চ সর্ব্বেষাং স্তুতিপাঠকঃ॥

(৫) বর্ণজ ব্রাহ্মণ।—ইহারা উচ্চশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন; কিন্তু শূদ্রের দান গ্রহণ করিয়া এবং শূদ্রগণের যাজন কার্য্য করিয়া হীনপদস্থ হইয়াছেন। রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক ও আচার্য্য ব্রাহ্মণগণের সহিত ইহাদিগের চলন নাই। সৎব্রাহ্মণগণ ইহাদিগের জলও স্পর্শ করেন না। ইহাদিগের অবস্থা তাদৃশ উৎকৃষ্ট নহে।

(৬) রাজপুত জাতি।—ইহারাও সর্ব্বদা সামাজিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ভূস্বামী, বণিক, রাজদূত প্রভৃতি পদেও ইহারা অভিষিক্ত হইয়া থাকেন। সামাজিক অবস্থানে, ইঁহারা ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা কথঞ্চিৎ হীনপদস্থ; কিন্তু অপরাপর জাতি অপেক্ষা সমধিক সমুন্নত।

(৭) ক্ষেত্রী বা ক্ষত্রিয়।—প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারা পশ্চিমদেশীয় বণিক। ইহারা পূর্ব্বতন আর্য্য ক্ষত্রিয়গণের বংশধর বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন। ইহাদের সংখ্যা অত্যন্ত বিরল।

(৮) বৈদ্যজাতি।—ইহারা পুরুষানুক্রমে চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকাযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। কিন্তু এক্ষণে ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই বাণিজ্যাদির অনুসরণ করিতেছেন এবং অন্যান্য সম্ভ্রমশালী কার্য্যেও ব্যাপৃত হইতেছেন। ইহারাও সচরাচর সমুন্নত ও উৎকৃষ্ট অবস্থাপন্ন। সামাজিক অবস্থানে, ইহারা কায়স্থগণ অপেক্ষা উচ্চপদস্থ নহেন। পূর্ব্বে ইহারা যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেন না; কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা রাজবল্লভ ইহাদিগকে

উপবীত ধারণ করাইয়াছেন। সামাজিক নিয়মানুসারে এই উপবীত কটিদেশে ধারণ করিবার অধিকার আছে; কিন্তু কালধর্ম্মে আজি কালি অনেকেই ব্রাহ্মণ-গণের ন্যায় স্কন্ধদেশেই উপবীত ধারণ করিতেছেন। ইহারা পুরাণোক্ত কংস-কার, শঙ্খকার ও গন্ধবণিকের ন্যায় বর্ণশঙ্কর জাতি। ইহারা বৈশ্যার গর্ভে ও ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতো অম্বষ্ঠোগান্ধিকো বণিক্।
কংসকারশঙ্খকারৌ ব্রাহ্মণাৎ সংবভূবতুঃ॥

(৯) কায়স্থ।—ইহারা শূদ্রগণের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জাতি; আদিশূর রাজার যজ্ঞকালে ইহাদের আদিপুরুষগণ কান্যকুব্জ হইতে আগত পঞ্চ-ব্রাহ্মণের পরিচারক বেশে এদেশে সমাগত হইয়াছিল। পরে রাজা বল্লালসেনের সময় হইতে ইহারাও কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ফলতঃ ইহারা ব্রাহ্মণগণের উপর অতীব ভক্তিমান। ব্রাহ্মণগণও ইহাদের পরিচর্য্যায় অতীব সন্তুষ্ট। সামাজিক অবস্থানে, ইহারা সমধিক সমুন্নত এবং ইহারাই কেরাণী, মুহুরী, দেওয়ানী ও ফৌজদারী সংক্রান্ত উচ্চ কর্ম্মচারী, তালুকদার, বণিক ও বহুবিধ সম্ভ্রমশালী কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। ব্রাহ্মণগণের নিম্নেই ইহা-দিগের আসন প্রদত্ত হয়। সামাজিক আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি ও শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানে ইহারা সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মণগণেরই অনুকারী। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাতেও ইহারা ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা ন্যূন নহেন। তবে, বেদপাঠে ইহা-দিগের অধিকার নাই। ইহাদিগের গৃহের বালবিধবাগণ ও যেরূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়া কঠোর ব্রহ্মচারিণী হন, তাহাতে তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণের বিধবা জ্ঞান হয়।

(১০) গন্ধবণিক।—ইহারা নানাবিধ মসলা বিক্রয় ও দোকানাদি করিয়া, জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহাদের অবস্থা মধ্যবিধ। ইহারাও বৈদ্যগণের ন্যায় পৌরাণিক বর্ণশঙ্কর জাতি।

(১১) আগুরি বা উগ্র ক্ষত্রিয়।—ইহারা উচ্চশ্রেণীস্থ কৃষিজীবী; ইহাদের অবস্থাও সমধিক সমুন্নত। ইহারা আধুনিক জাতি।

(১২) বারুই বা বারুজী।—ইহারা পান আবাদ ও বিক্রয় করিয়া জীবন-যাত্রানির্ব্বাহ করে। ইহারা সচরাচর নির্দ্ধন। ইহারা পরাশর সংহিতোক্ত নবশায়কের অন্তর্গত সংকীর্ণ জাতি। শাস্ত্রে কথিত আছে—

গোপোমালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদকবারুজী।
কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ॥

পরাশর সংহিতায় পূর্ব্বোক্ত সদ্গোপ, মালাকার, তেলি, তাঁতি, ময়রা, বারুই, কুম্ভকার, কর্ম্মকার ও নাপিত, এই নয় জাতি নবশায়ক নামে প্রসিদ্ধ। ইহারাও সংকীর্ণ জাতি বটে, কিন্তু ইহারা সৎ শূদ্র এবং ইহাদের জল ব্রাহ্মণ প্রভৃতির আচরণীয়।

(১৩) তাম্বুলী।—পান প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করাই ইহাদিগের প্রধান উপজীবিকা। ইহাদের প্রায় সমস্ত লোকই পৈতৃক ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়াছে এবং এক্ষণে চিনি ও নানাবিধ ব্যবসায় অবলম্বন ও বৃহৎ বৃহৎ দোকানাদি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। ইহাদের অবস্থা অতীব সমুন্নত। ইহাদের অধিকাংশই প্রচুর ধনশালী। ফলতঃ ইহাদের ন্যায় বাণিজ্য-প্রিয় ও ব্যবসায়-বুদ্ধি-সম্পন্ন জাতি হিন্দুদিগের মধ্যে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা অত্যন্ত সঞ্চয়ী ও কৌলিক প্রথার অনুগামী। শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকাণ্ডেও ইহাদের যার পর নাই শ্রদ্ধা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আজি কালি দুই চারিটি বিলাসী নব্য বাবুও ইহাদিগের মধ্যে শিরোত্তোলন করিয়াছে। ইহারা আধুনিক বর্ণশঙ্কর জাতি।

---

* কুশদ্বীপবাসী মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ ভূতি মহাশয়, নিম্নলিখিত ত্রি-অবয়ব-অনুমান-বাক্যানুসারে প্রমাণ করিয়াছেন যে, তাম্বুলীজাতি পূর্ব্বতন বৈশ্যবর্ণ বলিয়া পরিগৃহীত, পূর্ব্বতন বৈশ্যগণের ন্যায় উপাধি ও উপবীতধারী এবং সেইরূপ সদাচার সম্পন্ন হওয়া একান্ত আবশ্যক। তিনি বলেন, তাম্বুলীগণ বর্ণসঙ্কর হইলেও, পূর্ব্বকালীন অনুলোম বিবাহানুসারে বৈশ্যবর্ণ ভিন্ন অন্য কোনও বর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। মাননীয় ভূতি মহাশয় স্পষ্টাক্ষরে ও অতি প্রশংসীয়রূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে,

১। পূর্ব্বকালে গুণানুসারে বর্ণভেদ হইত;

২। বাঙ্গালার অধিকাংশ বঙ্গীয় সৎশূদ্র বৈশ্য গুণান্বিত;

৩। সুতরাং অধিকাংশ বঙ্গীয় সৎশূদ্র বৈশ্যত্ব লাভ করিতে পারে;

পূর্ব্বোক্ত ত্রি-অবয়ব-অনুমান বাক্যানুসারে দেখা যাইতেছে, যখন তাম্বুলীগণ বঙ্গীয় সৎ-শূদ্র বলিয়া পরিচিত, তখন উহাদিগের বৈশ্যত্ব লাভ অবশ্যই অশাস্ত্রীয় ও অনধিকৃত নহে। আমরা বলি, বঙ্গীয় সৎ-শূদ্রমাত্রেরই এইরূপ শূদ্রভাব পরিত্যাগ ও পৌরাণিক

(১৪) তেলী বা তৈলী।—তিলাদি শস্যের ব্যবসায়ই ইঁহাদিগের প্রধান উপজীবিকা; ইহারাও তাম্বুলীগণের ন্যায় ব্যবসাপ্রিয়। ইহারাও পৈতৃক ব্যবসা ত্যাগ করিয়াছে এবং জমীদারী ও ব্যবসা বাণিজ্য করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। ইহারাও ধনশালী ও ক্ষমতাপন্ন এবং পরাশর সংহিতোক্ত নবশায়কের অন্তর্গত সংকীর্ণ জাতি।

(১৫) সদ্গোপ।—ইহারা কৃষিজীবী ও সচরাচর নির্দ্ধন। ইহারাও নবশায়কের অন্তর্গত সংকীর্ণ জাতি। পুরাণে ইহারা গোপ নামে প্রসিদ্ধ।

(১৬) মালাকার বা মালী।—ইহারা উদ্যান রক্ষক, ফুল বিক্রেতা ও মালা প্রস্তুতকারী। ইহারা সচরাচর নির্দ্ধন। ইহারাও নবশায়কের অন্তর্গত এবং পুরাণোক্ত ষট্ শিল্পীর মধ্যগত বর্ণশঙ্কর জাতি। শাস্ত্রে লিখিত আছে,—

বিশ্বকর্ম্মা চ শূদ্রায়াং বীর্য্যাধানং চকার সঃ।
ততো বভূবুঃ পুত্রাশ্চ ষড়েতে শিল্পকারিণঃ॥
মালাকারঃ কর্ম্মকারঃ শঙ্খকারঃ কুবিন্দকঃ।
কুম্ভকারঃ কংসকারঃ ষড়েতে শিল্পিনো নরাঃ॥

অর্থাৎ বিশ্বকর্ম্মা শূদ্রার গর্ভে যে গর্ভাধান করেন, তাহাতে ছয় পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। সেই ছয় পুত্রের বংশধরেরাই ক্রমান্বয়ে মালাকর, কর্ম্মকার, শঙ্খকার, কুবিন্দক (তাঁতি), কুম্ভকার ও কংসকার এই ছয় প্রকার শিল্পী বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। ইহারাই পৌরাণিক শিল্পী জাতি।

আর্য্যভাব প্রাপ্তির জন্য; কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করা উচিত। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুজাতির মধ্যে এই পৌরাণিক আর্য্যভাব যতই সংক্রামিত হইয়া আসিবে—যতই হিন্দু আপনাকে হিন্দু বলিয়া চিনিতে পারিবেন—যতই হিন্দুর সুপবিত্র সদাচার সকল দৃঢ়মূল হইয়া, কলুষিত বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ মধ্যে চিরপ্রোথিত ও বদ্ধমূল হইতে থাকিবে—ততই অধঃপতিত হিন্দুর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে। আজি কালি যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে সহজেই বোধ হয়, যেন বৈশ্যবর্ণ বাঙ্গালার হিন্দু সমাজ হইতে এককালে নিষ্কাশিত ও লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু বস্তুগত্যা তাহা নহে;—বৈশ্যবর্ণ এইরূপে সৎশূদ্রমণ্ডলীর সহিত সংমিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। সেই জন্য, যাহাতে এই সঙ্কীর্ণতা বিদূরিত হইয়া, বর্ত্তমান সমাজ সংস্কৃত ও পবিত্র হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করা, বঙ্গীয় সৎশূদ্র ও আর্য্যসমাজ সংস্কারক ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

(১৭) কামার বা কর্ম্মকার।—ইহারা লৌহগঠন কারক; কেহ কেহ স্বর্ণের অলঙ্কারাদিও প্রস্তুত করে। ইহাদের অবস্থা মধ্যবিধ। কামার ও শেকরা উভয়ই নবশায়ক ও ষট্ শিল্পীর অন্তর্গত সংকীর্ণ জাতি; বৃত্তিভেদে ইহাদের আখ্যা বিভিন্ন হইয়াছে। পরাশর সংহিতায় উভয় জাতি কর্ম্মকার নামে প্রসিদ্ধ।

(১৮) শেকরা বা স্বর্ণকার।—ইহারা স্বর্ণ রৌপ্যাদির অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ লৌহের গঠনও প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহারা সচরাচর মধ্যবিধ অবস্থাপন্ন।

(১৯) কাঁসারি বা কংসকার বা কাংস্য বণিক্।—ইহারা কাঁসা ও পিত্তলের তৈজস প্রস্তুত করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে। ইহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত। ইহারা পুরাণোক্ত ছয় প্রকার শিল্পীর মধ্যে অন্যতম এবং নবশায়কের অন্তর্গত বর্ণশঙ্কর জাতি।

(২০) কুমার বা কুম্ভকার।—ইহারা মৃণ্ময় পাত্র ও মৃত্তিকার মূর্ত্তি প্রস্তুত কারী। ইহারাও সচরাচর মধ্যবিধ অবস্থাপন্ন। ইহারা নবশায়কের অন্তর্গত ও পুরাণোক্ত ষট্ শিল্পীর মধ্যগত বর্ণশঙ্কর জাতি।

(২১) শাঁখারি বা শঙ্খকার বা শঙ্খবণিক।—ইহারা শঙ্খের গঠন প্রস্তুত-কারী। ইহাদের অধিকাংশই নির্দ্ধন। ইহারা পুরাণোক্ত ছয় প্রকার শিল্পীর মধ্যে অন্যতম এবং নবশায়কের অন্তর্গত বর্ণশঙ্কর জাতি।

(২২) তন্তুবায় বা তাঁতি।—ইহারা বস্ত্র-বয়ন করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত। ইহারা পুরাণোক্ত বৈদ্যজাতির ন্যায় বর্ণশঙ্কর ষট্ শিল্পীর অন্যতম ও নবশায়কের অন্তর্গত জাতি।

(২৩) ময়রা বা মোদক।—ইহারা নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত ও বিক্রয় করে। ইহারা সচরাচর মধ্যবিধ অবস্থাপন্ন। ইহারাও নবশায়কের অন্তর্গত সংকীর্ণ জাতি।

(২৪) নাপিত।—ইহারা ক্ষৌরকর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহারা সচরাচর নির্দ্ধন। ইহারা নবশায়কের অন্তর্গত সংকীর্ণ জাতি।

নিম্ন লিখিত কয়টী জাতি অপেক্ষাকৃত অল্প সম্ভ্রান্ত; কিন্তু এককালে ঘৃণিত বা অস্পৃশ্য নহে।

(২৫) গোপ বা গোয়ালা।—ইহারা ধেনুপালক ও ধেনুরক্ষক, এবং দুগ্ধ ও নবনীতাদি বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহারা প্রায়ই নির্দ্ধন।

(২৬) কোইরী।—ইহারা কৃষিজীবী; কিন্তু প্রায়ই নির্দ্ধন।

(২৭) কুর্ম্মী।—ইহারা কৃষিজীবী ও সচরাচর নির্দ্ধন।

(২৮) কৈবর্ত্ত।—ইহারা জোৎ জমা রাখিয়া থাকে, এবং সামান্য সামান্য বাণিজ্য ব্যবসাও করিয়া থাকে। ইহাদের কেহ কেহ কৃষিজীবী ও ভৃত্য। শাস্ত্রানুসারে ইহারা প্রথমে মৎস্যজীবী ছিল। কিন্তু আজি কালি ইহাদের অতি অল্প সংখ্যক লোকই উক্ত ব্যবসা করিয়া থাকে। এই জাতি বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই অগণ্য বাস করিয়া থাকে। ইহারা সচরাচর মধ্যবিধ অবস্থাসম্পন্ন। স্ত্রী পুরুষেরা প্রধানতঃ প্রত্যহ বাজারে তরকারি ও ফলমূল বিক্রয় করে।

(২৯) সূত্রধর বা ছুতার।—কাষ্ঠের গঠনাদি নির্ম্মাণ করিয়াই ইহারা প্রধানতঃ জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহারা অধিকাংশই অমিতব্যয়ী ও নির্দ্ধন।

(৩০) বৈষ্ণব।—ইহারা কোনও বর্ণ বিশেষ নহে; সম্প্রদায় বিশেষ মাত্র। ইহাদের বিষয় আমরা স্থানান্তরে বিশদভাবে আলোচনা করিব। ইহারা প্রধানতঃ ভিক্ষোপজীবী ও নির্দ্ধন।

নিম্নলিখিত কয়েকটী জাতি ঘৃণিত ও উচ্চতম শ্রেণীর অস্পৃশ্য।

(৩১) তিলী।—তৈল প্রস্তুত করাই ইহাদিগের প্রধান জীবিকা; কিন্তু আজি কালি অনেকেই পৈতৃক ব্যবসা ত্যাগ করিয়াছে। এক্ষণে ব্যবসা বাণিজ্য করিয়াই, ইহারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। ইহারা সচরাচর মধ্যবিধ অবস্থাপন্ন।

(৩২) সুবর্ণ-বণিক।—ইহারা সুবর্ণ ও রৌপ্য বিক্রয় করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই বৃদ্ধিজীবী ও জমীদার। ইহাদের অবস্থা অতীব উন্নত। ইহাদের মধ্যে কয়েক ঘর বিশেষ ধনশালী।

(৩৩) চাসাধোবা।—ইহারা কৃষিজীবী ও সচরাচর নির্দ্ধন।

(৩৪) গাঁরারি বা গাঁড়াল।—ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। সচরাচর কৃষিকর্ম্মই ইহাদিগের ব্যবসা। ইহাদের অবস্থা অতীব ঘৃণিত।

(৩৫) শৌণ্ডিক বা শুঁড়ি।—সুরা প্রস্তুত ও সুরা বিক্রয় করিয়াই ইহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহাদের অবস্থা উন্নত।

(৩৬) রজক বা ধোপা।—ইহারা সাধারণের বস্ত্র পরিষ্কার ও ধৌত করিয়া, জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। ইহারা সচরাচর নির্দ্ধন।

(৩৭) যোগী।—ইহারাও বস্ত্র বয়ন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহারাও সচরাচর নির্দ্ধন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ সংপ্রতি উপবীত ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু সামাজিক অবস্থানে ইহারা ইতিপূর্ব্বে যেরূপ হেয় ও ঘৃণিত ছিল, এখনও তাহাই আছে। সাধারণে ইহাদের জল পর্য্যন্ত স্পর্শ করে না।

(৩৮) কলু।—ইহারা পেষণী যন্ত্রে (ঘানিতে) তৈল নিষ্পেষণ ও বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহারা প্রধানতঃ নির্দ্ধন।

(৩৯) কপালী বা কাপালিক।—ইহারা গনি ও থলি প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহারা প্রধানতঃ নির্দ্ধন।

(৪০) জেলে।—ইহারা মৎস্যজীবী ও নৌকাদি চালনা করিয়া থাকে। ইহারা সচরাচর নির্দ্ধন।

(৪১) মালা।—ইহারাও মৎস্যজীবী ও নৌকাদির চালনা করে। ইহারাও সচরাচর নির্দ্ধন।

(৪২) পাটনী।—ইহারাও নৌকাদির চালনা করে; কিন্তু ইহারা প্রধানতঃ খেয়াঘাটার পারাণি কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। ইহারাও নির্দ্ধন।

(৪৩) রাজবংশীয়।—ইহারা মৎস্যজীবী ও কৃষিজীবী। ইহারাও নির্দ্ধন।

(৪৪) তিওর।—ইহারা মৎস্যজীবী ও ধীবর জাতীয়। কিন্তু এক্ষণে উহারা পৈতৃক কার্য্য ত্যাগ করিয়া প্রায় অনেকেই রাজমিস্ত্রী, কাষ্ঠমিস্ত্রী, ঘরামি ও নানাবিধ কার্য্যকলাপ করিয়া, জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। ইহারাও নির্দ্ধন।

(৪৫) পোদ।—ইহারা সামান্য মৎস্যজীবী ও কৃষিকুশল; ইহারাও নির্দ্ধন।

(৪৬) বেহারা।—ইহারা শ্রমজীবী; প্রধানতঃ ইহারা শিবিকাবহন কার্য্য করিয়া দিনপাত করে; ইহারাও নির্দ্ধন।

(৪৭) রমণী কাহার।—ইহারা শুদ্ধ শিবিকা বহন কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহারাও নির্দ্ধন।

(৪৮) চুনারি।—শম্বুকাদি ভস্ম করিয়া চুন প্রস্তুত করাই ইহাদিগের প্রধান উপজীবিকা। ইহারাও নির্দ্ধন।

(৪৯) লাহেরী বা নুরী।—ইহারা গালার চুড়ী ও অন্যান্য গালার দ্রব্য প্রস্তত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহারাও নির্দ্ধন।

(৫০) কান বা কিন্নর।—ইহাদের কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই নৃত্য গীতাদি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এক্ষণে ইহাদের অনেকেই পৈতৃক ব্যবসা ত্যাগ করিয়াছে এবং ইহারা দৈনিক শ্রমজীবী হইয়া ও সামান্য কৃষিকার্য্য করিয়া, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে। ইহারাও নির্দ্ধন এবং ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। বিখ্যাত ঢপ ও কীর্ত্তন গায়ক মধুসূদন কান এই বংশসম্ভূত।

(৫১) চণ্ডাল।—ইহারা কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী, গ্রাম্য চৌকিদার এবং কখন ঠিকা মুটিয়ার কাযও করিয়া থাকে। ইহারা সচরাচর নির্দ্ধন। ইহারা অতি পৌরাণিক জাতি।

(৫২) বেলদার।—ইহারা নিত্য শ্রমজীবী ও নির্দ্ধন।

(৫৩) বাইতি।—ইহারা মাদুর চেটাই বুনিয়া এবং মহোৎসবে ঢোল ও সানাই প্রভৃতি বাজাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহারাও নির্দ্ধন।

(৫৪) বাগ্‌দী।—ইহারা মৎস্যজীবী, কৃষী, গ্রাম্য চৌকীদারি প্রভৃতির কার্য্য করিয়া দিনপাত করে। ইহারাও সচরাচর নির্দ্ধন।

(৫৫) বাউরি।—ইহারা বাগ্‌দী জাতীয় এবং মৎস্যজীবী, কৃষিজীবী ও শিবিকাবাহক। ইহারাও নির্দ্ধন।

(৫৬) ভূঁইমালী।—ইহারা মৃত্তিকার প্রাচীর প্রস্তত করে এবং ইহারা উদ্যানপালক ও কৃষিজীবী। ইহারাও নির্দ্ধন।

(৫৭) মাল। ইহারা সর্প ধরিয়া থাকে ও সর্পের ক্রীড়াদি দেখাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহারাও সচরাচর নির্দ্ধন।

(৫৮) শিকারী।—ইহারা ব্যাধের কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহারাই পৌরাণিক ব্যাধ জাতির বংশসম্ভূত ও চণ্ডাল জাতির সমশ্রেণীস্থ। ইহারাও নির্দ্ধন।

(৫৯) দুলিয়া।—ইহারা বাগ্‌দী জাতীয়; শিবিকা বহন কার্য্যে ইহারা অত্যন্ত তৎপর। ইহারাও নির্দ্ধন।

(৬০) ডোম।—ইহারা বাঁশের ও বেতের ঝুড়ি চুবড়ী প্রভৃতি প্রস্তত করিয়া,

জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহারা শূকর পালন, চারণ, ভক্ষণ ও বিক্রয় করিয়া থাকে। ইহারাও নির্দ্ধন।

(৬১) কাওরা।—ইহারাও শূকরের ব্যবসা করে। শিবিকা বহন কার্য্যেও ইহারা তৎপর। ইহারাও নির্দ্ধন।

(৬২) হাড়ি।—ইহারাও পূর্ব্বোক্ত জাতিত্রয়ের ন্যায় শূকর ব্যবসায়ী, শিবিকা-বাহক ও গ্রাম্য চৌকিদার। ইহারাও নির্দ্ধন। কেহ কেহ বিষ্ঠাদিও পরিষ্কার করে।

(৬৩) চামার বা মুচি।—ইহারা গরুর চর্ম্ম পরিষ্কার ও বিক্রয় করে এবং বিনামা ও অন্যান্য চর্ম্মের কার্য্য করিয়া থাকে। ইহারাও নির্দ্ধন।

(৬৪) মেথর।—বিষ্ঠা মূত্রাদি পরিষ্কার করাই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ইহারাও নির্দ্ধন ও হাড়িজাতির সমশ্রেণীস্থ।

(৬৫) মুর্দ্দফরাস।—ইহারা শবাদি বহন করে। ইহারাও অত্যন্ত নির্দ্ধন। ইহাদের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প।

কুশদ্বীপে হিন্দুদিগের মধ্যে উল্লিখিত জাতি গুলি দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমানগণের কোনও জাতিবিভাগ নাই; কিন্তু সামাজিক অবস্থানে মুসলমানেরা নিম্নলিখিত কয় প্রকার সম্প্রদায় বা ব্যবসায়ীকে অত্যন্ত ঘৃণা করিয়া থাকে।

(১) নিকারি।—ইহারা মৎস্যজীবী এবং ইহারা নৌকাদির পরিচালন ও ফলাদি বিক্রয় করিয়া থাকে। ইহারাও নির্দ্ধন।

(২) নালুয়া।—ইহারা বেতের চেটাই প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহারাও নির্দ্ধন।

(৩) জোলা।—হিন্দুদিগের মধ্যে যোগীরা যে শ্রেণীস্থ, মুসলমানগণের মধ্যে জোলারাও সেই শ্রেণীস্থ। বস্ত্রবয়নই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ইহারাও নির্দ্ধন।

(৪) কলু।—হিন্দু কলু ও তিলীর ন্যায় ইহারাও ঘানিতে তৈল প্রস্তুত করে। ইহারা সচরাচর নির্দ্ধন।

৫। পটুয়া।—ইহারা প্রতিমা চিত্র ও পটাদি অঙ্কন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহারাও নির্দ্ধন।

৬। ছুতার। ইহারা সাধারণতঃ কৃষিজীবী ও দৈনিক শ্রমজীবী। ইহারা পূর্ব্বে হিন্দু ছিল। পাঠানেরা ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণকে বলদর্পে মুসলমান করিয়াছে। কুশদ্বীপের মধ্যে খাঁটুরা গ্রামেই ইহাদের সংখ্যা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা অতীব নির্দ্ধন।

সম্প্রদায়।—এই সমস্ত জাতি ভিন্ন হিন্দুদিগের মধ্যে অনেক সম্প্রদায় দৃষ্টিগোচর হয়। যথা, বৈষ্ণব, কর্ত্তাভজা, বলরামভজা, ব্রাহ্ম ইত্যাদি; সেই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষ্ণব সম্প্রদায় সর্ব্বপ্রধান।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়। ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপে চৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা। বৈষ্ণবেরা প্রথমতঃ এক সম্প্রদায় মাত্র ছিল। পরিশেষে, উহারা অপেক্ষাকৃত বদ্ধমূল হইয়া ও স্ব স্ব পিতামাতা ও স্বজন বান্ধব ত্যাগ করিয়া, একটী জাতিরূপে গঠিত হয়। ইহারা বিষ্ণুর উপাসক। ইহারা নীচ হিন্দুবংশ হইতে স্ব স্ব অনুচর বা শিষ্য সংগ্রহ করে। ইহাদের মধ্যে কোনও জাতিভেদ বা উচ্চ নীচ শ্রেণী নাই;—সকলেই ভ্রাতৃভাবে আবদ্ধ। চৈতন্যের প্রথম শিষ্যদ্বয়ের অন্যতম অদ্বৈতের বংশধরগণ শান্তিপুরে বাস করিতেছে। তজ্জন্য, ইহারা শান্তিপুরকে অতি পবিত্র তীর্থ বলিয়া বিবেচনা করে। প্রথমে যে উচ্চ মত ও উন্নতিশীল ধর্ম্মনীতি অবলম্বন করিয়া, এই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়, কালক্রমে তাহা নিতান্ত অবনত হইয়া আইসে। সুতরাং উহা সাধারণের নিতান্ত অবজ্ঞাভাজন হয়। ইহাদিগের কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ফলতঃ ভিক্ষা, সার্ব্বজনীন প্রেম ও সন্ন্যাসই ইহাদিগের সারধর্ম্ম। ইহাদের মধ্যে ব্যভিচারিতা অত্যন্ত প্রবল; বিশেষতঃ স্ত্রীগণের সতীত্ব নাই বলিলে হয়।

কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়।—বৈষ্ণব দলের ন্যায় কর্ত্তাভজা দল বলিয়াও আর এক সম্প্রদায় আছে। প্রায় তিন চারি পুরুষ অতীত হইল, কাচড়াপাড়া হইতে তিন ক্রোশ পূর্ব্বে, নদীয়া জেলার অন্তর্গত ঘোষপাড়া গ্রামে এই সম্প্রদায় সর্ব্বপ্রথমে গঠিত হয়। রামশরণ পাল নামক জনৈক সদ্গোপ ইহার স্থাপয়িতা এবং আউলচাঁদ নামক একজন উদাসীন ইহার প্রবর্ত্তয়িতা।

অত। ১৬১৬ শকের ফাল্গুন মাসে উলার মহাদেব বারুই তদীয় ইক্ষুক্ষেত্রে আট বৎসরের একটী বালক কুড়াইয়া পায়। বালকটী বার বৎসর উক্ত বারুই

ঘরে থাকিয়া কোথায় চলিয়া যায় এবং নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া, সাতাইশ বৎসর বয়সে বেজপাড়া নামক গ্রামে উপস্থিত হয়। ইহারই নাম আউলচাঁদ। এই স্থানে তেইশ জন শিষ্য ইহার অনুগত ও সমভিব্যাহারী হয়। তৎপরে, রামশরণ পাল, ইহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করে। এই সময়ে উক্ত স্থানে একটী গান উঠে।—

"এ ভবের মানুষ কোথা হতে এল;
এনার নাইক রোষ, সদাই তোষ,
মুখে বল সত্য বল।
এনার সাথে বাইশ জন,
সবার একটী মন,—
জয় কর্ত্তা বলি, বাহু তুলি
কল্লে প্রেমের চলাচল।
এ যে হীরা দেওয়ায়, মরা বাঁচায়,
এর হুকুমে গঙ্গা শুকুল।"

১৬৯৯ শকে বোরালে গ্রামে আউলচাঁদের মৃত্যু হয়। হিন্দু ও মুসলমান সকলকেই ইনি সমান ভাবিতেন ও সকলেরই অন্ন গ্রহণ করিতেন। মুসলমানেরা ইহার নাম আউলচাঁদ রাখে;—কর্ত্তাভজারা ইহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া থাকে। তাহারা কহে, কৃষ্ণচন্দ্র, গৌরচন্দ্র ও আউল চন্দ্র—তিনে এক, একে তিন। ইহারা আরও বলে, মহাপ্রভু চৈতন্যদেব পুরুষোত্তমে কলেবর ত্যাগ করিয়া, আউল প্রভুরূপে আবির্ভূত হন। শ্রীকৃষ্ণের সহস্র নামের ন্যায়, ইহারও সহস্র নাম আছে। কর্ত্তাভজারা বলে, ইনি অনেক অলৌকিক ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। ইনি অন্ধকে চক্ষু ও খঞ্জকে পদ প্রদান এবং রোগীকে সুস্থ, মৃতকে সজীব ও দরিদ্রকে ধনী করিয়াছেন। ইনি খড়ম পায়ে গঙ্গার উপর দিয়া চলিয়া যাইতেন।

রামশরণ, প্রথমতঃ কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার এই সময়ের পবিত্র স্বভাব দেখিয়া, অনেকেই ইহার প্রতি প্রগাঢ়রূপে অনুরক্ত হয়। প্রবাদ আছে, একদিন রামশরণ পশুপাল চারণ করিতেছেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ আউলচাঁদ আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হন, এবং

তাঁহার নিকট এক পাত্র দুগ্ধ যাচ্ঞা করেন। তাহাতে রামশরণ অতীব ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, দলমধ্যগত একটী গাভীকে দোহন করিয়া, আউলচাঁদকে একপাত্র দুগ্ধ প্রদান করেন। আউলচাঁদ সেই দুগ্ধ পাত্র পান করিতেছেন, এমন সময়ে একটী লোক রামশরণের বাটী হইতে দৌড়িয়া আসিয়া বলিল—"রামশরণের সহধর্ম্মিণী অত্যন্ত পীড়িতা হইয়াছেন;—বোধ হয়, এ যাত্রা তিনি রক্ষা পাইবেন না।" এই কথা শুনিয়া আউলচাঁদ রামশরণকে নিকটে আহ্বান করিয়া, নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণী হইতে এক কলসী জল আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে রামশরণ জল লইয়া আসিলে, আউলচাঁদ সেই জল তাঁহার স্ত্রীর মুখে ও চক্ষে ছিটাইয়া দিতে কহিলেন। কিন্তু রামশরণ ব্যস্ততা প্রযুক্ত সেই জল মাটিতে ঢালিয়া ফেলিলেন এবং নিতান্ত ভগ্নাশ ও মর্ম্মপীড়িত হইয়া, আউলচাঁদের নিকট ফিরিয়া আসিলেন এবং উপস্থিত দুর্ঘটনার বিষয় যথাযথ বর্ণন করিলেন। ইতিমধ্যে রামশরণের ভার্য্যা ক্রমে ক্রমে মুমূর্ষুভাবাপন্ন হইয়া আসিলেন। তখন আউলচাঁদ যে স্থানে সেই জল কলস পড়িয়া গিয়াছিল, সেই স্থানের কিয়দংশ মৃত্তিকা ও জল লইয়া সবেগে রামশরণের বাটীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং মুমূর্ষু রামশরণ বনিতার সর্ব্বাঙ্গ সেই কর্দ্দমে অভিষিক্ত করিয়া দিলেন। এই দৈবানুগ্রহের ফল দেখাইবার জন্য, তিনি ইহাও প্রকাশ করিলেন যে, তিনি অচিরাৎ রামশরণের ভার্য্যা শচীমাতার গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, রামদুলাল নামে প্রসিদ্ধ হইবেন।

অন্তর্দ্ধান হইবার পূর্ব্বে, আউলচাঁদ রামশরণকে ডাকিয়া এই আদেশ করিয়াছিলেন যে, "প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যার পরে আমার পূজার অনুষ্ঠান করিও এবং তোমার ভার্য্যা শচীমাতার মৃত্যু হইলে তাঁহার শব ঐ দাড়িম্ব বৃক্ষের মূলে সমাধি প্রদান করিও।" তদবধি উক্ত স্থান রামশরণের সম্প্রদায়স্থ যাবদীয় লোকের প্রধান তীর্থ রূপে পরিগণিত হইয়া রহিয়াছে।

যৌবনকাল হইতেই রামদুলাল তদীয় ভাবি-জীবনের পরিচয় প্রদান করেন এবং ষোল বৎসর বয়স উত্তীর্ণ না হইতে হইতেই, আপনাকে অবতার বিশেষ বলিয়া প্রকাশ করেন। প্রকৃত কর্ত্তাভজার দল এই সময় হইতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কর্ত্তাভজা শব্দের প্রকৃত অর্থ, কর্ত্তার (সৃষ্টিকর্ত্তার) উপাসক দল। রামদুলাল এই সম্প্রদায়ের প্রধান নেতা বটে কিন্তু রামশরণই প্রথম কর্ত্তা

বা ঠাকুর বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়া থাকেন। ইহার পদ পৈতৃক এবং বংশের মধ্যে শুদ্ধমাত্র পুরুষেরাই এই পদের অধিকারী। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রভৃতি কর্ত্তাভজারা এই কর্ত্তা বা ঠাকুরকে প্রণাম করে—পদধূলি লয়—ও পাতের প্রসাদ খাইয়া পবিত্র হয়। ইহারা বলিয়া থাকে যে, পাপিদিগকে রক্ষা করিবার কর্ত্তার ক্ষমতা আছে এবং কর্ত্তাই প্রকৃত প্রস্তাবে পাপীদিগের অভয়-দাতা ও প্রতিভূ। কর্ত্তা নিষ্পাপ এবং যে কার্য্য অন্যের চক্ষে দুষ্কার্য্য বলিয়া প্রতীত হয়, যদিও তিনি কখন কখন তাদৃশ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন; কিন্তু সে সকলও শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের লীলা খেলার ন্যায়, পার্থিব লীলা বলিয়াই সাধারণের অবধারণ করা কর্ত্তব্য। কর্ত্তা বা সম্প্রদায়ের নেতা বিবাহ করিতে পারেন এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি অনেকগুলি বিবাহও করিয়া থাকেন। কর্ত্তার উপরে বিশ্বাস ও প্রতিদিন তিন বার করিয়া উহাদের ধর্ম্মের বীজমন্ত্র উচ্চারণ করাই উহাদিগের মুক্তির একমাত্র উপায়।

কর্ত্তার সহিত এই সম্প্রদায়ের অধিস্বামিত্ব সম্বন্ধ পোপের ন্যায় চিরন্তন। কর্ত্তা কতকগুলি প্রতিনিধি বা গুরু নিয়োগ করিয়া, ধর্ম্মপ্রচার করেন। এই প্রতিনিধি বা গুরুগণকে 'মহাশয় ও শিষ্যদিগকে 'বরাতি' কহে। গুরু শিষ্যগণকে প্রথমে 'গুরুসত্য' এই এক আনা মন্ত্র দান করেন। শিষ্যগণ এই মন্ত্রে পরিপক্ক হইলে, তিনি তাহাদিগকে ষোল আনা মন্ত্র দেন। ষোল আনা মন্ত্র এই, যথা ;—

"কর্ত্তা আউলে মহাপ্রভু,
আমি তোমার সুখে চলি ফিরি,
তিলার্দ্ধ তোমা ছাড়া নহি ;
আমি তোমার সঙ্গে আছি,
দোহাই মহাপ্রভু!

কর্ত্তার ব্যয়ভার সঙ্কুলানের জন্য সম্প্রদায়ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে সাধ্যানুরূপ কিছু কিছু বাৎসরিক দান করিতে হয়। নির্দ্ধন ব্যক্তিরাও এই অভিপ্রায় সাধনের জন্য প্রতিদিন এক এক মুষ্টি চাঁউল পৃথক করিয়া রাখিয়া দেয়। এই দানকে উহারা "খাজনা" কহে। মহাশয়গণ বৎসরান্তে এই দান কর্ত্তার গদীতে কর্ত্তার নিকট আনিয়া দেয়। মহাশয়গণই এই খাজনা আদায়ের জন্য কর্ত্তার

নিকট দায়ী। মহাশয়দিগের লাভ, তাহারা শিষ্যের বাটীতে পরমাদরে খাইতে পায়—বস্ত্র পায়—এবং আরও কত নানাবিধ দ্রব্য পাইয়া থাকে।

যখন কর্ত্তারা পরিবার পরিবৃত হইয়া, স্বীয় গ্রাম মধ্যে বাস করেন, তখন তাঁহারা আপনাদিগের বংশগত কুলমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু যখন তাঁহারা মেলা মহোৎসবে অবস্থিতি করেন; তখন জাতিভেদ স্বীকার ও উচ্ছিষ্ট বিচার করেন না; কিন্তু কাচড়াপাড়ার বৈষ্ণকর্ত্তাভজাগণ জাতিভেদ স্বীকার করে। ইহারা সমকক্ষবোধে, সকলেই একাসনেও এক পাত্রে অন্নাহার করে এবং পরস্পরকে ভ্রাতা ভগিনীর ন্যায় সম্বোধন করিতে থাকে। কর্ত্তাদিগের জন্মভূমি ঘোষপাড়াতে বৎসরে দোল ও রাস এই দুই উৎসব হইয়া থাকে। সেই সময়ে মুসলমান, বৈষ্ণব, নেড়ানেড়ী ও অন্যান্য সকল প্রকারের নীচ জাতি, এমন কি, হাড়ি ও চামার পর্য্যন্ত সমাগত হয় এবং এক পাত্রে ১২ জন স্ত্রী ও ৮ জন পুরুষ একত্র বসিয়া অন্নাহার করে। এই সময়ে ঘোষপাড়ার পালকর্ত্তাদিগের বাটীতে পর্ব্বতাকার ভাত রন্ধন হয় এবং মহাশয়েরা সশিষ্য আসিয়া মহাসমারোহে দলে দলে আহার করিতে থাকে। ইহাদের ধর্ম্মের মূল সত্য, সকলেই এক পিতার সন্তান ও সকলেই ভ্রাতা ভগিনী সম্বন্ধে সম্বন্ধ। প্রেম উহাদের ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি এবং উহার জন্যই তাহারা পরস্পরকে "দাদা" ও "দিদি" সম্বোধন করে। উহাদের বিশ্বাস যে, ষোল আনা মন্ত্রজপ ও এই প্রেমানুষ্ঠান দ্বারা ক্রমে ক্রমে সিদ্ধি লাভ হয়। ইহারা মধ্যে মধ্যে বৈঠক করিয়া নানা আমোদে সমস্ত রাত্রি অতিবাহন করে। শুনা গিয়াছে, বস্ত্র হরণ পর্য্যন্ত ইহাদের বাকি থাকে না। কর্ত্তাভজার মহাশয়রা কহে—মন্ত্রদাতা জগৎ প্রভু আউলচাঁদের স্বরূপ। কর্ত্তাভজারা ইন্দ্রিয় দোষেরও ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়াছেন; —তাঁহারা বলেন,

মেয়ে হিজড়ে পুরুষ খোজা—
তবে হয় কর্ত্তাভজা।

সুরাপান ইহাদের পক্ষে এককালে নিষিদ্ধ; এমন কি, সুরা স্পর্শ করাকেও ~~ইহারা~~ মহাপাপ বলিয়া বিবেচনা করে। কিন্তু বর্ত্তমান কর্ত্তা এতৎসম্বন্ধে মৌলিক মত হইতে বহুল পরিমাণে স্খলিত পদ হইয়াছেন। এই সম্প্রদায়ের

লোকেরা মাংস ভক্ষণেও মহা প্রত্যবায় জ্ঞান করে ; এমন কি, উহারা হিন্দু-দিগের বলি পর্য্যন্তও দেখে না। কর্ত্তা হিন্দুদিগের পূজা পার্ব্বণ বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করেন ; কিন্তু ইঁহার উপাসকমণ্ডলীর সে অধিকার নাই। কোন প্রকাশ্য মণ্ডলীতে সাধারণের ভজনা করার প্রথাও, ইহাদের পক্ষে এককালে নিষিদ্ধ। ইহাদের কোনও উপাসকই ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মত কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পায় না। উহাদের কতকগুলি চিহ্ন আছে ; তদ্দ্বারাই তাহারা স্ব স্ব সহযোগীকে চিনিয়া লইতে পারে। কিন্তু ইহারা পরিচ্ছদের কোনও বিভিন্নতা করে না। উহারা এই মত পোষণ করে যে, "ঈশ্বর নিরাকার এবং অদৃশ্য নহেন।" ইহাদের কোনও ধর্ম্মগ্রন্থ নাই ; কিন্তু ইহারা পরম্পরা-গত জনশ্রুতিমূলক মতের উপর বিলক্ষণ আস্থা প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহাদের প্রধান মহোৎসব দোল ও রাসযাত্রা। দোল, ফাল্গুণী পূর্ণিমাতে ও রাস, কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে অনুষ্ঠিত হয়। মহোৎসব চারি দিন ধরিয়া চলিতে থাকে। এতদুপলক্ষে প্রায় পঞ্চাশ হাজার যাত্রী ঘোষপাড়ায় সমাগত হয়। প্রথম মহোৎসব সময়ে, অর্থাৎ দোলযাত্রার সময়েই, "মহাশয়গণ" পাল-কর্ত্তা দিগের ঘোষপাড়ার গদীতে আসিয়া, বাৎসরিক খাজনা জমা দিয়া থাকে। সেই খাজনা ও অভ্যাগত যাত্রীগণের প্রণামী টাকা, এই উভয়ে মিলিয়া, প্রতি বৎসরে প্রায় নগদ পাঁচ ছয় হাজার টাকা আদায় হয়। যাত্রীরা ঘোষ পাড়ায় আসিয়া প্রধানতঃ দুইটী স্থান অতীব ভক্তিযোগ সহকারে দর্শন করে। উহাদের মধ্যে একটী 'হিমসাগর' নামক এক পুষ্করিণী ও অপরটী এক দাড়িম্ব বৃক্ষ। যে পুষ্করিণীর জলে রামশরণ-বনিতা আসন্ন মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিল, তাহারই নাম 'হিমসাগর'। সকলেরই বিশ্বাস, আজিও এই পুষ্করিণী-জলের পূর্ব্ববৎ রোগবিনাশিনী শক্তি আছে। তাহারা আরও বলিয়া থাকে যে, যাহারা জন্মাবধি দুশ্চিকিৎস্য রোগাক্রান্ত অথবা অন্য কোন-রূপে বিকলাঙ্গ হইয়া, চিরদিন ক্লেশ পাইতেছে, তাহারা এই জল ব্যবহার করিয়া অনায়াসে আরোগ্য লাভ করিতে পারে। সেই জন্য, অন্ধ, বধির, খঞ্জ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ অবিরত ধাক্কা খাইয়া ও সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও, কাতারে কাতারে আসিয়া, এই পুষ্করিণীতে অবগাহন করে। যে দাড়িম্ব বৃক্ষমূলে রামদুলাল জননী শচীমাতা সমাধিগতা রহিয়াছেন, সেই

স্থানের মুষ্টিমেয় মৃত্তিকা গ্রহণ করে। উহাদের বিশ্বাস, এই মৃত্তিকাতে শত শত রোগীর রোগ নাশ হয় এবং চিরপতিত মহাপাপী বীভৎস পাপ সকল হইতে অনায়াসে নিস্কৃতি লাভ করিতে পারে। এখানে সহস্র সহস্র লোককে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া অনশনে কয়েকদিন দিবারাত্র হত্যা দিয়া থাকিতেও পরিদৃষ্ট হয়।

মহোৎসবের সময়ে ঘোষপাড়ার মাঠে ঘাটে এই গান হইতে থাকে—

ও কে ডাঙ্গায় তরী যায় বেয়ে,
কোন্ রসিক নেয়ে।
আছে দাঁড়িমাঝি দশ জনা, ছয়জনা তার গুণ টানা,
সে যে জেনেও জান্‌লে না—
আনন্দেতে যাচ্চে বেয়ে, যত অনুরাগী সারি গেয়ে,
এ কোন্ রসিক নেয়ে॥

আবার অপর স্থানে গাহিতে থাকে—

ক্ষ্যাপা, এই বেলা তোর্ মনের মানুষ চিনে ভজন কর্।
যখন পালাবে সে রসের মানুষ, পড়ে রবে শূন্য ঘর।

বলরামভজা সম্প্রদায়।—কর্ত্তাভজাদিগের ন্যায় আরও এক সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়; উহাদিগকে "বলরামভজা" কহে। প্রায় ষাইট বৎসর গত হইল, মেহেরপুর জমীদারগণের অধীনে বলরাম হাড়ি নামক এক জন গ্রাম্য চৌকিদার ছিল। সেই ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। এই দল নদীয়ার কিয়দংশ, বর্দ্ধমান ও পাবনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। ইহারা ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া প্রধানতঃ জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বৈষ্ণব ও কর্ত্তাভজা-দিগের ন্যায় উহাদের বেশ ও ধর্ম্মমত দৃষ্টিগোচর হয়। কুশদ্বীপে এই দল এক কালে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে ইহাদের অনেকেই ভিক্ষার্থী হইয়া, এতদঞ্চলে সর্ব্বদা আসিয়া থাকে।

মেলা ও তীর্থস্থান।—বঙ্গদেশের মধ্যে অনেক মেলা ও তীর্থস্থান আছে। সকলের বিবরণ প্রদান করিতে হইলে, একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক হইয়া পড়ে। সেইজন্য, কুশদ্বীপবাসিগণ প্রধানতঃ যে সকল স্থানে পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, সর্ব্বদা গমনাগমন করিয়া থাকে, আমরা নিম্নে সেই সকল স্থানের বিবরণ ও নাম প্রদান করিতেছি।

(১) কালীক্ষেত্র।—এই স্থান কুশদ্বীপ হইতে বিংশতি ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। দক্ষযজ্ঞে সতী প্রাণত্যাগ করিলে নারায়ণ যখন চক্রদ্বারা তাঁহার মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করেন, সেই সময়ে দেবীর দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ এই কালীঘাটে পতিত হয়; তাহাতেই কালী বিগ্রহ ও নকুলেশ্বর শিবের উৎপত্তি হয় এবং এই স্থান বায়ান্ন পীঠের অন্তর্গত একটি মহাপীঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। এই ঠাকুর পূর্ব্বে বড়িশার সাবর্ণ্য চৌধুরীদিগের ছিল; সেই জন্য, চৌধুরী মহাশয়েরা এই ঠাকুর, ইহার পূজারি হালদার মহাশয়গণকে দান করেন। এক্ষণে ইহার যথেষ্ট আয় হইয়াছে এবং হালদার মহাশয়েরাও ইহার প্রসাদাৎ পৌত্র দৌহিত্র লইয়া, পরম সুখে কালাতিপাত করিতেছেন। অনেকেই অনুমান করেন, 'কলিকাতা' নামও, কালীক্ষেত্র এই মহাপীঠের নাম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বর্ত্তমান সহর যদিও অধিক দিনের নহে, কিন্তু কালীক্ষেত্র এই নাম, পুরাণ ও আইন আকবরী প্রভৃতি অতি প্রাচীন গ্রন্থ সকলেও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত "কালীক্ষেত্র" বহুলা (বর্ত্তমান বেহালা) হইতে দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইংরাজাধিকারের সূচনা হইতে, কালীক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইয়া, বর্ত্তমান কালীক্ষেত্রে বা কালীঘাটে পরিণত হইয়াছে। বল্লালসেনের জীবনী পাঠেও এই স্থানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আকবর বাদসাহের সময়ে তদীয় রাজস্ব-মন্ত্রী রাজা তোড়র্ম্মল "ওয়াশীল জমা তুমার" নামে একটী রাজস্ব হিসাব প্রস্তুত করেন। তাহাতেও এই কলিকাতা বা কালীক্ষেত্রের নাম আছে। উক্ত বাদসাহের রাজত্বকালে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে, বেলা তিন ঘটিকার সময়ে, এক ভয়ানক ঝড় হয় এবং সেই সময়ে সমুদ্রের জল উথলিয়া উঠিয়া, দক্ষিণ দিক নষ্ট করে। সেই সঙ্গে প্রায় দুইলক্ষ প্রাণীও কালগ্রাসে পতিত হয়। ঐ নষ্ট ও লোপপ্রাপ্ত ভূভাগকে এক্ষণে 'সুন্দরবন' কহে। ১২১৬ বঙ্গাব্দে, কালীঘাটের এই বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। কালীঘাটে কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে মেলা মহোৎসব হয় না। দেবীর কৃপায় এখানে এক্ষণে নিত্য মেলা মহোৎসব হইয়া থাকে এবং প্রত্যহ সহস্র সহস্র যাত্রী সমাগত হয়।

(২) তারকেশ্বর।—এই স্থান কুশদ্বীপ হইতে প্রায় ত্রিশ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে হুগলী জেলায় অবস্থিত। ইহা বৈদ্যবাটী হইতে প্রায় আট ক্রোশ

পশ্চিমদিক্‌বর্ত্তী। তারকেশ্বর বিগ্রহ সম্বন্ধে একটী গান প্রচলিত আছে।

"ষদ্দিনে বনের মধ্যে ক্ষেপা পশুপতি,
চারিদিকে জলাজঙ্গল থাকড়ার বসতি।
মধ্যেতে সিংহলদ্বীপ অতি মনোহর,
তার মধ্যে বিরাজেন প্রভু তারকেশ্বর।
কপিলা দিত দুগ্ধ একচিত্ত হয়ে,
দেখিলেন মুকুন্দঘোষ কাননে পশিয়ে।
কপিলার দুগ্ধে তুষ্ট ভোলা মহেশ্বর,
মুকুন্দ ঘোষেরে বলেন আমি তারকেশ্বর
তারকেশ্বর শিব আমি কাননেতে বসি,
মোর সেবা কর বাপা হইয়ে সন্ন্যাসী।

বর্ত্তমান সময়ে, যে স্থানে তারকেশ্বর মন্দির অবস্থিত, উহার পূর্ব্ব নাম সিংহল দ্বীপ। এই বিগ্রহ এই স্থানের জঙ্গলমধ্যে প্রস্তরের আকারে পড়িয়া ছিলেন। রাখালেরা এই প্রস্তরকে সামান্য প্রস্তর জ্ঞান করিয়া, তদুপরি ফলমূল ছেঁচিয়া থাইত। এই জন্য তারকেশ্বরের মস্তকে অদ্যাপি একটী গহ্বর দেখিতে পাওয়া যায়। জঙ্গলের মধ্যে ইনি সামান্য আকারে পড়িয়া থাকিতেন। মুকুন্দ ঘোষ নামক এক ব্যক্তির গাভী যাইয়া, প্রত্যহ ঠাকুরকে দুগ্ধ খাওয়াইয়া আসিত। গাভীর দুগ্ধ হয় না কেন, মুকুন্দঘোষ এই কারণ অনুসন্ধানে যাইয়া, এই অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে। প্রবাদ, একদিন ঠাকুর মুকুন্দ ঘোষকে বলেন, "তুমি সন্ন্যাসী হইয়া আমার সেবা কর। মুকুন্দঘোষ সন্ন্যাসী হইয়া, তারকেশ্বরের সেবা করিতে লাগিল। এদিকে তারকেশ্বর স্বপ্নে বর্দ্ধমান রাজাকে দেখা দিয়া কহিলেন—"আমি অনাবৃত স্থানে অত্যন্ত কষ্ট পাই-তেছি; আমাকে একটি বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দাও"।—রাজা তদনুসারে ইঁহার মন্দির ও বিষয়াদি করিয়া দেন। এদিকে সাধারণেও উৎকট পীড়াদি হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ইঁহার পূজা দিতে আরম্ভ করে। তাহাতেও ইনি সর্ব্বত্র বিখ্যাত ও অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হন। ইঁহার মহান্তেরা রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

একটী বৃহৎ মন্দিরমধ্যে তারকেশ্বর অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। এই মন্দিরের সম্মুখে একটী নাটমন্দির আছে। সেই নাটমন্দিরে অসংখ্যলোক, কেহ রোগ মুক্ত হইবার জন্য, কেহ বা সন্তান হইবার কামনায়, এইস্থানে হত্যা দিয়া থাকে। মন্দিরের মধ্যে একটী গহ্বর আছে; উহারই মধ্যে তারকেশ্বর প্রতিষ্ঠিত আছেন। গহ্বরের উপরিভাগ রৌপ্যময় ডেকে আবৃত। তারকেশ্বর এক অনাদিলিঙ্গ শিব। যাত্রীদিগের মধ্যে যে অধিক পয়সা ব্যয় করে, সেইই গহ্বর মধ্যে হস্ত দিয়া, ঠাকুরের স্পর্শসুখানুভব করিতে পায়। মন্দিরের পার্শ্বে মহান্তদিগের কতকগুলি কবর দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রত্যহ মহান্ত মহারাজ, স্বয়ং তারকেশ্বরের পূজা করিয়া থাকেন। মহান্তের পূজার সময় কোনও যাত্রী বা বাহিরের লোক মন্দিরমধ্যে থাকিতে পায় না। প্রবাদ আছে যে, যে সময়ে মহান্ত শিবের পূজা করেন, সেই সময়ে তাঁহার সহিত শিবের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। মহান্ত এই সময়ে শিবকে বিষয়াদি সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেন। তদ্ভিন্ন, "ইহা খাও" "উহা খাও" বলিয়া মহান্ত শিবের হস্তে, পেঁপে, রম্ভা, ক্ষীর প্রভৃতি নানাবিধ খাদ্য তুলিয়া দেন। তিনি আর খাইতে পারি না বলিলেও, মহান্ত ছাড়েন না। পূজা সমাপ্ত হইলে মহান্ত শিবিকারোহণ করিয়া ও অগ্র পশ্চাতে ৭।৮ জন প্রহরী পরিবৃত হইয়া, নিজ প্রাসাদাভিমুখে চলিয়া যান। মন্দিরের পশ্চাতে 'শিবগঙ্গা' নামে যে দীঘী আছে, সেই দীঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে যে একটী সুন্দর অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই মহান্ত মহারাজের আবাসভবন। মহান্তমহারাজ রূপার খাটে শয়ন করেন—সোনার থালে ভাত খান—এবং সোনা ও রূপা-বাঁধা হুকা ও ফরসীতে তামাক সেবন করিয়া থাকেন। মহান্ত মহারাজের গৃহে টানা-পাখা টাঙ্গান ও কক্ষপ্রাচীরে অসংখ্য ছবি লম্বমান রহিয়াছে।

বেলা একটা বা দেড়টার সময় তারকেশ্বরের 'মনুইভোগ' অর্থাৎ পায়স রাঁধিয়া ভোগ দেওয়া হয়। বেলা দুই বা আড়াইটার সময়, বিগ্রহের 'শৃঙ্গার-বেশ' হয় অর্থাৎ শিবকে পুষ্পাদি দ্বারা সুশোভিত করিয়া রাখা হয়। রজনীতে শিব মিষ্টান্ন ও লুচি আহার করেন। আহারের পরে, ধুনুচি আকারের একটী কলিকাতে অর্দ্ধপোয়া আন্দাজ গাঁজা সাজিয়া, তাহাতে তালের জটার আগুন দিয়া, গুড়গুড়িতে বসাইয়া শিবকে ধূমপান করিতে দেওয়া হয়। ঐ সময়ে

মন্দির মধ্যে কোনও যাত্রীর প্রবেশ করিবার অনুমতি থাকে না। তবে বাহিরে দাঁড়াইয়া সকলেই গুড়গুড়ির শব্দ শুনিতে পারেন। কিছুক্ষণ পরে কলিকাটী আনিয়া উবুড় করিয়া ঢালিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, শিব সমস্ত গাঁজা খাইয়া ভস্মসাৎ করিয়াছেন।

তারকেশ্বরের অনেক পাণ্ডা ব্রাহ্মণ আছেন। তাঁহারাই যাত্রীগণকে সঙ্গে লইয়া পূজা প্রদান করিয়া থাকেন। তারকেশ্বর হইতে প্রায় এক বা দুই ক্রোশ পথ দূরবর্ত্তী স্থান সকল হইতে, এই সকল ব্রাহ্মণেরা পশ্চাদ্বর্ত্তী হন। যাত্রীরা তারকেশ্বরে উপস্থিত হইলে, সেই সেই ব্রাহ্মণ, যাত্রীগণকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তোমাদের কোনও পূজা মানা আছে কি না; যদি থাকে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ, সেই পূজার টাকা প্রথমে মহান্তের গদীতে জমা দিতে বলেন। পরে, মহান্ত মহারাজ, যাহার কল্যাণে পূজা মানা থাকে, তাহার কপালে একটী অঙ্গুরীয়কের ছাপ দিয়া দেন। মহান্ত ছাপ দিবা মাত্র, অমনই নাপিত আসিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায় এবং মস্তকমুণ্ডন ও ক্ষৌরকার্য্য সম্পাদন করিয়া দেয়। পরে, যাত্রীগণকে ব্রাহ্মণেরা দুধকুমড়া নামক দীঘীতে স্নান করাইয়া লইয়া আইসে এবং যাহার যেমন ক্ষমতা, তদনুসারে আট আনা হইতে পঞ্চাশ বা একশত টাকার পর্য্যন্ত ডালা সাজাইয়া পূজা দেওয়ায়; কেহ কেহ নিজে দ্রব্যাদি কিনিয়া ডালা সাজাইয়া দেয়; কেহ কেহ বা বাজারের ডালা কিনিয়া লয়। এই বাজারের ডালার মূল্য আট আনা হইতে এক শত টাকায় বিক্রীত হয়। বাজারের বিক্রীত ডালাতে একটী ওলা, একটী কলা, চারিটী আতপ চাউল ও দুই চারিটী বিল্বপত্র ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। এই ডালা লইয়া, ব্রাহ্মণ দেবালয়ের দ্বারে যাত্রীগণকে রাখিয়া যায়। পরে, যাত্রীরা সেই দ্বারের দ্বারবানকে কিছু পয়সা ঘুস দিয়া দেবালয় মধ্যে প্রবেশ করে। দেবালয়মধ্যে আবার কতকগুলি পূজারি ব্রাহ্মণ থাকেন; তাঁহাদের মধ্যে যে কেহ একজন সেই ডালাখানি মন্দিরের এক কোণে ঢালিয়া লন এবং যাত্রীর ডালা খানিতে দুই চারিটী বিল্বপত্র, চারিটী আতপ চাউল, ও যৎসামান্য ওলাভাঙ্গা প্রসাদ স্বরূপ দিয়া যাত্রীকে মন্দির হইতে বাহির করিয়া দেন। যদি কাহার অধিক প্রসাদের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উহা পৃথক পয়সা দিয়া কিনিতে হয়।

শিবরাত্রি ও চৈত্রমাসের মহাবিষুব সংক্রান্তির সময়েই তারকেশ্বরে বহু-

সংখ্যক লোকের সমাগম হয়। এই সময়ে কখন কখন ২।৩টী লোক পর্য্যন্ত নিহত হইয়া যায়। অতিরিক্ত পুলিশ নিযুক্ত হইয়াও, সেই সময়ের ভীষণ গোলযোগ নিবারণ করিতে পারে না। বহুসংখ্যক মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী লোকগণও বাবার নিকট হত্যা দিয়া, বাবার প্রত্যাদেশ গ্রহণ করে এবং স্ব স্ব অভীষ্ট সাধন করিয়া লয়।

অগ্রদ্বীপ।—এখানে চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীতে গোপীনাথ ঠাকুরের মহোৎসব উপলক্ষে গোপীনাথ মেলা সংঘটিত হয়। কৃষ্ণনগরের রাজারাই এই বিগ্রহের অধিকারী। এই মেলাতে প্রায় ২৫০০০ লোকের সমাবেশ হয় এবং কৃষ্ণপক্ষের একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমাগত সপ্তাহকাল এই মেলা অবস্থিতি করে। মেলার প্রথম দিনে ঠাকুর স্বয়ং বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাতা ঘোষ ঠাকুরের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ সমাপন করেন।

এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে প্রদেশে একটী আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। সাধারণের প্রীতির নিমিত্ত আমরা সেই আখ্যায়িকা বিবৃত করিতেছি।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক, সুবিখ্যাত চৈতন্য দেবের 'ঘোষ ঠাকুর' নামক জনৈক কায়স্থ শিষ্য ছিলেন। এই ব্যক্তি কাঁটোয়ার তিন ক্রোশ দক্ষিণ অগ্রদ্বীপ নামক গ্রামে গোপীনাথ দেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি চৈতন্যের সঙ্গে থাকিতেন এবং অতি যত্ন ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন। এক দিন চৈতন্য আহারান্তে ঘোষ ঠাকুরের নিকট মুখশুদ্ধি যাচ্ঞা করেন; তাহাতে তিনি সে দিন তদীয় ভিক্ষালব্ধ— একটী হরিতকীর অর্দ্ধাংশ তাঁহাকে প্রদান করেন। পর দিন ভোজনান্তে প্রভু পুনরায় মুখ শুদ্ধি চাহিবামাত্র, ঘোষ ঠাকুর তাঁহার হস্তে সেই হরিতকীর অপরার্দ্ধ প্রদান করিলেন। তাহাতে চৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আজি আবার হরিতকী কোথায় পাইলে?" ঘোষ ঠাকুর উত্তর করিলেন—"কালি আপনাকে যে হরিতকী দিয়াছিলাম, আজি তাহারই অপরার্দ্ধ দিলাম। এই কথা শুনিয়া চৈতন্য কহিলেন—"আজিও তোমার বিলক্ষণ সঞ্চয়ের বাসনা রহিয়াছে, দেখিতেছি। সুতরাং তুমি আর আমার সঙ্গে না থাকিয়া গৃহে ফিরিয়া যাও।" এই শেল সম নিদারুণ বাক্য শুনিয়া ঘোষ ঠাকুর কাঁদিতে লাগিলেন এবং সকাতরে কহিলেন—"আমি আপনার বিরহে কিরূপে প্রাণ ধারণ করিব?"—চৈতন্য কহিলেন—

"আমার প্রতি তোমার যে বাৎসল্য আছে, শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতেও সেইরূপ বাৎসল্য প্রকাশ করিও।" ঘোষ ঠাকুর অগত্যা চৈতন্যের সহবাস ত্যাগ করিয়া, গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং প্রভুর নিদেশানুসারে এক কৃষ্ণ বিগ্রহ নির্ম্মাণ করাইয়া, অগ্রদ্বীপে প্রতিষ্ঠা করিলেন ও তাহার নাম গোপীনাথ রাখিলেন। সেই সময় হইতে ঘোষ ঠাকুর গোপীনাথকে যেমন পুত্র নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন, গোপীনাথও তেমনই তাঁহাকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। গোপীনাথ আজিও বারুণীর পূর্ব্বে চৈত্র মাসের কৃষ্ণা একাদশীতে তাঁহার শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। ঐ দিবস অগ্রদ্বীপে অনেক যাত্রী সমাগত হয়। তাহারা গোপীনাথের পিতৃ শ্রাদ্ধের আনুকূল্যার্থে অর্থ প্রদান করে। আজি কালি পূর্ব্বের ন্যায় অর্থ প্রাপ্তি না হইলেও, আপাততঃ উক্ত দিবস চারি পাঁচ শত টাকা দ্বারপ্রাপ্তি হয়। আজিও কলিকাতা ও মুরশিদাবাদ প্রভৃতির স্থানের দোকানী পশারীগণ উপস্থিত হয়। অগ্রদ্বীপের অনতি দূরবর্ত্তী কাশীপুর-বিষ্ণুতলা গ্রামে ঘোষ ঠাকুরের বাটী ছিল। তাঁহার জ্ঞাতির বংশ আজিও তথায় বাস করিতেছে।

প্রথমে পাটুলীর জমীদারগণ অগ্রদ্বীপের অধিস্বামী ছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা রঘুনাথের সময়ে অগ্রদ্বীপের মেলাতে একবার ৫।৬ জন লোক হত হয়। তাহাতে মুরশিদাবাদের নবাব মহাকুপিত হইয়া, ঐ গ্রাম কাহার জমীদারী, তাহাই অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করেন। পাটলীর জমীদারের উকীল, নবাবের কোপ দেখিয়া ভীত হইয়া, ঐ গ্রাম আমার প্রভুর অধিকারস্থ নহে বলিয়া এককালে অস্বীকার করে। তখন নবাব, বর্দ্ধমান ও নবদ্বীপের রাজাদিগের জমীদারী উহার নিকটস্থ দেখিয়া, একে একে উঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন। বর্দ্ধমান রাজের উকীলও পূর্ব্ববৎ অস্বীকার করেন। কিন্তু নবদ্বীপ রাজের উকীল বিলক্ষণ বুদ্ধিমান ও সুচতুর ছিলেন। তিনি অবসর বুঝিয়া কহিলেন—"ধর্ম্মবতার! ঐ গ্রাম আমার প্রভুর অধিকারস্থ এবং ঐ গ্রামের হত্যাকাণ্ডও সত্য। কিন্তু ঐ মেলাতে এরূপ অসাধারণ জনতা হইয়া থাকে, যে পাঁচ ছয় জন কেন, ১০।১৫ জন মৃত হওয়াও অসম্ভব নহে। লোকের প্রাণরক্ষার্থে যথোচিত যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করা হয়, দিবারাত্রি বিশেষ সতর্কও থাকা যায়; সেই জন্যই এত অল্প লোক মরিয়া থাকে। ঐ মেলাতে

যেরূপ অসাধারণ জনতা হয়, তাহা সভাস্থ কাহারও অবিদিত নাই।” উকীলের কথা শেষ হইলে, সভাস্থ অনেকেই বলিলেন “ধর্ম্মাবতার! যাহা শুনিলেন, তাহার কিছুই মিথ্যা নহে।” নবাব, “আচ্ছা, আমি এবারে অপরাধ মার্জ্জনা করিলাম; কিন্তু বারান্তরে এরূপ শুনিলে, সমুচিত দণ্ডবিধান করিব।” এই বলিয়া নিরস্ত হইলেন।

রঘুরাম এই কথা শুনিয়া মহা হর্ষিত হইয়া, অগ্রদ্বীপ অধিকার করিলেন এবং মহা সমারোহে ঠাকুরের পূজা দিলেন। পরে, ঠাকুরের সেবার্থে কুষ্টিয়া প্রভৃতি কতিপয় গ্রাম নিৰ্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন এবং কুষ্টিয়া গ্রামের নাম গোপীনাথাবাস রাখিলেন। এই সময় হইতে গোপীনাথ নবদ্বীপ রাজার ঠাকুর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালে, কলিকাতাবাসী রাজা নবকৃষ্ণ এই বিগ্রহ অপহরণ করিয়া, কলিকাতায় আনয়ন করেন। তজ্জন্য, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, তদনীন্তন গবর্ণর জেনেরল লর্ড হেষ্টিংসের নিকট অভিযোগ করেন। লর্ড হেষ্টিংস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া, রাজা নবকৃষ্ণের দোষ দেখিতে পান। সুতরাং হেষ্টিংস, নবকৃষ্ণকে বিগ্রহ ফিরাইয়া দিতে অনুমতি করেন। ইহাতে রাজা নবকৃষ্ণ তদনুরূপ আর একটী বিগ্রহ নির্ম্মাণ করাইয়া, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে তদীয় বিগ্রহ চিনিয়া লইতে বলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বৃত্তিভোগী এবং পূর্ব্ব বিগ্রহের পরিচারক জনৈক ব্রাহ্মণ, উভয় মূর্ত্তি দেখিয়া নিজের বিগ্রহ চিনিয়া লন এবং সেই বিগ্রহ পুনরায় অগ্রদ্বীপে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা নবকৃষ্ণদত্ত বহুমূল্যের আভরণাদি আজি পর্য্যন্তও গোপীনাথের অঙ্গে বিরাজ করিতেছে।

সুন্দরপুর।—এই স্থান করিমপুর মহকুমার অন্তর্গত; এখানে চৈত্রমাসের সংক্রান্তিতে, গোবীন্দজী নামক বিগ্রহের ‘তুলসীবিহার’ নামক মেলা হয়। এই মেলা এক পক্ষ অবস্থিতি করে এবং ইহাতে প্রায় দশ সহস্র লোক সমাগত হয়।

ঘোষপাড়া।—এই স্থান চাকদহ মহকুমার অন্তর্গত এবং কর্ত্তাভজা দলের লোকগণের পবিত্র তীর্থ স্থান। এখানকার মেলা ফাল্গুণ ও কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমার দিন বসিয়া থাকে। কখন কখন কর্ত্তাভজা দলের নেতা “কর্ত্তা”

কাষ্ঠময় মঞ্চোপরি আরোহণ করিয়া, এই মেলায় উপস্থিত হন। এখানে প্রায় পঁচিশ হাজার লোক সমাগত হয়।

গোঁসাই দুর্গাপুর।—এখানে কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে রাধারমণ দেবের রাসোপলক্ষে এক মেলা হইয়া থাকে। এই মেলা দশদিন পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে এবং ইহাতে প্রায় দশ হাজার লোকের সমাগম হয়।

কৃষ্ণনগর।—এখানকার রাজবাটীতে মহাদোল বা 'বারদোল' উপলক্ষে প্রতি বৎসর ১১ই চৈত্রে গোপীনাথ ও মদনমোহন দেবের মেলা হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে কৃষ্ণনগরের মহারাজার যত বিগ্রহ আছে, এই উৎসব উপলক্ষে সেই সমস্ত বিগ্রহ এখানে আনীত হয়। এই মেলা তিন দিন কাল অবস্থিতি করে। এই মেলায় প্রায় বিংশতি সহস্র যাত্রী আসিয়া থাকে।

নদীয়া বা নবদ্বীপ।—প্রতি বৎসর মাঘমাসে চৈতন্যদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে এখানে প্রায় ৪।৫ হাজার বৈষ্ণব সমাগত হয়। যতক্ষণ উৎসব চলিতে থাকে, ততক্ষণই ইহাতে নৃত্য, গীত ও কীর্ত্তন হইতে থাকে। নবদ্বীপে আরও একটী মেলা হয়; উহাকে "পটপূর্ণিমার" মেলা কহে। এই উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর মৃত্তিকার বিগ্রহসকল প্রস্তুত হয় এবং কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমাতে পূজা হইয়া থাকে। এই উৎসব দুই দিন মাত্র থাকে এবং প্রায় ৫।৬ হাজার যাত্রী ইহাতে সমাগত হয়।

শান্তিপুর।—এখানে কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমাতে শ্রীকৃষ্ণের রাস হইয়া থাকে। গোস্বামী মহাশয় দিগের বিগ্রহ সকল সমুন্নত দারুময় দোলমঞ্চোপরি দোদুল্যমান হয় এবং শেষদিনে রাজপথ বহিয়া মহাসমারোহ সহকারে গমন করিয়া থাকে। এই মেলাতে প্রায় ২৫।২৬ হাজার লোক সমাগত হয় এবং ইহা তিন দিন অবস্থিতি করে। গোস্বামী মহাশয় দিগের শ্যামসুন্দর বিগ্রহ অতীব প্রসিদ্ধ। এমন সুন্দর ও সুবৃহৎ বিগ্রহ বঙ্গদেশের মধ্যে নিতান্ত বিরল। শ্যামসুন্দরের মন্দিরও এমন উচ্চ ও বৃহৎ যে, তিন মাইল দূর হইতে দৃষ্টিগোচর হয়।

বীরনগর বা উলা।—এই স্থান রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্গত। বৈশাখ মাসের সংক্রান্তির দিন উলাই-চণ্ডী দেবীর উৎসব উপলক্ষে এই মেলা বসিয়া থাকে। সকলের বিশ্বাস, উলাই-চণ্ডী বিসূচিকা রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও

সর্ব্বসংহারক শিবের পত্নী। উলাই-চণ্ডীর যাত অতীব প্রসিদ্ধ ও বিলক্ষণ শ্রুতিমনোহর। চৈত্রমাসে এই যাত আরম্ভ হয়। যাতের সময়ে এখানে অনেক ছাগ ও মহিষ বলি হয়।

তেহাটা।—এখানে পৌষমাসের সংক্রান্তিতে "কৃষ্ণরায়ের মেলা" নামক এক মহোৎসব হইয়া থাকে। এই মেলা তিন দিন অবস্থিতি করে। কৃষ্ণনগর রাজগণের প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণরায় নামধেয় বিগ্রহের উৎসব উপলক্ষে এই মেলা সংঘটিত হয়। এখানেও প্রতিবৎসর ৩।৪ হাজার যাত্রী সমাগত হয়।

মুড়াগাছা।—এই স্থান নকাসীপাড়া থানার অন্তর্গত। বৈশাখী পূর্ণিমাতে এখানে প্রতিবৎসর সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর উৎসব উপলক্ষে এক মেলা হইয়া থাকে। এই মেলা তিন দিন অবস্থিতি করে এবং এতদুপলক্ষে প্রায় দ্বিসহস্র যাত্রী সমাগত হইয়া থাকে।

কুলিয়া।—এইস্থান চাকদহ থানার অন্তর্গত। এখানে প্রতি বৎসর "উপরোধ ভঞ্জন" নামক উৎসব হইয়া থাকে। গৌরাঙ্গদেবের সহিত তাঁহার ভার্য্যার বিবাদ ভঞ্জন করাই এই উৎসবের উদ্দেশ্য। ইহাও তিন দিন পর্য্যন্ত থাকে এবং ইহাতে প্রায় ৭।৮ হাজার যাত্রী সমাগত হয়।

গাঁড়াপোতা।—এই স্থানও চাকদহ থানার অন্তর্গত। চৈত্রমাসের সংক্রান্তিতে এখানে এক মেলা হইয়া থাকে। সেই মেলাতে প্রায় ৩।৪ হাজার লোক সমাগত হয়। এই মেলা চারি দিন অবস্থিতি করে।

সাণ্ডালপুর, মারুতিয়া ও হোগলবাড়িয়া।—এই তিনটী স্থান মেহেরপুর মহকুমার এবং বীরুই ও পাটলী—এই তুইটী স্থান রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্গত। পূর্ব্বোক্ত পাঁচ স্থানেও শ্রীকৃষ্ণদেবের পূজা উপলক্ষে এক এক মেলা হইয়া থাকে। বৈষ্ণবেরাই এই সকল মেলাতে অধিক আগমন করে। শেষোক্ত স্থানে যে মেলা হয়, তাহা মুসলমান মেলা বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

ভাগিরথী-স্নান।—কুশদ্বীপ ও পূর্ব্বাঞ্চলবাসী লোকেরা গঙ্গাস্নানোপলক্ষে যে যে স্থানে গমন করিয়া থাকে, সেই সেই স্থানেও সেই সেই সময়ে এক একটী মেলা হইয়া থাকে। ঐ সকল স্থানের মধ্যে ভাগিরথী ও জলঙ্গীর সঙ্গমস্থল নবদ্বীপ, শান্তিপুর, চাকদহ, হালিসহর, নৈহাটী, ত্রিবেণী ও কলিকাতা প্রধান।—অনূ্যন চল্লিশ বৎসর হইল, চাকদহে মাঘী পূর্ণিমার সময়ে এক মহতী মেলা

হইত। উহাতে প্রায় ১০।১৫ হাজার লোকের সমাগম হইত। আজি কালিকার হিন্দুগণের ধারণা, চাকদহের নীচে গঙ্গা নাই। সেই জন্য কয়েক বৎসর হইতে চাকদহে, যাত্রীর সমাগম না হইয়া, উহার নিকটবর্ত্তী যশড়া, রাণীনগর প্রভৃতি স্থানে যাত্রীর সমাগম হয়। এক্ষণে উক্তস্থান সকলেরও পরিবর্ত্তে কালিগঞ্জের নিম্নে যাত্রীগণ গঙ্গাস্নান করিয়া থাকে।

ত্রিবেণী।—এই স্থান হিন্দুদিগের এক মহাতীর্থ। গ্রহণ ও উত্তরায়ণের সময় এখানেও অনেক যাত্রী সমাগত হয়। প্রয়াগে স্নান করিলে, যেমন অক্ষয় পুণ্যলাভ হইয়া থাকে, এখানেও তাহাই হয়। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তদীয় প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্বে লিখিয়াছেন—

প্রদ্যুম্ন হ্রদাৎ যাম্যে সরস্বত্যাস্তথোত্তরে।
তদ্দক্ষিণে প্রয়াগস্তু গঙ্গাতো যমুনাগতা।
স্নাত্বা তত্রাক্ষয়ং পুণ্যং প্রয়াগইব লক্ষ্যতে॥

চাকদহ ষ্টেশনের পূর্ব্বে, 'খোজারহাট' নামক একটী স্থান আছে। তাহার দক্ষিণাংশেই প্রদ্যুম্ন-হ্রদ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ আছে, প্রদ্যুম্ন ঋষি এইখানে শাপগ্রস্ত হইয়া হ্রদমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। এই হ্রদের সহিত ভাগিরথী স্রোত মিলিত হইলেই, তাঁহার উদ্ধার সাধন হইবে। পূর্ব্বে এই হ্রদ ভাগিরথী হইতে যত দূরবর্ত্তী ছিল, এক্ষণে আর তাহা নাই। ভাগিরথী ক্রমশঃ ইহার নিকটবর্ত্তী হইতেছেন। যাহা হউক, ইহার দক্ষিণে দক্ষিণপ্রয়াগ বা মুক্তবেণী অবস্থিত। ইহাকেই সাধারণে ত্রিবেণী বলিয়া থাকে। এই স্থানের পশ্চিম পার দিয়া, সরস্বতী ও পূর্ব্বপার দিয়া যমুনা নদী প্রবাহিতা হইতেছেন। ইহা তিনটী নদীর সঙ্গমস্থল বলিয়াও, ইহার নাম ত্রিবেণী হইয়াছে। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে যে মহামারী হইয়া, ত্রিবেণী ধ্বংস হয়, তাহার পূর্ব্বে এই স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর ছিল। সেই সময়ে এখানকার জলবায়ু বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল। তখন কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের জমীদারেরা স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য এখানে আসিয়া বাস করিতেন এবং এখান হইতে পানীয় জল লইয়া যাইতেন। বিখ্যাত সপ্তগ্রাম ইহার সন্নিকটে সরস্বতী তীরে অবস্থিত ছিল। প্রায় ৩৫০ বৎসর গত হইল, কবিকঙ্কণ স্বরচিত কাব্য মধ্যে ত্রিবেণী ও সপ্তগ্রাম বন্দর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

গ্রামের বেগে সব কোথাও না যায়;
রে বসে সুখমোক্ষ নানা ধন পায়।
তীর্থমধ্যে পুণ্যতীর্থ অতি অনুপম,
সপ্তঋষি শাসনে বলয়ে সপ্তগ্রাম।
কাণ্ডারীর বচনে করিয়া অবনতি,
ত্রিবেণীতে স্নান করে সাধু ধনপতি।
নায়ে তুলে সদাগর নিল মিঠা পানী,
বাহ, বাহ, বলিয়া ডাকেন ফরমানী।"

সাগরসঙ্গম।—যে স্থানে ইচ্ছামতী ও যমুনার মিলিত স্রোত গঙ্গাসাগরে পতিত হইয়াছে, সেই স্থানেও প্রতিবর্ষে বহুসংখ্যক লোক স্নান করিতে গিয়া থাকে। এই স্থানের নাম "কপিলমুনি"। এখানে, মহর্ষি কপিলদেব ও সগর রাজার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই স্থান সুন্দরবনের অন্তর্গত। প্রতি বর্ষের পৌষ মাসের সংক্রান্তির পূর্ব্ব দিন হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে তিন দিন কাল এখানে মেলা হয়। গঙ্গাসাগর যোগে প্রায় লক্ষাধিক লোক কপিলমুনিতে গমন করিয়া থাকে। ইহাকেই সাধারণতঃ 'সাগর-স্নান' বলে।

এই সমস্ত বৃহৎ বৃহৎ মেলা ব্যতীত কুশদ্বীপে আরও দুই একটী ছোট ছোট মেলা হইয়া থাকে। এক্ষণে সেই সকলের নাম আছে মাত্র; কিন্তু প্রকৃত সমারোহ এককালে নিরুদ্ধ হইয়াছে। যাহাহউক, সাধারণের অবগতির জন্য আমরা উহাদিগের বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

চারঘাট।—এই স্থান হরেশুঁড়ীর দহ ও ঠাকুরবরের আস্তানার নিমিত্ত প্রসিদ্ধ। এখানে কোনও বৃহৎ মেলা হয় না বটে; কিন্তু যাত্রীরা মানসিক করিয়া, প্রায়ই এখানে আসিয়া থাকে ও ঠাকুরবর সাহেবের সির্ন্নি দেয়। ইহার তিন চারি ক্রোশ পূর্ব্বেই, যমুনা ও ইছামতী নদীর "টিপী" নামক সঙ্গম স্থল। কথিত আছে, পুরাকালে চারঘাটে হরি শুঁড়ী নামক একজন সত্যনারায়ণ ভক্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করিত। পীর ঠাকুরবর, উক্ত শুঁড়ীকে নিজের শিষ্য হইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু হরিশুঁড়ী তাহাতে অস্বীকৃত হয়। তাহাতে পীর ঠাকুরবর মহা কুপিত হইয়া, উহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হন। হরিশুঁড়ী তাহাতে নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া, জন্মভূমি পরিত্যাগ করতঃ, সপরিবারে পলা-

য়ন করিতে কৃতসংকল্প হয়। একদা হরি রজনীযোগে সপরিবারে নৌকারোহণে যমুনা দিয়া পলাইয়া যাইতেছে, এমন সময়ে ঠাকুরবর জানিতে পারিয়া, উক্ত দহা মধ্যে তাহাকে ডুবাইয়া মারেন। তদবধি উক্ত আবর্ত্তের নাম হরি শুঁড়ির দহা হইয়াছে। ফলতঃ যাহাই হউক, এই আবর্ত্ত প্রকৃতিদেবীর যমুনা-বক্ষস্থ অন্যতম বিশাল লীলাক্ষেত্র এবং যমুনার অন্যান্য আবর্ত্ত অপেক্ষা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

জলেশ্বর।—এইস্থান গোবরডাঙ্গার দুই তিন ক্রোশ পশ্চিমে যমুনাতীরে অবস্থিত। এখানে বুড়াশিব নামে এক বিগ্রহ আছেন। এই বিগ্রহের গাজন উপলক্ষে এক মেলা হয় এবং তিন চারি দিন সেই মেলা অবস্থিতি করে। উহাতে প্রায় ১০।১২ হাজার লোক সমাগত হয়। কথিত আছে, এখানে যে বিশাল দীঘী আছে, তাহাতে চড়ক কাষ্ঠ ও একখণ্ড প্রস্তর প্রতিবৎসর চড়কের সময় পাওয়া গিয়া থাকে। চড়কান্তে উক্ত চড়ক কাষ্ঠ ও প্রস্তর সেই বাপীজলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। ইহার পরে আর উহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। পরে চড়কের পূর্ব্বে শিব-জাগরণের দিনে উহারা পুনরায় দৃষ্টিগোচর হয়। এখানকার হাজরাতলায় হাজরাভাঙ্গির দিনে অনেক ছাগ বলি হয়।

ইচ্ছাপুর।—ফাল্গুণী পূর্ণিমাতে এখানকার চৌধুরী মহাশয়েরা মহাসমারোহে রাধাগোবিন্দের দোলোৎসব করেন। তদুপলক্ষে এক বৃহতী মেলা ও নানা রঙ্গের নৃত্যগীত হয়। এই মেলা একদিন মাত্র অবস্থিতি করে; কিন্তু উৎসব তিন চারি দিন চলিয়া থাকে। প্রায় তিন সহস্র লোক এই মেলাতে উপস্থিত হয়। চৌধুরী মহাশয়গণের ভাগ্যলক্ষ্মীর সহিত এই মেলাও নিয়তির বিকট বদন দর্শন করিতেছে।

খাঁটুরা।—এই গ্রামের পূর্ব্ব প্রান্তে বামোড় তীরে এক প্রাচীন বটবৃক্ষ আছে। সকলেই সেই বটবৃক্ষকে ৺ চণ্ডীদেবীর অধিষ্ঠান-তরু বলিয়া অতীব ভক্তি সহকারে পূজা করিয়া থাকে। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে নানা স্থান হইতে বহুসংখ্যক স্ত্রী ও পুরুষ ঢাক ঢোল বাজাইয়া এই স্থানে পূজা দিতে আইসে এবং তাহারা সময়ে সময়ে অনেক ছাগ বলিও প্রদান করে। ফাল্গুণী পূর্ণিমাতে এই স্থানে খাঁটুরার বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়দিগের রাধারমণের দোল হইয়া থাকে। তদুপলক্ষে এখানে একটী সামান্য মেলা হয়। সেই মেলায় প্রায় ৩।৪ শত লোকের সমাগম হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন, চৈত্রমাসের সংক্রান্তিতে

চড়ক উপলক্ষেও তদনুরূপ আর একটী ক্ষুদ্র মেলা হয়। এই দুই সময়ে এখানে রন্ধন মসালা বহুল পরিমাণে আমদানি ও বিক্রয় হয়। সকল গৃহীই এই সময়ে সেই মেলা হইতে বাৎসরিক রন্ধন মসালা ক্রয় করিয়া রাখে।

গোবরডাঙ্গা।—এখানকার মুখোপাধ্যায় জমীদার মহাশয়গণের গোষ্ঠ বিহারোপলক্ষে ১লা বৈশাখে অনেক লোকের সমাগম হয়। জমীদার মহাশয়-গণের প্রাসাদ সম্মুখস্থ বিস্তীর্ণ রঙ্গ ভূমিতে এক গাভীর সহিত একটী শূকরশাব-কের ক্রীড়া বা বিহারই এই উৎসবের প্রধান উদ্দেশ্য। ক্রীড়া করিতে করিতে গাভী যতক্ষণ সেই শূকরশাবককে দংশন না করে, ততক্ষণ এই বিহারের পরি-সমাপ্তি হয় না। এতদ্ভিন্ন, রথ যাত্রার সময়ে যমুনা তীরস্থ ষষ্ঠীতলায় রথোপলক্ষে এক বৃহৎ মেলা হয় এবং গ্রামস্থ যাবদীয় ব্যক্তির রথ এই স্থানে আনীত হইয়া থাকে। এই মেলায় অনেক কাঁঠাল ও আনারস বিক্রয় হইয়া থাকে। ইহাতে প্রায় ৫।৬ শত লোকের সমাগম হয়।

উল্লিখিত স্থান গুলিই কুশদ্বীপের প্রাচীন তীর্থ ও মেলাস্থান। কিন্তু কয়েক বৎসর হইতে নিম্নলিখিত স্থান গুলিও কুশদ্বীপের তীর্থ ও মেলা স্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এবং দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

দেয়াড়া।—এই স্থান যমুনা ও ইছামতী নদীর সঙ্গমস্থল টিপী ও চারঘাটের মধ্যস্থলে এবং গোবরডাঙ্গা হইতে দুই ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। মাঘী পূর্ণিমার দিন হইতে এখানে এক মেলা হইয়া থাকে। যমুনা নদীর দুই কূলে এই মেলা বসিয়া থাকে এবং উহা চারিদিন অবস্থিতি করে। এখানে প্রতি বৎসরে প্রায় ২৫।৩০ হাজার লোক সমাগত হয়। লোকের বিশ্বাস মাঘী পূর্ণিমার দিন ভীষ্মজননী গঙ্গাদেবী এই স্থানে আসিয়া তদীয় ভগিনী যমুনা নদীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই জন্য, মেলার সময়ে এখানে গঙ্গা ও যমুনার প্রতিমা পূজা হয়।

গৈপুর।—এই স্থান কুশদ্বীপের অন্তর্গত এবং গোবরডাঙ্গা ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরবর্ত্তী। এখানে ফাল্গুণ মাসের সংক্রান্তির দিন হইতে একটী মেলা হইয়া থাকে ও তিন দিন সেই মেলা অবস্থিতি করে। এই মেলাতে প্রায় ৫।৬ হাজার লোক সমবেত হইয়া থাকে। এখানে "ওলা বিবি" দেবীর এক দরগা আছে। সেই "ওলা বিবির" পূজা উপলক্ষেই এই মেলা বসিয়া থাকে।

শিমুলপুর।—ইহাও কুশদ্বীপের অন্তর্গত ও গোবরডাঙ্গা হইতে অনূ্ন তিন মাইল দূরবর্ত্তী। এখানে এক পীরের মসিদ আছে। খাঁটুরা নিবাসী শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ রক্ষিত সেই মসিদের জীর্ণ সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার নামানুসারে কয়েক বৎসর হইতে এখানে একটী মেলা হইতেছে। উহা রামকৃষ্ণের মেলা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই মেলাতেও প্রায় দুই হাজার লোক উপস্থিত হয়। প্রাগুক্ত রক্ষিত মহাশয় মেলার সময়ে জলছত্র প্রদান করিয়া দর্শনার্থী আগত লোকদিগের বিশেষ পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন।

ডুমা।—এই স্থানও খাঁটুরা হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী। এখানে ১২ই বৈশাখে এক মেলা বসিয়া থাকে এবং ১০।১২ হাজার লোক সমাগত হয়। এই মেলা চারি দিন অবস্থিতি করে। ইহা হিন্দু ও মুসলমানের মেলা।

ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান।—কুশদ্বীপে কোনও ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান নাই; কিন্তু নদীয়া জেলায় তাদৃশ স্থান দুই চারিটী দেখিতে পাওয়া যায় এবং সেই সকল স্থানের সহিত মধ্যে মধ্যে কুশদ্বীপেরও বিশেষ সংঘর্ষ হইয়া থাকে। সেই জন্য আমরা কুশদ্বীপের সন্নিকটবর্ত্তী ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান গুলির বিবরণ নিম্নে প্রদান করিতেছি।

নদীয়া বা নবদ্বীপ।—এই নগর ভাগিরথী ও জলঙ্গীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত। বাঙ্গালার শেষ হিন্দুরাজা লক্ষ্মণ সেন এই নগরে স্বকীয় রাজধানী স্থাপন করেন এবং যবন সেনাপতি বখতিয়ার খিলিজীর আক্রমণে ভীত হইয়া, শ্রীক্ষেত্রে পলায়ন করেন। সংস্কৃত বিদ্যালোচনার জন্যও এ স্থান অতীব প্রসিদ্ধ।

শান্তিপুর।—রাণাঘাট মহকুমার তিন চারি ক্রোশ দক্ষিণে এই নগর অবস্থিত। শান্তিপুরে ধনপতি সওদাগরের তনয় শ্রীমন্ত সওদাগর বাণিজ্য করিতে আসিতেন। চৈতন্যদেবের প্রিয় শিষ্য অদ্বৈত এই স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। শান্তিপুর বহুসংখ্যক লোক পূর্ণ বাণিজ্য স্থান। এখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এক বাণিজ্যাগার ছিল। ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরল মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্লী এখানে মধ্যে মধ্যে আসিয়া বাস করিতেন। শান্তিপুরের সূক্ষ্ম বস্ত্র অত্যন্ত বিখ্যাত। এখানে প্রায় ১০।১২ হাজার তাঁতি বাস করে। শান্তিপুরে অনেক গোস্বামী আছেন; তাঁহারা অদ্বৈতের বংশধর। শান্তিপুরের প্রায় তিন ভাগ লোক বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী।

উলা বা বীরনগর।—এই নগর রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্গত এবং অতীব প্রাচীন। এই স্থানে শিবসীমন্তিনী ভগবতী, শ্রীমন্ত সওদাগরের সিংহল যাত্রা কালে, তদীয় রণতরি সকল প্রবল ঝটিকা ও ভীষণ বৃষ্টিপাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই জন্য, উক্ত সওদাগর এই স্থানে নামিয়া, মঙ্গল চণ্ডীর পূজা করেন। সেই চণ্ডী উলুই-চণ্ডী নামে বিখ্যাত হইয়া, আজিও এই স্থানে বিরাজ করিতেছেন। "গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী" গ্রন্থে গঙ্গার যে গতি উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ভাগিরথী ইহার নিম্ন দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন, এইরূপ উল্লেখ আছে।

সুখসাগর।—পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে, সুখসাগর অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। তখন অট্টালিকাদিতে এই স্থান পূর্ণ ও শোভিত ছিল। প্রাচীনকালে লর্ড কর্ণওয়ালিস এই স্থানে আসিয়া বাস করিতেন। এখন যেমন গবর্ণমেন্ট সিমলা পাহাড়ে যান, তখন গ্রীষ্মকালে তাঁহারা সুখসাগরে আসিতেন। রেভিনিউ বোর্ড, মুরশিদাবাদ হইতে উঠিয়া আসিয়া, এই স্থানে সংস্থাপিত হয়। সুখসাগরের সমস্তই এক্ষণে গঙ্গায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। খৃষ্টীয় ১৮২৩ বা বাঙ্গালা ৩০ সালের বন্যায় সুখসাগরের বাজার ধ্বংস হইয়াছে।

কুশদ্বীপবাসিগণের সামাজিক অবস্থান।—পরিচ্ছদ ও অন্যান্য ভোগ্য বস্তু সম্বন্ধে কুশদ্বীপবাসিগণ আজি কালি অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে। অধুনাতন অপেক্ষাকৃত বিশিষ্ট ব্যবসায়িগণ গ্রীষ্মকালে এক খানি ধুতি ও একখানি উড়ানি ব্যবহার করে। উভয়ই কার্পাস সূত্র নির্ম্মিত এবং মূল্যে দুই টাকার অধিক নহে; পাদদেশে এক টাকা মূল্যের এক যোড়া চটী জুতাও ব্যবহার করে। শীতের সময়ে মোটা সূতার চাদর, মোটা শাল, অথবা এক খানি র‍্যাপার বা বনাত উড়ানির পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। ইহারা সচরাচর চারি পাঁচ কুঠারি বিশিষ্ট একটী ইষ্টকময় গৃহে বাস করে। গৃহ সামগ্রীর মধ্যে প্রধানতঃ দুই তিন খানি তক্তাপোষ, বস্ত্রাদি রাখিবার জন্য দুই তিনটী কাষ্ঠের সিন্দুক-বাক্স, কতকগুলি পিত্তল, তামা বা কাঁসা নির্ম্মিত তৈজস এবং কতিপয় প্রস্তর পাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রীলোকেরা দশ হাত লম্বা পাড়বিশিষ্ট এক খানি সূতার কাপড় পরিধান করে। কিন্তু সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের সধবা স্ত্রীলোক ২০।৩০ ভরির সুবর্ণ ও ৭০।৮০ ভরির রৌপ্যালঙ্কার পরিধান করিয়া থাকে। প্রত্যেক

সংসারেই দুই তিনটী বিধবা স্ত্রীলোক দেখিতে পাওয়া যায়; উহারা থান কাপড় পরিয়া থাকে এবং কোনও অলঙ্কার ব্যবহার করে না। স্বামীর স্বর্গারোহণান্তে ইহারা যে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে, আমরণ তাহা হইতে কদাপি বিচলিত হয় না। ইহাদিগকে দেখিলেই সতীত্বের প্রত্যক্ষ প্রতিমা বলিয়া বোধ হয়। আহার, ব্যবহার, বেশভূষাতেও ইহারা যেরূপ নিস্পৃহ ও নিঃস্বার্থ হইয়া দিনপাত করে, তাহাতে তাহাদিগকে দেবাঙ্গনা বলিতে ইচ্ছা জন্মে। হিন্দুধর্ম্মে যদি বিন্দুমাত্রও সারাংশ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে ইহাদিগের নৈতিক জীবনেই তাহা পরিলক্ষিত হয়। সংসারে অবস্থিতি করিয়া, সংসার হইতে নির্লিপ্ত হইতে, এমন আর কাহাকেও দেখা যায় না। হিন্দুবিধবা হিন্দু-ধর্ম্মের জ্বলন্ত প্রতিমা—এই সকল হিন্দু বিধবা আছেন বলিয়াই, আজিও হিন্দু-ধর্ম্মের অস্তিত্ব লোপ হয় নাই।

গৃহিগণ, সচরাচর অন্ন, ডাল, মৎস্য, দুগ্ধ ও নানাবিধ তরকারী আহার করিয়া থাকে। কোনও এক কলেক্টর সাহেব ছয় সাত জন পরিবার পরিবৃত মধ্যবিধ গৃহস্থের মাসিক সাংসারিক ব্যয় নিম্নলিখিতরূপে স্থির করিয়াছেন। সাড়ে তিন মণ চাউল, মূল্য ন্যূনাধিক নয়টাকা; অর্দ্ধমণ ডাল, মূল্য দুই টাকা; তৈল আড়াই টাকার; ঘৃত এক টাকার; কাষ্ঠ দুই টাকার; দুই তিনটী গাভীর বিচালী, দুই টাকার; লবণ দশ বার আনার; মসলাদি ও পান দুই টাকার; অপরাপর বাজে ব্যয় চারি টাকা; সর্ব্ব সাকল্যে ২৫।০ হইলেই, ছয় সাত জন পরিবার পরিবৃত মধ্যবিধ গৃহস্থ সুখে সচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে।

এতৎসম্বন্ধে কৃষিজীবী বিশিষ্ট-কৃষাণের ব্যয় অন্যরূপ। কৃষকেরা এক এক খানি মোটা ধূতি পরিধান করে এবং উড়ানির পরিবর্ত্তে একখানি সুদীর্ঘ গামোছা স্কন্ধে ফেলিয়া, সর্ব্বত্র গতায়াত করিয়া থাকে। শীতকালে কৃষকেরা এক এক খানি মোটা মান্দ্রাজী চাদর ব্যবহার করে। এক এক বাটীর মধ্যে দুই বা তিন খানি খড়ের ঘর, একখানি বড় গোয়াল বা গোশালা এবং সর্ব্বদা বাহিরে বসিবার ও দাঁড়াইবার জন্য এবং বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনগণের অভ্যর্থনার নিমিত্ত, একখানি চণ্ডীমণ্ডপ বা বাহিরের ঘর থাকে। এই সকল ঘরের প্রাচীর প্রধানতঃ মৃত্তিকানির্ম্মিত অথবা বাঁশের বেড়ার উপর মৃত্তিকার

লেপযুক্ত এবং উপরিভাগ বা ছাদ, তৃণ বা পর্ণাচ্ছাদিত বাঁশের চাল দ্বারা আবৃত। গৃহসামগ্রীর মধ্যে, এক বা দুইখানি তক্তাপোষ, দুই একটী কাষ্ঠের সিন্ধুক ও বাক্সই প্রধান। কৃষিজীবী সাধারণ গৃহস্থের সচরাচর আহার্য্য, মোটা অন্ন, মৎস্য, ডাল, তরকারি ও দুগ্ধ। যথার্থ কথা বলিতে কি, কৃষিজীবী গৃহস্থ, নিজ আবাদ হইতেই অন্ন, ডাল ও তরকারি পাইয়া থাকে। উহাকে শুদ্ধ মৎস্য, তৈল, লবণ, মসালা এবং পরিধেয় বসন ক্রয় করিতে হয়;—কাষ্ঠ কিনিতে হয় না; কেন না, গরুর গোময় হইতে যে কাণ্ডী বা ঘুঁটিয়া প্রস্তুত হয় এবং অরহর ও পাট প্রভৃতির যে শুষ্ক কাষ্ঠ থাকে, তাহাতেই তাহার কাষ্ঠের অভাব বিদূরিত হইয়া থাকে। প্রাগুক্ত কলেক্টর সাহেব এরূপ একটী কৃষিজীবীর মাসিক সাংসারিক ব্যয়ও নিম্ন লিখিতরূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এক টাকার মৎস্য; আট আনার অন্যান্য তরকারি; দেড় টাকার তৈল; আট আনার লবণ; দেড় টাকার পান ও মসলাদি; দুই টাকার বস্ত্র; অন্যান্য ব্যয়ে দুই টাকা এবং গরুর খইল প্রভৃতিতে দেড় টাকা;—সর্ব্ব সাকল্যে সাড়ে দশ টাকা মাত্র। কিন্তু ইহার উপর তাহার চাউল ও খাজানাদি ধরিলে, ঊর্দ্ধ সংখ্যায় কুড়ি টাকা হয়। কোনও ভাগ্যবান্ কৃষকপরিবারের নিত্যব্যয় সাধারণতঃ এইরূপই হইয়া থাকে। কিন্তু অধিকাংশ কৃষক পূর্ব্বোক্ত রূপেও সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করে না। একজন মধ্যবিধ কৃষক, এক যোড়া বলদ লইয়া, অন্যূন ১৫ বিঘা জমির আবাদ করিতে পারে এবং আহারাদির ব্যয় সমেত তাহার মাসিক ব্যয়, দশ টাকার অধিক পড়ে না।

ফলতঃ পূর্ব্বকালে প্রজারা পরম সুখেই কালযাপন করিত। সামাজিক অবস্থান সম্বন্ধে ভূমির কর ও আহারাদির সাচ্ছল্য, এই দুইটী প্রধান। যদি এই দুইটী সুখে চলিয়া যায়, তাহা হইলেই প্রজারা "রামরাজ্যে বাস" বলিয়া আপনাদিগকে গৌরববান মনে করে। বস্তুতঃ যে দেশে ভূমির কর লইয়া, প্রজাকে উৎপীড়িত হইতে হয় না, অথচ প্রজারা গ্রাসাচ্ছাদনেরও কোন কষ্ট পায় না, সেই দেশের প্রজারাই অতুল সুখে সুখী হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে প্রজাদিগের এই উভয়বিধ সুখই অপর্য্যাপ্ত ছিল। তখন একে ত শস্যক্ষেত্রের কর, প্রতি বিঘায় গড়পড়্তা দুই আনা ছিল এবং বাস্তু ও বাগানের কর, প্রতি বিঘায় বার্ষিক দুই টাকার অধিক ছিল না; তাহাতে আবার পত্তনি, দরপত্তনি,

প্রভৃতির বন্দোবস্ত না থাকাতে, ভূমির খাজানাও কোন কালে বড়িত না। আবার, প্রতি গ্রামে নিষ্কর ভূমি থাকাতে, কৃষিজীবী প্রজাগণের আরও সুবিধা হইত। নিষ্কর ভূমির খাজানা আরও অল্প ছিল। বিশেষতঃ যাহারা নিজের নিষ্কর ভূমি আবাদ করিত, তাহারা শস্য না জন্মিলেও, খাজানা দিতে হইবে না বলিয়া, তাদৃশ উৎকণ্ঠিত হইত না। যাহারা অন্যের নিকট নিষ্কর ভূমি খাজনা করিয়া লইত, তাহারাও নিশ্চিন্ত থাকিত। কেন না, একে তাহাদিগকে মালের জমী অপেক্ষা খাজানা কম দিতে হইত, তাহার উপর সেই খাজানা কোনও নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে দিবার আবশ্যকতা হইত না।

কুশদ্বীপে খাদ্য সুখ যার পর নাই ছিল। পূর্ব্বকালের কথা দূরে থাকুক, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, এখানে তণ্ডুলের মণ বার আনা; কলাই, ছোলা ও অরহরের মণ আট আনা; মুগের মণ এক টাকা; তৈলের মণ পাঁচ টাকা; ঘৃতের মণ দশ টাকা; এবং মটর, খেঁসারি ও মুসুরির মণ ছয় আনা ছিল। অন্যান্য খাদ্যও ঐরূপ সুলভ মূল্যে পাওয়া যাইত। ইহার পূর্ব্বে ঐ সকল দ্রব্যের মূল্য আরও অল্প ছিল। মুসলমান রাজত্বকালে, এপ্রদেশে যে কখনও দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, ইহা কোনও ইতিহাসেই দেখিতে পাওয়া যায় না। পরে, বিলাসিতা যতই প্রবল হইতেছে, কষ্টের পরিমাণও ততই অধিক হইতেছে। এখন একটী লোকের এক বেলার ভার লইতেও, লোকে কষ্ট বোধ করে; কিন্তু তখন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় দশ পনর জন অতিথি, পথিক বা কুটুম্ব আসিলেও, লোকে বিন্দুমাত্র বিরক্তি বা কষ্ট বোধ করিত না। কারণ, তৎকালে আমাদিগের প্রধান আহার্য্য অন্ন, ডাল, তরকারি, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ও শর্করা বা গুড় লোকের বাটীতে যে কোন রূপেই হউক, অপর্য্যাপ্তরূপে সঞ্চিত থাকিত। প্রত্যেকের বাটীতে একটী পুষ্করিণী ও তাহাতে বহুবিধ মৎস্যও রক্ষিত হইত; সুতরাং অভ্যাগত যে সময়েই উপস্থিত হউক না কেন, গৃহস্থ কোনরূপেই অপদস্থ ও কুণ্ঠিত হইত না। প্রত্যুত, গৃহী পরম সমাদরে তাহার সেবা করিতেন। কিন্তু এক্ষণে, লোকের ভোগ স্পৃহা যতই বাড়িতেছে—পুণ্যানুষ্ঠান রহিত করিয়া, তাঁহাদের গৃহলক্ষ্মীর অলঙ্কার গড়াইবার বাসনা, যতই বলবতী হইতেছে—কাল দুর্ভাগ্য বদন ব্যাদান করিয়া, ততই তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে যাইতেছে!

কুশদ্বীপের কৃষি কর্ম্ম।—কুশদ্বীপের ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা। এখানে বিবিধ আশু ও হৈমন্তিক ধান্য, সর্ব্ববিধ হরিৎ-খন্দ, তামাক, নীল ও পাট জন্মিয়া থাকে। এই ভূভাগের মধ্যে অর্থাৎ নিজ কুশদ্বীপ হইতে অন্যূন দুই ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে, হিঙলী নামে এক সামান্য গণ্ডগ্রাম আছে। তাহাতে অতি উৎকৃষ্ট ও সুমিষ্ট তামাক উৎপন্ন হয়। উহাকেই সাধারণে হিঙলী তামাক বলিয়া থাকে। এখানে আম্র, কাঁঠাল, নারিকেল, রম্ভা, দাড়িম্ব, আতা, জাম, লিচু, গোলাপজাম, গুবাক্, তিন্তিড়ী প্রভৃতি নানাবিধ সুস্বাদু ফলও উৎপন্ন হয়। এখানে যেমন উৎকৃষ্ট খর্জ্জুর গুড় উৎপন্ন হয়, এমন আর কোথাও পাওয়া যায় না। এই গুড়ের বিন্দুমাত্রের গন্ধে চারিদিক আমোদিত হয়, এবং উহা স্বচ্ছ, সুপরিষ্কৃত ও মিছরির ন্যায় দানা বিশিষ্ট। এই গুড়ে অতি উৎকৃষ্ট চিনিও প্রস্তুত হয়। আমরা যথাস্থানে এই চিনির বিষয় বিশদরূপে আলোচনা করিব।

কুশদ্বীপের কৃষিজাত প্রধান শস্য, ধান্য। ইহা উৎপাদন করিবার দুইটী প্রকার ভেদ আছে এবং উহা বৎসরের মধ্যে চারিবার উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রকার ভেদ যথা;—

(১) কর্ষিত ভূমিতে বীজ ছড়াইয়া দিলে, সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া, বৃক্ষে পরিণত হয় ও তাহাতে ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। আশু ও জালি ধান্য এই রূপে উৎপন্ন হয়।

(২)। কোনও স্থানে বীজ ছড়াইয়া ধান্যের গাছ প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। পরে, সেই গাছ প্রায় আধ হাত বা তিন পোয়া আন্দাজ হইলে, উহা তুলিয়া লইয়া গিয়া, সুচারুরূপে কর্ষিত ভূমিতে রোপণ করিতে হয়। পরে সেই গাছ কালক্রমে পরিণত ও শস্যসম্পন্ন হয়। হৈমন্তিক ও বোরো ধান্য এইরূপে রোপিত হইয়া থাকে।

১। আশু ধান্য।—ইহা বৈশাখে উপ্ত ও ভাদ্রে কর্ত্তিত হয়। চৈত্রের শেষ ভাগের বা বৈশাখের নবীন বারি ধারায় ধরাতল অভিষিক্ত হইলে, ভূমি পুনঃ পুনঃ কর্ষিত হয় এবং তাহাতে আশুধান্যের বীজ উপ্ত হইয়া থাকে। উচ্চ ভূমিতেই আশু ধান্য প্রধানতঃ জন্মিয়া থাকে।

২। হৈমন্তিক বা আমন ধান্য।—ইহা আষাঢ় মাসে রোপিত ও অগ্রহায়ণে কর্ত্তিত হয়। প্রথমতঃ আমন ধান্যের বীজ, নিম্ন সরস ভূমিতে উপ্ত

হয়। এক মাস পরে, সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া, আধ হাত বা তিন পোয়া আন্দাজ গাছে পরিণত হয়। তখন সেই গাছ অল্প জল বিশিষ্ট কর্দ্দমময় নিম্ন জলাভূমিতে রোপণ করিতে হয়। পরে উহা হইতে শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

৩। বোরো ধান্য।—ইহাও আমন ধান্যের ন্যায় মাঘ মাসে রোপিত হইয়া চৈত্র মাসে কর্ত্তিত হইয়া থাকে। ইহারও বীজ ধান্য, আমন ধান্যের ন্যায় উঠাইয়া, নিম্ন জলাভূমিতে রোপিয়া দিতে হয়। বোরো ধান্য কুশদ্বীপে জন্মে না।

৪। জালি ধান্য।—ইহাও বৈশাখে উপ্ত ও কার্ত্তিক মাসে কর্ত্তিত হয়। কুশদ্বীপে জালি ধান্যও জন্মে না।

গোধূম।—কার্ত্তিকমাসে উপ্ত হইয়া, ফাল্গুণে কর্ত্তিত হয়। ইহা সচরাচর আশু ধান্যের জমিতে, ধান্য কর্ত্তিত হইলে, উপ্ত হইয়া থাকে। এতদঞ্চলে গোধূমের চাস অতি অল্প হইয়া থাকে।

যব, মসিনা, সরিষা ও রাই সরিষা।—এই কয়েকটী শস্য গোধূমের ন্যায় একই প্রণালীতে, এক মাসে ও একই জমিতে বোনা হইয়া থাকে।

তিল।—ইহা শ্রাবণে উপ্ত ও পৌষে কর্ত্তিত হয়।

হরিৎ বা রবি-খন্দ।—হরিৎ-খন্দের মধ্যে, মুগ, মটর, ছোলা, মাসকলাই, মুসুরি ও অরহর প্রধান। উহাদিগের মধ্যে মটর কার্ত্তিক মাসে উপ্ত ও ফাল্গুণমাসে কর্ত্তিত হয়।—ছোলা, তিলের ন্যায় এক সময়ে ও একই প্রণালীতে উপ্ত ও কর্ত্তিত হয়;—মাস কলাই, কার্ত্তিক মাসে উপ্ত ও পৌষে কর্ত্তিত হয়;—মুসুরি, কার্ত্তিকে উপ্ত ও ফাল্গুণে কর্ত্তিত হয়।

লঙ্কা।—লঙ্কা বৈশাখে উপ্ত ও ফাল্গুণে কর্ত্তিত হয়।

পাট।—কুশদ্বীপে পাটও জন্মিয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব্বাঞ্চলে ইহা যে পরিমাণে ও যত উৎকৃষ্ট রূপে হইয়া থাকে, এখানে তেমন হয় না। ইহা আশুধান্যের উপযোগী জমির ন্যায় উচ্চ ভূমিতে জন্মিয়া থাকে। অর্দ্ধ বালুকা ও অর্দ্ধ মৃত্তিকা মিশ্রিত "দো-আঁসলা" জমিই, ইহার আবাদের সম্পূর্ণ উপযোগী। ফাল্গুণ-মাসে ইহার আবাদ আরম্ভ হইয়া, পুনঃ পুনঃ চসি হইতে থাকে। চসিয়া চসিয়া যখন সমস্ত মৃত্তিকা এককালে ধূলায় পরিণত হয়, তখন ইহাতে বীজ ছড়ান হয়। প্রতি বিঘায় অন্যূন তিন সের করিয়া বীজ লাগে। বৈশাখ মাসে জমিতে বীজ ছড়াইতে হয়। যখন বীজ অঙ্কুরিত হইয়া প্রায় আধ হাত

পরিমিত গাছ হয়, তখন অন্যান্য আগাছা ও ঘন বুনানি নিবারণ করিবার জন্য, ইহাতে বিদা দেওয়া হয়। এক পক্ষ পরে, ঐ জমিতে পুনরায় বিদা দিয়া, আগাছা ও ঘন বুনানি উঠাইয়া দেওয়া হয়। ভাদ্রমাসে যখন ইহাতে ফুল ধরিতে আরম্ভ করে, তখনই পাট কাটিতে হয়। প্রথম বৎসরে যথেষ্ট ফসল হইয়া থাকে ;—দ্বিতীয় বৎসরে ফসল কিছু অল্প হয় ;—তৃতীয় বৎসরে যখন ভূমির ফসল আরও মন্দ ও অল্প হয়, তখন ভূমি এককালে অনুর্ব্বর হইয়া পড়ে। ক্রমাগত অনাবৃষ্টি হইলে, পাটে এক প্রকার দোষ জন্মে। চলিত ভাষায়, এই দোষকে "কুচারি" কহে। এই দোষ জন্মিলে, পাটের পাতা সকল কোঁকড়াইয়া ও পরস্পর জড়াইয়া যায় এবং পাট গাছ আর বাড়িতে পারে না। পাটে আর এক প্রকার দোষও জন্মিয়া থাকে ; উহাকে শুঁয়াপোকার উপদ্রব কহে। পাটে শুঁয়াপোকা ধরিলে, সমস্ত পাতা শুঁয়াপোকায় এককালে খাইয়া ফেলে এবং শুষ্ক পাটের ডাঁটাটি মাত্র রাখিয়া দেয়। পাট কাটা হইলে, এক হস্ত বেড়ের এক একটী বোঝা বাঁধা হয় এবং কোনও ডোবা বা খাল মধ্যে কোন একটী ভারী দ্রব্য চাপাইয়া, সেই সকল বোঝা ডুবাইয়া রাখা হয়। তখন পাট পচিতে আরম্ভ হয় এবং ক্রমান্বয়ে দশ দিন পর্য্যন্ত জলমধ্যে থাকিয়া, উহার ছাল পচিয়া যায়। তখন জল হইতে উঠাইয়া, ইহার ডাঁটি হইতে পাট পৃথক্ করিয়া লওয়া হয়। তৎপরে সেই পাট দুইবার কাচিয়া লইয়া, রৌদ্রে শুখাইতে দেওয়া হয়। পরে, সেই পাট জড়াইয়া গাঁইট প্রস্তুত করা হয় এবং ব্যবহার বা বাজারের উপযোগী করিয়া লওয়া হয়।

আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, আমাদের এতদঞ্চলের পাট প্রতি বিঘায় ৬।৭ মণ জন্মিয়া থাকে এবং উহার মূল্য প্রতি মণ ৩৲ তিন টাকার ন্যূনে বিক্রয় হয় না।

কলিকাতার বাজারে দুই প্রকার পাট আমদানি হইয়া থাকে ; প্রথম প্রকারের পাটই উৎকৃষ্ট এবং উহাদিগের সর্ব্বজাতীয়ই পূর্ব্ব প্রদেশে জন্মিয়া থাকে। দ্বিতীয় প্রকার, কলিকাতার চতুর্দ্দিকে এবং পদ্মার দক্ষিণ পার্শ্বে উৎপন্ন হয়। উহাকে দেশী পাট কহে। ইহা চব্বিশ পরগণা, হুগলী ও নদীয়া জেলায় জন্মিয়া থাকে। কিন্তু ইহা পূর্ব্বাঞ্চলের পাট হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় নহে। মূল্য ও গুণাগুণ সম্বন্ধে, এতদঞ্চলের পাট পূর্ব্বাঞ্চলের উত্তম ও

অধম পাটের মধ্যবর্ত্তী স্থান অধিকার করে। এইরূপে কাঙ্গরিপাড়ার পাট, সিরাজগঞ্জের উত্তর প্রান্তস্থ এক স্থান হইতে আইসে এবং উহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাট বলিয়া আদৃত হয়। এই পাটের তারগুলি ৭ ফিট হইতে ১০ ফিট লম্বা ;—অত্যন্ত শ্বেতবর্ণ ;—চাকচিক্যশালী ; -এবং সম্পূর্ণরূপে ছাল শূন্য। ইহার নিম্নে ভূতমারি, করিমগঞ্জ, বাকরাবাদ প্রভৃতি পূর্ব্বাঞ্চলের পাট, স্থান লাভ করিয়াছে। বর্ণিও কোম্পানি থলী প্রস্তুত করিবার জন্য, পূর্ণিয়ার অন্তর্গত দৌলতগঞ্জের পাট অধিক মনোনীত করিয়া থাকে। মোটামোটি ধরিতে হইলে, প্রেসিডেন্সি ও বর্দ্ধমান বিভাগের মধ্যে যে পাট জন্মে, তাহাকেই দেশী পাট কহে। এই পাটের মধ্যে মণ্ডলঘাটার (মেদিনীপুর, হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে অবস্থিত পরগণা) নাম্নীপাট উত্তম ;—চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বারাশত মহকুমার পাট মধ্যম ;—এবং চাকদহ পাট নিকৃষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে। নদীয়ার পাট চাকদহের বাজারে আমদানি ও চাকদহ হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে ; সেই জন্য উহা "চাকদহ পাট" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

আমরা যতদুর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে বুঝিতে পারিয়াছি যে, দেশী ও পূর্ব্ব দেশীয় পাট উভয়ই এক জাতীয় এবং উভয়ই আশু ও আমন ধান্যের জমিতেই জন্মিয়া থাকে। পূর্ব্ব দেশীয় পাট সকল অপেক্ষাকৃত গভীর জলে জন্মে ; কিন্তু উহাদিগের উৎকৃষ্টতার কারণ বোধ হয়, জমির উত্তমতা ও জলপ্লাবনের উৎকর্ষ-বিধায়িনী শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। বারাশতবাসী কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, দেশী পাট তাঁহার গ্রামের চারিপার্শ্বস্থ আশুধান্যের জমিতেই জন্মিয়া থাকে। যাহাহউক, সকলেই অবগত আছেন যে, আশুধান্যের জমি কদাপি উৎকৃষ্ট হয় না। বস্তুতঃ কি জমি, কি পরিশ্রম, উভয় সম্বন্ধেই আমন অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। অন্য পক্ষে, এক জন দেশীয় পাটের ব্যাপারী বলেন যে, যে জমী নিতান্ত মন্দ ও পাটের অনুপযোগী, তাহাতেই আশুধান্য বোনা হইয়া থাকে। ইহাতেও দেশী ও পূর্ব্বাঞ্চলীয় পাটের ইতর বিশেষ অনায়াসে উপলব্ধি হইতেছে। দেশী পাটের জন্য মধ্যবিধ জমি এতদঞ্চলে মনোনীত হয় ; কিন্তু পূর্ব্ব দেশে অতি উৎকৃষ্ট ভূমিই পাটের নিমিত্ত নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে।

শন চাস।—কুশদ্বীপে কদাচিৎ শনের চাস হইয়া থাকে। পাট ও শন

উভয়ই বৈশাখ মাসে বপন করে এবং ভাদ্র মাসে কাটিয়া লয়। কার্ত্তিক মাসে নদীয়ার অপরাপর স্থানে কার্পাস বপন করা হয় এবং বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে উহার পাপরা সংগৃহীত হয়।

নীল।—এ প্রদেশে দুইবার নীলের ফসল হইয়া থাকে। বৈশাখ মাসের নব বৃষ্টি ধারার পূর্ব্বে এক প্রকার বীজ উপ্ত হইয়া থাকে এবং উহা ভাদ্রমাসে কর্ত্তিত হয়; অন্য প্রকারের বীজ, বর্ষার জল কমিতে আরম্ভ হইলেই, বোনা হয় এবং শ্রাবণ মাসে কর্ত্তিত হইয়া থাকে।

ইক্ষু।—চৈত্র বৈশাখ মাসে ইক্ষুর খাদি (কর্ত্তিত খণ্ড) রোপিত হয় এবং মাঘ ফাল্গুণে উহা কর্ত্তিত হইয়া থাকে।

তামাক।—ভাদ্র মাসে তামাকের বীজ ছড়ান হয়। পরে উহার গাছ হইলে, সেই গাছ আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে কর্ষিত জমিতে রোপিত হয় এবং মাঘমাসে উহা কর্ত্তিত হইয়া থাকে।

হরিদ্রা।—বৈশাখ মাসে হরিদ্রা বপন করা হয় এবং ফাল্গুণ মাসে উহার মূল হইতে হরিদ্রা আহৃত হইয়া থাকে।

তুঁত।—এপ্রদেশে তুঁতের চাস নাই; কিন্তু ভূমির প্রকৃতি দেখিয়া কোন কোন কৃষিশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত বলেন যে, এতদঞ্চলে তুঁতের চাস বহুল পরিমাণে হইতে পারে। সুতরাং সাধারণের অবগতির জন্য, আমরা এই মূল্যবান ফসলেরও এস্থলে নামোল্লেখ করিলাম। ফলতঃ ইহার চাসের জন্য, এপ্রদেশীয় কৃষকগণের দুই একবার চেষ্টা করিয়া দেখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। প্রকৃত আবাদ করিয়া উঠিতে পারিলে, কৃষকগণ নিশ্চয়ই বিপুল লাভবান্ হইবেন। যাহাহউক, এক প্রকারের তুঁত ভাদ্রমাসে ও অন্য প্রকারের তুঁত চৈত্রমাসে রোপিত হয় এবং ক্রমান্বয়ে আষাঢ় ভাদ্রে ও অগ্রহায়ণ চৈত্রে, চাসীরা উহার পত্র সংগ্রহ করিয়া, তুঁত কীটের পোষণ ও পরিবর্দ্ধন কার্য্য নির্ব্বাহ করে।

পান বা তাম্বুল।—বৈশাখ মাসে ইহা রোপিত হয় এবং পরবর্ত্তী বৎসরের বৈশাখ মাসে, উহার পত্র পরিপক্ক হইয়া আসিলে, সেই পত্র সকল তুলিয়া বিক্রয় করা হইয়া থাকে। পানের চাষ অত্যন্ত শুদ্ধাচারে করিতে হয়।

কুশদ্বীপের কৃষকগণের সাংসারিক অবস্থা।—যে সকল কর্ষক, শত বিঘা বা তদধিক ভূমির আবাদ করে, তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চশ্রেণীস্থ; যাহারা ত্রিশ

বিঘার অনধিক জমি আবাদ করে, তাহারাই নিম্ন শ্রেণীস্থ; এবং যাহারা ৬০।৭০ বিঘা জমি আবাদ করে, তাহারা মধ্যবিধ কৃষাণ বলিয়া পরিগণিত হয়। এক যোড়া বলদ, ১৫,১৬ বিঘা ভূমির অধিক আবাদ চালাইতে পারে না। কিন্তু এরূপ আবাদেও, কৃষকের সাংসারিক ব্যয় বাদে প্রতি বর্ষে, অন্যূন ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু কৃষক যদি নিজে লাঙ্গল, গরু প্রভৃতি দ্বারা কৃষি কর্ম্ম নির্ব্বাহ করে, তাহা হইলে উহাতে উহার দ্বিগুণ লাভ হইবার সম্ভাবনা। হীনপদস্থ কৃষাণেরা প্রায়ই অনিয়মিত ঋণজালে আবদ্ধ হয়। কুশদ্বীপের কথা দূরে থাকুক, নদীয়া জেলার প্রায় দশ আনা কৃষক ওটবন্দী জমিতে কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করে। উহাদিগের মধ্যে অনেকেই কর সংক্রান্ত আইনানুসারে প্রতি বৎসর অতিরিক্ত খাজনা দিয়া থাকে। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১০ আইনানুসারে কতকগুলি কৃষকের যে অতিরিক্ত খাজনা দিতে হয় না এবং পুরুষানুক্রমে তাহারা যে এক হারে খাজনা দিয়া আসিতেছে ও আসিবে, আমরা তাহা নিশ্চয় বলিতে পারি না। নদীয়া জেলার মধ্যে চিরস্থায়ী ক্ষুদ্র যোৎ-দারেরা, হয়ত, জমীদারের, নয়ত, অন্য কোনও বৃহৎ যোৎদারের অধীন থাকে।

কুশদ্বীপের গ্রাম্য ও গৃহপালিত জন্তু।—কুশদ্বীপের গ্রাম্য ও গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে, বলদ, গাভী, হস্তী, ছাগ, মেষ, অশ্ব, গর্দ্দভ, বিড়াল কুকুর ও শূকর প্রধান। কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য এখানে বলদ ও মহিষ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মহিষ অপেক্ষা বলদের সংখ্যাই সমধিক। বিড়াল ও কুকুর ব্যতীত, অপরাপর জন্তু খাদ্য, যান বা ব্যবসায় জন্য পালিত হইয়া থাকে। গুণানুসারে এক একটী গাভীর মূল্য কখন কখন দশ টাকা হইতে ত্রিশ বা চল্লিশ টাকা পর্য্যন্তও হইয়া থাকে। সমজাতীয় ও সমশ্রেণীস্থ দুইটী বলদের মূল্য ৪০।৫০ টাকাও হইয়া থাকে। এক যোড়া মহিষের মূল্য ১০০।১২৫ টাকা হইতেও দেখা গিয়াছে। এখানে এক কুড়ি মেষের মূল্য অন্যূন ত্রিশ টাকা, এক কুড়ি ছাগ ঊর্দ্ধ সংখ্যায় ২০।২৫ টাকার অধিক নহে। এক কুড়ি বয়ঃপ্রাপ্ত শূকরশাবক সময়ে সময়ে এক শত টাকায় বিক্রীত হয়। এখানে কেহই শূকর মাংস ভক্ষণ করে না। কাওরা, হাড়ি প্রভৃতি কয়েকটী ইতর জাতিই শূকর পালন ও শূকর মাংস ভক্ষণ করে।

কৃষিসংক্রান্ত অস্ত্র শস্ত্র।—কৃষি সম্বন্ধীয় অস্ত্র শস্ত্রের মধ্যে লাঙ্গল, মৈ, বিদা, কোদালী, কাস্তে ও নিড়ীন প্রধান।

১। লাঙ্গল।—ইহা দ্বারা ভূমি উত্তমরূপে কর্ষিত হয়; ইহার মূল্য ঊর্দ্ধ সংখ্যায় দুই টাকা।

২। মৈ।—ইহা এক খানি বাঁশের সিঁড়ি মাত্র, ইহা দ্বারা মাটির ঢেলা বা চাপ চূর্ণীভূত, ভূমি সমতল এবং বীজ মৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদিত হয়।

৩। বিদা।—ইহা দ্বারা ভূমি অল্প পরিমাণে কর্ষিত ও আগাছা সকল বিদূরিত হয়।

৪। কোদালী।—অল্প পরিমাণে ভূমি খনন বা স্তূপাদি নষ্ট করিবার প্রয়োজন হইলে, ইহা দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে।

৫। কাস্তে।—ইহা দ্বারা শস্য কর্ত্তিত হয়।

৬। নিড়ীন।—ইহা দ্বারা সামান্য সামান্য আগাছা সকল উন্মূলিত হয়।

কৃষিকার্য্যের অস্ত্রাদির ব্যয়।—১৫।১৬ বিঘা জমি কর্ষণোপযোগী অস্ত্র শস্ত্রের মূল্য সাত আট টাকা হইবে। এক জন কৃষাণের বার্ষিক বেতন ঊর্দ্ধ সংখ্যায় ৩৬৲ ছত্রিশ টাকা। কৃষাণভৃত্য উক্ত বেতন ব্যতীত, শীতের সময় ও বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বে বস্ত্র পাইয়া থাকে। উহাকে শীতুড়ি ও পার্ব্বনী কহে।

বাজার ওজন।

৫ তোলা বা ৪ কাঁচ্চায়	১ ছটাক্।
৪ ছটাকে	১ পোয়া।
৪ পোয়ায়	১ সের।
৪০ সেরে	১ মণ।

শস্যের মাপ।

৪ পালিতে	১ কাঠা।
৪ কাঠায়	১ আড়ি।
৫ আড়িতে	১ সলি।
৪ সলিতে	১ বিশ।
১৬ বিশে	১ পৌটে।

বেতন ও দ্রব্যের মূল্য।—৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে এই অঞ্চলে দৈনিক শ্রমজীবিগণ রোজ দুই আনা; ঘরমিরা রোজ তিন আনা; রাজমিস্ত্রী ও ছুতার মিস্ত্রীরা রোজ পাঁচ আনা হইতে সাত আনা পর্য্যন্ত পাইত। কিন্তু আজি কালি দৈনিক শ্রমজীবীরা রোজ চারি আনা; ঘরমিরা সওয়া পাঁচ আনা; এবং রাজ মিস্ত্রী ও ছুতার মিস্ত্রীরা ক্ষমতানুসারে মাসিক আট টাকা হইতে পনের টাকা হিসাবে মজুরি পাইয়া থাকে।

বর্ত্তমান সময়ের শস্যাদির মূল্যের নিয়ম, যথা ;—

সুপরিস্কৃত অত্যুৎকৃষ্ট চাউল	মণ	৪৲
মধ্যবিধ চাউল	„	৩।৴
নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকের ব্যবহার্য্য সামান্য চাউল	„	২।৹ হইতে ২৷৹
কুঁড়া বিশিষ্ট অপরিস্কৃত চাউল	„	২৲
পরিস্কৃত যব	„	১৸৹
গোধূম	„	২৷৹
ছোলা	„	১।৹
নীল	„	২৫৹৲
ইক্ষু	„	১৷৹

রক্ষিত জমি ও রাজজঙ্গল।—এপ্রদেশে জমীদার প্রভৃতি কর্ত্তৃক রক্ষিত জমি বা গোষ্ঠাদির সংখ্যা নিতান্ত অল্প এবং সম্ভবতঃ আর আর স্থানের ন্যায় এখানেও উহা দুষ্প্রাপ্য বোধ হয়। কিন্তু মহামারীর পর হইতে এত লোকের বাসোচ্ছেদ ও জমি সকল পতিত জঙ্গলাদিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে যে, এক একখানি উৎকৃষ্ট জনপদও সহসা ভীষণ অরণ্যের প্রারম্ভ বলিয়া বোধ হয়।

নিষ্কর-ভূমি স্বত্ব ভোগী।—নদীয়ার রাজগণের জমীদারীর চতুর্থাংশ ভূমি নিষ্কর ছিল। উঁহাদিগের অধিকার মধ্যে ব্রাহ্মণগণকে ভূমির কর আদৌ দিতে হইত না। সেই জন্য, যে ব্রাহ্মণের নিষ্কর ভূমিতে বাস নহে, তিনি ব্রাহ্মণ নহেন, এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত ছিল। রাজারা নিকট-কুটুম্ব ও অধ্যাপক বিশেষকে কখন কখন সমগ্র গ্রাম দান করিতেন। প্রিয় ভৃত্য ও কর্ম্মচারীগণও অনেক ভূমি নিষ্কর পাইত। শূদ্রবর্গের মধ্যে, বিশেষ কৃপাপাত্র ও গুণভাজন ব্যক্তি নিষ্কর ভূমি লাভ করিত। যবন জাতীয়েরাও দেবসেবার ব্যয়ের নিমিত্ত নিষ্কর ভূমি পাইত। এতদ্ভিন্ন, উক্ত রাজারা কোনও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া, সেই বিগ্রহের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ভূমি দান করিতেন এবং অপরে কোনও দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার প্রার্থী হইলেও, ঐ বিগ্রহের সেবার জন্য নিষ্কর ভূমি প্রদান করিতেন। সাধারণ প্রজাগণের মনস্তুষ্টির জন্য, প্রতি গ্রামের গাজনের শিবের সেবা ও চড়কের ব্যয়ের জন্য অনেক নিষ্কর ভূমি নির্দ্দিষ্ট ছিল। টোল চতুষ্পাঠীর উন্নতির জন্যও অনেক নিষ্কর ভূমি দান করা

হইত। এতদ্ভিন্ন, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তাঁহার দুই মহিষীকে অনেক ভূমি দান করিয়াছিলেন।

এই সকল নিষ্কর ভূমির মধ্যে, যে সকল ভূমি হিন্দুদিগের দেবসেবার্থ প্রদত্ত হইত, তাহাকে দেবোত্তর; যে সকল ভূমি যবনদিগের দেবতার নিমিত্ত প্রদত্ত হইত, সেই সকল পীরোত্তর; যে সকল ভূমি ব্রাহ্মণের বাস বা টোল চতুষ্পাঠীর উন্নতির নিমিত্ত প্রদত্ত হইত, সেই সকল ব্রহ্মোত্তর; এবং যে ভূমি শূদ্রগণকে প্রদত্ত হইত, তাহা মহোত্তরাণ নামে খ্যাত হইত। এতদ্ভিন্ন, ভৃত্যেরা বেতনের পরিবর্ত্তে কিয়দংশ ভূমি নিষ্কর পাইত, সেই ভূমিকে চাকরাণ ভূমি বলিত।

আমরা কুশদ্বীপে অনেক দেবোত্তর, পীরোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, মহোত্তর ও চাকরাণ ভূমি দেখিতে পাই। সে সমস্ত ভূমিই, নবদ্বীপের রাজগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত। এই সকল নিষ্কর ভূমির উপর কাহারই হস্তার্পণ করিবার ক্ষমতা নাই। রাজপ্রদত্ত তায়দাদ বা রঘুনন্দনী ছাড় দেখাইতে পারিলেই, তালুকদার ইজারদার বা শিকদারগণ ইহার জন্য কোনও আপত্তি করিতে পারেন না। ব্রাহ্মণের বাস্ত ভিটা ও বাগিচার জন্য কোনও দলীলেরই আবশ্যক হয় না। তবে, এক জন ব্রাহ্মণ, অধিক ভূমি নিষ্কর উপভোগ করিলেই, তাঁহাকে তায়দাদ দেখাইতে হয়। আজিও অনেক ব্রাহ্মণের বাস্ত ভিটার তায়দাদ দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ, পুরুষানুক্রমে তাঁহারা সেই ভূমি নিষ্কর ভোগ করিয়া আসিতেছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে, কুশদ্বীপে হবিবল হোসেন নামক এক জন ভূস্বামী ছিলেন। তিনি এ অঞ্চলের অনেক ব্রাহ্মণের তায়দাদ না দেখিতে পাইয়া, সেই সেই ব্রাহ্মণের ভূমি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের বৃত্তিচ্ছেদ করিয়াই হউক, অথবা যে কারণেই হউক, তাঁহাকে অধিক দিন তিষ্ঠিতে হয় নাই;—অচিরাৎ নিপাতের মুখ দেখিয়া লইতে হইয়াছে।

১। অন্যান্য ভূমি স্বত্বভোগীগণ।—নিষ্কর ভূমির পূর্ব্বোক্ত স্বত্বভোগিগণ ব্যতীত, কুশদ্বীপে আরও কয়েক প্রকার ভূমিস্বত্বভোগী দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে উহাদিগের তালিকা প্রদত্ত হইতেছে।

২। সদরমালগুজর।—ইহারাই উচ্চ শ্রেণীস্থ জমীদার। ইহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কোন ভূভাগ নির্দ্দিষ্ট হারে খাজনা করিয়া লইয়া, অন্যকে তাহা খণ্ডে খণ্ডে বিলি করিয়া দেন ও খাজনা আদায় করেন। ইহাদিগের প্রদত্ত

রাজস্ব গবর্ণমেণ্টের কোষাগারে বর্ষে বর্ষে জমা হইয়া থাকে। ইহাদিগকে সাধারণতঃ জমীদার বা সদর মালগুজর বলে।

৩। পত্তনিদার।—ইহারাও জমীদার; ইহাদিগের জমীদারীকে পত্তনি জমা কহে। গবর্ণমেণ্টের কোষাগারে ইহাদিগকে রাজস্ব জমা দিতে হয় না। ইহারা কোনও সদরমালগুজরের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট পণে পত্তনি স্বত্ব ক্রয় করিয়া, নির্দ্ধারিত রাজস্ব সেই সদরমালগুজরকেই প্রদান করিয়া থাকেন। যতদিন ইহারা আবার স্বকীয় স্বত্ব হস্তান্তর না করেন, অথবা রাজস্ব দায়ে যত দিন ইহাদের স্বত্ব বিক্রীত হইয়া না যায়, ততদিন ইহাদিগের স্বত্ব বিলুপ্ত বা নির্দ্ধারিত রাজস্বের হার পরিবর্ত্তিত হয় না। ইহারা আবার নিজ সম্পত্তি অন্যের সহিতও বন্দোবস্ত করিতে পারেন।

৪। দরপত্তনিদার।—পত্তনিদারের নিকট হইতে আবার যাঁহারা পত্তনি গ্রহণ করেন, তাঁহারা দরপত্তনিদার নামে অভিহিত হন এবং তাঁহাদের জমীদারীকে দরপত্তনি কহে।

৫। সি-পত্তনিদার।—দরপত্তনিদারকে পণ দিয়া, আবার যে পত্তনি গৃহীত হয়, তাহাকে সি-পত্তনি এবং উহার অধিস্বামীকে সি-পত্তনিদার কহে।

৬। ইজারদার।—ইহা চিরস্থায়ী জমীদারী নহে; মূল জমীদার বা কোন প্রকার পত্তনিদারের মধ্যে কাহারও সহিত বন্দোবস্ত করিয়া কয়েক বৎসরের মিয়াদে যে স্বত্ব ক্রীত হয়, তাহাকেই ইজারা এবং উহার অধিস্বামীকে ইজার দার কহে। যত দিনের জন্য ইজারা বন্দোবস্ত হয়, তত দিনের মধ্যে খাজনার নিরিখ কখনও পরিবর্ত্তিত বা বর্দ্ধিত হয় না এবং ইহাতে কোনও চিরস্থায়ী অধিস্বামিত্বও জন্মে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে জমা, ওটবন্দী বা বোৎ ভিন্ন, ইহা আবার কাহাকেও অন্য প্রকারে বিলি করিবার অধিকার নাই। এক জন ইজারদারের পূর্ব্বে, যদি কেহ অন্য ইজারদারের নিকট হইতে কোনও জমি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া থাকে, তাহা হইলে নির্দ্দিষ্ট কাল অতিবাহিত না হইলে, সেই জমি সেই যোদ্দারের হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে পারা যায় না।

৭। দর-ইজারদার।—ইজারদারের নিকট হইতে দ্বিতীয়বার যে ইজারা লওয়া হয়, তাহাকে দর-ইজারা ও উহার অধিস্বামীকে দর-ইজারদার কহে।

৮। সি-ইজারদার।—দর-ইজারদারের নিকট হইতে আবার যে ইজারা গৃহীত হয়, তাহাকে সি-ইজারা ও তাহার অধিস্বামীকে সি-ইজারদার কহে।

৯। ইস্তিমারারি, মুকররি বা জ্যাতিদার।—খাস জমীদারের নিকট হইতে, কোনও নির্দ্দিষ্ট হারে, চিরকালের জন্য যে জমা লওয়া যায়, তাহাকে মুকররি বা জ্যাতি এবং উহার অধিস্বামীকে মুকররিদার বা জ্যাতিদার কহে। যে জমীদার, পত্তনিদার বা ইজারদারের অধীনে জমীদারী থাকে, মুকররিদার সচরাচর তাহাকেই খাজনা দিয়া থাকে।

১০। মৌরসী জমাদার।—কোনও অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য, উত্তরাধিকারী স্বত্ব ভোগের অধিকারে নির্দ্দিষ্ট হারে যে জমা দেওয়া হয়, এবং খাজনা অনাদায় ভিন্ন অন্য কোনও দোষে যাহা কোন রূপেই খাস জমীদার হস্তান্তর করিয়া লইতে পারেন না, তাহাকেই মৌরসী এবং উহার অধিস্বামীকে মৌরসীদার কহে। কোনও নির্দ্ধারিত নিয়ম ভিন্ন অন্য কোন রূপে ইহার খাজনা বৃদ্ধি হয় না। এই সম্পত্তিতে স্বত্বাধিকারীর পৈতৃক স্বত্ব জন্মিয়া থাকে।

১১। জমাদার।—ইহাদিগের জমি সাধারণতঃ পাট্টাভুক্ত সম্পত্তি এবং সচরাচর ইহা প্রকৃত অধিস্বামীর আবাদ মধ্যে থাকে। কিন্তু ইহা আবার কখন কখন কোর্ফা জমাদার কিম্বা ওটবন্দী প্রজাকেও বিলি করিয়া দেওয়া হয়। আমরা পূর্ব্বে যে সকল ভূস্বামীর নামোল্লেখ করিয়াছি, তাঁহাদিগেরই কাহার না কাহার অধিকারে ওটবন্দী ও জমাই জমী থাকে এবং তিনিই তাহার খাজানা গ্রহণ করেন।

১২। কোর্ফা জমাদার।—জমাদারের নিকট হইতে যে জমি জমা বা ওটবন্দী বন্দোবস্তে লওয়া হয়, তাহাকেই কোর্ফা জমা এবং উহার অধিস্বামীকে কোর্ফা জমাদার কহে।

১৩। ওটবন্দী দার।—এক বৎসর বা কোনও নির্দ্দিষ্ট ফসলের নিমিত্ত যে জমী খাজানা করিয়া দেওয়া হয়, তাহাকে ওটবন্দী জমা ও উহার গৃহীতাকে ওটবন্দীদার কহে। এতদঞ্চলের কৃষাণদিগের সাধারণ রীতি এই যে, কোনও জমি আবাদ করিবার প্রয়োজন হইলে, প্রজা সেই জমীর স্বত্বভোগীর নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট হারে মৌখিক বন্দোবস্ত করিয়া লয়; পরে যখন সেই জমীতে ফসল হয়, তখন সেই জমি জরিপ করে এবং বাচনিক নির্দ্দিষ্ট হারে

হিসাব করিয়া সেই জমীর খাজানা প্রদান করে। কুশদ্বীপ ও নদীয়ার অধিকাংশ ভূমিই ওটবন্দীতে বিলি হয়। এই ওটবন্দী জমীর সংখ্যা দিন দিন ন্যূন, কি বৰ্দ্ধিত হইবে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

খাজানার নিরিখ।—নদীয়ার কলেক্টর সাহেব স্থির করিয়াছেন যে, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে এতদঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন জমি নিম্নলিখিত হারে বিলি ছিল।

(১) বাস্তু জমী বা গৃহস্থের বাসোপযোগী ভূমি। কোন কোন নগরে এই জমী বার্ষিক দুই টাকা হইতে দশ বা কুড়ি টাকায় বিলি হইত। বলা বাহুল্য যে, গণ্ডগ্রামের জমী অপেক্ষা নগরের জমীর খাজনা সৰ্ব্বদাই অধিক হয়।

(২) উদ্বাস্তু বা গৃহসংলগ্ন প্রাঙ্গণ প্রভৃতি। বাটীর পার্শ্বে পুষ্করিণ্যাদি খনন করিবার জন্য সচরাচর এই ভূমির প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই জমীর প্রতি বিঘা এক টাকা হইতে দুই টাকা।

(৩) বাগাৎ।—গৃহপার্শ্বে উদ্যানাদি করিবার উপযোগী ভূমি। নানা স্থানে এই জমীর হার নানা প্রকার। কৃষ্ণনগরে এই জমীর প্রতি বিঘা দুই টাকা হইতে পাঁচ টাকা; কিন্তু আমাদের কুশদ্বীপে, উখড়ায় ও মামজোয়ানীতে উহার নিরিখ আড়াই টাকা।

(৫) বরোজ ভূমি।—এই জমীতে পানের আবাদ হয়; ইহার প্রতি বিঘা দুই টাকা হইতে পাঁচ টাকা।

(৫) মাঠান জমী।—জমীর গুণানুসারে প্রতি বিঘা ছয় আনা হইতে পাঁচ সিকা। রাণাঘাট ও কুষ্টিয়া মহকুমাতে অত্যুৎকৃষ্ট মাঠান জমীর বিঘা আড়াই টাকা। এই সকল জমী প্রধানতঃ আশু ও আমন ধান্যের উপযোগী।

অন্যান্য রাজস্ব বিভাগে এই সকল মাঠান জমীর যে হার ছিল, তাহা নদীয়ার কালেক্টর সাহেব ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে নিম্নলিখিত রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কৃষ্ণনগরে ধান্যের জমী প্রতি বিঘা আট আনা হইতে পাঁচ সিকা; মামজোয়ানীতে ও উখড়ায় প্রতি বিঘা আট আনা; পলাশীতে প্রতি বিঘা পনের আনা; বাগোয়ান, ফৈজল্যাপুর, কুবাজপুর, রাজপুর, পাটমহল, এবং খোশালপুরে প্রতি বিঘা আট আনা হইতে দশ আনা;—ইক্ষু ও তুত জমী নিম্নোক্ত স্থান সকলে প্রতি বিঘা এক টাকা। অতি দীর্ঘকালের পাট্টায় কোন কোন পুরাতন জমা এরূপ নিম্ন হারে ছিল যে, তাহা দেড় আনা হইতে দুই আনার

অধিক নহে। কিন্তু এরূপ হার এক্ষণে আর প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। এই হারের সহিত আধুনিক হার তুলনা করিলে, বোধ হয় যেন, জমীদারগণ, প্রজার শোণিত শোষণ করিবার জন্যই ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

খাজনার প্রাচীন হার।—বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে, নদীয়া জেলায় আলমপুর, আসরফাবাদ, বাঘমারা, বাগোয়ান, ফৈজুল্লাপুর, হাবিলীসহর জয়পুর, কারিগাছি, খোশালপুর, কুশদহ, কৃষ্ণনগর, কুথাজপুর, মহৎপুর, মহম্মদআলিপুর, মামজোয়ানী, মেটিয়ারি, মূলগড়, মুন্সীগঞ্জ, নদীয়া বা নবদ্বীপ, পাজনৌর, পাটমহল, পলাশী, রাজপুর, শান্তিপুর, শ্রীনগর ও উখড়া এই ২৬টী রাজস্ববিভাগে বা পরগণায় বিভক্ত ছিল। সেই সকল বিভাগে যে হার প্রচলিত ছিল, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে। ১১৯৩ হইতে ১২০২ বঙ্গাব্দ অথবা ১৭৮৬ হইতে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কয়েক বৎসরে নদীয়া জেলায় জমীদারগণ স্ব স্ব পরগণার যে নিরিখের তালিকা প্রদান করিয়াছিলেন এবং যে নিরিখ অনুসারে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে মহামতি লর্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব দশসালা বন্দোবস্ত করেন, সেই তালিকা হইতেই, এই প্রাচীন নিরিখ গৃহীত হইতেছে। কিন্তু নদীয়া জেলার তদানীন্তন ২৬টী রাজস্ব বিভাগের নিরিখ এখানে প্রদান করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। সেই জন্য, শুদ্ধ কুশদ্বীপের নিরিখই আমরা নিম্নে প্রকটন করিলাম।

আশু ধান্যের	ভূমি	প্রতি	বিঘা	আট আনা।
আমন ,,	,,	,,	,,	ছয় আনা।
অরহর ,,	,,	,,	,,	তিন আনা।
তরকারির	,,	,,	,,	এক টাকা।
খড় জমি	,,	,,	,,	তিন আনা।
পতিত	,,	,,	,,	দুই আনা।
উদ্বাস্তু	,,	,,	,,	চৌদ্দ আনা।
বাঁশ জমি	,,	,,	,,	দুই টাকা।
আম্র বাগান	,,	,,	বৃক্ষ	তিন পয়সা।
কাঁঠাল	,,	,,	,,	এক আনা।
তেঁতুল	,,	,,	,,	পাঁচ পয়সা।

তামাক	ভূমি	প্রতি	বিঘা	এক টাকা।
কদলী	,,	,,	,,	বার আনা।
ইক্ষু	,,	,,	,,	এক টাকা তের আনা।
পাট	,,	,,	,,	বার আনা।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট নদীয়ার কালেক্টর সাহেবের নিকট, যে সকল ভূমিতে ফসল জন্মিয়া থাকে, সেই সকল ভূমির অবস্থা এবং উহার আবাদকারী কৃষকগণ কি হারে খাজনা দিয়া থাকে, সেই সকলের একটী বিবরণী চাহিয়া পাঠান। তাহাতে কালেক্টর সাহেব যে সাধারণ বিবরণী পাঠাইয়াছিলেন, তাহা হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় লিপিবদ্ধ করিতেছি।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জেলা, সদর মহকুমা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা বনগ্রাম ও রাণাঘাট এই ছয় রাজনৈতিক বিভাগে বিভক্ত ছিল। কিন্তু রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যের জন্য, উক্ত ছয় বিভাগ, নদীয়ার কালেক্টর সাহেবের বিবরণী অনুসারে কুশদহাদি ৮৮ ভাগে বা পরগণায় এবং বোর্ড অব্ রেভিনিউ দত্ত হিসাবানুসারে কুশদহাদি ৭২ ভাগে বা পরগণায় বিভক্ত ছিল। সেই সকল পরগণার মধ্যে, কুশদহের অধিকাংশ বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্ব্বর্ত্তী হইয়াছে। সেইজন্য, কালেক্টর সাহেবের বিবরণীতে বনগ্রাম মহকুমার ভূমির অবস্থা ও খাজনার হার যেরূপ লিখিত হইয়াছে, আমরা এখানে তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি। পাঠক বনগ্রাম মহকুমার বিবরণ পাঠ করিলেই, কুশদহের ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ভূমির অবস্থা ও খাজনার হার জানিতে পারিবেন।

বনগ্রাম মহকুমার পরিমাণ ফল ৬৪৯ বর্গমাইল; ইহাতে ৭৪৬টী গ্রাম ও নগর আছে; ইহাতে ৬০,৬৫৪ ঘর গৃহস্থের বাস; ইহার অধিবাসীর সংখ্যা ৩,১৮,১৭০ জন; সেই সকলের মধ্যে ১,৩২,২৪৬ জন হিন্দু; ১,৮৬,১৪৬ জন মুসলমান; ৪ জন খৃষ্টান এবং ৩৭৪ জন অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী। প্রতি বর্গ-মাইলে ৪৯১ জন লোক বাস করে; প্রতি বর্গ-মাইলে গ্রামের সংখ্যা ১.১৫; প্রতি বর্গ-মাইলে গৃহস্থের ঘরের সংখ্যা ৯৩; প্রতি ঘরে পরিবারের সংখ্যা ৫.৩; সমগ্র অধিবাসীর অনুপাতে পুরুষের সংখ্যা ৪৮.৭ জন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে এই মহকুমার সৃষ্টি হয় এবং ১৮৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে, একটী রাজস্ব সংক্রান্ত, একটী মাজিষ্ট্রেটের আদালত ও ৬টী থানা থাকে। নিয়মিত পোলিশ প্রহরীর সংখ্যা

তখন ৮৯ জন এবং গ্রাম্য চৌকিদার ৯২২ জন ছিল। মহকুমার শাসন সংক্রান্ত ব্যয় ৫২,৬৯৬০ টাকা ছিল।

যে সকল উচ্চ ভূমিতে, শুদ্ধ আমন ধান্য অথবা আশু ধান্য ও রবিখন্দ বা পাট জন্মিয়া থাকে, সেই সকল জমীর খাজনার হার প্রতি বিঘা দশ আনা হইতে পাঁচ সিকা; সেই জমীতে লঙ্কা বা নীল আবাদ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তাহার খাজনার হার প্রতি বিঘা এক টাকা হইতে পাঁচ সিকা; ইক্ষু জন্মিলে, প্রতি বিঘা এক টাকা হইতে দেড় টাকা; আম্র, কাঁঠাল, তেঁতুল ও বাঁশের জমার হার প্রতি বিঘা দুই টাকা হইতে আড়াই টাকা; খর্জ্জুর বৃক্ষের জমার হার প্রতি বিঘা আড়াই টাকা হইতে তিন টাকা অথবা প্রতি বৃক্ষ দুই আনা। এ প্রদেশে খর্জ্জুরের চাষও বহুল পরিমাণে হইয়া থাকে। এখানকার কোন কোন ভূমি অত্যন্ত বালুকামিশ্রিত। সেইজন্য সেই সকল ভূমিতে ধান্যেরই আবাদ হয়। ফলতঃ এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক, আমরা যে সকল হার প্রদান করিলাম, সে সমস্তই ওটবন্দীর হার। তবে যেখানে জমা শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, সেইখানেই ওটবন্দীর পরিবর্ত্তে জমার হার প্রদত্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বে নদীয়া জেলার ছাব্বিশটী বিভাগই এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন হারে বিলি হইত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এই হারের উপর নির্ভর করিয়া প্রচলিত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে, প্রত্যেক জেলায় যে হারে রাজস্ব আদায় হইত, তাহার কোন হিসাব বা বিবরণ পাওয়া যায় না। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ওটবন্দী প্রণালীতে যে হার নির্দ্ধার্য্য ছিল, তাহার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমকালীন হার তুলনা করিলে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কুশদ্বীপের জমীর খাজনা শতকরা ৩০ গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে, গবর্ণমেণ্টের খাজনা এক ভাবেই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু যাহা অতিরিক্ত আদায় হইতেছে, তাহা জমীদারগণেরই কুক্ষিগত হইতেছে।

পতিত জমি।—সমতল উচ্চ ভূমি সকল গৃহস্থের বাটী, উদ্বাস্তু, খামার, বাগান অথবা তরকারি উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। সেই সকল ভূমি অপেক্ষা নিম্ন অথচ গ্রামের চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি সকলে আশু ধান্য এবং সরিষা, তিসী, ছোলা, মটর, যব অথবা গম উৎপন্ন হইয়া থাকে। এতদঞ্চলে নিম্ন অথচ গ্রাম হইতে দূরবর্ত্তী ভূমিতে বৎসরের এক ফসল আমন বা হৈমন্তিক

ধান্য উৎপন্ন হয়। উচ্চ শ্রেণীস্থ অথবা আউস জমি ওটবন্দী বন্দোবস্তেই অধিকাংশ আবাদ হয় এবং তিন বৎসর ক্রমাগত বিপুল আবাদের পরে, তিন বৎসর পতিত রাখিতে হয়। যদি এককালে পতিত না রাখা হয়, তাহা হইলে ঠিকরা, খেঁসারি প্রভৃতি লঘু শস্য বপন করিতে হয়। নিম্ন অথবা আমন ভূমি বান ও বন্যা দ্বারা প্রায়ই সংস্কৃত হইয়া উর্ব্বরতা প্রাপ্ত হয় এবং কদাপি সেই সকল ভূমি পতিত রাখিবার প্রয়োজন হয় না। যে সকল ভূমিতে সার দেওয়া হয়, তাহা কদাপি এক বৎসরের অধিক পতিত থাকে না।

ফসলের অনুকল্প। যদিও কুশদ্বীপের কৃষকগণ নবদ্বীপের কৃষাণদিগের ন্যায় নিয়মিতরূপে ফসলের পরিবর্ত্তন করে না ; কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের উপকারিতা তাহাদিগের পৈতৃক কৃষি জ্ঞানের একাংশ। পুনঃ পুনঃ আবাদ করিয়া যখন ভূমি এককালে নিস্তেজ ও অসার হইয়া যায় এবং সারের অভাবে উহা সম্পূর্ণরূপে অকর্ম্মণ্য হয়, তখন কৃষকেরা সেই ভূমিতে সত্বর-বর্দ্ধনশীল বাবলা বৃক্ষ সকল বপন করে এবং পাঁচ ছয় বৎসর কাল তদবস্থায় ফেলিয়া রাখে। এই সময়ের মধ্যে সেই সকল বৃক্ষ ১২।১৪ হাত লম্বা হয়। তৎপরে, তাহারা সেই সকল বৃক্ষ কাটিয়া ফেলে এবং গাড়ির চাকা ও জ্বালানির নিমিত্ত, উহাদিগকে অতীব উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিতে থাকে। ইতিমধ্যে সেই সকল ভূমি পুনরায় সারবান হইয়া উর্ব্বরতা প্রাপ্ত হয় এবং পুনরায় আবাদের উপযোগী হইয়া আইসে। ধান্যের পরিবর্ত্তে পূর্ব্বোল্লিখিত কোন একটী লঘু শস্য বপন করাই, ভূমির অনুর্ব্বরতা নাশ করিবার সহজ উপায়।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের দশ আইনের ফলেই, সাধারণতঃ সকল প্রজার খাজনা বৃদ্ধি হইয়াছে। নীলকর সাহেবেরা যেখানে তালুকদারী পাইয়াছেন, সেই-খানেই খাজনা বৃদ্ধি অতি পরিস্ফুটরূপে প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে। কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও বনগ্রামেই ইহার সংখ্যা অধিক। নীলকর সাহেব-দিগের অনুকরণে অন্যান্য তালুকদারেরাও এই পথের পথিক হইয়াছেন। এই-রূপে, মাঠান জমির খাজনা অধিকাংশ স্থলে পাঁচ ছয় আনা হইতে এক টাকা বা পাঁচ সিকা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে।

সার প্রদান। যে সকল ভূমি নদীর নিকটবর্ত্তী বা যাহা প্রায়ই নদী জলে প্লাবিত হইয়া থাকে, সেই সকল ভূমিতে সার দিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু

তদ্ভিন্ন অন্য জমিতে সারের একান্ত প্রয়োজন হয়। ধান্য ও অন্যান্য কয়েকটী ফসলের পক্ষে গোময় এবং পান ও ইক্ষু জমির পক্ষে খইল অতি উত্তম সার। ইক্ষু জমির পক্ষে দুই তিন মণ খইল এবং ধান্য জমির পক্ষে দশ বার মণ গোময় পর্য্যাপ্ত সার বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। জনৈক কলেক্টর সাহেব স্থির করিয়াছেন যে, ধান্য জমিতে প্রতি বিঘায় এক টাকা হইতে দুই টাকার গোময় লাগিয়া থাকে। ইক্ষু জমিতে আবশ্যক খইল সারের মূল্য, প্রতি বিঘায় তিন টাকা। কিন্তু খইল ব্যতীত, কিছু গোময়ও ইক্ষুর ক্ষেত্রে দেওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে সমস্ত সারের মূল্য প্রতি বিঘায় ৫।৬ টাকা পড়ে।

পূর্ত্ত কার্য্য। কৃষি কর্ম্মের জন্য কুশদ্বীপে কদাপি খাল খননাদি কার্য্যের আবশ্যক হয় না। তবে যে সময়ে দেশে অনাবৃষ্টি হয়, সেই সময়ে আমন ধান্যের জন্য কখন কখন পয়ঃপ্রণালী ও জল সেচনাদি কার্য্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে। সেরূপ সময় উপস্থিত হইলে, কৃষকেরা পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া, বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় হইতে জল আনাইয়া, আপন আপন ভূমির শস্য বাঁচাইয়া থাকে। কলেক্টর সাহেবের বিবরণীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এরূপ কার্য্যে কৃষকগণের প্রতি বিঘায় বার আনা ব্যয় হয়। কুশদ্বীপের ক্ষেত্রে জল সেচন করিবার জন্য কূপ খনন করিবার আবশ্যক হয় না।

নৈসর্গিক বিঘ্ন। কুশদ্বীপে বা নবদ্বীপে যে অজন্মা বা শস্য হানি হইয়া থাকে, তাহা আংশিক মাত্র। বর্ত্তমান সময়ের লোকগণ আজি পর্য্যন্তও কুশদ্বীপ বা নবদ্বীপে এমন কোনও অজন্মা নয়নগোচর করেন নাই, যাহাতে সমগ্র শস্যের অপচয় সংঘটিত হয়। প্রত্যেক বৎসরেই পঙ্গপাল পড়িয়া, কোন না কোন শস্যের হানি করে। বিশেষতঃ শীত শস্যের ত কথাই নাই; কিন্তু পঙ্গপাল পতিত হইলে যে, দেশের সমস্ত শস্য নষ্ট হইয়া যায়, এ কথা কেহই বলিতে পারেন না।

বান বা বন্যা।—বান বা বন্যা এ প্রদেশে মধ্যে মধ্যে সংঘটিত হইয়া থাকে। নদী স্ফীত হইয়া জল, গ্রাম মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেই, ইহার আবির্ভাব উপলব্ধি হয়। তৎপূর্ব্বে ইহার আগমন কেহই জানিতে পারে না। যে সকল ভীষণ বন্যার আক্রমণে কুশদ্বীপের আবালবৃদ্ধবনিতার সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত হয়, সেই সকল বন্যা বিগত শতাব্দীর মধ্যে নয় বার সংঘটিত হইয়াছিল।

বঙ্গাব্দ ১২০৯, ১২৩০, ১২৪৫, ১২৬৪, ১২৬৬, ১২৭৪, ১২৭৮ ১২৯২ ও ১২৯৭ সালে অথবা ক্রমান্বয়ে ১৮০২, ১৮২৩, ১৮৩৮, ১৮৫৭, ১৮৫৯, ১৮৬৭, ১৮৭১ ১৮৮৫ ও ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কুশদ্বীপ এককালে প্লাবিত হয়। এই সকল বন্যার মধ্যে ১২৭৮ বঙ্গাব্দে বা ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে যে বন্যা আইসে, তাহাই অতীব ভয়ানক। এই বন্যা সম্বন্ধে এই স্থানে আমরা নদীয়ার কলেক্টর সাহেবের বিবরণী পূর্ণাবয়বে প্রকটন করিলাম।

১৮৭০-৭১ খৃষ্টাব্দ অতি সুখে ও সচ্ছন্দেই অতিবাহিত হইল। সুন্দর রবি খন্দের পরে, ধান্যের ফসলও উত্তমরূপে উৎপন্ন হইল। সেই সময়ে যে ফসল সংগৃহীত হইতেছিল, অথবা যাহা সংগ্রহের উপযোগী হইয়াছিল, মার্চ্চ মাসের নববারিবিন্দুর, যদিও তাহার সামান্য অপকার করিয়াছিল, তথাপি আগামী বর্ষের ফসলের উপযোগী ভূমি প্রস্তুত করিবার সুযোগ পাওয়াতে, কৃষকদিগের তাহাতে বিশেষ উপকারই হইয়াছিল। সে সময়ে গ্রীষ্মের প্রকৃত প্রাদুর্ভাব হয় নাই; নববর্ষের বৃষ্টিধারাও মধ্যে মধ্যে পসলাক্রমে পতিত হইতেছিল এবং যতদিন বর্ষাপগম না হইয়াছিল, ততদিন এই ভাবেই চলিতেছিল। কয়েক দিন পর্য্যন্ত নীল ও অন্যান্য শস্যও আশানুরূপ বোধ হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে, বৃষ্টিধারা যদিও স্থূলধার নহে; কিন্তু অবিরল বারিধারা নীলের পক্ষে আশাপ্রদ নহে। উহাতে তাপ ও জল উভয়ই ক্রমান্বয়ে পাওয়া আবশ্যক। যাহাহউক, অবিরল বারিধারায় চারার রং ধুইয়া গেল, এবং পাতা সকল পচিয়া পড়িতে লাগিল। কোন কোন ভূমির চারা সকল জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইল এবং বর্ষার প্রবল প্রাদুর্ভাবে সেই জঙ্গলের বর্দ্ধনও প্রবলতর হইয়া উঠিল। বোধ হয়, শুদ্ধ মুরশিদাবাদ ভিন্ন, এইরূপে সমস্ত প্রদেশের নীলের চাষ এককালে নষ্ট হইয়া গেল। তৎকালে চারা এতদূর অপকৃষ্ট হইল যে, তাহাতে গাঁজিবার ব্যয় সঙ্কুলান হওয়াও দুর্ঘট হইল। আশু ও হৈমন্তিক ধান্যের আশাও, আগষ্টের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত অতি উৎকৃষ্ট ছিল। কিন্তু এই সময় হইতেই, নদী অল্প অল্প স্ফীত হইতে আরম্ভ করিল; আগষ্টের অর্দ্ধাংশ উত্তীর্ণ না হইতে হইতেই স্পষ্ট প্রতীত হইল যে, এক ভীষণপ্লাবন অপ্রতিহত। নদীয়ার সদর মহকুমার যে অংশ ভাগিরথীর তীরে ছিল, সেই অংশ ও মেহেরপুর মহকুমা প্রথমেই সেই ভীষণ রাক্ষসীর কবলগত হইল। পরে, উত্তর-পূর্ব্ব ও

মধ্যভাগ সেই মুখে পতিত হইল; পরিশেষে চুয়াডাঙ্গার পূর্ব্বাংশ ও বনগ্রাম মহকুমা সেই পথের পথিক হইল।

এই সময়ে আশু ধান্য পাকিয়া আসিতেছিল; যে সকল ভূভাগ প্রথমে প্লাবিত হইল, সেই সকল ভূভাগই নিরতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইল। এই বন্যার সাধারণ গতি বহুল পরিমাণে মৃদু ছিল; সুতরাং পূর্ব্বাংশের হৈমন্তিক ধান্য পাকিবার ও সংগৃহীত হইবার অনেক অবসর পাওয়া গেল। রেলপথ ও মাথাভাঙ্গা নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান সকল, রেলপথ নির্ম্মাণ হওয়াতে, বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বটে; কিন্তু এই শঙ্কট সময়ে উহারা বন্যার জল প্রতিরোধ করিয়া তত্রত্য অধিবাসিগণের বিশেষ উপকারই সাধন করিয়াছে। যে যে স্থানে বন্যা প্রবেশ করিল,সেই সমস্ত স্থানেরই হৈমন্তিক ধান্য কর্ত্তিত ও সংগৃহীত হইয়াছিল। এই সময়ে ভাগিরথী তিনবার স্ফীত ও তিনবার নমিত হইয়াছিল; কিন্তু অন্যান্য নদী সকল দুইবার মাত্র স্ফীত ও নমিত হয়। প্রত্যেক বারেই আমি বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি যে, আর আর নদী সকল অপেক্ষা, ভাগিরথী কিছু পূর্ব্বেই এই ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। ভাবিপ্লাবন সময়ে, আমার বিশ্বাস, সম্ভবতঃ ভাগিরথীকেই সাভিনিবেশে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকিলে, অনায়াসে বন্যার প্রকৃতি অবধারণ করিতে পারা যায়। এই বন্যা সার্দ্ধ দুই মাসকাল অবস্থিতি করিয়াছিল। এই সার্দ্ধ দুই মাসকাল এতদঞ্চলীয় লোকগণ মহা ক্লেশে দিনপাত করিয়াছে। তাহারা অতীব ধীরতা ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া এই দুরন্ত রাক্ষসীর দুর্জ্জয় বেগ সহ্য করিয়াছে।—তাহারা এক মুহূর্ত্তের জন্যও নৈরাশ্যের বিকট বদন দর্শন করে নাই; প্রত্যুত, যে কিছু শস্য রক্ষা করিতে পারে, প্রাণান্ত পণ করিয়াও তাহার রক্ষা সাধনে সযত্ন হইয়াছে। তাহারা অনিমিক্‌-লোচনে তাহাদের অন্নের সংস্থান দর্শন করিতে ত্রুটি করে নাই। ঈশ্বরের ইচ্ছায় সে সময়ে চাউলাদি দুর্ভিক্ষের ন্যায় উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয় নাই এবং তাহাদের হস্তে যাহা কিছু সুসংস্থান ছিল, তাহাতে তাহাদের ভরণপোষণ অনায়াসে চলিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, তাহাদের কেবল কয়েকটী মাত্র টাকার আবশ্যক হইয়াছিল।

পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য বন্যার সহিত, বিশেষতঃ ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের (সাধারণতঃ পঁয়তাল্লিশ সালের) যে বন্যা অপেক্ষাকৃত প্রবল বলিয়া সাধারণের ধারণা, সেই

বন্যার তুলনা করিবার জন্য, আমি অনেক সরকারী কাগজ পত্র অনুসন্ধান ও ও পরীক্ষা করিয়াছি। তাহাতে আমি এক জন বন্দীর আকস্মিক পলায়ন ব্যতীত অন্য কোন উল্লেখ দেখিতে পাই নাই। বন্যার আগমনে এই ব্যক্তির গন্তব্য পথ রুদ্ধ হইয়াছিল। সেইজন্য, সে কারাগার হইতে বহির্গত হইয়াও, অভিপ্রেত স্থানে গমন করিতে পারে নাই। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের বা ত্রিশ সালের বন্যা, বর্ত্তমান বন্যার ন্যায় প্রবল হইয়াছিল বলিয়া সাধারণের ধারণা বটে, কিন্তু উক্ত বন্যা বর্ত্তমান বন্যার ন্যায় দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই এবং উহার বিষয় আমি অতি অল্প পরিমাণেই জানিতে পারিয়াছি; আবার সেই অল্পাংশও নিতান্ত অকিঞ্চিৎ-কর ও সাধারণের অপ্রীতিকর। ১৮০১ খৃষ্টাব্দের বা নয় সালের বন্যার বিষয় অনেক জানিতে পারা গিয়াছে এবং তাহাও নিতান্ত বিপজ্জনক হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আগষ্ট মাসের মধ্যভাগে এই বন্যা আরম্ভ হইয়াছিল এবং ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের বা আটাত্তর সালের বন্যার ন্যায়, ইহার নবোচ্ছ্বাসের উন্নতি মুখেই ইহার একবার পতন হইয়াছিল। বস্তুতঃ ১৮০১ খৃষ্টাব্দের বন্যার কথা বলিতে পারে, এমন একটী লোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, বর্ত্তমান সময়ে (১৮৭১ খৃষ্টাব্দে) গ্রামাদির সীমা এরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল যে, তিনি ১৮০১ সালের বন্যার সহিত ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের বন্যার তুলনাই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ফলতঃ মোটামোটি ইহাই বোধ হয় যে, ১৮০১ খৃষ্টাব্দের পরে যতগুলি বন্যা হই-য়াছে, সেই সকল অপেক্ষা ১৮৭১ সালের বন্যায় অনেক সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে এবং উহা অপেক্ষাকৃত সমধিক প্রবলতর হইয়াছিল।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের বন্যাতে অধিক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই। কারণ, এই সময়ে জল অল্পে অল্পে বাড়িয়া উঠিয়াছিল; তবে ফসল ও গো মহষাদি পশু অনেক নষ্ট হইয়াছিল। গণনা করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় এবং আমার বিবেচনায় এ গণনাও নিতান্ত অসঙ্গত নহে যে, অনশনে হউক, অথবা পীড়া-বশতঃ হউক, এই সময়ে প্রায় দুই লক্ষ পশু মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছিল, ধান্যের ফসলও প্রায় অর্দ্ধাংশ হইতে দুই তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সকলেই আশা করিয়াছিল যে, বন্যা প্রশমিত হইলে শীতের ফসল নিশ্চয়ই উপ্ত ও সংগৃহীত হইতে পারিবে; কিন্তু ফল বিপরীত হইল। শীতকালের

সর্ব্ববিধ ফসলই বপন করা হইয়াছিল; কিন্তু ফসল ছয় আনা হইতে আট আনার অধিক পাওয়া যায় নাই। লঙ্কা, অরহর, তামাক ও ইক্ষু প্রভৃতি বহুবিধ মূল্যবান ফসল এককালে নয়নগোচর হয় নাই। এরূপ দুঃসময়ে কৃষিজীবীগণকে উৎপীড়ন করিয়া জমীদারেরা যাহাতে খাজনা আদায় না করেন, এরূপ ইচ্ছাপরতন্ত্র হইয়া, জেলার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী, জমীদারদিগকে ধীরতা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করেন এবং কোর্টস অব্ ওয়ার্ডস্ প্রথমেই উঁহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন।

বন্যা প্রশমিত হইলে, এ প্রদেশীয় লোকগণ কায কর্ম্ম দেখিয়া লইয়াছিল এবং জমীদার ও মহাজনগণের সাহায্যে তাহারা উদরান্নের ও সংস্থান করিয়া লইতে পারিয়াছিল। এই সময়ে শ্রমজীবিগণ উচ্চ বেতনই প্রাপ্ত হইয়াছিল। বন্যাজনিত দুঃখ পরিহারের জন্য রেলওয়ে কোম্পানিও এই সময়ে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। পথাদির অপলাপ নিবন্ধন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের অধিকাংশ আবাদ শ্রমজীবি ব্যক্তিগণের পরিশ্রমে সাধিত হইয়াছিল; সুতরাং তাহাতেও নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকগণের কার্য্য পাইবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

অনাবৃষ্টি।—এতদঞ্চলে সময়ে সময়ে অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এ অঞ্চলে এই দুঃখ অতি অল্প পরিমাণেই ঘটিয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে যে ভীষণ অনাবৃষ্টি এতদঞ্চলের অধিবাসিগণের সুখসৌভাগ্য হরণ করিয়াছিল, তাহা ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দেই সংঘটিত হয় এবং স্থানীয় বৃষ্টির অভাবই তাহার একমাত্র মূল কারণ। অনাবৃষ্টি প্রতিবিধানের জন্য এতদঞ্চলে অন্য কোন পূর্ত্তকার্য্যের আবশ্যকতা হয় না। তবে, তৎকালে একটী কার্য্য করা হয়। কৃষকেরা শীতকালের ফসল বাঁচাইবার জন্য, বিল খালের জল আটক করিয়া রাখে এবং আবশ্যকমত তদ্দারাই অনাবৃষ্টির প্রতিবিধান করে। পূর্ত্তকার্য্যের জন্য, এ প্রদেশে কোনও সুদীর্ঘ খাল বা কূপাদির প্রয়োজন হয় না। বিল খাল হইতে ছোট ছোট পয়োনালা কাটিয়া ভূমির উপর জল আনিবার ও যাহাতে বিল খাল কর্দ্দমাচ্ছন্ন হইয়া, সেই সেই জলাশয় জলশূন্য না হয়, তাহারই উপায় অবধারণ করা একান্ত আবশ্যক।

ধরিতে গেলে; বন্যা ও অনাবৃষ্টি, এই উভয়বিধ অনাময় দ্বারা শুভাশুভ

এই উভয় ফলই প্রসূত হইয়া থাকে এবং উভয়বিধ সঙ্কটের প্রতিকূলেই উচ্চ ও নিম্ন উভয় প্রকার ভূমির বপন কার্য্য-সমাধা হয়। বন্যার আগমনে নিম্নভূমি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বটে, কিন্তু এই সময়ে উচ্চ ভূমি সকল প্রচুর ফসল প্রদান করে। আবার, অন্য পক্ষে অনাবৃষ্টির বৎসরে, উচ্চ ভূমি সকল বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় সত্য, কিন্তু নিম্নভূমি সকলে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফলতঃ যাহাই হউক, উভয়ের এই ক্ষতিপূরণকারিণী শক্তি অতীব অকিঞ্চিৎকর এবং তাদৃশ ভীষণ সঙ্কটে যে দুরন্ত ক্ষতি হইয়া থাকে, তাহাও সম্পূর্ণরূপে পরিপূরিত হয় না।

দুর্ভিক্ষ।—১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ ব্যতীত, বিগত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে, কুশদ্বীপে তণ্ডুল যে উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে, তাহা শুদ্ধ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দেই সংঘটিত হইয়াছিল। এই সময়ে চাউলের দর প্রতি মণ ২৸০ হইয়াছিল। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে এদেশে যে বন্যা আসিয়াছিল, তাহাতেই চাউল এরূপ উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল। সাধারণের ধারণা যে, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রকৃত দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হইয়াছিল। এই সময়ে অত্যন্ত মোটা চাউলও টাকায় ৮৷৷০ সাড়ে আট সেরের অধিক বিক্রয় হয় নাই। এই দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বে চাউলের যে দর ছিল, আজিও বাজারে সে দরে চাউল পাওয়া যায় না, বলিয়া সাধারণে বিবেচনা করিয়া থাকে।

দুর্ভিক্ষের পূর্ব্ব লক্ষণ।—নদীয়ার কলেক্টর সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন যে, যখন অতীব নিকৃষ্ট চাউল, টাকায় এগার সের করিয়া বিক্রীত হয়, তখনই চাউল দুর্ভিক্ষের দরে উপনীত হইয়া থাকে। নিম্ন শ্রেণীস্থ কৃষকগণের আয় মাসিক ৪৷৷০ সাড়ে চারি টাকা হিসাবে ধরিয়া, এই গণনা স্থিরীকৃত হইয়াছে। মাসিক ৪৷৷০ সাড়ে চারি টাকা আয়ে, নিম্ন শ্রেণীস্থ শ্রমজীবিগণ নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণ চালাইয়া এবং নিজাধিকৃত কুটীরমধ্যে বাস করিয়া, অনায়াসে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে; তাহাদিগকে কদাপি অনশনে দিনপাত করিতে হয় না। হীনাবস্থার কৃষককে তৎকালে নিশ্চয়ই মুটিয়ার কার্য্য অবলম্বন করিতে হয়; এদিকে চাউলাদির দরের ক্রমোন্নতিতে বাজারে মজুরের কর্ম্মও সকলে করাইয়া উঠিতে পারে না, কাজেই বাজারে মজুরের কর্ম্মও নিতান্তই অল্প হইয়া আইসে;—তখন মজুরি ও কম

হইয়া পড়ে। পরিশেষে, এইরূপে যখন হইতে উহাদের মাসিক আয় চারি টাকার ন্যূন হইয়া যায়, তখন হইতেই তাহারা অনশনে দিনপাত করিতে আরম্ভ করে। যদি চাউল এক সের সুলভ থাকে, অর্থাৎ টাকায় বার সের হয়, তাহাহইলে এই অবস্থার কৃষক এক বৎসর কাল কায় ক্লেশে কৃষি কর্ম্ম করিয়াই দিনপাত করিতে পারে; কিন্তু এই বিপদে পড়িয়া তাহার যে দেনা হয়, সেই দেনার দায়ে আগামী সনের ফসল তাহাকে মহাজনের নিকট বন্ধক রাখিতে হয়। কোনও বর্ষে ফসল নষ্ট হইলে, অথবা মাসে মাসে হৈমন্তিক ফসল সংগ্রহের পরে, যদি ফসলের দর অসঙ্গত উচ্চ থাকে, তাহা হইলে কলেক্টর সাহেবের মতে সেই বৎসর দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। নিকৃষ্ট চাউল, মাঘ মাসে টাকায় ১৮ আঠার সের বিক্রীত হইলে, বৎসরের শেষে নিশ্চয়ই দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষে কুশদ্বীপ যার পর নাই উৎপীড়িত হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষ কমিশনার ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টে যে বিজ্ঞাপনী প্রেরণ করেন, তাহা হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ উদ্ধৃত হইল।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ভীষণ বাত্যায় এতদঞ্চল অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইল। সমস্ত প্রদেশ যেন এককালে কালের বিশালসম্মার্জ্জনীতাড়িত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তৎ পরবৎসরে আবার দুঃসহ অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ২৫এ অক্টোবর বোর্ড অব্ রেভিনিউ প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিসনরকে তাঁহার অধীন ভূভাগের ধান্যের অবস্থা ও প্রত্যেক স্থানের খাদ্য সামগ্রীর মূল্যের বিবরণ পাঠাইতে আদেশ করেন। তদনুসারে নদীয়ার কলেক্টর সাহেব ৩১এ অক্টোবর দিবসে এইরূপ লিখিয়া পাঠান যে, অন্যান্য বৎসরে যেরূপ শস্য জন্মিয়া থাকে, এবারে তাহার অর্দ্ধাংশেরও আশা করা যায় না। জেলার অধিকাংশ স্থানের ফসল এককালে নষ্ট হইয়াছে। সত্বরে বৃষ্টি হইলেও, উহাদের পুনর্জ্জীবনের প্রত্যাশা নাই। কালেক্টর সাহেব আরও লিখিয়াছিলেন যে, এবারে কৃষকগণের নির্দ্দিষ্ট খাজনা দিবার ক্ষমতা নাই; এবারে তাহাদের আহারের সংস্থান করিতেই সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে।

যে সময়ে ধান্য পাকিয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়ে দ্রব্যের মূল্য কিছু সুলভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই ভীষণ দুঃখে সকলকেই অবিরত দলিত হইতে

হইয়াছিল। পরে, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে চার্চ্চ মিশনরি সোসাইটীর মিশনরি সাহেবেরা এই বিষয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর মহোদয়ের কর্ণগোচর করেন। উঁহাদিগের মধ্যে রেভারেণ্ড টী জী লিঙ্ক মহাত্মা লিখিয়া পাঠান যে, "কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, যে চাউলের রেক ৩।০ পয়সায় বিক্রয় হইত, তাহাই এক্ষণে চৌদ্দ পনের পয়সায় বিক্রয় হইতেছে! বর্ত্তমান বর্ষে নিঃস্ব অধিবাসীগণের যে মহাদুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতেই তাহা [illegible]ক্ষরে প্রতিপন্ন হইতেছে। কতকাল অধিকাংশ প্রজা অনাহারে থাকিবে, যদি আমাকে তাহা বলিতে হয় এবং তাহারা আজি কালি কি কি দ্রব্য আপনাদিগের খাদ্য করিয়া লইয়া প্রাণধারণ করিতেছে, তাহাও নির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহাহইলে সেই সেই দ্রব্য কদাপি খাদ্যস্থানীয় হইতে পারে না, এই বলিলেই আপনি আমার কথা বিশ্বাস করিবেন। রেভারেণ্ড এফ্ স্কারু নামা অপর এক জন কাপাশডাঙ্গার মিশনরি সাহেব লিখিয়াছিলেন যে, "বিশিষ্ট কৃষকগণ এক্ষণে এরূপ হীনাবস্থ হইয়া পড়িয়াছে যে, পূর্ব্বে তাহারা মাঠের কার্য্য করিবার জন্য যত গুলি নগদা চাসা নিযুক্ত করিত, এক্ষণে তাহারা আর তত গুলি লোক নিয়োগ করিতে পারে না; সুতরাং নিত্যশ্রমজীবিলোকগণ অনশনে দিনপাত করিবার অবস্থাতেই দাঁড়াইয়াছে। এই মার্চ্চ মাসেও (১৮৬৬ মার্চ্চে) তাহারা ক্ষেত্রের সামান্য সামান্য কার্য্য পাইতেছে; কিন্তু আর এক মাস গত হইলে, তাহাও আর থাকিবে না। আজি কালি তাহারা গাছের মূল, শ্যাকুল প্রভৃতি খাইয়া দিনপাত করিতেছে। কিন্তু যখন উক্ত দ্রব্য সকল নিঃশেষ হইয়া আসিবে, তখন তাহারা অগত্যা বৃক্ষের ছাল, ঘাস প্রভৃতি আহার করিতে আরম্ভ করিবে। আমার জীবনে আমি এরূপ ভয়াবহ দুঃখ আর কখন দেখি নাই।"

মিশনরি মহাত্মাদ্বয়ের এই দুই আবেদনে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর নদীয়া জেলার দরিদ্র প্রজাগণের অবস্থা সম্বন্ধে এক বিবরণী কলেক্টর সাহেবের নিকট চাহিয়া পাঠান। তদনুসারে, নদীয়া জেলার সর্ব্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া তদন্ত হয়। সেই তদন্ত হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, নদীয়া জেলার মধ্যবর্ত্তী স্থান সকলেই এই মহদ্দুঃখ অধিক পরিমাণে সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু যে সকল স্থানে খর্জ্জুর বৃক্ষ, লঙ্কা, তামাক ও অন্যান্য অর্থকর পদার্থ

অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়, সেই সেই স্থানে এই ভীষণ দুঃখের প্রকোপ অপেক্ষাকৃত অল্পই হইয়াছিল। নদীয়ার কলেক্টর সাহেব ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৩০এ এপ্রিল দিবসে গবর্ণমেণ্টের নিকট যে বিবরণী প্রেরণ করেন, তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন যে অপরাপর স্থান সকল অপেক্ষা কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুরের নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে প্রজাগণের ক্লেশ অপেক্ষাকৃত অল্প। জেলার অবশিষ্টাংশ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন "প্রত্যেক স্থানের বিবরণী অনুসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সকল স্থানেই মহাকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। তবে, এমন দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় নাই যে, এককালে শস্য পাইবার কোন উপায় নাই। অনেক স্থানে শস্য পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু তৎকালে অধিবাসিগণের এমনি অর্থের সঙ্গতি ছিল না যে, তদ্দ্বারা তাহারা চলিত হারে শস্য ক্রয় করে। কয়েক মাস পর্য্যন্ত দুঃখী প্রজাগণ (শুদ্ধ কৃষিজীবী নহে—শিল্পজীবী মাত্রেই) দিনান্তে একবারের অধিক আহার করিতে পাইতেছে না এবং বোধ হয়, অনেকের ভাগ্যে তাহাও ঘটিয়া উঠিতেছে না। ফলতঃ আমার এই মহাভয় জন্মিয়াছে যে, হয় ত, এত দীর্ঘকাল প্রচুর আহার করিতে না পাইয়া, অনেকে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে। কৃষ্ণনগরের মধ্যে দেখিয়াছি, দুঃখী প্রজাগণ মধ্যাহ্নকালে ধনী ও মধ্যবিধ লোকগণের বাটীতে দলে দলে গমন করিতেছে এবং তাঁহারা আহারান্তে যাহা কিছু ফেলিয়া দিতেছেন, তাহাই তাহারা কুড়াইয়া খাইয়া যথাকথঞ্চিৎরূপে জীবন ধারণ করিতেছে।"

নদীয়া জেলার কোন কোন স্থানে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন যে দুর্নিবার কষ্ট হইয়াছিল, তাহা বন্যা দ্বারাই আরও অধিক বর্দ্ধিত হইয়াছিল। জুলাই মাসে নদীর জল অসঙ্গত দ্রুততা সহকারে বাড়িতে আরম্ভ হয় এবং সাধারণতঃ আউস ধান্যেরই অধিক অনিষ্ট করে। ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী জেলার পশ্চিম প্রান্তের আউস ধান্য ইহাতে এককালে নষ্ট হইয়া যায়। এই সময়ে সেই সেই প্রদেশের চাউল টাকায় আট সের হইয়া দাঁড়ায়। কমিশনর সাহেবের বিজ্ঞাপনীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সময়ে ৪৫০০০ বিঘার আউস ধান্য এবং ৬০০০ বিঘার নীল বন্যায় ডুবিয়া গিয়াছে; বন্যানিমজ্জিত ভূভাগের অধিবাসিগণের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে; তাহারা বৃক্ষের

পত্র ও মূল খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে; এবং প্রায় পঞ্চদশ সহস্র লোক এই সকল ভূভাগে অনাহারে কষ্ট পাইতেছে।

পরবর্ত্তী আগষ্ট মাসে এই মহদ্দুঃখ ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া আইসে; চাউলের দর ক্রমে ক্রমে অবনত হইয়া যায়;—এবং জেলার মধ্যভাগে যে সকল অন্নাশ্রম ও অন্নছত্র সকল গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল, অনাবশ্যক বোধে ক্রমে ক্রমে তাহা উঠিয়া যায়। সেপ্টেম্বর মাসে সাধারণ হিতকর পূর্ত্তকার্য্যসকলের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে এবং শ্রমশীল বলিষ্ঠ ব্যক্তিগণ তাহাতে নিযুক্ত হইতে থাকে। দৈনিক দান ক্রমশঃ অল্প হইয়া আইসে। সমগ্র নদীয়া জেলায় ইতিপূর্ব্বে ২৪টী দানাশ্রম খোলা হইয়াছিল। এবং সকল স্থানেই অতীব ব্যস্ততা সহকারে কার্য্য চলিতেছিল। এতদ্ব্যতীত, মফঃস্বলে ১৬টী দানাশ্রম ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিমণ্ডলের ভবনে স্থাপিত হয়। এই সকল স্থান হইতেও চাউল ও অন্ন অবিরত বিতরিত হইয়াছিল। যে সকল স্থান গবর্ণমেণ্টের দানাশ্রম হইতে সমধিক দূরবর্ত্তী, সেই সকল স্থলের ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানালয় স্থাপন করিয়া, সাধারণ দীন দুঃখীকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই সময়ে কুশদ্বীপে যে সকল দানাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সকলের মধ্যে চিরস্মরণীয় স্বর্গীয় জমীদার মহাত্মা সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় গোবরডাঙ্গাতে এবং স্বর্গীয় কালীকুমার দত্ত মহাশয় খাঁটুরাতে যে দুইটী দানাশ্রম ও অন্নচ্ছত্র স্থাপন করেন, সেই দুইটীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে কি, এই দুইটী দানাশ্রমই কুশদ্বীপের দুঃখী প্রজাগণকে অকালমৃত্যুর দুর্ব্বার গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছিল।

রাজপথ।—যশোহরের ভূতপূর্ব্ব কলেক্টার ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব বলেন যে, পূর্ব্বে এতদঞ্চলে গমনাগমনের তাদৃশ সুবিধা ছিল না। এই অভাব দূরীকরণ মানসে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে ঢাকা যাইবার একটী প্রশস্ত রাজ-পথ প্রস্তুত হয়। এই পথ যশোহরের মধ্য দিয়া গমন করিয়াছে। এই পথের সাধারণ নাম "যশোহর ফোরিফণ্ড রোড।" এই পথের অন্তর্গত বোমদার হইতে সাইঘাটা পর্য্যন্ত প্রায় দশমাইল পথ কুশদ্বীপের অন্তর্গত। পূর্ব্বকালে কুশদ্বীপবাসীগণ এই পথেই কলিকাতায় গতায়াত করিতেন।

কিন্তু গোবরডাঙ্গার পরপারস্থ লক্ষ্মীপোল হইতে যোমদার পর্য্যন্ত কোনও উৎকৃষ্ট পথ না থাকাতে, সাধারণে যারপর নাই ক্লেশ পাইতেন। সেই জন্য গোবরডাঙ্গার স্বর্গীয় জমীদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সর্ব্বাধিকারী গোবরডাঙ্গা নিবাসী স্বর্গীয় শিবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিজ ব্যয়ে লক্ষ্মী পোল হইতে চোমদার পর্য্যন্ত একটী কাঁচা রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দেন। ইহাতে কয়টী সেতু নির্ম্মাণ করেন এবং পান্থগণের সুবিধার জন্য পথ পার্শ্বে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করেন। এই পথ শিবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের পথ বলিয়া প্রসিদ্ধ। শিবনারায়ণ বৃদ্ধ বয়সে ৺ কাশী যাত্রা করিলে, এই রাস্তার অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া উঠে। ১২৯০ সালে খুলনা রেলপথ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে যাঁহারা এই পথে কুশদ্বীপ হইতে কলিকাতায় গমন করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, এই পথ কি দুর্গম ছিল। গোবরডাঙ্গার ভূতপূর্ব্ব স্বর্গীয় জমীদার সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই রাস্তার মুখে যমুনার উপরে একটী সেতু নির্ম্মাণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কিয়দংশ প্রস্তুতও করিয়াছিলেন। কিন্তু কুশদহের দুর্ভাগ্য ক্রমে উহা শেষ না হইতে হইতেই দুর্জ্জয় কাল তাঁহার জীবনদীপ নির্ব্বাণ করিয়াছেন। স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় যে সময়ে বনগ্রাম মহকুমার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন কুশদ্বীপ হইতে বনগ্রাম পর্য্যন্ত একটী উৎকৃষ্ট পথ প্রস্তুত করিবার কল্পনা করেন এবং রোডশেশ ফণ্ডের টাকায় তাহার কিয়দংশ কার্য্যও আরম্ভ করেন। কিন্তু উহা এককালে সম্পূর্ণ হয় নাই। পরে, খাঁটুরাবাসী শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ রক্ষিত মহাশয় গত বর্ষে উহার জীর্ণ সংস্কার করেন। খাঁটুরা হইতে গৈপুর বা ইচ্ছাপুর যাইবার কোনও উৎকৃষ্ট পথ ছিল না; তজ্জন্য খাঁটুরার স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সাহায্যে এক উৎকৃষ্ট পথ প্রস্তুত করিয়া দেন। উক্ত পথ আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে এবং অধুনা গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপালিটীর অধীন হইয়াছে।

রেলরোড্।—১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে, কলিকাতা হইতে খুলনা পর্য্যন্ত যে রেল পথ প্রস্তুত হয়, তাহার মসলন্দপুর হইতে প্রায় ৫।৬ মাইল পথ কুশদ্বীপের অন্তর্গত। এই রেল পথ প্রস্তুত এবং গোবরডাঙ্গায় একটী ষ্টেশন স্থাপিত হইয়া, সাধারণের যে কি সুবিধা হইয়াছে, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না।

ইতিপূর্ব্বে সাধারণে গোবরডাঙ্গা হইতে কলিকাতা যাইবার সময় যে কি দারুণ কষ্টভোগ করিতেন, তাহা স্মরণ করিলেও গাত্র কণ্টকিত হয়। এই ৫।৬ মাইল রেলপথ ব্যতীত, কুশদ্বীপে আর রেলপথ দেখিতে পাওয়া যায় না।

আকরিক দ্রব্য।—কুশদ্বীপে কোনও আকর বা খনিজ পদার্থ পাওয়া যায় না। এখানকার নদী সকলে স্বর্ণরেণুও ভাসিয়া বেড়ায় না।

শিল্পকর্ম্ম। কুশদ্বীপে তিনপ্রকার শিল্প সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান, যথা;—বস্ত্র-বয়ন, নীলপ্রস্তুতকরণ, ও খর্জ্জুরগুড়োৎপন্ন শর্করা প্রস্তুত করণ। সমগ্র নদীয়া জেলাতেও এই তিন প্রকার শিল্প ব্যবসায়ী অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। বস্ত্রবয়নকারী তন্তুবায় প্রথমতঃ সমস্ত জেলায় বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল এবং উহাদিগের অনেকের উত্তম উত্তম তাঁতও ছিল। কিন্তু পরিশেষে পাশ্চাত্য বণিকসম্প্রদায়ের রেসিডেণ্ট এবং ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির বস্ত্রের কুঠী শান্তিপুরে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া, পূর্ব্বকালে শান্তিপুর বস্ত্রবয়নের জন্য সমধিক বিখ্যাত হইয়াছিল এবং প্রধান প্রধান তন্তুবায়গণ এই স্থানেই বাস করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু উৎকৃষ্ট বস্ত্র শান্তিপুরে প্রস্তুত হইলেও, অন্যান্য স্থানেও এই কার্য্য নিতান্ত অল্প ছিল না। তৎকালে সকলেই দেশজাত বস্ত্র ব্যবহার করিত; সেই জন্য দেশীয় বস্ত্রের আদরও যথেষ্ট ছিল এবং উহা দেশীয় তন্তুবায়গণ কর্ত্তৃকই প্রস্তুত হইত। কিন্তু যখন ভারতের দুর্ভাগ্য ক্রমে ম্যানচেষ্টার রাহুরূপী হইয়া, বস্ত্রের ব্যবসা এককালে গ্রাস করিয়া ফেলিল; তখন মুরশিদাবাদের রেশমী কাপড়, ঢাকা ও শান্তিপুরের সূক্ষ্মবস্ত্রের ন্যায় হীনদশা প্রাপ্ত হইয়া, তন্তুবায়গণের অন্নসংস্থান নষ্ট করিল এবং উহারা উদরান্নের জন্য লালায়িত হইয়া, ক্রমে ক্রমে স্ব স্ব বৃত্তি পরিত্যাগ করিল এবং এই ব্যবসাও শান্তিপুর, ঢাকা, মুরশিদাবাদ প্রভৃতি স্থানের ন্যায় এককালে নষ্টগৌরব হইয়া, ভারতের পুঞ্জীকৃত দুর্ভাগ্যের স্তূপ বর্দ্ধিত করিল। এই শতাব্দীর প্রথম আটাইশ বৎসরে গবর্ণমেণ্ট গড়পড়তায় ১২,০০,০০০ টাকা হইতে ১৫,০০,০০০ টাকার শান্তিপুরে কাপড় ক্রয় করিতেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারিতে ২৭৩ জন পাটতন্তুর বস্ত্রবয়নকারী ব্যতীত ১৩৬৮০ জন তাঁতি জীবিত ছিল। পূর্ব্বকালে যোগীজোলারাও বস্ত্রবয়ন করিত।

শর্করা প্রস্তুতকরণ প্রণালী।—নদীয়া জেলায় বহুবার এই ব্যবসায় পাশ্চাত্য বণিকদল কর্তৃক অতি বিস্তৃতভাবে অবলম্বিত হইয়াছিল। কিন্তু কেহই কোন বারেই কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন নাই। অথচ এই ব্যবসায় একবালে পরিত্যক্তও হয় নাই। কুশদ্বীপে ইহা অধিক পরিমাণে ও বিস্তৃত ভাবে অনুষ্ঠিত না হইলেও, দেশীয় ব্যবসায়ীগণ মধ্যবিধভাবে এই ব্যবসায় চালাইয়া থাকেন। আজিও নবদ্বীপের অন্তর্গত শান্তিপুরে ও কুশদ্বীপের অন্তর্গত গোবরডাঙ্গায় অনেক দেশীয় কারখানা বিদ্যমান রহিয়াছে। যশোহরের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল হইতে অনেক গুড় উক্ত দুই স্থানে ক্রীত হইয়া আইসে এবং সেই সকল গুড়ে শর্করা প্রস্তুত হয়। সাধারণের অবগতির জন্য, আমরা খর্জ্জুরের চাস ও শর্করা প্রস্তুত করিবার প্রণালী নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম। যশোহর জেলাতে সাধারণতঃ যে প্রণালী অবলম্বিত হয়, কুশদ্বীপ ও নবদ্বীপেও সেই প্রণালীতে খর্জ্জুরের চাস ও চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে; সুতরাং আমরা এস্থলে যশোহর অবলম্বিত প্রণালীই বিবৃত করিলাম।

শর্করা ব্যবসা।—ব্রিটীশ রাজত্বের প্রারম্ভ হইতেই যশোহর ও নদীয়া জেলা শর্করা প্রসবিনী ভূমি বলিয়া পাশ্চাত্য জগতে বিখ্যাত হইয়া উঠে। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে, শুদ্ধ একমাত্র যশোহর জেলাতেই ২৪০০০ মণ চিনি প্রস্তুত হইয়াছিল। উহার অর্দ্ধাংশ কলিকাতায় রপ্তানি হয়। ঐই সমস্ত শর্করার মধ্যে ইক্ষুজাত শর্করা অনেক ছিল। কিন্তু আজি কালি ইক্ষুজাত শর্করা উভয় অঞ্চল হইতে একবালে অন্তর্হিত হইয়াছে এবং খর্জ্জুরজাত শর্করাই তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। নিম্ন বঙ্গের মধ্যে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত এবং নবদ্বীপের নিকটস্থ 'ধোবা' নামক গ্রামে ইউরোপীয়গণ কর্তৃক প্রথমে এক চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্লেক সাহেব নামক একজন ইংরাজ ইহার প্রতিষ্ঠাতা। এই ব্যবসায়ে আয় অল্প হইতে আরম্ভ হইলে, ইনি এই কারখানা চালাইবার জন্য, কয়েকজন ইংরাজের সহিত মিলিত হইয়া, এক যৌথ কারবারের (কোম্পানির) সৃষ্টি করেন এবং নিজে উহা হইতে ক্রমে ক্রমে পৃথক্ হইয়া আইসেন। "ধোবা সুগার কোম্পানি" যশোহরের অন্তর্গত কোটচাঁদপুর ও ত্রিমোহিনীতে কর্ম্মকর্ত্তা বা গোমস্তা নিয়োগ করিয়া পাঠাইয়া দেন। পরে, কোটচাঁদপুরের কারখানা নিউহাউস

নামক এক ইংরাজের কর্ত্তৃত্বাধীন হয় এবং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তদবস্থায় থাকে এবং অপরটী পরিত্যক্ত হয়। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে গ্লাডষ্টোন ওয়াইলী কোম্পানি চৌগাছায় এক কুঠী স্থাপন করেন; কিন্তু তাঁহারা দুই এক বৎসর কার্য্য চালাইয়া, কর্ম্ম বন্ধ করিয়া দেন। ফল কথা, পাশ্চাত্য বণিক্‌দল এই ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিয়া তাদৃশ সুবিধা করিতে পারেন নাই; তাঁহাদের আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক পড়িত, কাযেই ব্যবসা বন্ধ করিতে হইয়াছিল।

খর্জ্জুর অপেক্ষা ইক্ষুজাত চিনিতে ব্যয় অধিক হয় বলিয়াই, দেশীয় ব্যবসায়ীগণ এতদঞ্চলে খর্জ্জুর চিনিই প্রস্তুত করিয়া থাকেন। ইক্ষুর আবাদের নিমিত্ত অত্যুৎকৃষ্ট ভূমির আবশ্যক; সুতরাং ভূমির খাজানা অধিক লাগে। ইক্ষুর আবাদে ভূমি প্রায় বারমাসই ব্যাপৃত রাখিতে হয় এবং আবাদান্তে ভূমিও এককালে নিস্তেজ ও সারশূন্য হইয়া যায়। ভূমিতে সার দিয়া, ও নানাবিধ পূর্ত্তকার্য্য করিয়া, ইক্ষু ভূমির প্রতিনিয়ত উন্নতি সাধন করিবার আবশ্যক হয়। কিন্তু খর্জ্জুর বৃক্ষ সাধারণতঃ নীরস ভূমিতেই উৎপন্ন হয়; ইহাতে কোনরূপ আবাদের আড়ম্বর করিতে হয় না। প্রথম ছয় সাত বৎসরে ইহাতে কোনও উৎপন্ন দ্রব্য পাওয়া যায় না বটে; কিন্তু তাহার পরে ২৫।৩০ বৎসর ক্রমাগত প্রচুর রস পাওয়া গিয়া থাকে। কৃষক জমির মধ্যে যেখানে খর্জ্জুরের বীজ ছড়াইয়া দেয়, সাত বৎসরের মধ্যে সেই সেই বৃক্ষ হইতে নির্দ্দিষ্ট বিপুল বার্ষিক আয় করিয়া লয়। যখন চারা অধিক পরিমাণে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হয়, তখন তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া আট হাত অন্তরে অন্তরে পুতিয়া দেয়। ইহাতে ভূমির সীমা অতি সুন্দররূপে বেড়াবন্দী হইয়া থাকে।

খর্জ্জুরের চারা প্রস্তুত করণ।—নিয়মিত খর্জ্জুর আবাদের জন্য উচ্চ ভূমিই মনোনীত করিতে হয়। সাধারণ ধান্যের জমি অপেক্ষা এই সমস্ত ভূমিতে খাজনাও অধিক পাওয়া যায়। নীচে অন্য কিছু না জন্মে, এজন্য মধ্যে মধ্যে কোদাল দ্বারা খনন করিতে হয়। গাছ সাত বৎসরের না হইতে হইতে নলি বসাইলে, খর্জ্জুর বৃক্ষ সতেজ থাকে না।

বৃক্ষে নলী বসান।—সপ্তমবর্ষ উত্তীর্ণ হইলে, খর্জ্জুর বৃক্ষে সর্ব্বপ্রথমে নলী বসাইতে হয় এবং ২৫।৩০ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষে এইরূপ করিতে হয়। ওয়েষ্টল্যাণ্ড নামক ভূতপূর্ব্ব কলেক্টর সাহেব গবর্ণমেণ্টে যে বিজ্ঞাপনী প্রেরণ

করেন, তাঁহা হইতে খর্জ্জুর চিনি প্রস্তুত করিবার নিম্নলিখিত প্রণালী গৃহীত হইতেছে। উক্ত মহাত্মা এই সম্বন্ধে যেরূপ বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন এবং যেরূপ পূর্ণাবয়বে বিবরণী প্রকাশ করিয়াছিলেন, এস্থলে তাহাই পূর্ণায়তনে আলোচনা করা যাইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন যে, "খর্জ্জুর বৃক্ষের পত্র সকল বোধ হয় যেন দ্বিবিধ স্তরে বিভক্ত। বৃক্ষের মধ্যস্থল হইতে কতকগুলি পত্র উদ্ভূত হইয়া চূড়ার ন্যায় দণ্ডায়মান থাকে এবং কতকগুলি পত্র মস্তকভাগের গাত্র বা পার্শ্ব দিয়া বহির্গত হইয়া, ছত্রাকারে অবনত হইয়া পড়ে। বর্ষাকাল সম্পূর্ণরূপে শেষ হইলে, এবং আর বর্ষার ভয় না থাকিলে, শিউলী, গাত্র নিঃসৃত পত্রগুলি অর্দ্ধ পরিধি ব্যাপিয়া কাটিয়া দেয়। এইরূপে বৃক্ষের প্রায় এক ফুট পরিমিত স্থান পত্রশূন্য হয়। এই কর্ত্তিত অংশ সর্ব্বাগ্রে অতি উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ থাকে; কিন্তু রৌদ্র ও বৃষ্টিতে থাকিয়া উহা কিয়ৎ পরিমাণে ধূসরবর্ণ ধারণ করে এবং মোটা মাদুরের ন্যায় বোধ হইতে থাকে। বৃক্ষের যে অংশ ঐরূপ রৌদ্র ও বৃষ্টিতে থাকে, তাহা খর্জ্জুর বৃক্ষের দারুময় তন্তুরাশি নহে; উহা অনেকগুলি পর্দ্দা দ্বারা গঠিত বৃক্ষের ত্বক্‌মাত্র এবং ঐ সকল পর্দ্দাই বৃক্ষের বর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়।

বৃক্ষ সকল কয়েক দিন এইরূপ রৌদ্র ও বৃষ্টিতে রক্ষিত হইলে, সেই রক্ষিত অংশ দীর্ঘ ও প্রস্থে তিন ইঞ্চি ও গভীরতায় অর্দ্ধ বা সিকি ইঞ্চি পরিমিত ইংরাজী ভী অক্ষরের ন্যায় খাদ কর্ত্তিত হয়। সুতরাং বৃক্ষের উপরিভাগে সমদ্বিবাহু বা সমকোণী ত্রিভুজাকারের একটী সমতল খাদ উৎপন্ন হয়। সেই খাদের মধ্যে রস নির্গত হয় এবং ত্রিভুজাকার স্থানের দুই বাহু বহিয়া, সেই রস ত্রিভুজের কোণে আসিতে থাকে। সেই স্থানে দ্বিখণ্ডে বিদীর্ণ বিঘত-পরিমিত একটী কঞ্চির নল প্রোথিত থাকে; তদ্দ্বারা রস ফোটা ফোটা করিয়া পড়িয়া, নলীমুখে আবদ্ধ কলসী বা ভাঁড়ে পতিত হয়।

রস নিঃসারণ কার্য্য।—প্রতি বৎসরে খর্জ্জুর বৃক্ষ যে সময়ে রস প্রদান করে, সেই সময়ে ছয় দিনের পর্য্যায়ে রস নিঃসারণ করিতে হয় এবং এই ব্যবস্থানুসারেই সমগ্র সময় কার্য্য করিতে হয়। উল্লিখিত রীতিক্রমে শিউলীরা প্রথম এক সন্ধ্যাতে গাছ কাটিয়া ভাঁড় পাতিয়া আইসে; সমস্ত রাত্রি সেই ভাঁড়ে রস বিন্দু বিন্দু করিয়া পতিত হয়। এই দিন যে রস পড়ে, তাহাই

অতি উত্তম ও সারবান্ রস। ইহাকে সচরাচর "জীরাণ" রস কহে। পরদিন প্রত্যূষে সিউলীরা সেই ভাঁড় খুলিয়া লয় এবং সমস্ত দিবাভাগ অমনই রাখিয়া দেয়। তাহাতে সূর্য্যোত্তাপে রস জমাট হইয়া কর্ত্তিত অংশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র সকল বদ্ধ করিয়া দেয়। পরে, সেই দিন সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে, সিউলীরা সেই গাছ পুনরায় কাটিয়া বা অল্প পরিমাণ চাঁচিয়া দিয়া, আবার ভাঁড় পাতিয়া আইসে; তখন কর্ত্তিত অংশ হইতে পুনরায় রস পূর্ব্ববৎ বাহির হইতে থাকে এবং বিন্দু বিন্দু করিয়া টুপিয়া ভাঁড়ে পতিত হয়। এই রসকে "দোকাট" রস বলিয়া থাকে। এই রস 'জীরাণ' রসের ন্যায় উত্তম বা অধিক নহে। দ্বিতীয় দিবসেও প্রথম দিবসের ন্যায় গাছ অমনই রাখা হয়। পরে তৃতীয় দিবসে গাছ পুনরায় কর্ত্তিত বা চাঁচা হয় না; কিন্তু কর্ত্তিত অংশের উপরিভাগ, সন্ধ্যার প্রাক্কালে ভাঁড় পাতিবার সময়ে, উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহাতে পুনরায় রস বাহির হইতে থাকে। ইহাকে 'ঝরা' রস কহে। এই রস দোকাটের রস অপেক্ষা অল্প ও নিকৃষ্ট। রৌদ্রের উত্তাপে উহা যতই গেঁজিয়া উঠিতে থাকে, ততই নিকৃষ্ট হইতে থাকে এবং চিনি প্রস্তুত হইবার সম্পূর্ণ অনুপযোগী হয়। কিন্তু এই রসে এক প্রকার পাতলা গুড় প্রস্তুত হয়; উহাকে 'ঝরা' বা 'ঝোলা' গুড় কহে। দেশীয় লোকগণ এই গুড় অতি আদর পূর্ব্বক ব্যবহার করিয়া থাকেন। এ গুড়ও দীর্ঘকাল থাকে না; শীঘ্রই মাতিয়া উঠিয়া টক্ হইয়া যায় ও ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া উঠে।

তিন রাত্রিতেই খর্জ্জুর বৃক্ষের বিশেষ কায হইয়া থাকে। পরবর্ত্তী তিন রাত্রিতে কিছুই কার্য্য হয় না; বৃক্ষ সকল অমনই থাকে। এই তিন দিবস অবকাশান্তে পুনর্ব্বার পূর্ব্ব প্রণালী অনুসারে কার্য্য হইয়া থাকে। এক বাগানে বা এক ভূমির মধ্যে যতগুলি গাছ থাকে, ততগুলি বৃক্ষ যে এক দিনে কর্ত্তিত হয়, এমন নহে; কোন কোন গাছে জীরাণ কাট আরম্ভ হয়, কোন কোন গাছে দোকাট চলিতে থাকে, কোন কোন গাছের বা অবকাশ সময় উপস্থিত হয়, এইরূপে কার্য্য চলিতে থাকে এবং সীউলীও প্রতিদিন নানাবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত হয়।

প্রত্যেক ছয় দিন অন্তর, পুরাতন কাটের উপর একটী নূতন কাট আরম্ভ

হয় এবং সমস্ত সময়ে এক এক গাছে এক এক বৎসরে অনেক কাট হইয়া থাকে। রস নিঃসরণের নির্দ্ধারিত কালান্তে, কর্ত্তিত অংশের সর্ব্ব নিম্নতল অর্থাৎ শেষ কাটের তল, সর্ব্বোচ্চ তল অর্থাৎ প্রথম কাটের তল্ল অপেক্ষা প্রায় চারি ইঞ্চির অধিক নিম্ন বা গভীর হইয়া যায়। প্রত্যেক বৎসরে গাছ যতবার কর্ত্তিত হয়, সমস্তই এক পার্শ্বে ও এক স্থানে হয় এবং পর বর্ষে তাহার বিপরীত পার্শ্বে হইয়া থাকে। এইরূপে ভিন্ন বর্ষে ভিন্ন দিকে কর্ত্তন হওয়াতে, বৃক্ষের কাণ্ড পার্শ্ব হইতে দর্শন করিলে, সমগ্র বৃক্ষ এক অদ্ভুত বক্রাকারের বৃক্ষ বলিয়া প্রতীত হয়। প্রত্যেক বৃক্ষের কাটের চিহ্নের সহিত ছয় বা সাত যোগ করিলে, প্রত্যেক বৃক্ষের জীবিত কালের বর্ষ সংখ্যা অনায়াসে অবধারিত হয়। আমরা কোন কোন বৃক্ষে চল্লিশ বারেরও অধিক কাট দেখিয়াছি; কিন্তু সাধারণে সহজে সেরূপ বৃক্ষ নয়নগোচর করিতে পারিবেন না। আবার আমি সেই ৪৬ বৎসরের সময়েও সেই বৃক্ষকে যথেষ্ট রস প্রদান করিতে দেখিয়াছি। আমরা বলিয়া আসিয়াছি, গাছ কাটিবার পূর্ব্বে সমস্ত কাণ্ডের উপরিভাগের পরিধি প্রায় দশবর্গ ইঞ্চি হয়। কিন্তু গাছ যতই কাটা হইতে থাকে, কাটা চিহ্ন ততই সন্নিকটেও সঙ্কীর্ণভাবে সন্নিবিষ্ট হয়।

অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে. খর্জ্জুর বৃক্ষের কাটা চিহ্ন প্রায়ই পূর্ব্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে থাকে। উত্তর বা দক্ষিণ পার্শ্বে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। অধিকন্তু, প্রথম কাটা চিহ্ন অধিকাংশ স্থানে প্রায়ই পূর্ব্ব পার্শ্বে হইয়া থাকে।

এক এক বৃক্ষের উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ।—কেহ কেহ ভাবিয়া থাকেন যে, একটী উত্তম সারবান্ বৃক্ষ হইতে প্রতি রাত্রিতে গড়্ পড়্তা পাঁচ সের রস নির্গত হয়। রজনী যত শীতল ও মেঘশূন্য হয়, রসও তত প্রচুর ও উৎকৃষ্ট হয়। নবেম্বর মাসের প্রথমেই গাছ কাটা আরম্ভ হয়; ডিসেম্বর ও জানুয়ারী অতি উত্তম রস নির্গত হয়;—এবং মার্চ্চ মাসে রস নির্গমন এককালে বন্ধ হইয়া যায়। ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে কখন কখন বেলা তিনটার পর হইতে রস নিঃসারিত হইতে থাকে এবং যেমন চৈত্র মাসের দুরন্ত উত্তাপ আরম্ভ হয়, অমনই রস নির্গমন রুদ্ধ হইয়া যায়। যদি সিউলীরা কিছু অগ্রে গাছ কাটিয়া নলী বসায়, বা নির্দ্ধারিত সময়ের পরও গাছ কাটিতে

থাকে, তাহা হইলে যত দূর লাভের আশায় এই অহিতাচরণ করে, ততদূর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। অক্টোবর মাসেই রস উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়; সেই জন্য অনেকেই এই সময়ে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হয়। যত দিন গাছ কাটা হইয়া থাকে, তত দিন চাষী খর্জ্জুর বাগান অতি উত্তমরূপে পরিষ্কার ও জঙ্গলশূন্য করিয়া রাখে; এমন কি, তাহাতে একটী ঘাস পর্য্যন্ত জন্মিতে দেয় না।

রস জাল।—গাছ কাটা সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়াগুলি একান্ত আবশ্যক। রস সংগ্রহের পরবর্ত্তী কার্য্য রস জাল। প্রত্যেক চাসীই ইহা প্রায় আপন আপন কর্ত্তৃত্বাধীনে করিয়া থাকে। এবং সচরাচর নিজ বাটী অথবা খামারের মধ্যে করিয়া থাকে। রস শীঘ্র শীঘ্র জাল না দিলে, গেঁজিয়া উঠে ও নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু সেই রস জাল দিয়া গুড় করিয়া লইতে পারিলে, উহা অনেক দিন পর্য্যন্ত রাখিতে পারা যায়। সেই জন্য, চাসী ও সিউলীরা বড় বড় নাদা করিয়া, চারি বা ছয় মুখ বিশিষ্ট চুল্লীর উপরে সেই রস জাল দিয়া, গুড় প্রস্তুত করে। এই চুল্লীকে "বাণ" বাণ বলিয়া থাকে। ইহাতে বৃহৎ বৃহৎ কাষ্ঠ জ্বাল দিয়া গুড় প্রস্তুত করিতে পারা যায়; কিন্তু সিউলীরা সচরাচর তাহা না করিয়া, গাছ কাটিবার সময় যে সকল পাতা কাটিয়া ফেলে, তাহাই প্রধানতঃ জালানি কাষ্ঠরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। যে রস প্রথমে অতি উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ থাকে, তাহাই পরিশেষে ঘোর কপিশ বর্ণ ধারণ করে এবং উহার কিয়দংশ অত্যন্ত কঠিন ও কিয়দংশ অত্যন্ত পাতলা হয়। ইহাকেই গুড় কহে। কিন্তু ইহা যতক্ষণ উষ্ণ থাকে, ততক্ষণ উহা অতি তরল অবস্থাতেই থাকে। কিন্তু শীতল হইলে বিলক্ষণ গাঢ় ও কঠিন হইয়া থাকে, সেই জন্য শিউলীরা উহা উষ্ণ থাকিতে থাকিতেই নাদা ঢালিয়া ভাঁড় মধ্যে পুরিয়া ফেলে।

গুড়—যখন সাত হইতে দশ সের রসে এক সের গুড় উৎপন্ন হয়, তখন একটী উৎকৃষ্ট সারবান্ বৃক্ষে কত পরিমাণে গুড় প্রদান করে, আমরা তাহা অনায়াসেই অবধারণ করিতে পারি। সচরাচর চারি বা সাড়ে চারি মাস গাছ কাটাতে, প্রতি বৎসরে প্রত্যেক বৃক্ষে অন্যান ৬৭ বার কাটা হইয়া থাকে। প্রত্যেক কাটে যদি ৫ সেরের হিসাবে প্রত্যেক গাছ রস প্রদান করে, তাহা

হইলে প্রত্যেক বৎসরে প্রত্যেক বৃক্ষ ৩৩৫ সের রস প্রদান করে। গড় পড়্তা ৮ সেরে রসে এক সের গুড় জন্মিলেও উক্ত ৩৩৫ সেরে প্রায় এক মণ গুড় উৎপন্ন হয়। গুড়ের মূল্য প্রতি মণ ২॥০ হইতে তিন টাকা; এদিকে এক বিঘা ভূমিতেও প্রায় ১০০ খর্জ্জুর বৃক্ষ জন্মিতে পারে; সুতরাং প্রতি বিঘায় যদি সমস্ত বৃক্ষ সমান সারবান হয়, তাহা হইলে জমির আয় প্রতি বিঘায় বৎসরে ২৫০৲ বা ৩০০৲ টাকা হইতে পারে।

গুড় জাল দিবার নাদার তারতম্য।—বাইনের অবিরত কঠিন জাল, সকল নাদা সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু কোন কোন কুম্ভকায় এই নাদা প্রস্তুতকরণ সম্বন্ধে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। চৌগাছা ওকোটচাঁদপুরের সিউলী-গণ, যশোহরের কিয়দ্দূর পশ্চিমে বাঘাডাঙ্গী নামক স্থানের নাদাই, বিশেষ আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করে। কুশদ্বীপের বাইন সকলে যে সকল নাদা ব্যবহৃত হয়, সে সমস্ত খাঁটুরার সন্নিহিত ত্রিপুলবাসী কুম্ভকারেরাই প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই দুইটী স্থানের মৃত্তিকা উক্ত কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া, এই দুই স্থানের মৃত্তিকাতেই অতি কঠিন ও দীর্ঘকাল তাপসহ নাদা সকল নির্ম্মিত হয়। যশোহর জেলার দক্ষিণ ভূভাগে যে সকল নাদার প্রয়োজন হয়; সেই সকল নাদা খুলনার নিকটস্থ আলাইপুর গ্রাম হইতে আসিয়া থাকে।

চিনির কারিকর।— চাসী ও সিউলীরা রস জাল দিয়া গুড় প্রস্তুত করে; উহারা তদতিরিক্ত কোনও কাজ করে না। পরে তাহারা সেই গুড় কারখানার অধিকারীগণকে বিক্রয় করে; কারখানার অধিকারীগণ তাহা হইতে চিনি প্রস্তুত করিয়া লয়। কেশরপুর অঞ্চলের অনেক চাসী ও চিনি প্রস্তুত করে এবং সেই চিনি সম্রান্ত ব্যবসায়ীগণকে বিক্রয় করিয়া থাকে। কুশদ্বীপে যে চিনি প্রস্তুত হয়, তাহা কারখানার অধি-কারীগণ কারিকর রাখিয়া প্রস্তুত করিয়া থাকেন। যশোহর জেলার সকল স্থানেই এক দল চিনি প্রস্তুতকারী চাসী আছে; তাহারা সচরাচর চিনি প্রস্তুত করে এবং স্ব স্ব গ্রামমধ্যে দুই দশ বিঘার ভূমি ও আবাদ করিয়া থাকে। কৃষিকর্ম্মের সহিত ব্যবসা কার্য্য নির্ব্বাহ করাই ইহাদিগের মুখ্যউদ্দেশ্য। উহারা আবার প্রতিবেশী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাসীগণের নিকট হইতে গুড় ক্রয় করে, কখন কখন বা সন্নিহিত হাট সকল হইতে গুড় কিনিয়া আনে এবং

সেই গুড়ে চিনি প্রস্তুত করিয়া, বৃহৎ বৃহৎ ব্যবসায়ীর আড়তে চালান দেয় ও যথা মূল্যে বিক্রয় করে।

কিন্তু এই সমস্ত লোক চিনি প্রস্তুতকারী কারিকর দলের অন্তর্ভুক্ত নহে, ইহারা বিভিন্ন শ্রেণীর লোক। চিনি প্রধানতঃ চিনি প্রস্তুতকারী কারিকর দ্বারাই প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। যাহা হউক গুড় প্রস্তুতকারী চাসী বা সিউলিগণের হস্ত হইতে গুড় সকল কিরূপে কারখানার অধিকারীগণের হস্তে আসিয়া থাকে, এক্ষণে আমরা তাহাই প্রকাশ করিতেছি।

গুড় ক্রয় প্রথা।— কারখানার অধিকারিগণের মধ্যে অতি অল্প লোকই চাসী বা সিউলীর নিকট হইতে গুড় ক্রয় করে। এক এক জন চাসী বা সিউলী যে অল্প পরিমাণে গুড় বিক্রয় করিতে আইসে, তাহা ক্রয় করিয়া এক একটী কারখানার কার্য্য নির্ব্বাহ করা নিতান্ত দুরূহ। সুতরাং এই ব্যবসায়ের মধ্যে এক প্রকার লোক রাখার একান্ত আবশ্যক হয়। এই লোক সকলকে ব্যাপারী বা দালাল বলিয়া থাকে এবং উহারাই চাসী বা সিউলীর হস্ত হইতে গুড় সংগ্রহ করিয়া, কারখানায় অধিকারিগণকে বিক্রয় করে। ইহারা আবার গুড় উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাসীদিগকে কিছু কিছু দাদন দিয়া রাখে। দাদনের টাকা গুড়ের মূল্য হইতে বাদ দিয়া লয়। ব্যাপারিগণ সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়ায়;—প্রত্যেক চাসীর নিকট গুড় ক্রয় করে এবং বৃহৎ বৃহৎ ব্যবসায়িগণের আড়তে সেই গুড় চালান দিয়া থাকে।

হাটের সময় আর এক দল ব্যাপারিও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। উহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ এক বিশাল ব্যবসায়ের অধিকারী। চাসীরা যে পথ বহিয়া হাটে গুড় বিক্রয় করিতে আইসে; উহারা সেই পথের ধারে বসিয়া থাকে এবং চাসীরা হাট মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে পথি মধ্যেই উহাদিগের নিকট হইতে দুই এক খানি গুড় নমুনা স্বরূপে লইয়া, চাসীদিগের প্রার্থিত মূল্যের উপর কিছু লাভ রাখিয়া কারখানার অধিকারিগণের সহিত একটী দরের চুক্তি করে, এবং উহাদিগের সমস্ত গুড় বেচিয়া দিয়া কিছু কিছু লাভ করিয়া থাকে। যে সকল চাসীর বৃহৎ কারবার আছে, তাহারা সময়ে সময়ে হাটে এত অধিক গুড় লইয়া আইসে যে, তাহা কারখানার অধিকারিগণকে

সকল গুড় নানা উপায়ে আপনাদিগের হস্তগত করিয়া লয়। গুড় যে সকল মৃণ্ময়ভাণ্ড পূর্ণ হইয়া হাটে বিক্রয় হইতে আইসে, চাসীরা আর সেই সকল ভাণ্ড ফিরিয়া পায় না। সেই সকল ভাঁড় ফিরাইয়া লওয়াও নিতান্ত অসম্ভব। কারখানার অধিকারিগণ সেই সকল ভাঁড় ভাঙ্গিয়া গুড় বাহির করিয়া লয়। সেই জন্য, দেশে যত দিন চিনির কার্য্য চলিতে থাকে, তত দিন কুম্ভকারের কাযও অতি সুচারুরূপে চলিয়া থাকে। কারণ, এক দিকে, চাসীরা যেমন গুড় বিক্রয় করিতে থাকে, অন্য দিকে, গুড় ভরিবার জন্য তেমনই নূতন ভাঁড়ের প্রয়োজন হইতে থাকে। যে সকল চাসী গুড় বিক্রয় করিতে হাটে আইসে, তাহারাই আবার গুড় বেচিয়া ফিরিয়া যাইবার সময় অগ্রে নূতন ভাঁড় কিনিয়া লইয়া যায়।

দলুয়া চিনি প্রস্তুত করিবার নিয়ম।—গুড় যেরূপে কারখানার অধিকারিগণের হস্তে আসিয়া থাকে, আমরা তাহা প্রকাশ করিয়াছি; এক্ষণে কিরূপে উহা হইতে চিনি প্রস্তুত হয়, অতঃপর তাহারই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। গুড় পরিক্রুত করিয়া, চিনি প্রস্তুত করিবার ছয় সাতটী প্রণালী আছে এবং সেই সকল প্রণালী অবলম্বন করিয়া, দুই তিন প্রকারের চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমরা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সেই সকলের বিষয় বর্ণন করিতেছি। কিন্তু প্রথমতঃ দলুয়া চিনি প্রস্তুত করিবার প্রণালী লিপিবদ্ধ করিতেছি। দেশীয় লোকেরাই এই কোমল, সরস, গুঁড়া চিনি ব্যবহার করে; বিশেষতঃ ময়রারা ইহার নিতান্ত পক্ষপাতী।

কারখানার অধিকারিগণ যে সকল গুড় ক্রয় ও সংগ্রহ করে, তাহারা সেই সকল গুড় প্রথমে ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং এক মণ করিয়া গুড় ধরিতে পারে, এমন এক একটী চুবড়ীতে সেই গুড় ঢালিয়া ফেলে। এই সকল চুবড়ী বা ঝুড়ির গভীরতা সওয়া হাত বা দেড় হাত হইবে। এই গুড় পূর্ণ চুবড়ীর উপরিভাগ সমতল করিয়া রাখিতে হয়; তজ্জন্য চুবড়ীতে গুড় ফেলিয়াই উহার উপরিভাগ আঘাত করিয়া সমতল করিয়া দিতে হয়। পরে, এই বড় বড় চুবড়ী সকল বৃহৎ বৃহৎ মৃত্তিকার গামলার উপর "তেকাটা" দিয়া বসাইতে হয়। আট দিন কাল এই ভাবে রাখিলে, উহার কোতরা বা

হয় এবং গুড়ের সারভাগ বা চিনি চুবড়ীতেই থাকিয়া যায়। প্রকৃত কথা বলিতে হইলে, গুড়, চিনি ও কোৎরা বা পাতলা গুড়ের মিশ্রণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কোৎরার সংমিশ্রণে প্রকৃত উৎকৃষ্ট গুড়ও কৃষ্ণবর্ণ হয়; সুতরাং গুড় পরিষ্কার করিবার উদ্দেশ্যেই গুড় হইতে মাৎ বা কোৎরা পৃথকীকৃত হয়। তদ্ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নহে।

গুড় এইরূপে আট দিন রাখাতে, অধিকাংশ কোৎরা বা মাৎ গুড় বিন্দু বিন্দু করিয়া, নিম্নবর্ত্তী গামলায় বা নাদায় পতিত হয়; কিন্তু সমস্তই এককালে অপসারিত হয় না। আবার, এই রীতি আরও সুপ্রণালী বদ্ধ করিবার জন্য পাটন শেওলা নামক এক প্রকার শৈবাল চুবড়ীর উপর দেওয়া হয়। এই শৈবাল কবতক্ষ, যমুনা, ইচ্ছামতী ও অনেক পুষ্করিণী জলাশয়ে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই শৈবাল চুবড়ীর উপর রাখিবার কারণ এই যে, ইহার দ্বারা গুড় ক্রমাগত সরস থাকে, এবং এই সরস পদার্থ চিনির ভিতর দিয়া নামিবার সময় উহার সহিত মাৎভাগও নামাইয়া লয় এবং চিনি অপেক্ষাকৃত শুভ্র ও গুড় হইতে এককালে পৃথকভূত হয়। গুড় আটদিন কাল শৈবাল জড়িত থাকার পরে, সমস্ত গুড়-পিণ্ডের চারি ইঞ্চি পরিমিত অংশ পরিষ্কৃত হইতে দেখা যায়। পরে এই চারি ইঞ্চি পরিমিত স্থান কাটিয়া লওয়া হয় এবং যে গুড় পিণ্ড অবশিষ্ট থাকে, তাহাই পুনর্ব্বার শৈবাল জড়িত হইয়া চুবড়ী মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। এই বার এবং ইহার পরে আর একবার পূর্ব্বরীতি অবলম্বিত হইলেই, সমগ্র পিণ্ড এককালে পরিশোধিত হইয়া দলুয়া চিনির আকার ধারণ করে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা যে চিনি প্রস্তুত হয়, তাহা সরস থাকে; সুতরাং উহাকে বিশোধিত করিয়া লইবার জন্য, উহাকে সূর্য্যোত্তাপে রাখিতে হয় এবং যাহাতে চাঙ্গ বাঁধিয়া না যায়, সেই জন্য উহা প্রথমে এক প্রকার স্থূলধার অস্ত্র দ্বারা কর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই চিনি নীরস হইয়া আসিলে, স্বচ্ছ ও সুন্দর চিনি হইয়া থাকে এবং ইহার ওজন আদিপিণ্ডের শতকরা ত্রিংশাংশ হয়। দুরাচার কারখানাধিকারীগণ অধিক ওজন দেখাইবার জন্য, গুড় শৈবালাচ্ছাদিত করিয়া, চুবড়ীতে আটদিনের পরিবর্ত্তে পাঁচ ছয় দিন রাখিয়া থাকে। ইহাতে কোৎরা অল্প পরিমাণে নিঃসারিত হয়; সুতরাং চিনির ওজনও অপেক্ষাকৃত অধিক হয়। এই প্রক্রিয়া দ্বারা

কুটিয়া লইলে, আর সেরূপ মলিন থাকেনা। এই সময়েও, চিনির ওজন বাড়াইবার জন্য উক্ত দুর্ব্বৃত্তগণ অন্য এক অসদুপায় অবলম্বন করে। কারখানার প্রাঙ্গণ অপেক্ষা কারখানার ঘরের মেজের তল, প্রায়ই এক বা দেড় ফুটের অধিক উর্দ্ধ থাকে না। সুতরাং চিনি শুখাইবার সময় চারি-দিকের ধূলিরাশি ঝাঁইট দিয়া আনিয়া চিনির সহিত মিশ্রিত করা হইয়া থাকে; তাহাতে চিনির লঘুতা অনেক নষ্ট হইয়া যায়। আবার চিনিতে ভাঁড়ের কুচি ফেলিয়া দিয়াও চিনিকে ভারি করা হইয়া থাকে।

কোৎরা বা মাৎগুড়।—আমরা ইতিপূর্ব্বে যে প্রণালী বর্ণন করিয়াছি, সেই প্রণালী ক্রমে গামলা বা নাদায় যে গুড় সঞ্চিত হয়, তাহাতেও চিনি এককালে গুড় হইতে বিশ্লিষ্ট হয় না। খাদ্যের সহিত মিশাইয়া খাইবার জন্য, এই গুড় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং এই গুড় এককালেই বিক্রীত হউক, অথবা দ্বিতীয়বার চিনি প্রস্তুত করণের জন্যই রক্ষিত হউক, বাজারে ইহার যেরূপ মূল্য নির্দ্ধারিত হয়, সেই মূল্যের উপর নির্ভর করিয়াই ইহার দ্বিতীয় প্রকরণ অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয়বার চিনি প্রস্তুত করিতে হইলে, এই গুড়কে পুনরায় জাল দিতে হয়; পরে, মৃত্তিকামধ্যে যে বৃহৎ বৃহৎ গামলা বা নাদা প্রোথিত থাকে, শীতল করিবার জন্য এই গুড় সেই নাদাতে ঢালিয়া ফেলিতে হয়। গুড় পূর্ব্বোক্ত রূপে দ্বিতীয়বার জাল না দিলে, উহা গেজিয়া উঠে; কিন্তু জাল হইয়া শীতল হইবামাত্র, আদি গুড়ের ন্যায় (যদিও তাদৃশ উৎকৃষ্ট নহে) এক প্রকার পিণ্ডে পরিণত হয়। তৎপরে সেই গুড়-পিণ্ডকে শৈবাল জড়িত করিয়া পূর্ব্বপ্রণালী অবলম্বন করিতে হয়। তাহা হইলেই শতকরা দশাংশ পরিমাণে চিনি প্রস্তুত হয়। কিন্তু এই চিনি পূর্ব্ব চিনি অপেক্ষা কথঞ্চিৎ কৃষ্ণবর্ণ ও রুক্ষ হইয়া থাকে।

যদি কারখানাধিকারী একটু পরিপক্ক ব্যবসাদার হন এবং উক্ত চিনি শীঘ্রই বেচিয়া ফেলিতে অভিলাষ করেন, তাহা হইলে তাহার আর একটী সত্বর-প্রক্রিয়া অবলম্বন করা, একান্ত আবশ্যক। গুড় শীতল হইবামাত্র, তিনি যেন সেই গুড় একটী থলিয়া মধ্যে নিক্ষেপ করেন এবং তাহাতে সবলে চাপ দিয়া, তাহা হইতে সমস্ত মাৎ পৃথক্ করিয়া দেন। পরে, অবশিষ্টাংশ শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া চিনির ন্যায় বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। প্রথম প্রণালীক্রমে যে চিনি প্রস্তুত

হইয়া থাকে, তদপেক্ষা ইহা অধিক বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু এই চিনি শীঘ্রই মাতিয়া উঠে ও শীঘ্রই বিক্রয় করিবার প্রয়োজন হয়।

এইরূপে, গুড় সবলে নিষ্পেষণ করিয়া চিনি প্রস্তুত হইলে, যে মাৎ-নিঃসারিত হইয়া থাকে, তাহাকে কোৎরা বা চিটা গুড় বলিয়া থাকে। ইহা বিভিন্ন পণ্য রূপে বিক্রীত হয় এবং বহুতর স্থলে প্রেরিত হইয়া থাকে। পরে ইহার বিষয় উল্লিখিত হইবে।

পাকা চিনি প্রস্তুত করিবার প্রণালী।—পূর্ব্বোক্ত রীতিক্রমে যে চিনি প্রস্তুত হয়, তাহাকে "দলুয়া চিনি" কহে। ইহা কখনই সম্পূর্ণরূপে পরিস্কৃত হয় না। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যে যে প্রণালীতে এই চিনি প্রস্তুত হয় সেই প্রণালী ক্রমে গুড়ে যে ময়লা থাকে, এবং চিনি প্রস্তুত হইবার সময় ইহার সহিত যে ময়লা মিশ্রিত হয়, তাহা চিনিতেও সর্ব্বশেষে মিশ্রিত দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে। ইহার আর এক বিষম অন্তরায় এই যে, ইহা অতি শীঘ্রই মাতিয়া উঠে। সুতরাং ইহা কিছু দিন স্থায়ী হয় না। আপাততঃ আমি যে পাকা চিনি প্রস্তুত করিবার প্রণালী লিপিবদ্ধ করিতেছি, সেই প্রণালীক্রমে চিনি যেমন দীর্ঘস্থায়ী, তেমনই সুপরিস্কৃত হইয়া থাকে। এই পাকা চিনি আবার অপেক্ষাকৃত দানাদার হইয়া থাকে। দলুয়া চিনিতে সেরূপ দানা দেখিতে পাওয়া যায় না। পাকা চিনি প্রস্তুত করিতে অনেক ব্যয়ও হইয়া থাকে। ইহার মূল্য প্রতি মণ দশ টাকা; কিন্তু দলুয়া চিনি ছয় টাকায় পাওয়া যায়।

গুড় প্রস্তুত করিবার সময়, প্রথমেই গুড় একখানি তক্তার উপর ঢালিতে হয়। এই সময়ে যত খানি মাৎ বাহির হইবার থাকে, তত খানি মাৎ সহজে বাহির করিয়া দিতে হয়। পরে, অবশিষ্ট গুড় একটী থলিয়ার মধ্যে পুরিয়া অনবরত চাপিতে হয়। তাহাতে কিয়দংশ মাৎ নির্গত হয়। পরে, এই গুড়ের সহিত জল মিশাইয়া, বড় বড় নাদাতে জাল দিতে হয়। এইরূপে জাল দিবার সময় উহাতে যত ময়লা থাকে সমস্তই উপরে ভাসিয়া উঠে। তখন ঐ ময়লা ফেলিয়া দিতে হয়। এই ময়লা সকলকে 'গাদ' এবং উক্তরূপে ময়লা ফেলিয়া দেওয়াকে "গাদ" কাটা বলে। এই প্রক্রিয়ার পরে যে সারভাগ অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে পুনরায় আর একবার জাল দিতে হয় এবং তৎপরে এক

প্রশস্ত মৃত্তিকাপাত্রে ছড়াইয়া দিয়া শীতল করিয়া লইতে হয়। উহা শীতল হইলে, এক প্রকার নিকৃষ্ট চিনি প্রস্তুত হয়। পরে তাহাই চুবড়ীতে ফেলিয়া, উপরে শেওলা চাপ দিয়া, পুনরায় মাৎ ঝরাইতে হয়। ইহার পরে যে চিনি উৎপন্ন হয়, তাহাই অতি উৎকৃষ্ট শুভ্র পাকা চিনি হয়। এই সময়েও যদি চুবড়ীর তলায় কিছু অপরিস্কৃত সার থাকে, তাহা হইলে তাহাতেও পুনরায় শেওলা চাপা দিয়া রাখিতে হয়। প্রথম মাৎও শেওলার নিম্নস্থ মাৎ একত্র করিয়া থলির মধ্যে পুরিয়া চাপ দিতে দিতে এক প্রকার সার পাওয়া যায়; এই সার পূর্ব্ব প্রণালী ক্রমে দুইবার জাল দিলে, আর এক প্রকার পরিস্কৃত চিনি উৎপন্ন হয়। এই সময়ে থলি হইতে যে মাৎ পড়িয়া থাকে, তাহাকেই চিটা গুড় কহে। এই চিটাতে অন্য কোন প্রকার চিনি প্রস্তুত হয় না। সুপরিস্কৃত পাকা চিনির আকারে যে অংশ পরিণত হয়, তাহার ওজন আদি গুড়ের শতাংশের ত্রিশাংশ।

কেশবপুরের চিনি প্রস্তুত করণ প্রণালী।—কেশবপুরে পাকা চিনি প্রস্তুত করিবার আর এক প্রণালী আছে; উহা উপর্য্যুক্ত প্রণালী হইতে অত্যল্প বিভিন্ন। গুড় প্রথমে অতি প্রশস্ত নাদায় জাল দিতে হয় এবং প্রত্যেক নাদাতে দুই এক মুষ্টি বীজগুড় ছড়াইয়া দিতে হয়। পরে উহাকে শীতল করিতে হয়। পরে তাহার উপর শেওলা চাপাইয়া রাখিতে হয়। তখন সেই গুড় পরিস্কৃত হইয়া চিনির আকার ধারণ করে। শেওলা চাপাইয়া যে শেষ মাৎ বাহির হয়, তাহা জাল দিয়া অপেক্ষাকৃত নীরস ও কঠিন করিলেই, বীজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। বীজের কার্য্য স্পষ্টই এই দেখিতে যায় যে, ইহার জন্য গুড় একবারের অধিক দুইবার জাল দিতে হয় না। প্রথম প্রণালী ক্রমে যে মাৎ নিঃসারিত হয়, তাহাই বীজের সহিত জাল দিয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ শীতল করিতে হয়; পরে থলিতে রাখিয়া চাপ দিতে হয়; তাহাতে মাৎনিঃসারিত যে সার-ভাগ অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে জল মিশাইয়া জলে দিবামাত্র উহার জলীয় অংশ শুখাইয়া যায়। পরে, তাহাই শীতল করিয়া শেওলা চাপা দিয়া চুবড়ীতে বসাইলেই, পরিস্কৃত চিনি উৎপন্ন হয় এবং উহা হইতে যে মাৎ ঝরিয়া পড়ে, তাহাই চিটা গুড় হইয়া থাকে। এই চিনি ও মূল গুড়ের ওজনের শতাংশের পঁচিশ বা ত্রিশ অংশ মাত্র।

ইউরোপীয় প্রণালী ক্রমে চিনি প্রস্তুত করণ।—চৌগাছা ও কোটচাঁদপুরে ইউরোপীয় রীতি ক্রমে যে চিনি প্রস্তুত হয়, এক্ষণে তাহাই আমাদিগের এক মাত্র বর্ণনীয়। এই প্রণালীতে কাঁচা গুড়ের সহিত কিয়ৎপরিমাণে জল মিশাইয়া লইয়া, বৃহৎ লৌহ কটাহে জাল দিতে হয়। এই জাল বাইনের সাধারণ জালের ন্যায় নহে; অন্যান্য কার্য্য বাষ্পীয়যন্ত্র দ্বারা যেরূপে সাধিত হয়, ইহাও সেইরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এইরূপে জাল প্রয়োগ করিতে করিতে, লঘুতর আবর্জ্জনা সকল উপরে ভাসিয়া উঠে। তখন সেই আবর্জ্জনা রাশি কাটিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। পরে সেই জালাবশিষ্ট সার, কম্বলের নল দ্বারা অপর এক কটাহে ঢালিয়া লইতে হয়। তৎপরে, জল শুখাইয়া লইবার জন্য, সেই সার আর একবার জ্বালে বসাইতে হয়। এই সময়ে সেই সারে যদি প্রয়োজনানুরূপ জাল প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে দানাদার চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। দেশীয় পাকা চিনি হইতে তাহার কিছুই প্রভেদ থাকে না। কিন্তু সেই সারে যদি প্রয়োজনানুরূপ জাল প্রদত্ত না হইয়া শুদ্ধ জল শুখাইবার উপযোগী জাল দেওয়া হয়, তাহা হইলে চিনি মিছরি খণ্ডের ন্যায় চাক্‌চিক্য-শালী কুঞ্চিত আকার বিশিষ্ট হয়। এই চিনির বস্তুগত কোনও তারতম্য আছে কি না, আমরা তাহা বলিতে পারি না। পরন্তু সাধারণ লোকে সুন্দর ও উৎকৃষ্ট বস্তু বলিয়া যতদিন মনোনীত করিবে, ততদিন এই চিনি বাজারে উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

চিনির হাট।—যশোহরের পশ্চিমাংশে এবং নদীয়া ও কুশদ্বীপের স্থানে স্থানে চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু উহাদিগের মধ্যে কোটচাঁদপুর, চৌগাছা, ঝিকারগাছা, ত্রিমোহিনী, কেশবপুর, যশোহর, খাজুরা, শান্তিপুর ও গোবরডাঙ্গা এই সকল স্থানই চিনি প্রস্তুত হইবার প্রধান স্থান। এই সকল চিনি রপ্তানি হইবার দুইটী প্রধান স্থান আছে—কলিকাতা ও নলছিটি। বাখরগঞ্জ জেলার মধ্যে নলছিটি প্রধান বাণিজ্য স্থান; পূর্ব্বাঞ্চলের মধ্যে এই স্থানই বাণিজ্যের কেন্দ্র ভূমি। দেশীয় লোকের ব্যবহারের জন্য, এই স্থানেই দলুয়া চিনির অধিক প্রয়োজন দেখিতে পাওয়া যায়। শুদ্ধ কোটচাঁদপুর হইতে নহে; পূর্ব্বাঞ্চলের সমস্ত স্থলেরই দলুয়া চিনি নলছিটি অথবা ইহার সন্নিহিত ঝালকাটিতে আসিয়া

থাকে। কোটচাঁদপুর হইতেও অনেক দলুয়া চিনি নলছিটিতে প্রেরিত হয়; কিন্তু দেশীয় লোকের অভাব দূরীকরণ জন্য, কলিকাতাতেই ইহার অধিকাংশ রপ্তানি হয়। এই চিনি স্থল পথে কলিকাতায় যাইবারও বিলক্ষণ সুবিধা আছে। বস্তুতঃ কলিকাতাতে চিনির দুই প্রকার অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ দলুয়া চিনি, কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন হয়;—দ্বিতীয়তঃ পাকা চিনি ইউরোপ ও অনন্য দূরদেশে পাঠাইবার জন্য, প্রয়োজন হইয়া থাকে। কিন্তু এই শেষোক্ত অভাব কেশবপুর ও যশোহরের দক্ষিণাঞ্চলবর্ত্তী অন্যান্য স্থান সকল হইতে বিদূরিত হয় এবং প্রথমোক্ত অভাব শুদ্ধ কোটচাঁদপুর হইতেই পরিপূরিত হইয়া থাকে। সুতরাং চিনির ব্যবসায় ও রপ্তানি নিম্নলিখিতরূপেই নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। যথা;—

১। শর্করাপ্রধান অঞ্চলের উত্তরার্দ্ধে সাধারণের ব্যবহারোপযোগী দলুয়া চিনি প্রস্তুত হয় এবং উহা কলিকাতাও পূর্ব্বাঞ্চলে প্রেরিত হয়।

২। শর্করাপ্রধান অঞ্চলের দক্ষিণার্দ্ধে উভয়বিধ চিনিই উৎপন্ন হয়;—উহাদিগের মধ্যে দলুয়া চিনি প্রধানতঃ চাষীরাই প্রস্তুত করে এবং উহা নলছিটী ও পূর্ব্বাঞ্চলে প্রেরিত হয় এবং পাকা চিনি সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়িগণ কর্ত্তৃক প্রস্তুত ও কলিকাতায় প্রেরিত হইয়া থাকে।

চিনি ব্যবসায়ের অবস্থা ও আশা।—দলুয়াচিনির অভাব দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে; বিশেষত পূর্ব্বাঞ্চলে এই অভাব অতীব বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু পাকা চিনির অভাব দিন দিন হ্রাস হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সাধারণ ব্যক্তিবৃন্দই দলুয়া চিনি ব্যবহার করিয়া থাকে এবং ইউরোপীয়েরা পাকা চিনির ব্যবহার করে। সুতরাং সাধারণ ব্যক্তিবৃন্দের সৌভাগ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যতই দলুয়ার ব্যবহার বাড়িতেছে, ততই দলুয়ার অভাব প্রসারিত হইতেছে। পক্ষান্তরে, অন্যান্য বৈদেশিক পাকা চিনি ইউরোপীয় বাজারে যতই আমদানি হইতেছে, দেশীয় পাকা চিনির আদর ইউরোপীয় বাজারে ততই হ্রাস হইয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ ইউরোপীয় বাজারে আজি কালি দেশীয় পাকা চিনির অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে। সেই সকলের মধ্যে, আজি কালি মরিশশ চিনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। এই মরিশশ

আদর ততই হ্রাস হইয়া আসিতেছে—উহার ব্যবসাও ক্রমশঃ অবনত হইয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ দেশীয় পাকা চিনি অপেক্ষা মরিশশ চিনি লব্ধপ্রসর হইবার যেরূপ সুবিধা আছে, তাহাতে দেশীয় পাকা চিনির গৌরব এককালে নষ্ট হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

প্রাগুক্ত কারণ বশতঃ যশোহরের চিনিপ্রধান অঞ্চলের দক্ষিণাংশের ও আমাদিগের কুশদ্বীপের চিনির ব্যবসা, যশোহরের উত্তরার্দ্ধ অপেক্ষা অনেক অল্প হইয়া আসিয়াছে। ত্রিমোহিনী. কেশবপুর, গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানের অনেক কারখানা এককালে বন্ধ হইয়াছে।

কেশবপুরে পাঁচ বৎসরের মধ্যে ১২০টী কারখানার স্থলে ৪০ বা ৫০টী মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। পূর্ব্বে, ত্রিমোহিনী কেশবপুরেরই একটী আড্ডা ছিল; এবং উহাতেও প্রায় ১০।১২টী কারখানা চলিত; কিন্তু আজি কালি উহাতে একটী কারখানাও দেখিতে পাওয়া যায় না। গোবরডাঙ্গার অবস্থাও তদ্রূপ হইয়া উঠিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে উহাতে ৮০টী কারখানা ছিল, কিন্তু আজি কালি ২০।২৫টী কারখানার অধিক নাই এবং যাহাও আছে, তাহাও অত্যন্ত শোচনীয় দশাগ্রস্ত। ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, কেশবপুর ও ত্রিমোহিনী শুদ্ধ মাত্র চিনি প্রস্তুত হয় বলিয়াই প্রসিদ্ধ নহে; এই উভয় স্থান হইতে মহাজনগণ অনেক চিনি ক্রয় করিয়াও থাকেন। আমরা এই উভয় স্থানের সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, এখানকার অধিকাংশ চাষী, নিজেরাই গুড় জাল দিয়া চিনি প্রস্তুত করে এবং যখন উহাদিগের চিনি, এখানকার প্রধান প্রধান মহাজনগণের গোমস্তাদিগের নিকট, কারখানার বাহিরেও বিক্রীত হয়, তখন এই উভয় স্থানে নিশ্চয়ই অপর্য্যাপ্ত চিনি জন্মিয়া থাকে।

এদিকে, কেশবপুর ও তৎসন্নিহিত স্থান যেমন উল্লিখিত কারণ বশতঃ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তেমন অপর একটী কারণ বশতঃ কি উত্তর কি দক্ষিণ উভয় অঞ্চলের প্রত্যেক নগরই বিলক্ষণ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছে। পাশ্চাত্য বণিকদল আসিয়া খর্জ্জুর বৃক্ষের আবাদ আরম্ভ করিবার কিছু পরে, দেশীয় বণিকগণ দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং পাশ্চাত্য বণিক দলের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতে লাগিল। এদিকে, পাশ্চাত্য বণিকদল কৃত অত্যুৎকৃষ্ট

চিনি অপেক্ষা, দেশীয় ব্যবসায়িগণকৃত চিনির অভাব ও আদর অধিক হইয়া আসিল। ইহাতে দেশীয় ব্যবসায়িগণ অনায়াসেই পাশ্চাত্য বণিকগণকে কার্য্যক্ষেত্র হইতে বিদূরিত করিতে সমর্থ হইল। কিন্তু পাশ্চাত্য বণিকগণও ছাড়িবার পাত্র নহে; তাহারাও এই ব্যবসায়ের জন্য, বিষম প্রতিযোগিতা করিতে আরম্ভ করিল। খর্জ্জুর বৃক্ষ অন্ততঃ সাত বৎসরের না হইলে, গুড় প্রদান করিতে পারে না; সুতরাং এরূপ স্থলে, ইউরোপীয় বণিকগণ হঠাৎ গুড় প্রস্তুত বা সংগ্রহ করিয়া, চিনি প্রস্তুত করিতে পারিল না বটে, কিন্তু দেশীয় ব্যবসায়ীগণের প্রতিকূলাচরণ করিতেও প্রতিনিবৃত্ত হইল না। ইহাতে নিকৃষ্ট জাতীয় গুড়েরও মূল্য বৃদ্ধি হইল;—ব্যবসায়ীগণের লাভাংশ অল্প হইয়া পড়িল;—ব্যবসায় এককালে অবনতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইল;—এবং সর্ব্বশেষে এই ফল লাভ হইল যে, সেই অবনতি দ্বারাই অধিকাংশ বণিক, এই ব্যবসায় [illegible] এককালে পৃথক্‌ভূত হইল। ইতিমধ্যে, চাসীগণ স্ব স্ব পণ্যের তাদৃশ উচ্চ মূল্য পাইয়া, বিলক্ষণ লাভবান্ হইয়া, খর্জ্জুরের চাস আরও বাড়াইয়া ফেলিল। ইহাতে গুড়ের মূল্য হ্রাস হইল কিন্তু চিনির অভাব অধিক থাকাতে, মধ্যবর্ত্তী দেশীয় ব্যবসায়ীদল অধিক লাভ পাইতে লাগিল। দৈবানুগ্রহে এই সময়ে যদি পূর্ব্বাঞ্চলের অভাবের অনুরূপ চিনি প্রস্তুত হইত, তাহা হইলে এই অবনতি শীঘ্রই দূরীভূত হইত এবং এই ব্যবসায় পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিত।

চাসীগণ।—চিনির মহাজন ও কারখানার অধিকারীগণ, চিনির ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু উহা অপরদিকে চাসীগণকে বিলক্ষণ লাভবান্ করিয়াছে। উহারা গুড়ে ক্রমান্বয়ে উচ্চ মূল্য প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে এবং এতদূর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে যে, চারিদিকে খর্জ্জুরবৃক্ষের আবাদ আরম্ভ করিয়াছে। তদনুসারে, কেশবপুর ও ত্রিমোহিনীর নিকট যে সকল চাসী নিজেই স্ব স্ব গুড় হইতে দলুয়া চিনি প্রস্তুত করে, তাহারা এই ভীষণ ঝটিকার বেগ এক দিনের জন্যও সহ্য করে নাই। কলিকাতায় পাকা চিনির মূল্য যেমন হ্রাস হইয়া গিয়াছে, নলছিটে দলুয়া চিনির মূল্য তেমনই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং চিনি ব্যবসায় সম্বন্ধে ইহাই স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, চিনির ব্যবসায়ে চাসীদিগের অবস্থা যেমন উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছে, মহাজনেরা তেমনই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

চিনির হাটের বিবরণ। আমরা যাহাকে হাটের অবনতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম, তাহা শুদ্ধ উপমাবাচক কথা মাত্র। কারণ, কোটচাঁদপুরে বা কেশব-পুরে চিনির সময়ে যে দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, অপেক্ষাকৃত অন্য কোনও কোলাহলময় নগরে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। চারি বা পাঁচ মাস ধরিয়া, চিনি ও গুড় প্রতিদিন প্রত্যেক দিক দিয়া অবিরত প্রবিষ্ট হইতে থাকে। শুদ্ধ মাত্র কোটচাঁদপুরেই প্রত্যহ দুই তিন হাজার মণ এবং কেশব-পুরে সম্ভবতঃ হাজার মণ গুড় আসিয়া থাকে। যখন চাষীরা গুড়ের কলসী-পূর্ণ গোযান সকল লইয়া আসিতে থাকে, তখন এককালে সকল পথ পরিপূর্ণ করিয়া ফেলে,—মহাজনগণের দোকান ও কারখানা সকল ক্রেতাবর্গে সমাচ্ছন্ন হয়, এবং গুড়ের ওজন ও চালান অনবরত চলিতে থাকে। কারখানার দ্বার-দেশেই মহাড়ম্বরে কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। এক দিকে যেমন ওজনাদি হইতে থাকে, অমনই আর এক দিকে গুড়ের কলসী পূর্ণ গোযান সকল কারখানায় গুড় উঠাইয়া দিবার জন্য, প্রতীক্ষা করিতে থাকে। অল্প হউক বা অধিক হউক, কোটচাঁদপুরে ইহা প্রতিদিনই সংঘটিত হয়। এতদ্ভিন্ন হাটবারে এই সকল কার্য্য আরও অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। কেশবপুরেও প্রত্যহ বাজার বসিয়া থাকে, কিন্তু অন্যান্য স্থানে নির্দ্দিষ্ট হাটবারেই এইরূপ কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে সচরাচর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

চিনির কারখানা।—প্রত্যেক কারখানাই এক একটী বৃহদাকারের মুক্ত চতুর্ভুজ ক্ষেত্র। ইহার চতুর্দ্দিক বেড়া দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং ইহার এক বা দুই দিকে শ্রেণীবদ্ধ ঘরের সারি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল ঘরে কার-খানার সামান্য সামান্য কার্য্য সম্পন্ন হয়; প্রধানতঃ গুড় ও চিনি এই সকল স্থানে সঞ্চিত থাকে। যে সমস্ত কারখানায় পাকা চিনি প্রস্তুত হয়, সেই সকল কারখানার প্রাঙ্গণ ভূমিতে অনেক বাইন দেখিতে পাওয়া যায় এবং প্রত্যেক বাইনেই লোকগণ কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে। কেহবা বৃহচ্চুলীর অগ্নি রক্ষা করে;—কেহ বা গাদ কাটিতে থাকে;—কেহ বা চিনি প্রস্তুত করে। আর যদি উহা দলুয়া চিনির কারখানা হয়, তাহা হইলে শ্রেণী বদ্ধ চুবড়ী সকল সজ্জিত থাকে; সেই সকল চুবড়ী পাটা শেওয়ালা দ্বারা আচ্ছাদিত

মুক্ত প্রাঙ্গণের চারিদিকেই প্রচলিত প্রণালী ক্রমে চিনি প্রস্তুত হইতে থাকে।

অগ্রহায়ণের প্রথম হইতে চৈত্রের শেষ পর্য্যন্ত চিনি প্রস্তুত করিবার প্রকৃত সময়। অগ্রহায়ণের প্রথমে বা কার্ত্তিকের শেষে চিনি ব্যবসায়ী ও কারখানার অধিকারীগণ নিজ নিজ ব্যবসা-স্থানে আগমন করিতে থাকে এবং চৈত্র মাস পর্য্যন্ত কার্য্যক্ষেত্রে অবস্থিতি করিয়া, কালোচিত কার্য্য সাধন করতঃ স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিতে থাকে। এই পাঁচ মাস কাল, কোটচাঁদপুর ও কেশবপুর প্রভৃতি স্থান সকল, যেরূপ অবস্থাপন্ন হয়, তাহার সহিত বৎসরের অবশিষ্ট মাস সকলের তুলনা করিলে, উক্ত স্থান সকল নির্ব্বাসিত ও পরিত্যক্ত স্থান বলিয়া সহজেই প্রতীতি জন্মে। যে সময়ে চিনির কাষ না চলে, সেই সময়ে কারখানা সকল বন্ধ হইয়া যায়;—কোন প্রকার গুড়েরই আমদানী হয় না। এবং বাজারে কোনও কাষই হয় না। শান্তিপুর ও গোবরডাঙ্গার অনেক ব্যবসায়ী চিনির সময়ে কোটচাঁদপুরে গিয়া অবস্থিতি করে। শান্তিপুরের মহাজনেরা শান্তিপুরেও ক্ষুদ্রাকারের এক একটী কারখানা স্থাপন করিয়া থাকে। কোটচাঁদপুর, যাদবপুর, ও ঝিকারগাছা হইতে সেই সকলের জন্য অনেক গুড় প্রেরিত হয়। কিন্তু গোবরডাঙ্গায় এই সকল স্থানের গুড় কদাপি আইসে না। চাঁহুড়িয়া, কলারোয়া প্রভৃতি স্থানে যে সকল গুড় উৎপন্ন হয়, সেই সমস্তই গোবরডাঙ্গায় আসিয়া থাকে ও চিনির নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। কেশবপুর ও ত্রিমোহিনীর ব্যবসায়িগণ শান্তিপুর প্রভৃতি কোনও স্থানের সহিত সংস্রব রাখে না; উহারা কলিকাতার সহিত সকল কার্য্যই সম্পন্ন করে। যে সময়ে কোটচাঁদপুর চিনির নিমিত্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে, সেই সময় হইতে ইহা ব্যবসায়ীগণের প্রতিযোগিতায় অপরাপর সকল স্থান অপেক্ষা সমধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। অন্য কোন স্থানে তাদৃশ অনিষ্টাপাত দেখিতে পাওয়া যায় না। উহার নিমিত্ত কোটচাঁদপুরের চিনি অতীব দুর্ণামগ্রস্ত হইয়াছে। এই প্রতিযোগিতার সময়ে অনেক অসাধুব্যবহার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আমরা ইতিপূর্ব্বে তৎসমুদয়ের কিছু কিছু বর্ণন করিয়া আসিয়াছি। বিশেষতঃ এই ব্যবসায়ে আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, নীলকরেরা নীলে যেমন ভিন্ন ভিন্ন মার্ক বা চিহ্ন দিয়া থাকে, চিনি প্রস্তুতকারী

ব্যবসায়িগণ এই ব্যবসায়ে তেমন ভিন্ন ভিন্ন মার্ক ব্যবহার করে না। তাহাতেই এতদঞ্চলের উত্তম অধম যাবদীয় চিনি একই দুর্ণামের ভাগী হইয়াছে এবং অতি সদাশয় সাধুব্যবসায়ীর চিনিও অতীব কষ্ট সহকারে বিক্রীত হয়। সেই জন্য, যে গুড় কোটচাঁদপুরে অনায়াসে চিনি হইতে পারে, তাহা তথায় চিনি না হইয়া, শান্তিপুরে আসিয়া চিনি হয়। যে মহাজনের চিনি কোটচাঁদপুরে অতীব দুর্ণামগ্রস্ত হইয়াছে, শান্তিপুরের কারখানায় সেই মহাজনের চিনি অতীব সুনাম সহকারে বিক্রয় হইয়া থাকে।

খর্জ্জুর চিনি সম্বন্ধীয় যাবদীয় বিষয়ই আমরা একে একে লিপিবদ্ধ করিয়াছি; শুদ্ধ চিনির হাটগুলির বিশেষ বিবরণ এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করি নাই। সুতরাং আমরা এক্ষণে চিনি-প্রধান অঞ্চলের হাট সকলের বিশদ বিবরণ বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

যতগুলি চিনির হাট দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সকলের মধ্যে কোটচাঁদপুরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। এই স্থান এবং ইহার সন্নিহিত সলেমানপুর গ্রাম শুদ্ধমাত্র চিনির কারখানাতেই সমাচ্ছন্ন। এই উভয় স্থানে যত চিনি প্রস্তুত হয়, তৎসমুদয়ই প্রায় কলিকাতায় প্রেরিত হয়, কেবল চতুর্থাংশ বা এক তৃতীয়াংশ মাত্র নলছিটি ও বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ঝালকাটিতে গমন করিয়া থাকে। ঝালকাটিতে প্রেরয়িতব্য চিনির পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে। কোটচাঁদপুর হইতে কলিকাতায় আসিবার দুইটী পথ আছে; একটী জলপথ এবং অপরটী স্থলপথ। কলিকাতায় স্থলপথে যে চিনি রপ্তানি হয়, তাহা প্রথমে গোযান প্রভৃতি দ্বারা ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানির কৃষ্ণগঞ্জ ও রামনগর ষ্টেশনে উপস্থিত হয় এবং তথা হইতে রেলপথে কলিকাতায় পৌহুছিয়া থাকে। যে সকল চিনি গোযানে কৃষ্ণগঞ্জে বা রামনগরে আসিয়া থাকে, সেই সকল গোযান কোটচাঁদপুরে ফিরিয়া যাইবার সময়, গুড় সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়া থাকে। প্রতি বর্ষে কোটচাঁদপুর ও তৎসন্নিহিত স্থান সকল হইতে প্রায় লক্ষ মণ চিনি বিদেশে প্রেরিত হয়। উক্ত চিনির মূল্য অন্যূন ছয় লক্ষ টাকা হইবে। চিনিপ্রধান অঞ্চলে যত চিনি প্রস্তুত হয়, সম্ভবতঃ উহা তাহার চতুর্থাংশ মাত্র। এতদঞ্চলের যাবদীয় প্রধান প্রধান চিনির

দাস প্রামাণিক ভিন্ন অপর সকলেই কুশদ্বীপবাসী তাম্বুলী। বংশীবদন প্রথমে অতি সামান্য মূলধন অবলম্বন করিয়া, এই কার্য্যে হস্তার্পণ করেন। পরে, স্বকীয় অসামান্য ব্যবসাবুদ্ধির প্রাখর্য্যে বিপুল বিত্ত সম্ভ্রম লাভ করিয়া, এতদঞ্চলের একজন যশস্বী বণিক হইয়া উঠেন। চিনিপ্রধান অঞ্চলের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সকল স্থানেই ইহার কারখানা ও কলিকাতাতে এক প্রধান দোকান আছে।

কুশদ্বীপবাসী মহাজনগণের মধ্যে খাঁটুরা নিবাসী খ্যাতনামা ধনকুবের স্বর্গীয় কালীকুমার দত্ত মহাশয় সর্ব্বাগ্রে এই ব্যবসায়ের পথ প্রদর্শন করেন। বহুপূর্ব্বে প্রোক্ত মহাত্মা কলিকাতার বড়বাজারে এক দোকান করিয়াছিলেন। তদীয় কনিষ্ঠ মাননীয় বৈদ্যনাথ সেই দোকানের অধ্যক্ষ ছিলেন। চিনির ব্যবসায়ে কথঞ্চিৎ উন্নতি লাভ করিয়াই, তিনি প্রধান প্রধান চিনির হাটে গোমস্তা পাঠাইয়া চিনি ক্রয় করিতে আরম্ভ করেন এবং সেই সমস্ত চিনি কলিকাতায় আনাইয়া বিক্রয় করিতেন। কৃষ্ণদয়াল রায় নামক জনৈক লোক প্রথমে ইহার গোমস্তা হইয়া কোটচাঁদপুরে কার্য্যারম্ভ করেন।

উক্ত খ্যাতনামা চিনির মহাজন স্বর্গীয় কালীকুমারের অনুকরণ করিয়া, খাঁটুরা নিবাসী স্বর্গীয় রামজীবন আশ মহাশয় এই কার্য্যে ব্যাপৃত হন। পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক কুশদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ ইহার গোমস্তা হইয়া কোটচাঁদপুরে উপস্থিত হন এবং ব্যবসাকার্য্য আরম্ভ করেন।

ইহার কিছু কাল পরে, হয়দাদপুরনিবাসী বড় বাজারের সুপ্রসিদ্ধ দেশীয় ব্যবসায়ী সৃষ্টিধর কোঁচ মহাশয় এই স্থানে এক গদী সংস্থাপন করেন এবং হয়দাদপুর নিবাসী তাম্বুলী জাতীয় শ্রীরামচন্দ্র আশ মহাশয়কে অংশীদার ও কার্য্যাধ্যক্ষ করিয়া পাঠাইয়া দেন। অনুমান, ১২৭৩ বা ১২৭৫ সালে কোঁচ মহাশয়ের এই কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। শ্রীরামচন্দ্র স্বকীয় অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অদম্য পরিশ্রম, অটল অধ্যবসায় ও অলৌকিক যত্ন প্রভাবে ইহার যেরূপ লোকাতীত উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন, তেমন আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রাতঃস্মরণ্য কালীকুমার দত্ত মহাশয় কুশদ্বীপবাসী মহাজন গণের অগ্রণী ছিলেন বটে, কিন্তু উল্লিখিত আশ মহাশয়, সময়ে সময়ে তাঁহারও প্রতিযোগিতা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে মহান ...

ফলতঃ কোটচাঁদপুরে আমাদিগের কুশদ্বীপের যতগুলি মহাজন গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও অপেক্ষা ইনি হীন পদ ছিলেন না, এবং কার্য্যতৎপরতা ও দক্ষতা প্রভাবে কাহারও কার্য্য ইহার কার্য্যের ন্যায় এতদূর দৃঢ়মূল ও দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে নাই। ব্যবসা কার্য্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সকলের কার্য্যই উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু এই শ্রীরামচন্দ্রের কার্য্যকুশলতা গুণে আজিও সৃষ্টিধরের কার্য্য কোটচাঁদপুরে অটল হইয়া রহিয়াছে। এখানে দুই এক জন ইউরোপীয় বণিকও ব্যবসা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন; কিন্তু প্রতিযোগিতায় তাহারাও এই আশ মহাশয়ের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারেন নাই। কি ব্যবসায়ের লাভালাভে, কি সাধারণ হিতকর কার্য্যে, কি স্থানীয় ক্রেতৃবৃন্দের সহানুভূতি ও অনুরাগ আকর্ষণে—সকল বিষয়েই এই আশ মহাশয় সকলের অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন। এমন কি, ইউরোপীয় বণিক্‌বৃন্দের প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে ও মিউনিসিপালিটীর উচ্চাসন, ইহারই করতলগত হইয়াছিল। শ্রীরামচন্দ্র কয়েক বৎসর ধরিয়া এতদঞ্চলের লোক সাধারণের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইয়া রহিয়াছেন। ফলতঃ শ্রীরাম বাবু, এতদঞ্চলে অবস্থিতি করিয়া, এ প্রদেশের বিস্তর উপকার সাধন করিয়াছেন। সেই জন্য, এই স্থানে আমরা তাঁহার এক সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং তাঁহার জীবনের কয়েকটী কার্য্য সংক্ষেপে বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

শ্রীরামচন্দ্র হয়দাদপুরের আদিম অধিবাসী নহেন। ইহাদিগের পূর্ব্বনিবাস যশোহর জেলার অন্তর্গত পুরাতন বনগ্রাম। বর্গীর হাঙ্গামাকালে, যখন অন্যান্য তাম্বুলী স্ব স্ব বাসস্থান ত্যাগ করিয়া, খাঁটুরা প্রভৃতি স্থানে বাস করেন, সেই সময়ে শ্রীরামচন্দ্রের পিতা স্বর্গীয় রামকুমার আশ মহাশয়, স্বকীয় বাসস্থান পুরাতন বনগ্রাম ত্যাগ করিয়া, হয়দাদপুরে আসিয়া বাস করেন। শ্রীরামচন্দ্র ১২৪৮ সালে হয়দাদপুরের ভবনে জন্ম গ্রহণ করেন। তখনকার প্রথানুসারে শ্রীরামচন্দ্র পঞ্চমবর্ষ উত্তীর্ণ হইলেই, গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করেন। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইনি পাঠশালা ত্যাগ করিয়া, স্বজাতীয় এক আত্মীয় তাম্বুলীর দোকানে দুই তিন বৎসর কাল চাকুরী করেন। তৎপরে, উক্ত চাকুরী ত্যাগ করিয়া,

স্থাপন করেন। গোবরডাঙ্গার চিনির কারখানার অধিকারীমাত্রকেই চাঁহুড়িয়ায় গিয়া, প্রতি সপ্তাহের হাটে গুড় কিনিয়া আনিতে হইত। তদনুসারে, শ্রীরামচন্দ্রও এই অল্প বয়সে চাঁহুড়িয়া গিয়া নিজে গুড় কিনিয়া আনিতেন এবং সেই গুড় জ্বাল দিয়া চিনি প্রস্তুত করিয়া, কলিকাতায় বিক্রয়ের জন্য পাঠাইয়া দিতেন।

কয়েক বৎসর পরে, শ্রীরামচন্দ্র এই কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, কেশবপুরে গমন করেন এবং তথায় এক কারখানা স্থাপন করেন। দুই এক বৎসর কেশবপুরে কার্য্য করিয়া, শ্রীরামচন্দ্র কলিকাতায় আইসেন এবং তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতা গোপালচন্দ্র আশের সহিত মিলিত হইয়া, বড়বাজারের চিনিপটীতে এক খানি চিনির দোকান করেন। এই দোকানে উভয় ভ্রাতারই কিছু কিছু লাভ হইতে লাগিল। কিন্তু এই সময়ে বড়বাজারের বিখ্যাত চিনির মহাজন শ্রীযুক্ত স্থষ্টিধর কোঁচ মহাশয় ইঁহাকে কোটচাঁদপুরের কর্ম্মের অংশীদার ও কার্য্যাধ্যক্ষ করিয়া, তথায় পাঠাইয়া দেন। এই সময় হইতেই ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না হইয়া, শ্রীরামচন্দ্রকে স্বকীয় সুখময় অঙ্কে স্থান দান করেন।

বঙ্গীয় ১২৭৩ কি ৭৫ সালে, শ্রীরামচন্দ্র সর্ব্ব প্রথমে কোটচাঁদপুরে উপনীত হন। এই সময়ে, প্রাতঃস্মরণীয় কালীকুমার দত্ত ও স্বর্গীয় রামজীবন আঁশ, এই দুই মহোদয়ের কার্য্য কোটচাঁদপুরে মহাড়ম্বরে নির্ব্বাহিত হইতেছিল। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র, কোটচাঁদপুরে দোকান খুলিয়া, যেরূপ ধীরতা ও বিচক্ষণতা সহকারে কার্য্য করিতে লাগিলেন, তাহাতে অতি সত্বরেই স্থষ্টিধরের সুনাম এতদঞ্চলের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল এবং স্থষ্টিধরও একজন বিশিষ্ট মহাজন বলিয়া সর্ব্বত্র আদৃত হইলেন। শ্রীরামচন্দ্রের পরে, গোপালচন্দ্র রক্ষিত ও কালাচাঁদ কুণ্ডু প্রভৃতি কয়েক জন তাম্বুলী মহাজন ও কোটচাঁদপুরে গদী সংস্থাপন করিয়াছিলেন কিন্তু কেহই ইঁহার সমকক্ষতা লাভ করিতে পারেন নাই। কালক্রমে, চিনির ব্যবসায় দিন দিন হীনভাব প্রাপ্ত হইলে, সকল তাম্বুলী মহাজনই একে একে কোটচাঁদপুরের ব্যবসা ত্যাগ করেন, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের যত্নে, স্থষ্টিধরের কার্য্য আজিও অতি সুন্দররূপে চলিয়া আসিতেছে। এবং স্বর্গীয় কালাচাঁদ কুণ্ডুর কার্য্য, তদীয় আত্মজ সুযোগ্য শশীভূষণ

শ্রীরামচন্দ্র কোটচাঁদপুরে গিয়া, যে শুদ্ধ কয়েক জন দেশীয় মহাজনের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া, স্বকীয় ব্যবসায় কার্য্যের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, এমন নহে; তাঁহাকে দুই চারি জন পাশ্চাত্য প্রবল বণিকের সহিত ও প্রতিপক্ষতা করিতে হইয়াছিল। তৎকালে, কোটচাঁদপুরে ই, জি, ম্যাক্‌লাউড্ ও ই, আই, সী, ম্যাক্‌লাউড্ নামক দুই ব্যক্তির চিনির কারখানা ও ভুষা মালের দোকান বহুদিন হইতে চলিতেছিল। এতদ্ভিন্ন, বর্দ্ধমানের "ধোবা সুগার কোম্পানি" যে নিউহাউস্ সাহেবকে আপনাদিগের গোমস্তা করিয়া এই স্থানে পাঠাইয়া দেন, সেই নিউহাউস্ সাহেবও নিজে এখানে এক চিনির কল স্থাপন করেন। বর্ত্তমান সময়ে, উক্ত নিউহাউস্ সাহেবের দুই পুত্র হেনেরি নিউহাউস ও আলেকজণ্ডার নিউহাউস ও এই কল সুন্দররূপে চালাইতেছেন। ইহারা সকলেই শ্রীরামচন্দ্রের প্রবল প্রতিপক্ষ কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র, বিচক্ষণতা, অধ্যবসায়, সরল ব্যবহার ও মিষ্ট বচনে সকলকেই বশীভূত করিয়া, আপামার সাধারণ সকলেরই প্রীতিও শ্রদ্ধাভাজন হইয়া রহিয়াছেন।

অধিক কি বলিব, কিয়দ্দিবস হইল, কোটচাঁদপুরের মিউনিসিপালিটির কমিসনরগণ ম্যাকলাউড্ সাহেবকে মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান করিয়াছিলেন এবং গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অনররি ম্যাজিষ্ট্রেট পদে উন্নীত করেন। এই সময়ে, শ্রীরামচন্দ্র ও উক্ত মিউনিসিপালিটী কর্ত্তৃক ভাইস্ চেয়ারম্যান ও গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনররি ম্যাজিষ্ট্রেট পদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ম্যাক্‌লাউড্ সাহেব বহুদিন এই পদদ্বয় উপভোগ করিতে পারেন নাই; অচিরেই তিনি ঐ পদদ্বয় হইতে অবসৃত হন এবং ঝিনাইদহের ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় কোটচাঁদপুরের চেয়ারম্যানের আসন গ্রহণ করেন। সৌভাগ্যের বিষয়, আমাদিগের প্রিয়ম্বদ কুশদ্বীপ ভ্রাতা শ্রীমান্ শ্রীরামচন্দ্র পীড়ায় দেড় বর্ষকাল শয্যাগত থাকিলেও, কোটচাঁদপুরের মিউনিসিপালিটী ও গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে উক্ত দুই পদ হইতে অবকাশ প্রদান করেন নাই। উহারা তাঁহাকে অতীব সম্মান সহকারে উক্ত দুই পদে নিয়োজিত রাখিয়াছেন।

শ্রীরামচন্দ্র শুদ্ধ চিনির ব্যবসায়েই যে এরূপ প্রতিপত্তিশালী হইয়াছিলেন এমন নহে; কোটচাঁদপুরে অবস্থিতিকালে, যে কয়েকটী সাধারণ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই সকল কার্য্য দ্বারাই তিনি তত্রত্য

আপামর সাধারণের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। আমরা সাধারণের অবগতির জন্য, নিম্নে সেই সমস্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যত দিন কোটচাঁদপুরে এই সকল কীর্ত্তির বিন্দু মাত্র চিহ্ন থাকিবে, ততদিন শ্রীরামচন্দ্রের স্মৃতি এতদঞ্চলের লোকগণের চিত্তপট হইতে কদাপি বিদূরিত হইবে না।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সলেমানপুর কোটচাঁদপুরের একটী অংশ এবং এখানেও অনেক গুলি চিনির কারখানা আছে। শ্রীরামচন্দ্র, বাজারের অপরাপর ব্যবসায়ীগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া, এখানে এক দেবালয় নির্ম্মাণ করাইয়া, তাহাতে কালীদেবী ও ৺জগন্নাথের মূর্ত্তি স্থাপিত করেন এবং বাজারের সকল লোকের সমবেত সাহায্যে উক্ত দেবদেবীর নিত্য সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। সলেমানপুরে অনেক মুসলমানও বাস করিয়া থাকে। উহাদিগের ধর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য শ্রীরামচন্দ্র উক্ত সলেমানপুরে একটী মসিদ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এই মসিদটী দেখিতে বড় সুন্দর। ইহাতে মুসলমানগণ দলে দলে আসিয়া সেই অনাদি অনন্তদেবের ভজনা করিয়া থাকে।

শ্রীরামচন্দ্রের আর একটী কার্য্যও অতীব প্রশংসনীয় ও ভেদজ্ঞান বিরহিত নিঃস্বার্থতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। বহুকাল হইতে এখানে ৺ জগন্নাথ দেবের একখানি রথ ছিল। রথযাত্রাকালে, সেই রথোপলক্ষে বিলক্ষণ সমারোহও মেলা হইয়া থাকে। মেহেরপুর নিবাসী রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই রথের অধিকারী ছিলেন। কালক্রমে এই রথখানি এককালে ভগ্ন হইয়া যায় এবং উক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়েরা এককালে অত্যন্ত নিঃস্ব হইয়া পড়াতে সেই রথ খানির জীর্ণ সংস্কারের কোনও সম্ভাবনা থাকে না। রথখানির এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া, উদার শ্রীরামচন্দ্রের কোমল হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হয়। তজ্জন্য, শ্রীরামচন্দ্র নিজব্যয়ে এই রথ খানির জীর্ণ সংস্কার করাইয়া দিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় দিগের কৌলিক কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখেন। রথের সময়ে এখানে এক বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে; তাহাতে প্রতি বৎসর প্রায় ৫।৭ হাজার লোক সমাগত হয়।

তিনি বর্ষে বর্ষে দুর্গোৎসবাদিতে যেরূপ ব্রাহ্মণ ভোজনাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহা দেখিলে সকলেরই হৃদয় আহ্লাদে নাচিয়া উঠে এবং শ্রীরামচন্দ্রকে শতমুখে আশীর্ব্বাদ করিতে ইচ্ছা জন্মে। আজি কালি মাননীয়া বিনোদিনী দাসী দানালয় স্থাপন করিয়াছেন বটে, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র ইতিপূর্ব্বেই এককালে তিন সহস্র টাকা দান করিয়া দুঃস্থ প্রতিবেশীমণ্ডলীর অন্নাচ্ছাদনের সংস্থান করিয়া দিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন চিরস্থায়ী ফলের আশা নাই দেখিয়া তিনি তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, মাসিক দশ টাকা করিয়া দান করিতেন। এক্ষণে, উক্ত টাকা কোন এক সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীর আড়তে জমা হইতেছে; কিন্তু আশা করি, অচিরেই উহার কার্য্যারম্ভ হইবে।

স্বদেশের-স্বজাতির বা স্বজনের উন্নতি সাধনে সকলেই বদ্ধপরিকর হন। কিন্তু বিদেশে গিয়া, অজ্ঞাতকুলশীল হইয়াও, যাঁহাদিগের সাধু হৃদয় পরোপকার ব্রতে ব্রতী ও যত্নবান হয়, তাহাদিগের অন্তঃকরণই যথার্থ সাধু—যথার্থ মহান্ ও যথার্থ পরহিতচিকীর্ষু। দুর্ভাগ্যের পাদনিষ্পিষ্ট কুশদ্বীপের ভগ্ন সৌধস্তূপে আজিও যে এমন দুই একটী মহাপ্রাণের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাই কুশদ্বীপের অসারসম্বল শস্তমরুভূমির অতীব গৌরবের বিষয়। যাহা হউক, আমরা সেই অনাথনাথ ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, পুত্রপৌত্রাদি লইয়া, এই সকল, মহাপুরুষ দীর্ঘজীবী হইয়া, কুশদ্বীপের মলিন মুখচন্দ্র উজ্জ্বল করেন।

চৌগাছা।—কোটচাঁদপুরের ন্যায় চৌগাছাও কপোতাক্ষনদের উপর অবস্থিত। এখানে পাকা ও দলুয়া উভয় বিধ চিনিই প্রস্তুত হয়। আমরা এ স্থানের রপ্তানি সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা বলিতে পারি না, কিন্তু বোধ হয়, কোটচাঁদপুরের রীতি নীতি হইতে ইহার রীতি নীতি অন্যরূপ নহে। প্রেরয়িতব্য পণ্যের কিয়দংশ জলপথে প্রেরিত হয় এবং অবশিষ্ট অংশ কৃষ্ণগঞ্জ ষ্টেশন দিয়া কলিকাতায় আসিয়া থাকে। কলিকাতার গ্লাডষ্টোন ওয়ালী কোম্পানি সর্ব্বপ্রথমে এই স্থানে একটী চিনির কল স্থাপন করেন। এই কলে প্রত্যহ হাজার মণ চিনি প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু এখানে এরূপ

খর্জ্জুর বৃক্ষের অতি বিস্তৃত আবাদ করিয়াছিলেন; সেই জন্য, আজ কালি চৌগাছাকে যেন খর্জ্জুরবনবেষ্টিত বলিয়া সহসা প্রতীতি জন্মে। শুনিতে পাওয়া যায়, যে যখন প্রথমে এই গ্রামে কল সংস্থাপিত হয়, তখন গুড়ের ভাঁড় এখানে এক আনায় বিক্রীত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পরেই সেইরূপ ভাঁড় ছয় সাত আনায় বিক্রয় হইয়াছিল। তৎকালে এখানকার বাজারের ভূস্বামী, সমস্ত বাজার হইতে ১১৮ টাকা রাজস্ব আদায় করিতেন (সম্ভবতঃ প্রতি বিঘায় ৫৲ পাঁচ টাকা খাজনা পাইতেন); কিন্তু এক্ষণে ইহার প্রতি বিঘার খাজনা চল্লিশ টাকা হইয়াছে।

ঝিকারগাছা।—এই স্থান চৌগাছার আরও দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে চিনি প্রস্তুত অপেক্ষা গুড় বিক্রয়ই অধিক হইয়া থাকে। এই স্থানে তিন বা চারিটী মাত্র চিনির কারখানা আছে। ব্যবসায়ীরাই এই স্থানের অধিকাংশ গুড় ক্রয় করে এবং সেই সমস্ত গুড় শান্তিপুরে লইয়া গিয়া চিনি প্রস্তুত করে। যশোহরের এই অংশ রাজপথের উপর অবস্থিত বলিয়া, শান্তিপুরের পক্ষে ইহা সমধিক সুগম বলিয়া বোধ হয়।

যাদবপুর।—এই গ্রাম ঝিকারগাছার কিছু পশ্চিমাংশে অবস্থিত। এই স্থানে চিনি প্রস্তুত না হইয়া, ঝিকারগাছার ন্যায় শুদ্ধ গুড় উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং সেই সকল গুড় সাধারণতঃ শান্তিপুরে প্রেরিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এই স্থান গুড়ের একটী বিশাল হাটমাত্র। প্রতি সপ্তাহের সোমবারে ও শুক্রবারে এখানে হাট বসিয়া থাকে এবং এই প্রদেশের যাবদীয় চাষী উক্ত দুইবারে এখানে গুড় বিক্রয় করিবার জন্য, নিজ নিজ শ্রমোৎপন্ন গুড় লইয়া আইসে। ব্যাপারীরা আসিয়া সেই গুড় ক্রয় করে এবং শান্তিপুরে লইয়া যায়।

কেশবপুর।—চাষীর বাটীতে প্রস্তুত দলুয়া চিনি ক্রয় ও পাকা চিনি প্রস্তুত করাই এই স্থানের প্রধান কার্য্য। এইস্থানে যে দলুয়া প্রস্তুত হয়, তাহার প্রায় সমস্তই পূর্ব্বাঞ্চলে গমন করিয়া থাকে; শুদ্ধ কিয়দংশমাত্রে কলিকাতায় রপ্তানি হয়। কিন্তু সমস্ত পাকা চিনিই কলিকাতার বাজারে প্রেরিত হইয়া থাকে। অধিকাংশ স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, ক্রেতৃগণ কলিকাতা গদী-কর্তৃক নিয়োজিত প্রতিনিধি বা গোমস্তা। এই গোমস্তাগণ কেশবপুরের বে

রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিতি করে, তাহাকে কলিকাতাপটী' বলিয়া থাকে। কতিপয় বর্ষ পূর্ব্বে, কুশদ্বীপের অন্তর্গত খাঁটুরা ও গোবরডাঙ্গার তাম্বুলীগণই প্রধানতঃ এই চিনির কর্ম্মে ব্যাপৃত হইয়া কেশবপুরে গিয়া অবস্থিতি করিতেন এবং এই ব্যবসায় উপলক্ষে বিপুল বিভবশালী হইয়া কুশদ্বীপের মুখোজ্জ্বল করিতেন।

ইতিপূর্ব্বে যে গরপেটে চিনির কথা শুনাগিয়াছে, তাহা কেশবপুর হইতেই প্রেরিত হইত। পাঁচ রকম চিনি মিশ্রিত করিয়া এখানে এক প্রকার চিনি প্রস্তুত হইত এবং সেই চিনি বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর নাখোদা ও শেটীগণ মরিশশ প্রভৃতি দূরতর স্থানে প্রেরণ করিত; এই চিনিকেই গরপেটে চিনি বলিত। এই চিনির ব্যবসায়ে লাভ অত্যন্ত অধিক ছিল। কিন্তু এক্ষণে বিট ও মরিশশ চিনি আমদানি হইয়া এই গরপেটের কার্য্য এককালে বন্ধ হইয়াছে। আমাদিগের কুশদ্বীপের তাম্বুলীগণ এই ব্যবসায়ে যেমন বিচক্ষণ ও পরিপক্ক ছিলেন, তেমন আর কোন জাতিকেই দেখিতে পাওয়া যায় না। তৎকালে কেশবপুর ত্রিমোহিনীতে এককালে নোটের ব্যবহার ছিল না। সমস্ত কার্য্যই নগদ টাকায় নির্ব্বাহিত হইত। সেইজন্য কলিকাতার প্রধান আড়ত হইতে নগদ টাকা আরিন্দা দ্বারায় খাঁটুরা বা গোবরডাঙ্গায় ধনীর নিজ ভবনে প্রেরিত হইত। তথা হইতে কেশবপুর ও ত্রিমোহিনীতে পুনরায় আরিন্দা কর্ত্তৃক সেই সমস্ত টাকা প্রেরিত হইত। এইরূপে প্রতি সপ্তাহেই ৫।৭ টী আরিন্দা হইতে প্রায় ২০।৩০ জন পর্য্যন্ত আরিন্দা কেশবপুরেও ত্রিমোহিনীতে গমন করিত। যে সমস্ত মুটে টাকার তোড়া মাথায় করিয়া লইয়া যাইত, তাহাদিগকেই আরিন্দা কহে। তৎকালে এই আরিন্দা বা মুটিয়াগণও এই ব্যবসায়ের জন্য বিপুল পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হইত ও অপেক্ষাকৃত অনেক সুখ সচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পাইত। ফলতঃ বৈদেশিক চিনির আমদানি হইয়া যেমন এই ব্যবসায় এককালে নষ্ট হইয়াছে, তেমনই অনেকেরই অন্নের সংস্থান চিরদিনের জন্য উঠিয়া গিয়াছে।

নদী পথেই কেশবপুরের রপ্তানি কার্য্য সম্পন্ন হইত; অথবা যাবতীয় পণ্য গোযানযোগে ত্রিমোহিনীতে আনীত হইত, এবং তথা হইতে পুনরায় নদী পথে উহা কলিকাতায় আসিত।

কেশবপুরে একটী সুবৃহৎ কুমারের কারখানা আছে। চিনি প্রস্তুত করিবার জন্য, যে সমস্ত মৃণ্ময় পাত্রের আবশ্যক হয়, এই স্থান হইতেই তাহা সংগৃহীত হইয়া থাকে। চিনি-প্রধান অঞ্চলের যাবতীয় স্থান অপেক্ষা কেশবপুরে একটী বিশেষ সুবিধা দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থান সুন্দরবনের অতি নিকটবর্ত্তী। ভদ্রা নদী এই স্থান হইতে অতি সরলভাবে গিয়া, বন প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই নদী দ্বারা বন্য-ইন্ধনরাশি, চিনি প্রস্তুত হইবার জন্য, এখানে আনীত হয়। এইরূপ নানাবিধ কারণেই এই স্থানে চিনি প্রস্তুত হইবার বিলক্ষণ সুবিধা থাকে এবং এই স্থান কোটচাঁদপুরের নিম্নেই স্থান লাভ করিয়াছে।

কেশবপুর, ত্রিমোহিনী, কুশডাঙ্গা ও বরণ ডালি এই কয়টী স্থান হইতেই প্রধানতঃ গরপেটে চিনির আমদানি হইত এবং এই সকল স্থানেই কুশদ্বীপের নিম্নলিখিত খ্যাতনামা ব্যবসায়ীগণের কারখানা ছিল। এই সকল স্থানকে উক্ত ব্যবসায়ীগণ সচরাচর 'মোকাম' বলিতেন। প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীগণের নাম। যথা;—

১।	খাঁটুরা	নিবাসী	কালীকুমার দত্ত।
২।	„	„	রামজীবন আশ।
৩।	„	„	বৈদ্যনাথ দত্ত।
৪।	„	„	গোলকচন্দ্র দত্ত।
৫।	„	„	কেদারনাথ পাল।
৬।	„	„	রামতারণ রক্ষিত।
৭।	„	„	পুরুষোত্তম আশ।
৮।	„	„	কালীবর পাল।
৯।	হয়দাদপুর	„	রামচন্দ্র কোঁচ।
১০।	„	„	গোপালচন্দ্র রক্ষিত।
১১।	গোবরডাঙ্গা	„	হারাণচন্দ্র কুণ্ডু।

ত্রিমোহিনী।—ত্রিমোহিনী, কেশবপুরের এক প্রকার সদর আড্ডা বলিয়া বিখ্যাত। কারণ, এখানে যে সকল মহাজনের গোমস্তা আছে, কেশবপুরেও তাঁহাদিগেরই গোমস্তা দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে মহাজনগণ চিনি ক্রয় করেন এই মাত্র; নতুবা, এখানে চিনি প্রস্তুত হয় না। চাসীরা যে গুলমা

চিনি প্রস্তুত করে, এবং উহার চতুঃপার্শ্বস্থ কারখানা সকলে যাহা প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং ঝিঁকারগাছাতে ও তৎসন্নিহিত স্থানেও যে চিনি প্রস্তুত হয়, সে সমস্ত চিনিই এখানে কেনা হইয়া থাকে এবং সেই সমস্ত চিনিই নদী পথে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে রপ্তানি হয়।

৭ টালা।—এই স্থান আরও দক্ষিণাংশে অবস্থিত; ইহাও চিনির অপর একটী প্রধান হাট এবং কেশবপুরের সহিত বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট।

মনিরামপুর।—এই স্থানে দুই তিনটী চিনির কুঠী আছে; কিন্তু স্থানীয় অভাব পরিপূরণ ব্যতীত এখানকার চিনিতে অপর কোনও কার্য্য সাধিত হয় না।

খাজুরা।—এখানকার চিনির ব্যবসা ও অতীব সুবিস্তৃত। খর্জ্জুর শব্দ হইতেই এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে। আমরা এই স্থানের বিশেষ বিবরণ অবগত নহি। তবে, আমাদিগের বিশ্বাস, এই স্থানের উৎপন্ন পণ্যজাত নলছিটি ও বাখরগঞ্জে প্রেরিত হয়।

কালিগঞ্জ।—খাজুরা যে নদীর উপর অবস্থিত, কালিগঞ্জ ও সেই নদীর উপরে, আরও কিছু দক্ষিণাংশে অবস্থিত। ইহা কোটচাঁদপুর হইতে আট মাইল দূরবর্ত্তী। যে চিনি কোটচাঁদপুর হইতে নলছিটিতে রপ্তানি হইয়া থাকে, সে সমস্ত চিনি এই স্থানেই নৌকা বোঝাই হইয়া থাকে। নিজ কালিগঞ্জে অধিক চিনি প্রস্তুত হয় না। কিন্তু ইহার চতুর্দ্দিকস্থ কোন কোন গ্রামে দুই চারিটী কারখানা দেখিতে পাওয়া যায়। সিঙ্গিয়া, ফরাশপুর প্রভৃতি স্থান সকলই তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। এই স্থানে যত চিনি প্রস্তুত হয়, সে সমস্তই নলছিটি ও ঝালকাটিতে রপ্তানি হয়।

কালেক্টর সাহেব লিখিয়াছেন যে, নিজ চিনিপ্রধান অঞ্চলে যে সকল বিখ্যাত হাট আছে, আমি একে একে সেই সমস্তেরই বিশদ বিবরণ প্রদান করিয়াছি। শুদ্ধ মাত্র, যশোহরের নিকটবর্ত্তী রাসন্তিয়া, রূপদিয়া, বাজহাট প্রভৃতি স্থানেরই কোনও উল্লেখ করিতে পারি নাই। এই সকল স্থান ও নারিকেলবেড়িয়া প্রভৃতি গ্রাম পরীক্ষা করিবার কোনও সুযোগ প্রাপ্ত হই নাই। তবে আমার বিশ্বাস, ঐ সকল স্থানের উৎপন্ন পণ্যও নলছিটি ও ঝাল-

চিনিপ্রধান অঞ্চলের বহির্ভাগস্থ যে সকল স্থানে চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে, আমরা এ পর্য্যন্ত সেই সকল স্থানের বিন্দুমাত্র বিবরণও প্রদান করি নাই। প্রথমতঃ যে পথ ঝিনাইদহ ও মাগুরার মধ্য দিয়া গমন করিয়াছে, সেই পথ এক বিস্তীর্ণ খর্জ্জুর প্রসবিনী ভূমির অন্তর্ব্বর্ত্তী। এই অঞ্চলের কোনও স্থানে কোন নিয়মিত চিনির কারখানা দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহাও আছে, তাহাও ক্ষুদ্র ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। এই পথের উপর অবস্থিত এবং মাগুরা হইতে চারি মাইল দূরবর্ত্তী ইছাকাদা নামক একটী গ্রাম আছে। এই গ্রামের হাটে অনেক গুড় বিক্রয় হয়। চাসীরা প্রত্যেক মঙ্গল ও শুক্রবারের হাটে এখানে অনেক গুড় আনয়ন করে এবং এখানকার কারখানার অধিকারিগণকে সেই সকল বিক্রয় করিয়া যায়। এখানকার উৎপন্ন কিয়দংশ গুড়, মাগুরা হইতে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী বিনোদপুর নামক স্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে। এই স্থানেও দুই একটী কারখানা আছে; সেই সকল কারখানাতে এই সমস্ত গুড় চিনি হইয়া থাকে। বিনোদপুরের চিনিও নলছিটে রপ্তানি হয়। ইহার আরও পূর্ব্ববর্ত্তী মহম্মদপুর নামক গ্রামেও অল্প পরিমাণে চিনি প্রস্তুত হয়। এই চিনিও নলছিটে প্রেরিত হয়।

নড়াইল।—নড়াইল বিভাগ প্রধানতঃ অতি নিম্নভূমির উপর অবস্থিত। খর্জ্জুর আবাদের জন্য যেরূপ উচ্চ ভূমির প্রয়োজন, এতদঞ্চলে তাহা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই স্থানের সন্নিহিত লোহাগড়া নামক স্থানে কতকগুলি চিনির কারখানা আছে বটে, লোহাগড়াতে কতকগুলি খর্জ্জুর বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে, কিন্তু ভূমি নিতান্ত নিম্ন বলিয়া, সেই সকলে আদৌ রস নিঃসারিত হব না। আবার, লোহাগড়ার নিকটবর্ত্তী স্থান সকল হইতেও গুড় উৎপন্ন হয়। যে সকল স্থানে সাধারণতঃ উত্তমরূপে খর্জ্জুরের চাস হইয়া থাকে, সেই সকল স্থানে ধান্য জন্মে না। সুতরাং যখন লোহাগড়া অপেক্ষাকৃত নিম্ন ভূমি, তখন নিশ্চয়ই ইহাতে কিছু পরিমাণে ধান্য জন্মিয়া থাকে। সেই ধান্য রাশি নৌকাযোগে খাজুরা ও অন্যান্য স্থানে আসিয়া থাকে। আবার, সেই সকল নৌকা লোহাগড়ায় ফিরিয়া যাইবার সময় গুড় বোঝাই লইয়া যায়। এইরূপে, লোহাগড়াতে যে অল্প পরিমাণে গুড়ের অভাব হয়, তাহা এইরূপে

কাংশই পাকা এবং উহা প্রধানতঃ কলিকাতাতেই রপ্তানি হইয়া থাকে। কিন্তু উহার কিয়দংশ বাখরগঞ্জেও গিয়া থাকে।

চিনিপণ্যজীবি ব্যবসায়ী।—যে সকল ব্যক্তি প্রধানতঃ চিনির রপ্তানি কার্য্য সাধন করিয়া থাকে, তাহাদিগের সম্বন্ধে দুই একটী বলা একান্ত আবশ্যক। কারখানার অধিকাংশ অধিকারী, রপ্তানি দিবার জন্যই, চিনি ক্রয় করিয়া থাকে। চিনি রপ্তানি দিবার জন্য, বৃহৎ বৃহৎ কারখানার অধিকারিগণ যে গুড় বা চিনি ক্রয় করে, তাহা তাহারা স্থানীয় মহাজনগণের নিকট অধিক লাভ পাইলেও, বিক্রয় করে না। উহারা স্থানীয় চিনি ক্রয় করিয়া, স্বীয় কারখানায় প্রস্তুত চিনির সহিত এক যোগে রপ্তানি দিয়া থাকে। এই রূপ, চিনি ক্রয় করিয়া রপ্তানি দেওয়াও, একটী পৃথক্ ব্যবসারূপে পরিগণিত হয়। বিশেষতঃ কেশবপুর ত্রিমোহিনীতে আমাদিগের কুশদ্বীপবাসী এমন অনেক তাম্বুলী ব্যবসায়ী আছেন যে, তাঁহারা স্থানীয় চিনিই ক্রয় করেন এবং সেই চিনি কলিকাতায় প্রেরণ করিয়া নিজেই লাভালাভ গ্রহণ করেন। কিন্তু এরূপ ব্যবসায়ীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প। চিনি ক্রয়কারী ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই কলিকাতা গদী কর্ত্তৃক নিয়োজিত গোমস্তা। দেশীয় বাণিজ্যের প্রথানুসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন গদী অথবা কোন গদীর অংশীদারগণ কৃত অপর গদীর নানা স্থানের শাখা গদী বা দোকান থাকে, এবং ভিন্ন ভিন্ন গোমস্তা দ্বারা প্রত্যেক স্থানের কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে এবং সকল স্থানের পণ্যই কলিকাতার বৃহৎ গদীতে প্রেরিত হয়। এইরূপে প্রত্যেক বৃহৎ মহাজনেরই ৪।৫টী মোকাম ও কলিকাতায় একটী বৃহৎ গদী দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থলে, গোমস্তাগণের সম্বন্ধেও দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। পূর্ব্বে যাহারা গোমস্তা পদে অভিষিক্ত হইয়া, মোকামে গমন করিতেন, তাঁহাদিগের বার্ষিক বেতন তিন চারি শত টাকার অধিক ছিল না; কিন্তু তাঁহারা এই বেতন ব্যতীত, গদী হইতে পাচক ব্রাহ্মণ, ভৃত্য ও আহারাদি পর্য্যন্ত সমস্তই প্রাপ্ত হইতেন এবং মোকামে গিয়া মহাড়ম্বরে অবস্থিতি করিতেন। তাঁহাদের অবস্থানের রীতি নীতি দেখিলেই, যেন তাঁহাদিগকে নবাব সিরাজউদ্দৌলার দৌহিত্র বলিয়া প্রতীতি জন্মিত। এই গোমস্তাগণকে সাধারণে

ভৃত্য শশব্যস্তে তামাকু সাজিয়া দিয়া, সত্বরে পায়খানায় জল দিয়া আসিত ;—কর্ত্তা সেই তামাক-কলিকা (হয়ত, ইহার পরেও আরও দুই তিন কলিকা) উত্তম রূপে ভস্মসাৎ করিতেন,—পরে পায়খানায় যাইতেন ; এদিকে ভৃত্য মুখ প্রক্ষালনের দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করিয়া, অপর, এক ভৃঙ্গারে জল লইয়া পায়খানার পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিত ;—কর্ত্তা পায়খানা হইতে বহির্গত হইলেই, ভৃত্য কর্ত্তার হস্তে খানিক মৃত্তিকা প্রদান করিত, এবং নিজে কর্ত্তার হস্তে জল ঢালিয়া দিত। এইরূপে, কর্ত্তার শৌচ ও মুখ প্রক্ষালনাদি কার্য্য শেষ হইলে, কর্ত্তা কিয়ৎকাল বাজারের কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, পরে, স্নানাহারের সময় হইত। তখন কর্ত্তা, একটী মন্দোদরী ও এক তাকিয়া লইয়া সর্ব্বাবয়বে সেই মন্দোদরীর উপর পতিত হইতেন ; এদিকে, ভৃত্য সুবাসিত তৈল আনিয়া কর্ত্তার সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিত। পরে, ভৃত্য কর্ত্তাকে স্নান করাইয়া দিলে, ব্রাহ্মণ ঠাকুর, শাক সূপ প্রভৃতি ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া কর্ত্তার আহারের যোগাড় করিয়া দিত। আহারান্তে কর্ত্তা পুনরায় তামাক সেবন ও তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইতেন। গাত্রোত্থান করিয়া কর্ত্তা পুনরায় হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করিতেন এবং পুনরায় বাজারের কর্ম্মে মনোনিবেশ করিতেন। গোমস্তা মাত্রেই এইরূপ আড়ম্বরে ছয় মাস মোকামে ও ছয় মাস স্বদেশে অবস্থিতি করিতেন। ফলতঃ আমরা দেখিয়াছি, যাঁহারা গোমস্তা পদে অভিষিক্ত হইয়া মোকামে যাইতেন, তাঁহারা যেরূপ লম্বোদর ও সুস্থকায় হইয়া প্রত্যাগত হইতেন, বাটীতে অবস্থানকালে সেরূপ হইতেন না।

মোকামে গোমস্তাগণের এইরূপ মহাড়ম্বরে অবস্থান, দেশীয় বাণিজ্য-নীতির অন্যতম কূট-রহস্য। কিন্তু বলিয়া রাখা আবশ্যক, এই গোমস্তাগণই ধনীর ভাগ্যনেমীর প্রথম পরিচালক। ইহাদিগের দক্ষতা ও বিচক্ষণতা প্রভাবেই ধনীর কারবার উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিত। ইহাদিগের কেহই এল এ, বিএ, এম এ, বা ষ্টুডেণ্টসিপ্ পাশ করিয়া বা বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া, পাশ্চাত্য শিক্ষার আদ্য শ্রাদ্ধ করিয়া, গোমস্তা পদে অভিষিক্ত হইতেন না ; এমন কি অনেকে নিরক্ষর ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি

পণ করিয়াও ধনীর স্বার্থ বাঁচাইতেন। তাহাতেই ধনীর যথেষ্ট লাভ হইত. এবং কারবারও অতি অল্প দিনের মধ্যে সমৃদ্ধি পূর্ণ হইত। কুশদ্বীপের এই তাম্বুলীগণ অন্য কিছু জানুন বা নাই জানুন, "কেনার মুখেই ব্যবসা" এই নীতি টুকুর যাথার্থ্য অতি সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং আমরণ এই নীতির বিরুদ্ধে কদাপি কার্য্য করেন নাই। সুতরাং ইঁহাদিগের দক্ষতায় যে ব্যবসার উন্নতি হইবে না, ইহা কে বলিতে পারে? এতদ্ভিন্ন ইঁহারা কলিকাতার বাজার দর প্রতি মুহূর্ত্তেই নখদর্পণে রাখিয়া দিতেন; সেই দরের সহিত স্থানীয় বাজার দর তুলনা করিয়া, যদি ধনীর স্বার্থ দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে ধনীর বিনা অনুমতিতেও মাল খরিদ করিতেন ও কলিকাতায় সেই মাল রপ্তানি করিতেন। ইঁহাদের দক্ষতা প্রভাবে তাহাতে অধিকাংশ স্থলেই ধনী বিপুল লাভ পাইতেন। সুতরাং এই ব্যবসায়ে ইঁহারাই ধনীর দক্ষিণ ও বাম হস্ত স্বরূপ ছিলেন। এবং ইঁহাদের যত্ন, পরিশ্রম ও যোগ্যতার উপরে ব্যবসায়ের যাবতীয় লাভালাভ নির্ভর করিত।

চিটাগুড়।—চিনি প্রস্তুত হইলে, যে মাৎ বা চিটা অবশিষ্ট থাকে, তাহা কোন্ কার্য্যে প্রয়োজন হয়, আমরা এ পর্য্যন্ত তাহার কোনও উল্লেখ করি নাই। ইহার কিয়দংশ তামাকের সহিত মিশ্রিত করিয়া, স্থানীয় লোকের ধূমপানের জন্য ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট অধিকাংশ কলিকাতা, নলছিটি ও সিরাজগঞ্জে প্রেরিত হইয়া থাকে। তৎপরে যে ইহার পরিণাম কি হয়, আমরা তাহা বলিতে পারি না। ইহা দ্বারা রম সুরা প্রস্তুত করিবার জন্য, তাহির-পুরে দুই একবার চেষ্টা করা হইয়াছিল; এজন্য তথায় একটী চিনির কুঠী ও রম সুরার ভাঁটিতে পরিণত হইয়াছিল। সেই সময়ে যে চেষ্টা করা হইয়াছিল, তাহাতে তাদৃশ ফল লাভ হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে উহা যে কিরূপে এই কার্য্যের উপযোগী হইয়াছে, আমরা তাহা বিশেষরূপে অবগত নহি। ফলতঃ দেশীয় সুরা প্রস্তুতকালে ইহা যে ভাঁটিতে নিত্য প্রয়োজন হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা প্রস্তুতকালেও এই চিটা ব্যবহৃত হয় এবং ইহা দ্বারা অট্টালিকার দৃঢ়তাও বিশেষরূপে সাধিত হইয়া থাকে।

চিনির ব্যবসায়ে ফলাফল।—যশোহরের কলেক্টর সাহেব লিখিয়াছেন যে,

দেখাইয়াছি, তাহাতে অনায়াসেই উপলব্ধি হইবে যে, এই ব্যবসা দ্বারা কিরূপ ধনাগমের সম্ভাবনা।

খর্জ্জুর বৃক্ষের আবাদে অতি অল্প মাত্র পরিশ্রমের প্রয়োজন;—উহাতে যে আয় হইয়া থাকে, তাহাও আশানুরূপ;—আবার ইহাতে যে পরিশ্রম ও শিল্প নৈপুণ্য প্রয়োজন, তাহাও বহু সংখ্যক কৃষিজীবীর অনায়াস সাধ্য। আমরা মোটামোটি গণনা করিয়া দেখিয়াছি যে, এক যশোহর জেলাতেই প্রায় চারি লক্ষ মণ চিনি প্রস্তুত হয়; উহার মূল্য অন্যূন ২৫ বা ৩০ লক্ষ টাকা। আমারও ধ্রুব বিশ্বাস, এই গণনা কদাপি ভ্রান্তি-মূলক নহে। সার্টিফিকেট ট্যাক্স বৎসরে কারখানার অধিকারিগণের ৩,২৪,০০০ টাকা আয়ের উপর ট্যাক্স নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে আবার যাহাদিগের উপর কলিকাতায় ট্যাক্স ধার্য্য হইয়াছিল এবং যে সকল কারখানায় অধিকারীর পাঁচ শত টাকা আয় ছিল না, তাহারা এই ট্যাক্সের দায় হইতে নিস্কৃতি লাভ করিয়াছিল। সমস্ত ব্যবসায়ে যাবদীয় কৃষিজীবী ও ব্যবসায়ী যে লাভ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আমার বিশ্বাস যে, তাহা কোন রূপেই ছয় লক্ষ টাকার ন্যূন নহে। চিনির ব্যবসায়ে ব্যাপৃত কৃষক, গৃহস্থ, এমন কি মুটিয়া পর্য্যন্ত যে স্বচ্ছন্দ্য ও শান্তি উপভোগ করে, তাহা একবার স্থিরচিত্তে পর্য্যালোচনা করিলে, চিনি প্রধান অঞ্চলের সংস্থান ও সাচ্ছল্য অনায়াসেই উপলব্ধি হইতে পারে।" এই কথা গুলি লিপি-বদ্ধ করিয়াই, যশোহরের কলেক্টার ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব তদীয় প্রস্তাবের উপ-সংহার করিয়াছেন।

ইক্ষু চিনি।—ইক্ষু হইতে রস নিষ্পেষণ করিয়া লইয়াও চিনি প্রস্তুত হয়। কিন্তু অধিক ব্যয়সাধ্য বলিয়া এই কার্য্য বিস্তৃতভাবে সাধন করা নিতান্ত দুষ্কর এবং ইহাতে যে চিনি প্রস্তুত হয়, তাহাতেও বিশেষ সন্তোষপ্রদ লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই।

বস্ত্র বয়ন, নীল প্রস্তুতকরণ ও চিনি প্রস্তুতকরণ ব্যতীত, কুশদ্বীপে আরও বহুবিধ শিল্প ও বাণিজ্য কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। শুদ্ধ স্থানীয় লোকের ব্যবহার ভিন্ন, তদ্দ্বারা অন্য কোনও উপকার সাধিত হয় না। সেই জন্য আমরা সেই সকল কার্য্যের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান না করিয়া শুদ্ধ উহাদিগের

কুম্ভকার বা কুমার বৃত্তি—দেশীয় লোকের নিত্য ব্যবহারের জন্ত মৃণ্ময় পাত্র সকলের বিশেষ প্রয়োজন হয়। গুড় ও চিটা রাখিবার জন্ত অনেক ভাঁড়, কলসী ও জালারও আবশ্যক হয়; এই সমস্তই কুম্ভকারেরা প্রস্তুত করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন যে সমস্ত পুত্তল, প্রতিমা ও মৃণ্ময় খেলানা দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সকলও কুম্ভকারেরা প্রস্তুত করিয়া থাকে। কুশদ্বীপের স্থানে স্থানে দুই এক ঘর কুম্ভকার বাস করে। তাহারাই উক্ত মৃণ্ময় পাত্রাদি প্রস্তুত করিয়া বাজারে বিক্রয় করে। শিহুলীরাও ইহাদিগের নিকট হইতে ভাঁড় কিনিয়া লইয়া যায়। কুশদ্বীপের মধ্যে ত্রিপুল নামুক স্থানেই এই ব্যবসায়ের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

পটুয়া-বৃত্তি।—পটুয়ারা মৃন্ময় পাত্র ও নানা প্রকার গঠন বহুবর্ণে চিত্রিত করিয়া থাকে। পূর্ব্বে কৃষ্ণ নগরেই এই কার্য্য অতি উত্তমরূপে সাধিত হইত। কৃষ্ণ নগরের কুম্ভকার ও পটুয়াগণের নিকট শিক্ষা করিয়া, কুশদ্বীপের পটুয়ারাও এই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু কুশদ্বীপ বা কৃষ্ণনগরে এই ব্যবসায়ের কোনও বিস্তৃত কারখানা দেখিতে পাওয়া যায় না। কৃষ্ণনগরের কুম্ভকার ও পটুয়াগণ কৃত চিত্রিত মৃণ্ময় গঠন ও পুত্তলাদি লণ্ডন ও পারিস সহরের মেলায় প্রেরিত হইয়াছিল এবং সেই সেই কার্য্যের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত উঁহার নির্ম্মাতাগণ স্বুবর্ণ ও রৌপ্য পদক পুরস্কার পাইয়াছিল।

কাঁসারি বৃত্তি।—কাঁসারিরা পিত্তল ও তাঁমার গঠন প্রস্তুত করে। কলিকাতা, মেহেরপুর ও নবদ্বীপ, এই তিন স্থানে এই ব্যবসা অতি বিস্তৃতভাবে প্রচলিত আছে। কুশদ্বীপে যদিও কোন কোন কাঁসারি তৈজস দ্রব্য প্রস্তুত করে সত্য, কিন্তু এখানে কাহারই এই কার্য্যের বিস্তীর্ণ কারখানা নাই। তবে এখানকার অনেকেই পিত্তলাদি তৈজস দ্রব্যের ফেরী, দোকান ও বিনিময় সাধন করিয়া স্ব স্ব জীবিকা নির্ব্বাহ করে; কাযেই শেষোক্ত কার্য্য বহুলরূপে সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়।

উল্লিখিত শিল্প ও বাণিজ্য কার্য্য ব্যতীত আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসা কুশদ্বীপে দৃষ্টিগোচর হয়। যদিও কুশদ্বীপবাসিগণ অতি বিস্তৃতভাবে সেই সকল ব্যবসায়ের অনুসরণ করে না; কিন্তু অনেকেই সেই সকল কার্য্য অবলম্বন করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে। তজ্জন্য আমরা নিম্নে

সেই সকল কার্য্যের নাম নির্দ্দেশ করিলাম। যথা; (১) নীলগাঁজনকারী কারিকর; (২) লাক্ষাজীবী; (৩) স্থপতি; (৪) করাতী; (৫) শকট-নির্ম্মাণকারী মিস্ত্রী; (৬) নৌকাগঠনকারী মিস্ত্রী; (৭) টিন শিল্পী; (৮) জহুরী; (৯) ঝুড়ি, চুবড়ী নির্ম্মাণকারী শিল্পী; (১০) মালী বা মালাকর; (১১) শাঁকারী (১২) ঝালাকর; (১৩) ছত্রনির্ম্মাণকারী কারিকর; (১৪) চিনিপ্রস্তুতকারী কারিকর; (১৫) ছুতার মিস্ত্রী; (১৬) চিত্রকর ও পটুয়া; (১৭) পালকীপ্রস্তুতকারী মিস্ত্রী; (১৮) কলাইকারী কারিকর; (১৯) ঘটিকা প্রস্তুতকারী কারিকর; (২০) মাদুরপাটী নির্ম্মাণকারী কারিকর) (২১) চাবুক প্রস্তুতকারী কারিকর; (২২) হুকাও হুকার নলিচা প্রস্তুতকারী কারিকর; (২৩) বেতের দ্রব্য প্রস্তুতকারী কারিকর; (২৪) শালও বনাত সংস্কারক ও পরিষ্কারক; (২৫) দর্জ্জি; (২৬); থলি প্রস্তুতকারী কারিকর; (২৭) কম্বল প্রস্তুতকারী কারিকর; (২৮) মেদব্যবসায়ী; (২৯) ঘরামি; (৩০) কূপখনক; (৩১) স্বর্ণকার; (৩২) কর্ম্মকার; (৩৩) পাখাপ্রস্তুত-কারী কারিকর; (৩৪) খেলনা প্রস্তুতকারী কারিকর; (৩৫) গিল্টিকারক; (৩৬) গালিচা প্রস্তুতকারী কারিকর; (৩৭) চর্ম্মকার; (৩৮) জালপ্রস্তুত-কারী কারিকর; (৩৯) রেশম পরিষ্কারক কারিকর; (৪০) ন্যায়রা।

কুশদ্বীপের জাতিবিভাগ প্রবন্ধে আমরা এই শেষোক্ত জাতির বিবরণ প্রকাশ করি নাই। ফলতঃ ইহারা মুষলমান ধর্ম্মাবলম্বী। স্বর্ণকারের দোকানে প্রত্যহ যে আবর্জ্জনা জমিয়া থাকে, ইহারা স্বর্ণকারের নিকট হইতে সেই আবর্জ্জনারাশি ক্রয় করে এবং তাহা পরিষ্কার ও বিশোধিত করিয়া স্বর্ণ, রৌপ্য বাহির করে। স্বর্ণ ও রৌপ্য ও ইহারা বিশুদ্ধ করিয়া থাকে। ইতি-পূর্ব্বে কুশদ্বীপে এই জাতি অনেক ছিল। কিন্তু আজি কালি ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইয়া আসিয়াছে। ইহাদের অবস্থা জঘন্য।

পণ্যদ্রব্য।—কুশদ্বীপের পণ্যদ্রব্যের মধ্যে, নীল, চিনি, লঙ্কা, হরিদ্রা, পাট, তিসী ও তামাক প্রধান। অল্প পরিমাণে হউক, কি অধিক পরিমাণেই হউক, শস্য, পিতলবাসন, ও তুলার কাপড় এখান হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল দ্রব্য এত অধিক পরিমাণে বিদেশে প্রেরিত হয় না যে, সেই

একটী দ্রব্যও উল্লেখযোগ্য। এখানকার পৈতা এরূপ উৎকৃষ্ট ও সূক্ষ্ম যে একটী বড় এলাচের খোসার মধ্যে ১২টী প্রমাণ ত্রিদণ্ডী হইতে পারে, এমন একটী পৈতা রাখিতে পারা যায়। এখানে কাপড়, পাথরিয়া কয়লা, শালকাষ্ঠ, লবণ, ছত্র, জুতা, চাউল, গুবাক এবং নানাবিধ মসলা ও সুগন্ধি দ্রব্য আমদানি হইয়া থাকে।

প্রধান বাণিজ্য স্থান।—কুশদ্বীপের মধ্যে কোন সুপ্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে, গোবরডাঙ্গা অপেক্ষাকৃত প্রধান ও বিখ্যাত এবং চাহুড়িয়া, বাহুড়িয়া, গোপালনগর ও কলিকাতার সহিত ইহার বিশেষ সংঘর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল স্থান হইতে অনেক বাণিজ্য দ্রব্যও এখানে আসিয়া বিক্রীত হয়। আজি কালি রেলপথের সুবিধা হওয়াতে, কলিকাতাই ইহার আমদানি ও রপ্তানির কেন্দ্রভূমি হইয়াছে। তবে, নানাবিধ ভূষিদ্রব্য, ও লঙ্কা হরিদ্রা প্রভৃতি কয়েকটী পণ্য পূর্ব্বোক্ত স্থান সকল হইতে আসিয়া থাকে এবং যাবদীয় খর্জ্জুর গুড় চাঁহুড়িয়ার হাট হইতে ক্রীত হয়। ফলতঃ সমস্ত আমদানি ও রপ্তানি কার্য্য চিরপ্রবাহমান হাট দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। মেলা মহোৎসব সকলও সময়ে সময়ে এইরূপ বাণিজ্যকার্য্যের বিশেষ সহায় হইয়া থাকে। এবং আমরা ইতিপূর্ব্বে যে সমস্ত মেলা মহোৎসবের কথা বলিয়া আসিয়াছি, সেই সকলে যেমন কিয়ৎ পরিমাণে ধর্ম্মের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনই ইহাতে বাণিজ্য কার্য্যের প্রকৃতিও বহুল পরিমাণে লক্ষিত হয়। নীল চিনি ব্যতীত আর আর যাবদীয় সামগ্রী দেশীয় সমগ্র অভাব পরিপূরণ করিয়া উদ্বর্ত্ত হয় না; সুতরাং সেই সকল দ্রব্য বিদেশে প্রেরয়িতব্য পণ্যরূপেও পরিগণিত হয় না।

মূলধন ও সুদ।—বাণিজ্য, শিল্প, তেজারতীকার্য্য, ও ভূমি ক্রয়ের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। এতদঞ্চলের সচরাচর সুদের হার নিম্নে লিখিত হইতেছে। সামান্য সামান্য ঋণ ব্যাপারে, যখন অধমর্ণ কোন বস্ত্র বা তৈজসাদি বন্ধক রাখিয়া কুড়ি, টাকা পর্য্যন্ত ঋণ করে, তখন প্রতি টাকায় মাসিক এক আনার হিসাবে বা শতকরা ৬।০ হিসাবে সুদ দিয়া থাকে। কিন্তু স্বর্ণ বা রৌপ্যালঙ্কার রাখিয়া টাকা কর্জ্জ লইলে, চব্বিশ টাকা পর্য্যন্ত সচরাচর এক পয়সা বা শত করা, ১৸৴০ হিসাবে সুদ লাগিয়া থাকে। কিন্তু স্বর্ণ

বা রৌপ্যালঙ্কার রাখিয়া, শতকরা হিসাবে ঋণ গ্রহণ করিলে পঁচিশ টাকা হইতে এক শত টাকা পর্য্যন্ত শতকরা এক টাকার হিসাবে সুদ লাগিয়া থাকে। কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ ঋণ ব্যাপারে, অথবা যখন কোন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী টাকা কর্জ্জ করেন, তখন শতকরা আট আনা হইতে এক টাকা পর্য্যন্ত সুদ দিয়া থাকেন। কোন কোন স্থলে জমি বা পাকা বাটী রাখিয়া, ঋণ গ্রহণ করিবার সময়ে শতকরা ১২ টাকা হইতে কুড়ি টাকা পর্য্যন্ত সুদ হইয়া থাকে।

তেজারতী কার্য্য। তেজারতী কার্য্যে কৃষকেরা যখন উত্তমর্ণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে, তখন সচরাচর টাকায় দুই পয়সা অথবা শতকরা বার্ষিক ৩৭৷৷০ সাড়ে সাইত্রিশ টাকার হিসাবে সুদ দিয়া থাকে। কিন্তু ঈদৃশ স্থলে মূলধন কুড়ি টাকার অধিক হইলে, শতকরা বার্ষিক চব্বিশ টাকার হিসাবে সুদ ধার্য্য হইয়া থাকে। তেজারতী ব্যাপারে যখন কৃষকেরা ফসলের বন্দোবস্ত করিয়া, ধান্যাদি শস্য ঋণ গ্রহণ করে, তখন তাহারা মূলধন বা মূল-শস্যের দেড় বা সওয়া গুণ হিসাবে সুদ দিয়া থাকে। এই সুদকে বাড়ি বা বৃদ্ধি কহে এবং এইরূপ উত্তমর্ণকে মহাজন, অধমর্ণকে খাতক ও এই রূপ সুদগ্রহণ ব্যবসাকে তেজারতী কারবার কহে। কুশদ্বীপের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ও সৎশূদ্র এইরূপ তেজারতী কারবার করিয়া, বিপুল বিভব-শালী হইয়াছেন। অর্দ্ধশতাব্দীর কিছু পূর্ব্বে, ইহাই সাধারণের আহা-রাচ্ছাদনের এক প্রকার উপায় ছিল। মহাজনেরা টাকা ও শস্য উভয়ই কর্জ্জ দিয়া থাকেন। নিজ গ্রামেই হউক অথবা পর গ্রামেই হউক, প্রধান প্রধান মহাজন দিগের এক একটী গোলাবাড়ী থাকে। তাঁহারা সেই স্থানে অবস্থিতি করিয়াই, তেজারতী কর্ম্ম সমাধা করিয়া থাকেন। আমাদিগের কুশদ্বীপের পূর্ব্বতন তাম্বুলীগণের প্রধানতঃ ইহাই উপজীবিকা ছিল। খাঁটুরা গোবরডাঙ্গা হইতে বহুদূরবর্ত্তী পল্লীগ্রাম সকলে তাঁহাদিগের পৃথক পৃথক গোলাবাড়ী ছিল। উহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ এই তেজারতী কারবার উপলক্ষে, কোন কোন স্থানে এক একটী নূতন গ্রামও পত্তন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের নামানুসারে সেই সেই গ্রামের নামকরণ হইয়াছে। কাহিনীর ক্রম বিস্তারে পাঠকগণ তাহা জানিতে পারিবেন।

পীড়াদি।—কুশদ্বীপের প্রবহমান সাধারণ পীড়া, নবজ্বর, পালাজ্বর, বসন্ত, উদরাময়, রক্তামাশয়, প্লীহা-যকৃত বিবর্দ্ধন ও বিসূচিকা ইত্যাদি। স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ বিধানার্থ পতিত জঙ্গলাদির কর্ত্তন, কৃষি কার্য্যের উন্নতি সাধন, ও বিল খাল প্রভৃতির সংস্করণ পূর্ব্বক জল নিকাশের উপায়াবধারণ প্রভৃতি কোন প্রকার স্বাস্থ্যজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান, এতদঞ্চলে আপাততঃ সংঘটিত হয় নাই বলিয়া প্রতীতি জন্মে। এখানে বিসূচিকা রোগ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় এবং প্রবাদ আছে, প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে, এই রোগ মহামারীর আকার ধারণ করিয়া, প্রথমে এতদঞ্চলে প্রাদুর্ভূত হয়। এই রোগ কুশ-দ্বীপের সন্নিহিত যশোহর জেলায় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম দৃষ্টিগোচর হয় এবং উহা ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া জেলায় গমন করে।

পরে, ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এক প্রকার সংক্রামক জ্বররোগ মহামারীর আকার ধারণ করিয়া এই স্থানে উপস্থিত হয়। কিছু দিন পূর্ব্বে, হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলা যে ভীষণ মহামারীতে শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে, ইহাও সেই প্রকৃতির ভীষণ মহামারী বলিয়া বোধ হয়। এই ভীষণ মহামারী এক সময়ে এতদঞ্চলে যে হৃদয়বিদারক মহাত্রাস উৎপাদন করিয়াছিল, তাহাতে আজিও ইহার নাম শুনিলে, সকলেরই প্রাণ চমকিয়া উঠে। এই ভীষণ ব্যাধি কোথা হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, কিরূপেই বা সমগ্র মধ্যবঙ্গ এককালে আলোড়ন ও বিদলন করিয়াছিল, তাহা জানিবার জন্য অনেকেরই কৌতূহল হয়। সেইজন্য, আমরা এই ব্যাধির প্রসার নিম্নে পূর্ণাবয়বে প্রদান করিলাম। এই ব্যাধির প্রথম আবির্ভাব—

১৮২৪ কি ২৫ খৃষ্টাব্দে, যশোহরের অন্তর্গত মহম্মদপুর গ্রাম; পরে দালগা নলডাঙ্গা ও চাসড়া;—কিছু দিন পরে ভৈরব নদের কূলবর্ত্তী কশবা প্রভৃতি।

১৮৩৫ কি ৩৬ খৃষ্টাব্দে গদঘাট গ্রাম; পরে, নিজ যশোহর,

১৮৩২ কি ৩৩ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জেলার গদখালি প্রভৃতি স্থান;

১৮৩৫ কি ৩৬ খৃষ্টাব্দে গুয়াতেলি, কাদবিলা, সুখপুখুরিয়া;

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে পুনরায় গদখালি;

১৮৪৪ কি ৪৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীনগর ও তৎসন্নিহিত গোপালনগর বাহুরামপুর, দীর্ঘড়া, চৌবাড়িয়া, শিমুলিয়া ও গাঙ্গসারি;

১৮৫০ কি ৫১—গোরপোতা, দেবগ্রাম, মাঝেরকালী ও মুড়াগাছা;

১৮৫৬—উলা বা বীরনগর;

১৮৫৭—রাণাঘাটের নিকটবর্ত্তী আনুলিয়া, কায়েতপাড়া, জগপুর ও চাকদহ;

১৮৫৯—কাচড়াপাড়া, তৎপরে হুগলীর দক্ষিণ পূর্ব্বাংশ ও বারাশত জেলা;

১৮৫৭ হইতে ৬০। উলা হইতে বারাশত, বাদঘুল্লা, খামার শিমুলিয়া প্রভৃতি;

১৮৫৯—৬০—কুলে, বেলগড়িয়া ও মালিপোতা দিয়া শান্তিপুর;

১৮৬০—শান্তিপুরের উত্তর গোবিন্দপুর, দিগনগর ও তন্নিকটবর্ত্তী অনেক গ্রাম;

১৮৬৪—কৃষ্ণনগর।

এই বিষম ব্যাধি ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে কুশদ্বীপে উপনীত হইয়া, ইহার প্রায় তিন চতুর্থাংশ লোককে একেকালে কাল কবলে নিক্ষেপ করে। সেই অবধি কুশদ্বীপের পূর্ব্বগৌরব চির দিনের মত অস্তমিত হইয়াছে। নতুবা ইতিপূর্ব্বে এখানকার জল বায়ু এরূপ উৎকৃষ্ট ও স্বাস্থ্যকর ছিল যে, লোকে দূরদেশে পীড়িত হইরা এখানে আসিয়া কিয়দ্দিন অবস্থিতি করিবামাত্র আরোগ্য ও সুস্থ হইয়া যাইতেন। আজ কালিও ফাল্গুন হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত কয়েক মাস এস্থান যেরূপ স্বাস্থ্যকর থাকে, অনেক স্থান সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু আষাঢ় হইতে মাঘ পর্য্যন্ত কয়েক মাস ইহা অতীব অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। এই সময়ে যদিও মারীভয় তাদৃশ অধিক হয় না, তথাপি পৌনঃ পুনিক জ্বরে অধিবাসিগণের অস্থিচর্ম্ম জর্জ্জরীভূত হয় এবং সাধারণ লোকবৃন্দ অস্থিসার ও কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট হইয়া, কায়ক্লেশে দিনপাত করিতে থাকে। ফলতঃ এই ব্যাধির আক্রমণের পূর্ব্বে, যে কুশদ্বীপ বিদ্যার জ্যোতিতে ও বাণিজ্যের কমনীয় সৌন্দর্য্যে এক দিন সকলেরই শ্রদ্ধা ও যত্নের সামগ্রী হইয়াছিল, সেই কুশদ্বীপ আজি একেকালে হীনাভ হইয়া গিয়াছে। ইচ্ছাপুরের জমীদার বংশ পূর্ব্ব হইতে হীনাবস্থ হইয়া আসিলেও, একেকালে ধ্বংসের শেষাঙ্ক অভিনয় করেন নাই; কিন্তু

হইয়া, নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া আসিয়াছেন। এই সময়ে ইঁহাদিগের দৌহিত্র বংশধরগণ গোবরডাঙ্গাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ভাগ্যলক্ষ্মীর পূর্ণাশীর্ব্বাদ কিয়ৎ পরিমাণে উপভোগ করিতেছিলেন বটে; কিন্তু যে বিমল পূর্ণ শশধর সেই সময়ে দুর্জ্জয় রাহুমুখে উপপ্লুত হইতে বসিয়াছিল, কিছুতেই তাহা আর নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিল না;—ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন সুপ্রসারিত কুশদ্বীপ-গগন-পটে যে কাল মেঘের উদয় হইয়াছিল, কিছুতেই তাহাও আর অপসারিত হইল না। সুতরাং বলিতে গেলে, সেই দুরন্ত প্রচণ্ডব্যাধিই কুশদ্বীপের ভীষণ অন্তক সদৃশ হইয়া, কুশদ্বীপকে এককালে নষ্ট ও শ্রীভ্রষ্ট করিয়াছে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে ইহার অধিবাসিগণের সুখসচ্ছন্দ্য হরণ করিয়া, ইহাকে মহাশ্মশানের চিরাদর্শ করিয়া তুলিয়াছে!

পশুব্যাধি।—এখানে গোমহিষাদি জন্তুর "এঁসে" নামক এক প্রকার পীড়া হইয়া থাকে। এই পীড়া হইলে, গরুর ক্ষুরমূলে ভীষণ ক্ষত হয়। ইহা কখন কখন সংক্রামক পীড়ার আকারও ধারণ করে। কিন্তু ইহাতে কোন সাংঘাতিক অনিষ্ট হয় না। গাভীদলের পশ্চিমা নামক এক প্রকার মহামারী হয়। এতদ্ভিন্ন, বসন্তরোগেও অনেক গরু নষ্ট হইয়া থাকে। এই রোগ অত্যন্ত ভয়ানক এবং ইহাতে গোয়ালের সমস্ত গরুই এক কালে নষ্ট হইয়া যায়। বন্যার পরে জল সরিয়া গেলে, নিম্নভূমিতে এক প্রকার বিষাক্ত নবতৃণ জন্মিয়া থাকে। সেই ঘাস গরুর পক্ষে অত্যন্ত ভয়ানক। উহা ভক্ষণ করিলে, গরুর গলদেশ স্ফীত হয় এবং গরু ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিশ্চয় মরিয়া যায়। বন্যার পরে গাভীদলে যে মহামারী হয়, ইহাই তাহার মূল কারণ। মেষের উদরাময় রোগ সচরাচর সংঘটিত হয়। এই রোগ উহাদিগের পক্ষে অত্যন্ত সাংঘাতিক ও অনিষ্টকর।

চিকিৎসা ব্যবস্থা।—ইতিপূর্ব্বে, কুশদ্বীপে এলোপ্যাথিক বা হোমিওপ্যাথিক মতের চিকিৎসা প্রচলিত ছিল না। তৎকালে নিদান, চরক, শুশ্রুত, বাগ্‌ভট প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসাগ্রন্থে ব্যুৎপন্ন অনেক চিকিৎসক বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহারা যে সমস্ত ব্যবস্থা প্রদান করিতেন, তদনুসারেই সকলে চিকিৎসিত হইতেন। তাঁহারা প্রথমে নানাবিধ পাঁচনাদি সেবন করাইয়া

দিন কাল রোগীকে অতি লঘু আহার প্রদান করিয়া, এমন কি এককালে উপবাসী রাখিয়া, তাঁহারা সহজে রোগীকে আরাম করিবার প্রয়াস পাইতেন। তাহাতে রোগ আরোগ্য না হইলে, কঠিন ঔষধির ব্যবস্থা করিতেন। ইহাতে রোগী যেরূপ সুস্থ হইত তেমন আর কিছুতেই দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কি, আমরা দেখিয়াছি, কোনও কোনও রোগী এইরূপে আরাম হইয়া ১৫।২০ বৎসর পর্য্যন্ত নীরোগ থাকিত। এক মুহূর্ত্তের জন্য তাহাদের শিরঃপীড়া বা উদর স্ফীতিও হইত না। পরে, সংক্রামক জ্বররোগ যেমন প্রবল হইয়া উঠিল, অমনই ডাক্তারী চিকিৎসাও সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ লাভ করিল। যৎকালে কুশদ্বীপে কবিরাজী চিকিৎসা বহুলরূপে প্রচলিত ছিল, তৎকালে এই কবিরাজগণ অস্ত্র চিকিৎসা করিতেন না। উহা ক্ষৌরকার ও মালগণ দ্বারা সম্পন্ন হইত। শেষোক্ত ব্যক্তিগণ যদিও ডাক্তারগণের ন্যায় শারীরবিদ্যায় তাদৃশ পরিপক্ক ছিলেন না; কিন্তু অস্ত্রচিকিৎসায় বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন এবং যাবদীয় অস্ত্রকার্য্য ইঁহারাই সম্পন্ন করিতেন।

আজি কালি কুশদ্বীপে অনেক বিষয়েরই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আহারে বিহারে, শয়নে, ভ্রমণে যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই পরিবর্ত্তনের প্রিয়স্রোত ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সাধারণচিকিৎসা ও শিক্ষা এই দুই বিষয়ের পরিবর্ত্তনই সমধিক লক্ষণীয়। বস্তুতঃ ক্ষণকাল স্থির চিত্তে বিবেচনা করিলে, স্পষ্টই বোধ হয় যেন সমাজ এই দুই বিষয়ে ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে অথবা এক বিভিন্ন চত্বরে সমুপস্থিত হইয়াছে। বেশ বিন্যাস, আহার, বিহার, প্রভৃতি অপরাপর বিষয়ের পরিবর্ত্তন আংশিক বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু চিকিৎসা ও শিক্ষা সম্বন্ধের পরিবর্ত্তন পূর্ণ ভাবেই লক্ষিত হইয়া থাকে। কারণ অনুসন্ধান করিলে যে ইহার প্রকৃত কারণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এমন নহে; ইহার বিশিষ্ট কারণই বিদ্যমান রহিয়াছে। ক্ষণমাত্র অনুধাবন করিলে, তাহা সকলের চক্ষেই হেমাক্ষরে প্রকটিত হইতে পারে।

শাখাপত্রহীন বটবৃক্ষ কতক্ষণ পথিককে সুশীতল ছায়া প্রদান করে?— প্রাণহীন দেহ কোথা সবলভাব ধারণ করিয়া থাকে?—মেঘগর্ভ ক্ষিরা

পারিজাত গন্ধবিহীন হইয়াই কি সামান্য মাদার পুষ্পে পরিগণিত হয় নাই ?—কুশদ্বীপও সেইরূপ শিক্ষিতচিকিৎসক ও সদাচার সম্পন্ন অধ্যাপকমণ্ডলী বিহীন হইয়াই, এই বিরাট্ পরিবর্ত্তনের বশবর্ত্তী হইয়াছে। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে যখন মহামারী শ্রীনগর, উলা, রাণাঘাট, চাকদহ, কাচড়াপাড়া প্রভৃতি উদরসাৎ করিয়া, এতদঞ্চলে প্রবেশলাভ করে, তখন যেমন একে এখানকার জলবায়ু নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়া আইসে, তেমনই, রামপ্রাণ, রামগতি, কালীকিঙ্কর, রামরতন, বিশ্বম্ভর, ভগবান প্রভৃতি সর্ব্ব শাস্ত্র বিশারদ প্রধান প্রধান দিগ্‌গজ চিকিৎসকমণ্ডলী কুশদ্বীপ গগনপট হইতে এককালে অন্তর্হিত হইয়া যান। অধ্যাপক মণ্ডলী ও টোলের অবস্থাও তৎকালে প্রায় তদনুরূপ হইয়া উঠে। যেখানে চন্দ্রশেখর, রামধন, রামকুমার, ভগবান প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় সুধীমণ্ডলী প্রচণ্ডভাস্করের ন্যায় মহাপ্রতাপে স্ব স্ব টোলচতুষ্পাঠীতে বসিয়া, কর্ণাট, দ্রাবিড় প্রভৃতি দেশ হইতে সমাগত ছাত্রবৃন্দের অধ্যাপনাকার্য্য সমাধা করিতেন, সেইখানে এখন এক জন দশকর্ম্মবিদ্ ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও লোপ হইয়াছে। সুতরাং এই মহাসঙ্কটে যে এই মহাপ্রলয় নির্ব্বিঘ্নে সমুপস্থিত হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? ফলতঃ শিক্ষা পরিবর্ত্তন আমাদিগের আপাততঃ আলোচ্য নহে। সেই জন্য আমরা উক্ত প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া, সাধারণ চিকিৎসা প্রণালী পরিবর্ত্তনের বিবরণ বর্ণন করিতেছি।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে, এক দিকে যেমন মহামারীর প্রচণ্ড প্রকোপ—প্রতিদিন কুশদ্বীপের প্রত্যেক গ্রামে দুই দশ জন করিয়া লোক ইহযাত্রা সম্বরণ করিতেছে—অন্য দিকে, তেমনই চণ্ডী কবিরাজ, হর বৈরাগী, বাহাদুর মাল প্রভৃতি লোকের ন্যায় অশিক্ষিত ইতর লোকের হস্তে কুশদ্বীপবাসী জনগণের প্রিয় প্রাণ ন্যস্ত। এরূপ সঙ্কট সময়ে, ধন ও সমৃদ্ধিপূর্ণ কুশদ্বীপে অতি অল্পমাত্র ছিদ্র অবলম্বন করিয়াই, যে কোনও আপাতমনোরম অভিনব চিকিৎসাপ্রণালীর লব্ধপ্রসর হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে। কুশদ্বীপের অদৃষ্টচক্রে বাস্তবিক তাহাই সংঘটিত হইল। ঘটনাসূত্র অবলম্বন করিয়া, এলোপ্যাথিক চিকিৎসাপ্রণালী এই সময়ে পরমাত্মীয় ভাবে আমাদিগের

প্রণালীর পরিবর্ত্তে তাঁহাকেই সাদরে আহ্বান করিল এবং সেই অবধি এলোপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালী কুশদ্বীপ-বাসীর জীবন মরণের একমাত্র নিয়ামক হইয়া রহিল। যে ঘটনাসূত্র অবলম্বন করিয়া, এই মহা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, নিতান্ত আবশ্যক বোধে, আমরা তাহা নিম্নে বর্ণন করিতেছি।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে, কথকশিরোমণি রামধন তর্কবাগীশ মহাশয়ের কনিষ্ঠাত্মজ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়, খাঁটুরার স্বর্গীয় ভগবান্‌চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের টোলে ব্যাকরণ ও সাহিত্য পাঠ সমাপন করিয়া, কলিকাতাস্থ গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন এবং তথায় কিয়দ্দিবস পাঠানন্তর প্রয়োজনীয় যাবদীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তথাকার পাঠাগারের সাহিত্যাধ্যাপক পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সময়ে প্রাতঃস্মরণীয় জগদ্বিখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদে সমাসীন ছিলেন এবং যাবদীয় শিক্ষা বিভাগের উপর তাঁহার অখণ্ডনীয় প্রভুত্ব ছিল। এই সময়ে উক্ত মহাত্মার যত্নে মেডিকেল কলেজে প্রথম বাঙ্গালা শ্রেণী স্থাপিত হইয়া, নেটিভ ডাক্তারের পদ সৃষ্ট হয়। আজি কালি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে, যেমন কেহ মেডিকেল কলেজের বাঙ্গালা শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইতে পায় না, তখন এরূপ নিয়ম ছিল না। যোগাযোগ করিতে পারিলে, যেমন তেমন বাঙ্গালা শিখিয়াই, সকলে এই শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইতে পারিত। তদনুসারে, শ্রীশচন্দ্র, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহায্যে আপনার কয়েকটী আত্মীয়কে এই শ্রেণীতে প্রবেশ করাইয়া দেন এবং স্বীয় জনককে বলিয়া, শিমুলিয়ার নিজ ভবনে উহাদিগের আহার ও থাকিবার বন্দোবস্ত করেন। এই সুযোগে, মাননীয় স্বর্গীয় গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মেডিকেল কলেজের বাঙ্গালা শ্রেণীতে প্রথম প্রবিষ্ট হন। ঈশ্বরেচ্ছায় ইঁহারা সকলেই শিক্ষিত ও উত্তীর্ণ হইয়া, স্থানে স্থানে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মে নিয়োজিত হইলে, মাননীয় বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ও পুনরায় এই শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। কিয়দ্দিবস এই শ্রেণীতে পাঠ করিয়া, ইংরাজী চিকিৎসাশাস্ত্রে কিয়ৎ পরিমাণ ব্যুৎপত্তি লাভ

করিয়া, বীরেশ্বর বাবু স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন; কিছু দিন পরে, স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্রও সেই পথের পথিক হন।

এই সময়ে কুশদ্বীপে মহামারীর প্রবল প্রাদুর্ভাব;—প্রতি গৃহে প্রতি দিন দুই চারিটী করিয়া লোক কালকবলে নিপতিত হইতেছে;—সকলের দাহক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে;—অনেকেই সৎকার করিতে না পারিয়া, যমুনার পুলিনে অথবা গৈপুরের খালধারে শব ফেলিয়া দিয়া আসিতেছে;—যমুনার জলও অব্যবহার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে;—শবের কেশ ও মেদ অনবরত যমুনার জলে ভাসিতেছে;—দুই চারিটি শবও ভাসিয়া যাইতেছে;—শ্মশানের পার্শ্ব দিয়া, যমুনার জল খাইতে বা স্নান করিতে যায়, কাহার সাধ্য?—যমুনার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও, ভয় ও ঘৃণায় হৃদয় যুগপৎ আকুল হইয়া উঠে;—মহাভয়ে প্রাণ সিহরিত হয়!—সকলেই ভীত ও সন্ত্রান্ত;—চারি দিকেই হাহাকার রব; সকলের হৃদয়ই মহাশোকে আচ্ছন্ন;—কেহ কাহারও কথা জিজ্ঞাসা করে, এমন লোকও দেখিতে পাওয়া যায় না;—বৈকালে বেলা দুই চারি দণ্ড থাকিতে বাটীর বাহির হইতেও, কাহার সাহস হয় না। আজি সন্ধ্যার সময় যাহাকে দেখিতেছে, প্রত্যূষে উঠিয়া আর তাহাকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ সদৃশ দিক্‌পালগণও চিরদিনের জন্য ধরাপৃষ্ঠ আশ্রয় করিয়াছেন!

এই মহাসঙ্কটের সময়ে, বীরেশ্বর বাবু মেডিকেল-কলেজ ত্যাগ করিয়া, পীড়িতের পিতা, ব্যথিতের মাতা, আর্ত্তের সখী, অসহায়ের পরিচারক, ও নিরাশ্রয়ের আশ্রয় স্বরূপ হইয়া, কুশদ্বীপে উপস্থিত হন এবং খাঁটুরা নিবাসী স্বর্গীয় ভুবনমোহন দানিয়াড়ি মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া, উক্ত দানিয়াড়ি মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপে এক ডিস্‌পেন্‌সরি স্থাপন করেন ও স্থানীয় চিকিৎসায় প্রবর্ত্তক হন। এই সময়ে কি ইতর কি ভদ্র যে তাঁহাকে আহ্বান করিল, বীরেশ্বর বাবু অম্লান বদনে তাহার বাটীতেই উপস্থিত হইলেন—সাধ্যানুসারে যে যাহা দিয়া সন্তুষ্ট হইল, বিনা বাক্যব্যয়ে বীরেশ্বর বাবু তাহাই গ্রহণ করিতে লাগিলেন; এমন কি অনেকে শুদ্ধ ঔষধের মূল্যের কিয়দংশ মাত্র প্রদান করিল, বীরেশ্বর পরমাহ্লাদে তাহাই গ্রহণ করিলেন এবং সকলকেই অতি যত্ন সহকারে চিকিৎসা করিয়া নীরোগ করিবার চেষ্টা

পাইলেন। বলিতে কি, এই সময়ে বীরেশ্বর বাবুর ন্যায় সরল, অমায়িক, দেশানুরাগী ও অর্থলোভহীন লোকের হস্তে চিকিৎসার ভার না পড়িলে, কুশদ্বীপের অদৃষ্টে যে কি ঘটিত, তাহা বলিতে পারা যায় না। এই সময়ে অনেকেই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু বীরেশ্বর বাবুর অবিরত যত্ন চেষ্টা ও শুশ্রূষায় কেহ কেহ মুক্তিলাভ করিল। অবশ্য বীরেশ্বর বাবু ডাক্তারী চিকিৎসার পারসীমা দর্শন করিয়া, চিকিৎসা কার্য্য আরম্ভ করেন নাই; কিন্তু তিনি একে যেরূপ অসাধারণ চিকিৎসাশাস্ত্র বিশারদ মহামহোপাধ্যায় চিকিৎসকের আত্মজ, তাহার উপর কৌলিক চিকিৎসাপ্রতিভা এতাদৃশ অল্প বয়সেই তাঁহাতে যেরূপ পূর্ণভাবে স্ফুরিত হইয়াছিল, তাহাতে তিনি যে অতি সুদিক্ষতার সহিত চিকিৎসাকার্য্য সম্পন্ন করিবেন, ইহা বিন্দু মাত্রও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বস্তুতঃ তাঁহার এই অসাধারণ গুণে মুগ্ধ হইয়াই, স্বদেশবৎসল, সর্ব্বপূজ্য, প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় জমীদার সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে তদীয় সদর ও অন্তঃপুরের একমাত্র গৃহচিকিৎসক পদে অভিষিক্ত করেন, তদবধি আজি পর্য্যন্তও উক্ত জমীদার ভবনের যাবদীয় চিকিৎসা কার্য্য ইঁহার পরামর্শানুসারে নির্ব্বাহিত হইতেছে। ইনি প্রাগুক্ত স্বর্গীয় জমীদার মহাশয়ের সভাসদ ও প্রিয়পাত্র ছিলেন, এমন নহে; তিনি ইঁহাকে এতদূর ভাল বাসিতেন যে ইঁহাকে প্রিয় বয়স্যের ন্যায় জ্ঞান করিতেন এবং যখন কোনও দূরদেশে গমন করিতেন, তখনই ইঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন।

বীরেশ্বর বাবুর কুশদ্বীপে আগমনের কিছু পরেই, পূর্ণবাবুও কলেজ ত্যাগ করিয়া খাঁটুরা প্রত্যাগত হন এবং স্বর্গীয় জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অর্থানুকূল্য ও পরামর্শানুসারে স্বর্গীয় ধরণীধর কথক চূড়ামণি মহাশয়ের এক বহিঃপ্রকোষ্ঠে ডিস্‌পেন্‌সরি স্থাপন করেন এবং বীরেশ্বর বাবুর অনুসৃত পথের পথিক হন। পূর্ণ বাবুও সদয় ও সরল ব্যবহারে সকলকে বিমোহিত করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তিনি কোন রূপেই বীরেশ্বর বাবুর সমকক্ষতা লাভ করিতে পারিলেন না। অতি অল্প কালের মধ্যেই বীরেশ্বর বাবু খাঁটুরা, গোবরডাঙ্গা, ইচ্ছাপুর, গৈপুর, বালিনী, মাটিকোমরা প্রভৃতি ভদ্র সমাজ মধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়িলেন, কিন্তু পুনর্ব্বার একমাত্র খাঁটুরা

এই সময়ে প্রসন্ন চন্দ্র সেন নামক জনৈক বঙ্গদেশীয় বৈদ্য গোবরডাঙ্গায় অবস্থিতি করিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় মতে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া ছিলেন। কিন্তু ইনি অত্যন্ত মদ্যপায়ী ছিলেন বলিয়া বিশেষ ফললাভ করিতে পারেন নাই। কাযেই, বীরেশ্বর বাবু চিকিৎসার গুণে অচিরেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইলেন ও এলোপ্যাথিক মতের চিকিৎসা প্রণালী এতদঞ্চলে এককালে বদ্ধমূল করিলেন।

বীরেশ্বর বাবু স্বনামখ্যাত পুরুষ। কিন্তু ইহার কৌলিক পরিচয়ও নিতান্ত সামান্য নহে। খাঁটুরার যে ব্রাহ্মণকুলতিলক নবদ্বীপাধিপতির নিকট নিগৃহীত ও কারাবদ্ধ হইয়া, স্বীয় অলৌকিক চিকিৎসা বলে রাজবৈদ্যগণকে পরাভূত করিয়া, রাজকুমারের প্রাণদান করিয়াছিলেন এবং মহারাজের নিকট বিপুল ভূসম্পত্তি লাভ করিয়া, খাঁটুরার ব্রাহ্মণমণ্ডলীমধ্যে অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন এবং যাঁহার বংশধরগণ আজিও কুশদ্বীপের শ্রেষ্ঠাসন একায়ত্ত করিয়া রাখিয়াছেন, বীরেশ্বর বাবু সেই বর-চিকিৎসক চিরস্মরণীয় রামরাম তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রপৌত্র। সুবিখ্যাত রামপ্রাণ বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় ইহার খুল্ল পিতামহ। খাঁটুরার আদি সম্ভ্রান্ত ও ধনকুবের ব্রাহ্মণ প্রাগুক্ত স্বর্গীয় রামরাম তর্কালঙ্কার মহাশয়ের তিন পুত্র ছিল; জেষ্ঠ্য রামহরি, মধ্যম কালীশঙ্কর ও কনিষ্ঠ রামপ্রাণ। বীরেশ্বর বাবু রামহরির একমাত্র পুত্র রামগতি বিদ্যানিধি মহাশয়ের কনিষ্ঠ তনয়। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক, পূর্ণবাবুও বীরেশ্বর বাবুর নিতান্ত নিকট জ্ঞাতি। বীরেশ্বর বাবুর মধ্যম পিতামহ কালীশঙ্করের দুই পুত্র জন্মে; জ্যেষ্ঠের নাম বিশ্বম্ভর এবং কনিষ্ঠের নাম রাজচন্দ্র। পূর্ণবাবু এই রাজচন্দ্রেরই সর্ব্বকনিষ্ঠ তনয়। রামগতি বিদ্যানিধি মহাশয় সাহিত্য ব্যাকরণাদির অধ্যয়ন শেষ করিয়া, নিদান প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন এবং সাহিত্যাদি সাধারণ বিদ্যায় যেমন ব্যুৎপন্ন, চিকিৎসাশাস্ত্রেও তেমনই অসাধারণ জ্ঞানলাভ করেন। কুশদ্বীপ অঞ্চলে বিদ্যানিধি মহাশয় একজন সুপ্রতিষ্ঠিত কবিরাজ ছিলেন। প্রধানতঃ ইনি সাধারণে গতি বিদ্যানিধি বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। বিদ্যানিধি মহাশয় দুইবার দারপরিগ্রহ করেন। তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে শ্যামাচরণ নামে এক পুত্র এবং কনিষ্ঠা স্ত্রীর গর্ভে সৃষ্টিধর ও বীরেশ্বর নামক দুই পুত্র ও বরদাসুন্দরী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। যাবদীয়

বাবুর পিতৃবিয়োগ হয়। এই সময়ে ইঁহার জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণ আবগারি বিভাগে কর্ম্ম করিয়া বিলক্ষণ দশ টাকা উপার্জ্জন করিতেন ও বিশেষ সম্ভ্রমশালী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু শ্যামাচরণ তদীয় বিমাতা ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি তাদৃশ স্নেহবান্ ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, বীরেশ্বরের জননী অতি কষ্টে স্বীয় তনয়যুগলের লালনপালন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জ্যেষ্ঠ পুত্র সৃষ্টিধর উপায়ক্ষম হইয়া, জননীর অশ্রুরাশি মোচন না করিতে করিতেই, কালকবলে পতিত হন। তাঁহার বিধবা-ভার্য্যার অন্নাচ্ছাদনের ভারও অপোগণ্ড বালক বীরেশ্বরের গলদেশে পতিত হয়। যাহাহউক, এই সময়ে বীরেশ্বর বাবু বাঙ্গালাভাষায় কালোচিত জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহাকে কলিকাতার বাটীতে লইয়া গিয়া, মেডিকেল কলেজের বাঙ্গালা শ্রেণীতে প্রবেশ করাইয়া দেন। ইহার পরে বীরেশ্বর বাবুর অদৃষ্টচক্রে যাহা যাহা সংঘটিত হইয়াছে, পাঠকগণ ইতিপূর্ব্বেই তাহা অবগত হইয়াছেন।

বীরেশ্বর বাবু উপায়ক্ষম্ হইয়াই, প্রথমে বারাশত হইতে তদীয় বিধবা ভগিনী বরদা দেবী ও তদীয়া অপোগণ্ড বালকদ্বয় পরেশনাথ ও অক্ষয়চন্দ্রকে নিজ বাটীতে আনাইয়া, জননীর দীর্ঘসন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তিবারি সেচন করেন। বীরেশ্বর বাবু ভাগিনেয়দ্বয়কে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন ও যথারীতি লেখাপড়া শিখাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুরদৃষ্টক্রমে ভাগিনেয়দ্বয় তাদৃশ সুশিক্ষিত হইতে পারে নাই। যাহা হউক, তথাপি ইনি উহাদিগের বিবাহাদি দিয়া, নিজবাটীর নিকটেই উহাদিগের পৃথক্ বাটী করিয়া দিয়াছেন।

বীরেশ্বর বাবুর দুই বিবাহ। খাঁটুরা নিবাসী স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর সরখেল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শিবমোহিনী ইঁহার প্রথমা ভার্য্যা। চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ না হইতে হইতেই এই ভার্য্যা গতায়ু হওয়াতে, বীরেশ্বর বাবু দ্বিতীয়বার জাগুলিয়ায় বিবাহ করেন। এই স্ত্রীর গর্ভে তাঁহার তিন পুত্র ও দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। বীরেশ্বর বাবু ধনে পুত্রে অতীব সৌভাগ্যশালী হইয়া, পরমসুখে কালযাপন করিতেছেন। দুঃখের মধ্যে, দেশাচারের বশবর্ত্তী হইয়া, ইঁহাকে জ্যেষ্ঠা কন্যার সংস্রব ত্যাগ করিতে হইয়াছে। বীরেশ্বর বাবু, তদীয় জ্যেষ্ঠা কন্যা হালিসহর নিবাসী শ্রীমান্ অতুলকৃষ্ণ রায়চৌধুরী মহাশয়কে সম্প্রদান করেন। অতুল বাবু এখানে এম এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

হইয়া, ইংলণ্ডে গমন করেন এবং তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিজ্জ বিদ্যায় ও এনাটমি পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগত হন। এক্ষণে ইনি কুষ্ঠিয়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছেন। বিলাত গমন করাতে, দেশীয় হিন্দুগণ অতুল বাবু ও তাঁহার ভার্য্যার সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন। কাজেই বীরেশ্বর বাবুকেও কন্যা ও জামাতার সংস্রব ত্যাগ করিতে হইয়াছে। এক্ষণে মাতাপিতা ও কন্যা জামাতার পরস্পর দেখাশুনা ভিন্ন অন্য কোনও সংস্রব নাই। সামান্য মনঃকষ্ট হইলেও বীরেশ্বর বাবু সৎপাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিয়া পরম সুখেই কালযাপন করিতেছেন। ধরিতে গেলে, বীরেশ্বর বাবুর এ কষ্ট কষ্টই নহে; যখন কন্যা সৎপাত্রের হস্তগতা হইয়া, পরমসুখে ও মহানন্দে কালযাপন করিতেছে, তখন তাহাই বীরেশ্বর বাবুর পক্ষে স্বর্গলাভ। বাস্তবিক, যদি কন্যা, সৎপাত্রস্থা এবং ধনমান সম্ভ্রম ও গৌরবের উচ্চাসনে আসীনা হইয়া, পিতার সংস্রব ত্যাগ করে, তাহাহইলেও কি পিতা তাহাতে গৌরববান্ হন না?—কন্যার সেই অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা লোকমুখে শ্রবণ করিয়াও কি পিতার দুই চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু নির্গলিত হয় না? অবশ্যই হইয়া থাকে। সেই জন্যই বলিতেছি যে, সামান্য মনঃকষ্ট হইলেও, বীরেশ্বর বাবু পরমসুখে দিনপাত করিতেছেন।

অধুনা বীরেশ্বর বাবু গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপালিটীর কমিশনর ও তথাকার জমিদার মহোদয়গণের বাটীর ডাক্তার পদে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। অন্যূন পঞ্চাশৎ বর্ষ হইবে, তিনি শেষোক্ত পদে একাদিক্রমে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, জমিদার মহোদয়গণের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া রহিয়াছেন।

সাধারণ হিতকরকার্য্যেও ইঁহার বিশেষ অনুরাগ আছে। শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ রক্ষিত মহাশয়ের যে সকল সদনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়, বীরেশ্বর বাবুই তাহার প্রথম উদ্যোগী ও একমাত্র পরামর্শদাতা। ইঁহার তত্ত্বাবধানে রামকৃষ্ণ বাবুর অনেকগুলি কার্য্যও সম্পন্ন হইয়াছে। স্থানান্তরে আমরা তাহার বিশদ বিবরণ প্রকাশ করিলাম।

কয়েক বৎসর হইল, এক দানশীলা তাম্বুলী মহিলার বদান্যতাগুণে খাঁটুরা চতুষ্পাঠী গ্রামে এক চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গোবরডাঙ্গা নিবাসী হরদেব

চতুষ্পাঠীতে মাসিক ২০।২২ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার অবস্থা কিরূপ, এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে হইলে, হৃদয় আকুল হইয়া উঠে।

কয়েক বৎসর অতীত হইল, শ্যামাচরণ সেন নামক একজন তাম্বুলী সূতার ব্যবসা করিয়া, বিলক্ষণ ধনশালী হইয়া উঠেন। ইনি বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় সামান্যরূপ লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। অতি অল্প বয়সেই শ্যামাচরণের পিতৃমাতৃবিয়োগ হয়। সেইজন্য, শ্যামাচরণ যৎসামান্য লেখাপড়া শিখিয়াই, তদীয় আত্মীয় বংশীধর পাল মহাশয়ের কলিকাতাস্থ সূতার দোকানে ব্যবসাকার্য্য শিক্ষা করিবার জন্য প্রবিষ্ট হন। এই দোকানে কার্য্য করিয়া, শ্যামাচরণ যৎকিঞ্চিৎ অর্থোপার্জ্জন করেন এবং সূতাপটীতে একটী বারাণ্ডার কিয়দংশ ভাড়া লইয়া, দুই দশ মোড়া সূতা ক্রয়বিক্রয় করিতে থাকেন। অতি সতর্কতাপূর্ব্বক কর্ম্ম করাতে, শ্যামাচরণ এই সামান্য দোকান করিয়াই, কিঞ্চিৎ ধনসঞ্চয় করেন। ন্যূনাধিক পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে শ্যামাচরণ খাঁটুরার উত্তরপাড়া নিবাসী ক্ষেত্রনাথ রক্ষিতের দ্বিতীয়া কন্যা দশমবর্ষীয়া যোগমায়ার পাণিগ্রহণ করেন। কথিত আছে, এই যোগমায়াকে বিবাহ করার পর হইতেই, শ্যামাচরণের ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না হইয়া উঠেন।

বিবাহের দুই তিন বৎসর পরেই শ্যামাচরণ শোভাবাজারের নন্দরাম সেনের গলিতে অবস্থিত ঈশ্বরচন্দ্র দত্তের বাটীর দ্বিতলে একটী ঘরভাড়া করিয়া যোগমায়াকে লইয়া, বাস করিতে আরম্ভ করেন। এই দোকানখানি অবলম্বন করিয়া শ্যামাচরণ ক্রমশঃ লাভবান্ হইলেন। দুই এক বর্ষ এইরূপে গত হইলে, শ্যামাচরণ একখানি দোকানগৃহ ভাড়া লইয়া, রীতিমত দোকান করিলেন। এইরূপে কিছুকাল উত্তীর্ণ হইলে, খাঁটুরাবাসী রাজেন্দ্র পাল শ্যামাচরণের মিতব্যয়িতা, মিষ্টভাষিতা ও ব্যবসা-বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখিয়া, বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন এবং শ্যামাচরণের সহিত একযোগে সূতার দোকান করিতে মনস্থ করিলেন। অচিরেই শ্যামাচরণ ও রাজেন্দ্রের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইল। রাজেন্দ্র, শ্যামাচরণের সহিত যোগদান করিলেন। কয়েক বৎসর দোকান করিয়াই, উভয়ে বিলক্ষণ সম্পত্তিশালী হইয়া উঠিলেন এবং উভয়েই কলিকাতাতে এক একখানি পাকাও বাটী ক্রয় করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

শ্যামাচরণ অতি সামান্য অবস্থা হইতে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া, অতুল ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ধনের আনুষঙ্গিক রোগ তাঁহাকে কদাপি স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি সামান্য অবস্থাতেও যেমন প্রফুল্লচিত্ত, লোকপ্রিয় ও ইতর ভদ্র সকললোকের সহিত সদালাপী ছিলেন, অতুল ধনশালী হইয়াও সেইরূপ রহিলেন। অহঙ্কার বা গর্ব্ব কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দেবদ্বিজেও শ্যামাচরণের অপরিসীম ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল। দেশস্থ একটী সামান্য ব্রাহ্মণকুমারকে দেখিলেও শ্যামাচরণ সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করতঃ হাসিয়া হাসিয়া তাহার অনাময় কুশল জিজ্ঞাসা করিতেন। দোল, দুর্গোৎসব, পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ ও অন্যান্য ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়া, শ্যামাচরণ প্রায়ই ব্রাহ্মণ ও কুটুম্বগণকে নিমন্ত্রণ করিতেন এবং খাঁটুরার ও কলিকাতার উভয় বাটীতেই সমান সমাদর ও বিনীত অভ্যর্থনা সহকারে তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতেন। যখন ব্রাহ্মণগণ নিমন্ত্রিত হইয়া, তাঁহার বাটীতে পদার্পণ করিতেন, তখন শ্যামাচরণ স্বয়ং ভৃঙ্গার হস্তে লইয়া, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিতেন এবং স্বহস্তে ব্রাহ্মণগণের পাদ ধৌত করাইয়া, অঞ্জলিপূর্ণ পাদোদক পান করিতেন।

যাহাহউক, শ্যামাচরণ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ও প্রিয়কারিণী মনোমোহিনী সহধর্ম্মিণী লাভ করিয়াও, সকল সুখে সুখী হইতে পারেন নাই। এই সময়ে যোগমায়া সন্তানপ্রসবকাল অতিক্রম করিয়াছিলেন। একটী অপত্যের অভাবে শ্যামাচরণ সর্ব্বদাই দুঃখিত থাকিতেন। পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার পরামর্শ দিলেও, শ্যামাচরণ সে পরামর্শ গ্রহণ করিতেন না। বরং যাগাদি ক্রিয়াকাণ্ড ও কবচাদি ধারণ করিয়া, যাহাতে সহধর্ম্মিণীর বন্ধ্যা-দোষ কাটিয়া যায়, শ্যামাচরণ তাহারই প্রয়াস পাইতেন। ফলতঃ বহুবিধ কার্য্য করিয়াও, শ্যামাচরণ সন্তানমুখ নিরীক্ষণ করিতে পাইলেন না।

অবশেষে, গুরুপুরোহিতের প্ররোচনায় ও প্রিয়তমা ভার্য্যার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে, শ্যামাচরণ অগত্যা ভার্য্যান্তর পরিগ্রহ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন এবং স্বীয় গ্রামবাসী বনমালী দাঁ নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত তাম্বুলীর কনিষ্ঠা কন্যা বিনোদিনীর পাণিপীড়ন করিলেন। এই বিবাহে শ্যামাচরণের সহধর্ম্মিণী

প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে সেই সময়ে তাঁহাকে দেবী বলিয়া অনেকের প্রতীতি জন্মিয়াছিল।

এইরূপে যোগমায়া স্বহস্তে ও স্বীয় উদ্যোগে পতির বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া, কনিষ্ঠা ভগিনী নির্ব্বিশেষে বিনোদিনীকে পালন করিতে লাগিলেন। বিনোদিনীও কন্যার ন্যায় জ্যেষ্ঠা সপত্নীর অনুগতা হইলেন। ফলতঃ যেখানে লক্ষ্মীর সমাবেশ থাকে, সেখানে সকল দিকেই সুখের স্রোত প্রবাহিত হয়। শ্যামাচরণ যে ভয়ে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন, সে ভয়ের আর বিন্দুবিসর্গ চিহ্নও দেখিতে পাইলেন না। প্রত্যুত, শ্যামাচরণ দেখিতেন, যেখানে তাঁহার যোগমায়া অবস্থিতা, সেই খানেই যোগমায়ার ছায়া-রূপিণী বিনোদিনীও যোগমায়ার পার্শ্বাবলম্বিনী।

যাহা হউক, প্রগাঢ় স্নেহ ও যত্নসহকারে পালন করিয়া যোগমায়া বিনো-দিনীকে যেমন সম্বর্দ্ধিতা তেমনই গৃহকুশলা করিয়া তুলিলেন। যোগমায়ার অলৌকিক ও অকৃত্রিম যত্নে বিনোদিনী দেখিতে দেখিতেই বয়ঃপ্রাপ্তা হইলেন—দেখিতে দেখিতেই সুকুমার যৌবনভারে ভাদ্রের গঙ্গার ন্যায় ঢল ঢল করিতে লাগিলেন। শ্যামাচরণের অনন্ত প্রেমরাজ্যে যোগমায়া একমাত্র অধীশ্বরী ছিলেন। ঘর, দ্বার, গৃহসজ্জা সকলই তাঁহার বলিয়া জানিতেন; তাহাতে যে আবার একজন অংশভাগিনী হইবে, যোগমায়া স্বপ্নেও তাহা একবারের জন্য বিবেচনা করেন নাই। কিন্তু দৈবের বিড়ম্বনায় আজি সে সমস্তই তাঁহাকে বিভাগ করিয়া দিতে হইল। ইহাতেও যোগমায়া বিন্দুমাত্র দুঃখানুভব করেন নাই। আজি বিনোদের একটী পুত্রসন্তান হইবে,—সেই পুত্রটীকে লইয়া যোগমায়া লালনপালন করিবেন—তাহাকে লইয়াই গৃহিণী হইবেন—পুত্র প্রসব না করিয়াও, পুত্রবতী হইয়া, পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার হইবেন—শুদ্ধ এই আনন্দেই যোগমায়ার হৃদয় উৎফুল্ল হইল; বিনোদ হইতে একটী পুত্র পাইবার ইচ্ছায়, তিনি সকল স্বার্থেই জলাঞ্জলি দিলেন।

ঈশ্বরের অনুগ্রহে ও ভবিতব্যতার নির্ব্বন্ধে বিনোদিনীও যথাকালে এক পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। সকলেই অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইল। শ্যামা-চরণের শুষ্ক দেহ মঞ্জরিত হইল। যোগমায়া স্নেহভরে সেই সন্তানের নাম সাধনচন্দ্র রাখিলেন। সাধন আজি অন্ধের যষ্টি—অঞ্চলের মাণিক, [illegible]

বিভিন্ন লতার সম্মিলিত কাণ্ডের একমাত্র মধুময় কুসুম। সাধনকে পাইয়া, যোগমায়া ও বিনোদিনীর সুখের প্রবাহ নূতন ধারায় প্রবাহিত হইল; শ্যামাচরণও দিন দিন অপার আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

কয়েক বৎসর অতীত হইতে না হইতেই, এই সুখের প্রবাহ ভিন্ন পথে ধাবিত হইল। কেহই চিরস্থায়ী নহে; কাল সকলেরই প্রতীক্ষা করিতেছে। নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত হইলে, সকলকেই কালের সহগামী হইতে হইবে। এই অভ্রান্ত সত্যের অনুবর্ত্তী হইয়াই, শ্যামাচরণ জ্বররোগাক্রান্ত হইলেন। সেই জ্বর ক্রমশঃ প্রবল হইয়া, ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। সুতরাং শ্যামাচরণ আর সে যাত্রা অব্যাহতি পাইলেন না; অপ্রাপ্তকালেই তাঁহার জীবন-কোরক বিচ্ছিন্ন হইল। তখন তিনি যোগমায়া, বিনোদিনী, সাধন, দাসদাসী ও আত্মীয়স্বজন সকলের নিকট বিদায় লইয়া, সকলকেই অপার দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিয়া, জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিলেন।

যে কাল সকল সুখের মূল—সকল শান্তির অনন্ত প্রস্রবণ—সকল সম্পদের একমাত্র কারণ; সেই কালই আবার সকল দুঃখের একমাত্র নিয়ামক—সেই কালই একে একে সকল কষ্ট যন্ত্রণা ডাকিয়া আনে। শ্যামাচরণের মৃত্যুর কিছু দিন পরেই, সাধনচন্দ্রও বিষম জ্বররোগে আক্রান্ত হইল এবং অচিরে কালকবলে পতিত হইয়া, শ্যামাচরণের জলগণ্ডূষের শেষ আশা অবধি লোপ করিল। এদিকে, কি এক দুর্দ্দৈব প্রভাবে, এই সময়ে যোগমায়া ও বিনোদিনীতেও মনান্তর উপস্থিত হইল। তখন যোগমায়া সংসার শূন্য ও অরণ্যপ্রায় দেখিতে লাগিলেন। উভয় সপত্নীতে এক সঙ্গে সংসার করা যেন উভয়েরই বিষম দায় হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ যে বিনা-সূতার হারে উভয়েই এক বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, সেই বন্ধন, ছিন্ন হইয়া যেন উভয়েই অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। সুতরাং গ্রামস্থ ভদ্র আত্মীয়ের সাহায্যে, যোগমায়া শ্যামাচরণের ঐশ্বর্য্যের কিয়দংশমাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়রূপে গ্রহণ করিলেন এবং বিনোদিনীর সহিত সংস্রবশূন্যা হইয়া, স্বকীয়া পিতৃভবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বিনোদিনীও নিঃসন্তান হইয়া, শ্যামাচরণের অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করিলেন

লাগিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহারাও বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ হইতে ক্ষান্ত হইলেন। কাযেই বিনোদিনী তখন স্ব-প্রধানা হইয়া, স্বামীর নাম যশ রক্ষা করিতে কৃতসংকল্পা হইলেন।

বিনোদিনী অনেকগুলি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। সেই সকলের মধ্যে ইষ্টক দ্বারা খাঁটুরার বাজার গৃহ নির্ম্মাণ, একটী অবৈতনিক চতুষ্পাঠী স্থাপন, ও দরিদ্রগণের সাহায্য দান, এই কয়েকটী প্রধান। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, বিনোদিনী শেষোক্ত কার্য্য দুইটীর জন্য এককালীন ৫০০০৲ টাকা শ্রীযুক্ত ভূতনাথ পালের নিকট জমা রাখিয়াছেন। তিনি উক্ত টাকা গুলি খাটাইয়া, মাসিক ত্রিশ টাকা করিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন দত্তের নিকট প্রদান করেন। ক্ষেত্র বাবু উক্ত ত্রিশ টাকার মধ্যে ২০৲ টাকা চতুষ্পাঠীতে ও ১০৲ টাকা দরিদ্রগণের সাহায্যার্থে ব্যয় করিয়া থাকেন।

খাঁটুরা গ্রামের সর্ব্ব প্রকার দেশহিতকর কর্ম্মে ক্ষেত্রমোহন বাবুকে উদ্যোগী দেখিতে পাওয়া যায়। কুশদ্বীপের উন্নতির জন্য 'কুশদহ' নামে একখানি পাক্ষিক সংবাদ পত্র প্রচার করিয়াছিলেন। নানা কারণে বার্ত্তাবহ স্থায়ি হয় নাই। সুলভ সমাচারের সহিত মিলিত করিয়া কুশদহকে পুনর্জ্জীবিত করা হইয়াছিল। খাঁটুরা বঙ্গবিদ্যালয় ক্ষেত্রমোহনের যত্নে পরিচালিত। গ্রামস্থ বালিকাগণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য তিনি কয়েকবার পাঠালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। যে গ্রামে বালকগণ বিদ্যোপার্জ্জনে রত নহে, তথায় বালিকা বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা লোকের বোধগম্য হওয়া অসম্ভব। কলিকাতার ন্যায় মহানগরীতে বালিকা বিদ্যালয়ের উপযোগীতা সাধারণে স্বীকৃত হয় নাই। কেহ আপন কন্যাকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করিলে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণের স্মরণ গ্রহণ ভিন্ন সুবিধাজনক স্থান পাইবেন না; এ অবস্থায় খাঁটুরার মত পল্লীতে বালিকা বিদ্যালয় তিষ্ঠিতে পারে না। ক্ষেত্র মোহন ও তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র বসন্তকুমার তাম্বুলী সমাজের প্রথম কৃতবিদ্য। তাঁহাদের বিদ্যাবত্তায় স্বজাতিয়েরা ভীত হইয়াছিল। ইহাতে ইংরাজী শিক্ষার দ্বার আত্মীয়গণের নিকট উদ্ঘাটিত হইতে পারে নাই। তাঁহারা দুইজনেই ব্রাহ্ম হইলেন; ব্রাহ্মদের দোষ এই, হিন্দু আচার ব্যবহারকে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখেন। ...

আজ্ঞার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন না, ইহাতে অভিভাবকগণ নিতান্ত ব্যথিত হইয়া থাকেন, তাহাতে ব্রাহ্ম সন্তানের স্বকীয় উন্নতি হইতে পারে বটে, কিন্তু তিনি যে সমাজে জন্মিয়াছেন, তাহার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে হয়। সুতরাং তাঁহা দ্বারা বংশের কোন উপকার হয় না। স্বাত্মবর্ত্তিতা দোষাবহ নহে, হিন্দু সমাজ ইহা বুঝেন না, ব্রাহ্মগণও তদ্রূপ। অশিক্ষিতেরা কেমন করিয়া বুঝিবে, এই ভাবিয়া শিক্ষিতগণের উদারতা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। হিন্দুধর্ম্ম স্থিতিস্থাপকতা গুণ বিশিষ্ট, তাহার মত ও বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন করাইতে পারা যায়। কিন্তু ক্রমশঃ সহ্য করাইতে হয়। ব্রাহ্মগণ প্রশান্তভাবে কার্য্য করিলে একটি পৃথক জাতির সৃষ্টি করিতে হইত না। বোম্বাই প্রদেশের ব্রাহ্মগণ হিন্দু সমাজকে পরিত্যাগ করেন নাই, তাঁহারা হিন্দু থাকিয়া হিন্দু সমাজকে সংস্কৃত করিতে চাহেন। বঙ্গীয় ব্রাহ্ম কহিবেন, যাহাই কেন হউক না, কপটতার প্রশ্রয় দিতে পারি না। স্বর্গও যদি চূর্ণ হইয়া যায়, তথাপি ন্যায়কে রাজত্ব করিতে দিতে হইবে। এই কথা অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় সন্দেহ নাই। নিজে ত্যাগ স্বীকার না করিলে পরের উপকার করিতে পারা যায় না। সমাজের মঙ্গল করিতে হইলে আপনাকে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করিতে হইবে। স্বানুবর্ত্তিতা খর্ব্ব করিয়া সমাজানুবর্ত্তিতা বৃদ্ধিকরা উচিৎ, নতুবা সমাজ তোমার কথা শুনিবে না। যাহার সহিত সহানুভূতি নাই, তাহার বাক্য বা দৃষ্টান্তের প্রতি আস্থা প্রদর্শন করা অসম্ভব। মনুষ্য অগ্রে স্বীয় তদনন্তর পরিবারিক, পরে জাতীয়, সর্ব্বশেষে বিশ্বজনিন হিত কামনা করিবে, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। সোপান ত্যাগ করিয়া একেবারে সার্ব্বজনিক সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। ক্ষেত্রমোহনের শ্বশুর ব্রাহ্মমতাবলম্বিনী কন্যা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত কার্পেট সারমেয় শোভা সম্পাদনের জন্য ও প্রীতিচিহ্ন স্বরূপ গৃহভিত্তিতে আলম্বিত করিয়াছিলেন। ক্ষেত্রমোহন হিন্দুমতাবলম্বী শ্বশুর কর্ত্তৃক লিখিত "দুর্গানামের শিব"-চিত্র গৃহে স্থান দিতে পারেন নাই।

বিনোদিনীর উদ্দেশ্য অতি মহৎ—অতি উদার—অতি সুপ্রশংসিত। তিনি হিন্দু গৃহের বদ্ধ পক্ষ বিহঙ্গিনী হইয়া, নিজের পুণ্যানুষ্ঠান ও মৃতপতির পারলৌকিক শান্তির জন্য, যাহা করিবার, তাহা করিয়াছেন। পতিলোকে অনন্ত বাসাধিকারিণী হইবার ইহা অতি সুপ্রশস্ত সহজ পথ।

ধর্ম্মানুষ্ঠান ও শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপ।—কুশদ্বীপের মধ্যে কয়েকটী অতিথিশালা ছিল। প্রথমতঃ, খাঁটুরা নিবাসী স্বর্গীয় অনন্তরাম দত্ত মহাশয়ই এই পথের প্রথম প্রদর্শক। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর, এই পুণ্য কর্ম্মের লোপ হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান বংশধরেরা নিতান্ত অক্ষম নহেন; তথাপি পৈতৃক ধর্ম্ম ক্রিয়ার এককালে লোপ করিয়াছেন।

এই অতিথিশালা তিরোহিত হইলে, অনন্তরামের জ্ঞাতি স্বর্গীয় কালীকুমার দত্ত মহাশয় নিজ ভবনে এক অতিথিশালা সংস্থাপন করেন। এই অতিথিশালা আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কুশদ্বীপে রেলপথ প্রস্তুত হওয়ার পরে, এই অতিথিশালা নিতান্ত স্তিমিত ভাব অবলম্বন করিয়াছে। কালীকুমারের বর্ত্তমান বংশধরগণের ঐকান্তিক যত্ন থাকিলেও এখানে আজি কালি অতিথির সমাগম অত্যন্ত বিরল হইয়াছে। রেলপথ হওয়াতে সাধারণ লোক এক্ষণে প্রায়ই পথিমধ্যে অবস্থিতি করে না। পূর্ব্বে এই অতিথিশালা অতীব বিস্তৃত ছিল। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, গঙ্গাস্নানের কোনও যোগ উপস্থিত হইলে, কালীকুমার বা তাঁহার বংশধরগণ গ্রামস্থ অধিকাংশ ব্রাহ্মণের বাটীতে দুই একটী চুল্লী কাটিয়া রাখিতেন এবং নিজ অতিথিশালায় সঙ্কুলন না হইলে, প্রতিবেশী ব্রাহ্মণগণের বাটীতে অতিথিগণের স্থান করিয়া দিতেন ও সমস্ত ব্যয়ভার নিজেরা বহন করিতেন। প্রাণান্তেও কোন অতিথিকে বিমুখ হইতে দিতেন না। যোগের সময় অন্ধকারে অতিথিগণের আসিতে ক্লেশ হইবে বলিয়া ১০।১২ জন লোক আলোক হস্তে গ্রাম হইতে দুই তিন ক্রোশ পর্য্যন্ত গমন করিয়াও, অতিথিগণকে পথ দেখাইয়া মহাসমারোহে নিজ ভবনে লইয়া আসিতেন। ফলতঃ আজি কালিও উঁহার বংশধরগণের যত্নের কোনও ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু আজি কালি অতিথি সমাগম তাদৃশ হয় না।

গোবরডাঙ্গার ভূস্বামী মহাশয়গণের বাটীতেও অতিথি সেবা হইত; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণে আজি কালি সেখানেও অতিথির তাদৃশ সমাগম হয় না বলিয়া ভূস্বামী মহাশয়েরা উহা এককালে উঠাইয়া দিয়াছেন।

পূর্ব্বে মণিরাম রক্ষিত ও ভবানীপ্রসাদ রক্ষিত নামক দুই জন তাম্বুলী ছিলেন। তাঁহাদের বাটীতে [illegible]

অর্থ, প্রতি দিন গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণের বাজার করিবার জন্য যত অর্থ প্রয়োজন হইত ইহারা সেই অর্থ প্রত্যহ ব্রাহ্মণগণকে দান করিতেন। ব্রাহ্মণগণ, বাজারের সময় ইহাদের বাটীতে উপস্থিত হইয়া, দৈনন্দিন বাজার খরচ চাহিয়া লইয়া, বাজার করিয়া আসিতেন। তখনকার ব্রাহ্মণগণ প্রত্যহ যাহা ব্যয় হইত, তদতিরিক্ত এক কপর্দ্দকও অধিক যাজ্ঞা করিতেন না। তৎকালে কড়ি দিয়াই বাজার করিবার প্রথা ছিল, জিনিষ পত্রও তেমনই সুলভ ছিল।

খাঁটুরার বড় রক্ষিতদিগের আদিপুরুষ বিজয়রাম রক্ষিতের শ্রাদ্ধোপলক্ষে তদীয় পুত্র মণিরাম রক্ষিত দম্পতিবরণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ সেই শ্রাদ্ধোপলক্ষে এক সস্ত্রীক ব্রাহ্মণকে বরণ করেন এবং তাঁহাদিগের বংশধরগণের বাটী ঘর, নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া আজীবন তাঁহাদের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিবার ভার গ্রহণ করেন। দুঃখের বিষয়, এই ব্রাহ্মণদম্পতী কোন পুত্র পৌত্রাদি না রাখিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। মণিরাম ব্রাহ্মণদম্পতীকে অনেক অর্থ দান করেন। ব্রাহ্মণ প্রথমে কালগ্রাসে পতিত হইলে, ব্রাহ্মণী সেই বিপুল অর্থের অধিকারিণী হন। কিন্তু এই রমণীও নিঃসন্তান হওয়াতে ব্রাহ্মণী সেই অর্থে খাঁটুরার উত্তর প্রান্তরে এক সুদীর্ঘ বাপী খনন করাইয়া দেন। আজিও সেই বাপীকে সাধারণে ঠাকুরুণ পুকুর বলিয়া থাকে।

কুশদ্বীপের অনেক স্থানে পুরাণ পাঠও হইয়া গিয়াছে। এই পুরাণ উপলক্ষেও এক এক মহোৎসব হইত। কুশদ্বীপের মধ্যে যতগুলি পুরাণ হইয়াছে, সেই সকলের মধ্যে খাঁটুরা নিবাসী ৺সিদ্ধিরাম রক্ষিতের পুরাণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। এই পুরাণোপলক্ষে সিদ্ধিরাম খাটুরার নিত্য সমাজস্থ ব্রাহ্মণগণকে (অন্যূন ৩০০) প্রায় ৬০।৬৫ টাকা মূল্যের স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি দান করেন। এই পুরাণ শ্রবণ করিয়াই, স্বর্গীয় রামধন তর্কবাগীশ মহাশয় অভিনব কথকতার প্রণালী উদ্ভাবন করেন। খাঁটুরার বামোড় তীরে যে চণ্ডিকাদেবী আছেন, তাঁহার ইষ্টকময় বেদী এই সিদ্ধিরামই প্রথমে প্রস্তুত করিয়া দেন।

দেবালয় ও মন্দির প্রতিষ্ঠা।—কুশদ্বীপে যে সমস্ত দেবালয় ও মন্দির-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, সেই সকলের মধ্যে কুশদ্বীপপতি রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী চতুর্দ্ধুরীণ

ডাঙ্গার স্বর্গীয় জমীদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় কৃত দ্বাদশ শিবমন্দির সম্বলিত ৺ আনন্দময়ীর বাটী ;—খাঁটুরার স্বর্গীয় বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় কৃত বামোড়-তীরস্থ কালীবাটী ও তদীয় বাটী সংলগ্ন যুগল শিবমন্দির ; স্বর্গীয় কালীকুমার দত্ত কৃত তদীয় প্রধান পুষ্করিণীর ঘট্টসংলগ্ন শিবমন্দির দ্বয় ও স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় কৃত, তদীয় জননী কর্ত্তৃক উৎসর্গীকৃত বামোড়তীরস্থ ঘট্ট ও তৎসংলগ্ন শিবমন্দিরদ্বয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। এই সকল দেবালয় প্রতিষ্ঠার সময় কুশদ্বীপ সমাজের যাবদীয় ব্রাহ্মণ আমন্ত্রিত ও অতীব সমারোহ সহকারে কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছিল। সেই সেই সময়ে অনেক কাঙ্গালী, ফকির বৈষ্ণব, ভাট প্রভৃতিও যথোচিত আহার ও দান প্রাপ্ত হইয়াছিল। কাশী, নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, কুমারহট্ট, কামালপুর, প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থানের অধ্যাপকমণ্ডলীও এই সময়ে নিমন্ত্রিত হইয়া সভাস্থলে উপস্থিত ও উপযুক্ত পাথেয় ও বিদায় গ্রহণ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইছাপুরে যে চারিটী প্রাচীন দেবালয় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা জীর্ণাবশিষ্ট বটে, কিন্তু উহাদিগের কারু ও স্থপতি কার্য্য এতদূর উৎকৃষ্ট যে, সকলেই ঐ দেবালয় চতুষ্টয়কে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। ফলতঃ আমরা যতদূর অবগত হইয়াছি তাহাতে বলিতেছি, কুশদ্বীপপতি রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী চতুর্দ্ধুরীণ মহাশয়ের সহিত নদীয়ারাজ রাঘবের অত্যন্ত সম্প্রীতি ছিল। সেই সূত্রে নদীয়াপতির তনয় রুদ্র রায়, রঘুনাথ চতুর্দ্ধুরীণ মহাশয়কে পিতার ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। সেই জন্য, তিনি ঢাকা হইতে আলান বখস নামা অদ্বিতীয় স্থপতিকে আনাইয়া স্বকীয় চক, নাচ ঘর, পীলখানা ও নহবৎখানা প্রভৃতি সুদৃশ্য সৌধাবলী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই স্থপতি দ্বারাই এই দেবালয় চতুষ্টয় ও নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। তাহাতেই এগুলি এতাদৃশ উৎকৃষ্ট ও সুদৃশ্য হইয়াছিল। নতুবা প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত দেবালয়গুলি বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত নহে।

আমরা বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় কৃত যে কালীবাটীর উল্লেখ করিয়াছি, এক্ষণে তাহা বিলীন হইয়াছে। আজি কালি বামোড়তীরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে বাগান আছে, এই বাগানেই সেই কালীবাটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক, স্বর্গীয় কালীকুমার দত্ত মহাশয় মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়ও বিপুল উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠতনয় স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহিত ইছাপুরের স্বর্গীয় জমীদার যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী মহাশয়ের কথান্তর হওয়াতে, সমারোহের অনুষ্ঠান এককালে স্থগিত হয়, এবং নিয়ম রক্ষার ন্যায় কোনও প্রকারে প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন করেন। সমারোহের জন্য যে সমস্ত দ্রব্যাদি আহৃত হইয়াছিল, কালীকুমারের চতুর্থতনয় স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র দত্ত মহাশয় সেই সকল কলিকাতায় ফিরাইয়া আনেন।

এই সমস্ত মন্দির ও দেবালয় ব্যতীত, কুশদ্বীপবাসী প্রধানতঃ খাঁটুরাস্থ তাম্বুলীগণ বিদেশেও দুই চারিটি মন্দির ও দেবালয়াদির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সেই সকলের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টী অপেক্ষাকৃত উল্লেখ যোগ্য।

১। হয়দাদপুর নিবাসী উমেশচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ৺কাশীধামে যে যুগল শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাই প্রথম উল্লেখযোগ্য। ইনিই প্রথমতঃ এই পথের প্রদর্শক। ইহার সাত্ত্বিকতা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান লোক বিশ্রুত।

১২৬৩ সাল হইতে কাশীবাসী হইয়া ইনি যেরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানে দিনপাত করিতেছেন, তাহাতে ইহাকে আজি কালি দর্শন করিলে, ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত এক যোগরত তপস্বী বলিয়া সহসা প্রতীতি জন্মে। ইনি কুশদ্বীপের দাতা-প্রবর সুপ্রসিদ্ধ ভবানীচরণ রক্ষিত মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। কলিকাতার বড়-বাজারস্থ চিনিপটীতে যে রামকুমার রক্ষিতের লেন আছে, ইনি সেই রামকুমার রক্ষিতেরও জ্ঞাতিসম্বন্ধে ভ্রাতুষ্পুত্র। কুশদ্বীপের যে সমস্ত তাম্বুলী প্রথমে চিনির ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া, ইউরোপকে ভারতবর্ষীয় চিনির অমৃতরসাস্বাদন প্রদান করিয়াছিলেন, ইহার প্রপিতামহই তাঁহাদিগের অন্যতম ও অগ্রগণ্য ছিলেন।

উমেশচন্দ্র ১২২০ সালের ২৪এ মাঘ, দাতাপ্রবর ভবানীপ্রসাদের কনিষ্ঠ সহোদর শম্ভুচন্দ্রের ঔরসে এবং খাঁটুরাবাসী রামহরি রক্ষিতের কন্যা ব্রহ্মময়ীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। অতি কিশোরকালে উমেশচন্দ্র পিতৃহীন হইয়া, খাঁটুরার রামহরি রক্ষিত মহাশয়ের ভবনে মাতুলাশ্রয়ে বাস করিতে আরম্ভ করেন। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে, ১২৫৫ সালের ১০ই মাঘ দিবসে

ইনি কলিকাতাস্থ বর্ত্তমান ১৫৩/১ সংখ্যাত গৃহে চিনির ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এই ব্যবসায়ে তিনি দিন দিন লাভবান্ হইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু এই সময়ে তাঁহার মন ভগবচ্চিন্তায় একান্ত আসক্ত হইয়া উঠে। সেই জন্য তিনি আট বৎসর উত্তীর্ণ না হইতে হইতেই বিষয় কার্য্য তদীয় মাতামহের অন্যতর দৌহিত্রীতনয় শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র রক্ষিতের হস্তে অর্পণ করিয়া, ১২৬৩ সালের শ্রীপঞ্চমীতে সপরিবারে নৌকাযোগে ৺ কাশী যাত্রা করেন। নবীনচন্দ্রের কর্ত্তৃত্বাধীনে ব্যবসায় দিন দিন শ্রীবৃদ্ধিশালী হইতে লাগিল বটে, কিন্তু তিনি স্বদেশে বাস করিতে ইচ্ছা না করিয়া, এককালে কাশীবাসী হইতে কৃতসংকল্প হইলেন। তজ্জন্য তিনি সোনারপুরাতে এক দ্বিতল বাটী ক্রয় করিলেন এবং তাহাতে দুই শিবপ্রতিষ্ঠা করিয়া পারলৌকিক চিন্তাতে ব্যাপৃত রহিলেন। মধ্যে মধ্যে ইঁহার পরিবারাদিও খাঁটুরার বাটীতে আসিয়া বাস করিতেন।

১২৬১ সালের ২৪এ আশ্বিন তদীয় কনিষ্ঠতনয় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয় খাঁটুরাতে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি পিতৃসন্নিধানে থাকিয়া, তথাকার সংস্কৃত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। বহুকাল হইল, উমেশচন্দ্র বাসভবনাদি স্বীয় পুরোহিত মহাশয়কে দান করিয়া, খাঁটুরা হইতে এককালে সংস্রবশূন্য হইয়াছেন। ইঁহার কনিষ্ঠাত্মজ পূর্ব্বোক্ত দুর্গাচরণ ১২৭৮ সালে মনুসংহিতা পাঠকালে বৈশ্যোচিত "ভূতি" উপাধি ধারণ করিয়াছেন এবং পৈতৃক ব্যবসায় উপলক্ষ করিয়া এক্ষণে সপরিবারে কলিকাতায় বাস করিতেছেন। আশৈশব ইঁহার রীতি ও স্বভাব যেরূপ মধুর ও পূর্ণবিকসিত, তাহাতে ইনিও যে পৈতৃক গুণাবলীর সম্পূর্ণ উত্তরাধিকারী হইয়াছেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হইল, উমেশচন্দ্রের পুণ্যবলে তদীয় ব্যবসায় অক্ষুণ্ণ ও নিষ্কলঙ্কভাবে চলিয়া আসিতেছে। অনেকেই বলেন, প্রবঞ্চনা ও প্রতারণাশূন্য হইয়া ব্যবসা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারা যায় না। যাঁহাদিগের এই ধারণা আছে, তাঁহারা যেন উমেশচন্দ্রের ১৫৩/১ সংখ্যাত ভবনস্থ ব্যবসায়ের অনুকরণ করেন।

দস্যু ও তস্কর।—তখন দস্যু তস্করের ভয়ে অধিবাসিরা অত্যন্ত শঙ্কিত ও

তস্করের ভয়ে অতি দীনাবস্থায় কালাতিপাত করিত। এমন কি, ঋণের আদান প্রদান পর্য্যন্তও অতি সংগোপনে সম্পন্ন হইত। লোকের কর্ণগোচর হইবার আশঙ্কায়, ঋণপত্রে অন্য সাক্ষী না করিয়া, শুদ্ধ মাত্র ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়াই ঋণপত্র লিখিত হইত। পাছে, দস্যু তস্করের লোভপথে পতিত হইতে হয়, এই ভয়ে ধনিগণের অর্থ চন্দ্র সূর্য্যেরও গোচর হইত না। তাঁহারা স্ব স্ব ধন সম্পত্তি গৃহের প্রাচীর মধ্যে অথবা ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিতেন। সাধারণ লোকগণ গৃহের মধ্যস্থলে একটী গর্ত্ত করিয়া রাত্রিতে আভরণ ও তৈজসাদি তন্মধ্যে রাখিয়া, তদুপরি এক খানি কাষ্ঠফলক আচ্ছাদন করিয়া তাহার উপর শয্যারচনা করিতেন। অর্থবলে অট্টালিকাবাসে সমর্থ হইলেও লোকে পর্ণকুটীরে বাস করিত। স্থল পথ অপেক্ষা জল পথে আরও অধিক ভয় ছিল।

কুশদ্বীপের ভূস্বামীগণ চৌর্য্যাপরাধে অতি গুরুতর দণ্ড প্রদান করিতেন। শুনা গিয়াছে, তাঁহারা চোর ও দস্যুগণকে বিবিধ শারীরিক দণ্ড প্রদান করিতেন, সর্ব্বদা কারাবদ্ধ করিয়া রাখিতেন এবং তণ্ডুলের পরিবর্ত্তে ধান্য ভোজন করাইতেন। এতদূর শাস্তি বিধান করিয়াও, উহাদিগের উপদ্রব কিছু প্রশমিত হইত না। যবনাধিকারকালে ভূম্যধিকারীগণের উপর দেশ শাসনের যে ক্ষমতা ছিল, ইংরেজাধিকারের প্রারম্ভে তাহাও বিলুপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং এই সময়ে দস্যুদল অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে আবার অনেক জমীদার দস্যুদল পোষণ করতঃ দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই সেই দস্যু কখন কোম্পানির সৈন্যের পরিচ্ছদ পরিয়া লুটপাট করিত, কখন বা সন্ন্যাসী ও ফকিরের বেশ ধারণ করিয়া, লোকের সর্ব্বনাশ করিত। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের মন্বন্তরের পরে, অনেক কৃষকও চৌর্য্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল। তৎকালে ঠগ ও ডাকাইত নামে দুই প্রকার তস্কর সম্প্রদায় ছিল। তাহারা গ্রামে অগ্নি প্রদান করিয়া, লুণ্ঠন কার্য্য সম্পন্ন করিত। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে এই দস্যুরা কলিকাতায় ১৫০০০ গৃহ ও ২০০ লোক ভস্মসাৎ করে।

তখন এই দুর্দ্ধর্ষ দস্যুদল, লাঠী, সড়কি, তীর তরবারি লইয়া সাধরণের

তদনুরূপ ছিল। তাহারাও লাঠী, সড়কি, তীর, তরবারি লইয়া, সেই দুর্জ্জয় দস্যুবেগ বিমুখ করিত। তখনও প্রতিগ্রামে দুই একটী লাঠিয়াল, দুই একজন সড়কিওয়লা, দুই একজন তীরন্দাজ, এবং দুই চারি জন তরবারিধারী বীরপুরুষ বহির্গত হইত। তাহাদিগের প্রভাবেই, হয় ত, অনেক দস্যু দূর হইতে প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইত। সে দিন নবদ্বীপাধিপতি রাজা রামকৃষ্ণ সামান্ত বংশদণ্ডের সাহায্যেই, কৃষ্ণনগরের দুর্গতোরণে দ্বাদশ সহস্র বঙ্গীয় বীর পুরুষ সমবেত করিয়া, দুরন্ত মোগলসুবাদার মুরশিদকুলী খাঁকেও তৃণের ন্যায় জ্ঞান করিয়াছেন—দুর্জ্জয় আরঙ্গজীবের বিপুল মোগল-চমূর সম্মুখেও, একাদশবর্ষ রাজস্ব প্রদান না করিয়া দ্বিতীয় কৃতান্তের ন্যায় অখিল বঙ্গরাজ্যের ত্রাসদণ্ড হইয়া, সাধারণের মহাভীতি সমুৎপাদন করিয়াছিলেন। আবার যখন বর্গিগণের দুর্জ্জয় পৌনঃপুনিক আক্রমণে সমস্ত ভারতভূমি আলোড়িত হইতেছিল, নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও যখন সেই দুর্ব্বার অরাতিদলের ভয়ে সশঙ্কিত হইয়া, কৃষ্ণনগরের সুখময় রাজভবন ত্যাগ করিয়া, নসরৎ-বেড়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন—তখন কুশদ্বীপপতি কাশীশ্বর চৌধুরী মহাশয়, কয়েকটী বংশদণ্ডের প্রভাবেই সেই বিপুল অরিবাহিনী উপেক্ষা করিয়া স্বকীয় বক্ষঃস্থলে তাম্বুলী ও নবাগত ব্রাহ্মণগণকে স্থাপন করিয়া, মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দ করতঃ তাহাদিগকে অনুক্ষণ রক্ষা করিয়াছিলেন। এই লাঠীই একদিন আমদিগের ধন, মান ও প্রাণস্বরূপ ছিল। ইহার প্রভাবে দস্যু তস্করেরা আমাদিগের সর্ব্বস্বান্ত করিত বটে, কিন্তু তখনও আমরা এককালে হৃতসর্ব্বস্ব হই নাই।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে, কৃষ্ণনগরের পূর্ব্বাংশে ছয় ক্রোশের মধ্যে আশা নগর গ্রামে, বিশ্বনাথ, বৈদ্যনাথ ও পীতাম্বর নামে তিন জন প্রসিদ্ধ দস্যু ছিল। কোম্পানির রাজত্বের প্রারম্ভে নবদ্বীপের রাজগণের শাসনাধিকার লোপ পাওয়া প্রযুক্ত হউক অথবা কোম্পানির পুলিশদল পূর্ব্বোক্ত দস্যুগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়-মান হইতে অসমর্থ হইয়াই হউক, এই অঞ্চল দস্যু ও ডাকাইতগণের প্রধান আড্ডাস্বরূপ হইয়া উঠে। উহাদিগের ভয়ে কুশদ্বীপ দূরে থাকুক, সমগ্র বঙ্গ-দেশ এককালে অশ্বত্থপত্রের ন্যায় সর্ব্বদা কম্পিত হইত। ইহাদিগের অধীনে

ও বৈদ্যনাথ বাগ্দীজাতীয় ছিল। কথিত আছে, ইহারা ধনবান্ ব্যক্তিগণকে পত্র লিখিয়া দিবাভাগেই ডাকাইতি করিত। উহারা লিখিত, "তুমি অমুক সময়ে অমুক স্থানে, এত টাকা পাঠাইবে, যদি না পাঠাও, তবে অদ্য বা কল্য তোমার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইবে" এই পত্র পাইয়া অনেকেই প্রাণভয়ে টাকা পাঠাইয়া দিত। বিশ্বনাথের নলদহা, কৃষ্ণসর্দ্দার ও সন্ন্যাসীনামক তিন জন সর্দ্দার ছিল; উহাঁদিগের মধ্যে নলদহা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়া থাকিতে পারিত। এক সময়ে বিশ্বনাথ কালীপূজা করিতে মানস করে, কিন্তু পূজার ব্যয়োপযোগী টাকার অনেক অপ্রতুল ছিল। ইতিমধ্যে বিশ্বনাথের চরেরা আসিয়া বলিল, বৈদ্যপুরের নন্দীদিগের কালনাস্থ গদীতে দশ হাজার টাকা আসিয়াছে। তাহা শুনিয়া বিশ্বনাথ রাত্রিতে পিস্তল ও তরবারিধারী ৪ জন ডাকাইতকে সঙ্গে লইয়া, নৌকাযোগে কালনায় আসিয়া উপস্থিত হয় এবং উক্ত গদীর দারোগাকে ডাকাইয়া একরার নামা লিখাইয়া লয়। পরে বিশ্বনাথ নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া ধনাধ্যক্ষের নিকট গিয়া উক্ত দশ হাজার টাকা লইয়া আইসে। বিশ্বনাথের নাম শুনিয়া কেহ বাক্‌নিষ্পত্তি করিতেও সাহসী হয় নাই।

অন্য এক সময়ে, বিশ্বনাথ লোক মুখে শুনিতে পায় যে, নদীয়ার অন্যতম নীলকর স্যামুয়েল সাহেবের কুঠিতে কলিকাতা হইতে অনেক টাকা আসিয়াছে। সেই কথা শুনিয়া, বিশ্বনাথ স্বকীয় দলবল লইয়া রজনীযোগে সাহেবের বাঙ্গালা আক্রমণ করে। সাহেবের বিবি তখন প্রাণভয়ে আকুল হইয়া, উপায়ান্তর না দেখিয়া একটী কৃষ্ণবর্ণ হাঁড়ি মস্তকে স্থাপন করিয়া বাটীর সীমাস্থিত এক পুষ্করিণী মধ্যে ডুবিয়া থাকেন। সাহেব ডাকাইতদিগের হস্তগত ও তাহাঁদিগের আড্ডাতে আনীত হয়। ডাকাইতের সর্দ্দারগণ সাহেবকে বধ করিবার জন্য উপরোধ করে এবং জনৈক ডাকাইত শাণিত তরবারি উত্তোলন করিয়া সাহেবের প্রাণবধে উদ্যত হয় কিন্তু বিশ্বনাথ তাহাতে সম্মত না হইয়া সাহেব যাহাতে তাহাদের গুপ্তস্থান প্রকাশ না করেন এইরূপ শপথ করাইয়া লইয়া, ডাকাইতের হস্ত হইতে অসি কাড়িয়া লইয়া সাহেবকে ছাড়িয়া দিতে আদেশ করে। এদিকে সাহেব শপথ

নিকট গমন করিয়া আদ্যন্ত সকল কথাই প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তদানীন্তন পুলিশ, বিশ্বনাথের দুর্দ্দান্ত দলের সম্মুখীন হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য বিবেচনা করিয়া, ইলিয়াট সাহেব কলিকাতায় লিখিয়া পাঠাইলেন এবং কেল্লা হইতে সিপাহী পাঠাইতে অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে, কলিকাতার তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট সী, ব্লাকয়ার সাহেব জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের ভার গ্রহণ করিয়া ইলিয়ট সাহেবের সহযোগী হইলেন, এবং কলিকাতার ইউরোপীয়ান সৈন্য ও বিশ্বনাথের দলবলের সম্বাদপ্রদানসমর্থ কতকগুলি শান্তিপুরবাসী উপরগস্তি সঙ্গে লইয়া, নদীয়ায় উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই জনৈক উপরগস্তির মুখে শুনিলেন যে, সেই দিন বিশ্বনাথ ডাকাইতি করিতে গমন করিয়াছে। এই কথা শ্রবণ করিয়া সাহেব সদলে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, বিশ্বনাথের সর্দ্দারগণ বাটীর বাহিরে ঘাঁটি দিয়া, অস্ত্র সঞ্চালন করিতেছে, এবং তাহাদের অপরাপর লোকেরা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া গৃহস্থের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতেছে। ব্ল্যাকয়ার সাহেব সর্দ্দারগণের প্রতি অস্ত্রপ্রয়োগ না করিয়া জীবিতাবস্থায় বন্দী করিবার জন্য সিপাহীগণকে আদেশ করিলেন কিন্তু তাহারা তাহা অসম্ভব বলিয়া প্রতিবাদ করিল। তখন সাহেবেরা বহু কষ্টে ও বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া, উহাদিগকে বন্দী করিলেন। কিন্তু বিশ্বনাথের সন্ধান পাইলেন না। অবশেষে ১২১৫ বঙ্গাব্দে বা ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে, উহার দলভুক্ত দুই একজন ডাকাইতের বিশ্বাসঘাতকতায়, বিশ্বনাথ ও তাহার কতিপয় সঙ্গী এক বনমধ্যে আহারাদির আয়োজন করিতেছে এমন সময়ে পুলিশের হস্তগত হয় এবং ফাঁসিকাষ্ঠে আরোহণ করিয়া স্ব স্ব দুষ্কৃতির ফল ভোগ করে।

তৃতীয় অধ্যায়।

কুশদ্বীপবাসী।

কুশদ্বীপ-বাসীর পরিচয় দিতে হইলে অগ্রে ইছাপুরের জমীদার মহাশয় দিগের পরিচয় দিতে হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ৺রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় ইঁহাদের আদিপুরুষ। একারণ অগ্রে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের ইতিবৃত্ত লেখা যাইতেছে। পরন্তু এই ইতিবৃত্ত জনশ্রুতি মূলক। ৺রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় একজন মহাপুরুষ ছিলেন। ইনি শাস্ত্রে যেমন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন, যোগেও তেমনই বাক্‌সিদ্ধ। ইঁহার ন্যায় সত্যনিষ্ঠ, স্বধর্ম্মরত, অধ্যবসায়শালী পুরুষ অতি অল্পই শ্রুত হইয়া থাকে। ইঁহার এই অসাধারণ গুণ ও পুণ্যপ্রভাবেই ইঁহার বংশধরগণ আজিও কুশদ্বীপের শিরোভূষণ হইয়া রহিয়াছেন। যোগসিদ্ধি প্রভাবেই ইনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। ইনি সম্রাট্ আকবর, মহারাজ মানসিংহ ও ভবানন্দ মজুমদারের সমসাময়িক ছিলেন। ভবানন্দ যে সময়ে সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে ১০১৫ হিজরী বা ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে ফরম্যান্ প্রাপ্ত হইয়া নদীয়ার অধিপতি হন, তখন ইনিই ইছাপুরের ভূম্যধিকারীর আসনে আসীন থাকিয়া কুশদ্বীপ পরিচালন করেন। বোধ হয় ১৫৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই ইনি প্রাদুর্ভূত হন এবং যে সময়ে মহারাজ প্রতাপাদিত্য দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ সহকারে যশোহরে স্বকীয় শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন, সেই সময়ে ইনিও প্রভূত পরাক্রম ও যশঃসহকারে কুশদ্বীপের রাজাসন অলঙ্কৃত করিতে ছিলেন।

কথিত আছে, রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ এরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন যে, ইছাপুর হইতে ৺ভাগীরথী আট্‌ক্রোশ দূরবর্ত্তী হইলেও, ইনি প্রত্যহ প্রত্যূষে উঠিয়া, ভাগীরথীতে স্নান করিতে যাইতেন এবং তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া

সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের সম্বন্ধে এতদ্দেশে অনেক জনপ্রবাদ আছে। তন্মধ্যে মহারাজ প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধীয় জনশ্রুতিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রচলিত। সেইজন্য আমরা নিম্নে উহা প্রকটন করিলাম।

এক সময়ে কোন ব্রাহ্মণ কন্যাভারগ্রস্ত হইয়া মহারাজ প্রতাপাদিত্যের রাজসভায় গমনোদ্যত হন। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় তাহা শ্রবণ করিয়া, সেই ব্রাহ্মণকে স্বকীয় সভায় আহ্বান করেন এবং মহারাজ প্রতাপাদিত্যের দান-গ্রহণ করিতে নিষেধ করেন। তাঁহার কন্যার বিবাহকার্য্য সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় নিজেই সম্পাদন করেন।

কোনও দুষ্টাশয় এই কথা মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কর্ণগোচর করে। তাহাতে মহারাজ প্রতাপাদিত্য ক্রোধান্ধ হইয়া, সিদ্ধান্তবাগীশকে সমুচিত দণ্ডবিধান করিবার জন্য সসৈন্যে ইছাপুরাভিমুখে আগমন করেন ও গোবর-ডাঙ্গার অনতিদূরে যমুনার দক্ষিণ-পূর্ব্বে শিবির সন্নিবেশ করেন।

এই কথা সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের কর্ণগোচর হইলে, সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় প্রত্যূষে স্নানাহ্নিক করিয়া ছদ্মবেশে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের শিবিরে গমন করিলেন এবং শাস্ত্র-বিচারে সভাস্থ সকলকেই নিরুত্তর ও পরাস্ত করিলেন। এইরূপে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের শিবিরে ২।৪ দিন যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

পরিশেষে একদিন সভায় গমন করিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "আজি পূর্ণিমা, সকাল সকাল গাত্রোত্থান করা যাউক।" কিন্তু সে দিন পূর্ণিমা নহে, সম্পূর্ণ অমাবস্যা। ইহাতে সভাস্থ যাবদীয় পণ্ডিত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং এরূপ ভ্রমপ্রমাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় কহিলেন— "মহারাজ। যদি আজি রাত্রিতে চন্দ্রোদয় হইতে না দেখিতে পান, তাহা হইলে তখন আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া ভৎর্সনা করিবেন।

এই কথার পরে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় যমুনা নদীতে স্নান করিয়া নিজ-ভবনে গমন করিলেন এবং সেই সময় হইতে সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত যোগাসনে উপবেশন করিয়া জপ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার কিয়ৎপরে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় জপ সমাপন করিয়া উত্থিত হইলেন এবং পুনরায় মহরাজ প্রতাপা-

দিত্যের শিবিরে গমন করিলেন। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়কে দেখিয়া সকলেই "চাঁদ কৈ, চাঁদ কৈ" বলিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল। তখন সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় প্রতাপাদিত্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"মহারাজ! হস্তপদাদি প্রক্ষালন করতঃ কৃতশুদ্ধি হইয়া আমার গাত্র স্পর্শ করুন।—" মহারাজ তদ্রূপ করিয়া দেখিলেন, গগনমণ্ডলে পূর্ণচন্দ্র বিমলভাস্বরে বিরাজ করিতেছেন।

এই অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া মহারাজ প্রতাপাদিত্য সাতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়কে শতমুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে মহারাজ প্রতাপাদিত্য গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের পদতলে পতিত হইলেন এবং তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

তখন সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় নিজের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিয়া কহিলেন—"মহারাজ! আপনার খ্যাতিলোপ বা সম্ভ্রমনাশের জন্য আমি ব্রাহ্মণকে আপনার রাজসভায় যাইতে নিষেধ করি নাই। আপনি ব্রাহ্মণকন্যার বিবাহকার্য্য সমাধা করিয়া দিলে, শূদ্রের দান গ্রহণ জন্য ব্রাহ্মণকে পতিত করিতেন এবং ব্রাহ্মণকে পতিত করার জন্য নিজেও পতিত হইতেন। মহারাজ আমি সেই জন্যই ব্রাহ্মণকে আপনার নিকট যাইতে নিষেধ করিয়াছিলাম এবং দাতা গৃহীতা উভয়কেই পাতিত্য হইতে রক্ষা করিয়াছি। ইহা ভিন্ন আপনার বিপক্ষতাচরণ করা আমার উদ্দেশ্য নহে।"

সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের এই যুক্তিযুক্ত কথা শুনিয়া মহারাজ প্রতাপাদিত্য আরও অধিক সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করা দূরে থাকুক, যাহাতে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় তাঁহার উদ্ধতাচরণাপরাধ মার্জ্জনা করেন, তজ্জন্য শত শত বার কাতরে প্রার্থনা করিলেন।

এইরূপে মহারাজের সহিত সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের সখ্যতা স্থাপিত হইলে, সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় একদিন মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে আহার করাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু আমি নিজাধিকার ভিন্ন অন্যত্র আহার করি না বলিয়া, সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন। ইহাতেও সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় নিবৃত্ত হইলেন না। তিনি

রাজ! এক্ষণে প্রতাপপুর আপনার অধিকারভুক্ত হইয়াছে। সুতরাং নিজাধিকারে অবস্থিতি করিয়া অনায়াসেই আমার আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারেন।"

এইবার মহারাজ প্রতাপাদিত্য সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়কে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। সুতরাং সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় তাঁহাকে সুচারুরূপে ভোজন করাইলেন। তদবধি আজি পর্যন্তও সেই স্থান প্রতাপপুর নামে খ্যাত হইয়া রহিয়াছে।

এই সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের বংশাবলীর সহিত খাঁটুরা গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানের ইতিহাস সমসূত্রে গ্রথিত এবং ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয়ের পুত্র রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী চৌধুরী মহাশয়ের সময়েই তাম্বুলীগণ সপ্তগ্রাম হইতে আসিয়া বড়া, কাওলা, বনগ্রাম, শিমুলপুর, মধুসূদনকাটি, বিষ্ণুপুর, মল্লিকপুর ও লক্ষ্মীপুর প্রভৃতি স্থানে বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সময় হইতেই কুশদ্বীপ শুক্লপক্ষের শশধরের ন্যায় দিন দিন উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল। এই মহাপুরুষই ইছাপুরের সৌধাবলী, নবরত্ন, যোড়বাঙ্গালা, নাটমন্দির, দোলমঞ্চ, ও মঠমন্দির প্রভৃতি অপূর্ব্ব কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া, ইছাপুরকে অমরাবতীর ন্যায় সুসমৃদ্ধ নগরে পরিণত করিয়া যান। বস্তুতঃ উক্ত অট্টালিকা সমূহে এরূপ শিল্প-চাতুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় যে উহা দেবনির্ম্মিত বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। সেই জন্য, আজিও এতদঞ্চলের লোকগণের বিশ্বাস যে, রঘুনাথ চৌধুরী মহাশয়, প্রপিতামহ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের ন্যায় সিদ্ধ হইয়া দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা ঐ সকল নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী চৌধুরী মহাশয়ই জমীদারীর বহুল উন্নতি সাধন করেন এবং নবাব সরকার হইতে চৌধুরী উপাধি লাভ করিয়া, বঙ্গদেশীয় ভূস্বামিগণের শ্রেণীভুক্ত হন।

রঘুনাথ চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র রামেশ্বর চৌধুরী ও মধুসূদন চৌধুরী মহাশয়ও পূর্ব্বোক্ত অট্টালিকা সমূহের সংস্কার ও পিতৃনির্ম্মিত সৌধাবলী বর্দ্ধিত করিয়া ইছাপুরের বহুল উন্নতি সাধন করেন।

ইছাপুরের চৌধুরী মহাশয়গণের বংশাবলী নিরূপক তালিকা।

ধৃতি কান্যকুব্জবাসী।
|
দক্ষ (আদিশূর রাজার যজ্ঞে আনীত।)
|
কাকত্য (হড়োগ্রামবাসী।)
|
হৃদ্ধভিদাস
|
শ্রীমান্
|
পশুপতি
|
শ্রীকর রাঘব
|
কমল
|
নীলকণ্ঠ ঠাকুর
|
প্রজাপতি
|
জগদীশ তর্কাচার্য্য

রাঘব সিদ্ধান্ত বাগীশ

১ কৃষ্ণ, ২ রামচন্দ্র সার্ব্বভৌম, ৩ সনাতন ৪ গোপাল ৫ কন্দর্প

রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী চতুর্দ্ধুরীণ

রাজেন্দ্র, রামেশ্বর মধুসূদন যাদবেন্দ্র

কাশীশ্বর, শ্রীকৃষ্ণদেব, চাঁদশেখর, হরিরাম

বামদেব গোবিন্দরাম * পঞ্চানন রামচরণ * (নবঠাকুর) হরিবোল

রামচন্দ্র শ্যামচন্দ্র

কালীবর বিশ্বম্ভর দেবীবর যজ্ঞেশ্বর (দত্তক)

নারায়ণ ইন্দ্রনারায়ণ বিধুভূষণ গঙ্গামণি

হেমচন্দ্র কন্যা
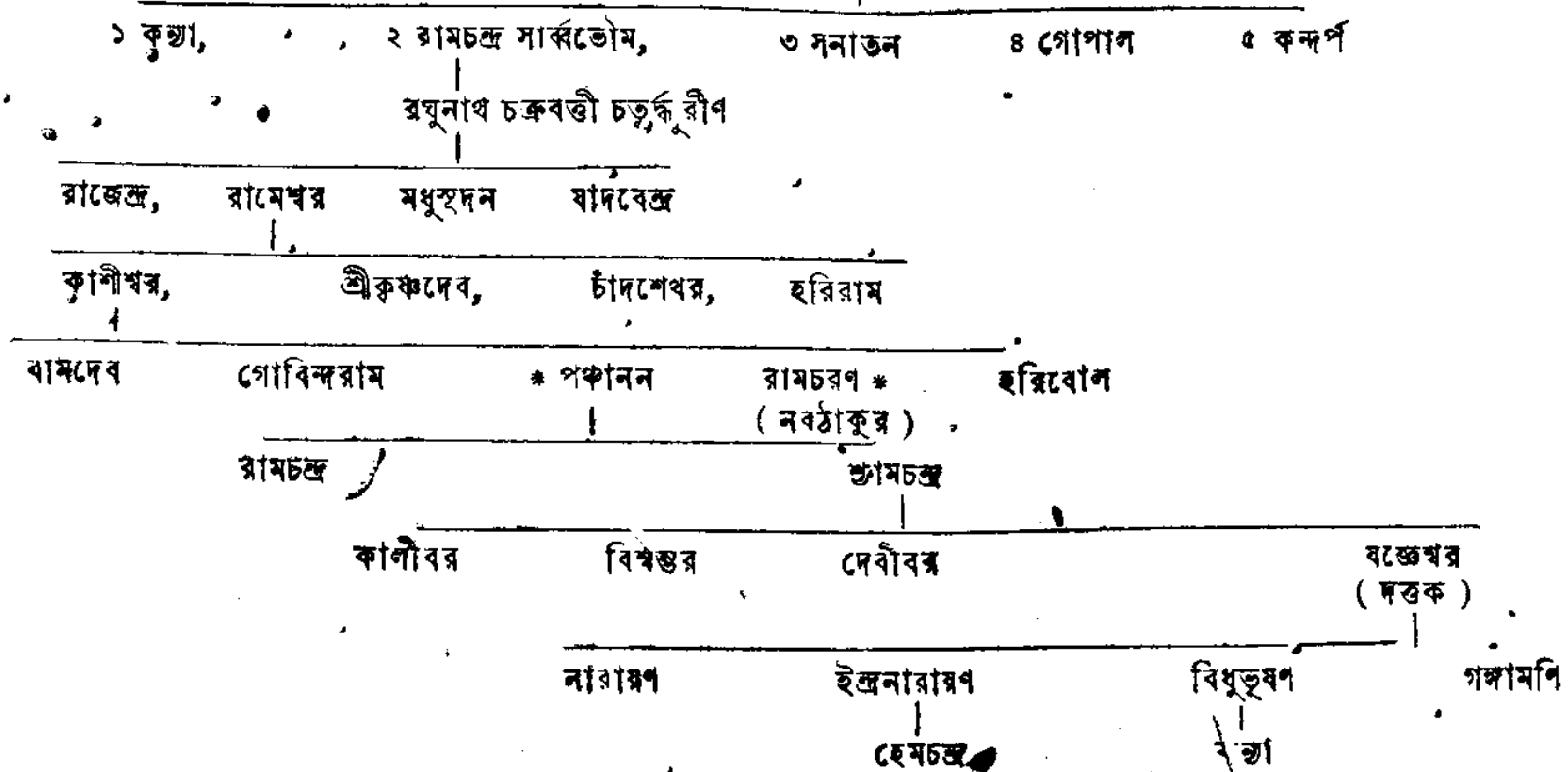
* পঞ্চাননের কন্যা কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ শিবচন্দ্রের ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিবাহ করেন এবং রামচণের কন্যাকে খেলারাম

অধিকন্তু, মধুসূদন চৌধুরী মহাশয়ই পিতৃপ্রতিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তি গুলির যথারীতি সেবা করাইবার জন্য ইছাপুর নিবাসী সরখেল ব্রাহ্মণগণকে প্রাগুক্ত দেবালয় সকলের পরিচারক রূপে নিয়োজিত করেন। পরে, তাম্বুলীগণ খাঁটুরায় বাসভবন প্রস্তুত করিলে, পুরোহিতের জন্য উহাদিগের ক্রিয়াকলাপ এক প্রকার বন্ধ ছিল। কিন্তু মধুসূদন চৌধুরী মহাশয় সরখেল মহাশয়দিগকে ইহাদিগের পৌরহিত্যে নিয়োজিত করিয়া দেন। তৎপরে বেড়েলা বৈঁচি হইতে তাম্বুলীগণ কর্তৃক আনীত সাণ্ডিল্য ব্রাহ্মণগণ লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন।

মধুসূদনের পরলোকান্তে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র কাশীশ্বর চৌধুরী মহাশয়, বিষয়াধিকারী হন। ইহার সময়েও ইছাপুরের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কাশীশ্বর স্বকীয় তৃতীয়পুত্র রামচরণের হস্তে জমীদারীর ভার অর্পণ করিয়া স্বর্গারোহণ করেন।

রামচরণ চৌধুরী মহাশয়ের বংশধরগণ নবঠাকুরের বংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার সময় হইতেই খাঁটুরা গোবরডাঙ্গার ইতিহাস এক নূতন জগতে পদার্পণ করেন। এই রামচরণ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট সারসা নিবাসী শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি খাঁটুরার পাটোয়ারি কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। খাঁটুরার ঘটক মহাশয়দিগের বাটীর পূর্ব্বধারে এবং সদর রাস্তার পশ্চিম ভাগে চৌধুরী মহাশয়গণের কাছারি ছিল। শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সেই কাছারির নায়েব বা পাটোয়ার ছিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কুলমর্য্যাদা ও অসাধারণ গুণরাশি দেখিয়া, রামচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অত্যন্ত মোহিত হন এবং তাঁহার সহিত নিজ কন্যার পরিণয় কার্য্য সমাপন করেন এবং খাঁটুরার আয়ের অষ্টমাংশ সেই বিবাহের যৌতুক স্বরূপ স্বকীয় কন্যাজামাতাকে প্রদান করেন। এই বিবাহে শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দুইপুত্র উৎপন্ন হয়। জ্যেষ্ঠ জগন্নাথ ও কনিষ্ঠ খেলারাম।

শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বর্গান্তে খেলারাম মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই মাতামহ প্রদত্ত জমীদারীর অধিকারী হন। শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় জমীদারীর অংশ পাইয়া গোবডাঙ্গায় এক প্রকাণ্ড বাটী নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু খেলারাম মুখোপাধ্যায় মহাশয় পিতার পরলোকান্তে সেই বাটী ত্যাগ করিয়া

ক্রমে ক্রমে বাড়াইতে লাগিলেন। এদিকে এই সময় হইতেই চৌধুরী মহাশয়গণের প্রভুত্ব ও সম্পত্তি হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল এবং তাঁহাদের ভাগ্যলক্ষ্মী মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণেরই অঙ্কশায়িনী হইলেন। এক্ষণে এই খেলারাম মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বংশধরগণই খাঁটুরা গোবরডাঙ্গার সর্ব্বেসর্ব্বা, সমাজপতি ও একমাত্র ভূস্বামী।

অধ্যাপক মণ্ডলী।

এক সময়ে যাঁহাদের বিদ্যার বিমল জ্যোতিঃ কুশদ্বীপকে উদ্ভাসিত করাতে উহা বঙ্গের শীর্ষ স্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল; দেশ বিদেশ হইতে অধ্যাপক ও ছাত্রমণ্ডলী যাঁহাদের গুণে আকৃষ্ট হইয়া কুশদ্বীপে আগমন করাতে কুশদ্বীপবাসীর পরিচয় হইত, রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের পরেই এক্ষণে তাঁহাদের নামের তালিকা ও স্থূল স্থূল বিবরণ প্রকটন করিলাম।

১। স্মার্ত্ত অনন্তরাম বিদ্যাবাগীশ।
২। " কালীকিঙ্কর তর্কবাগীশ।
৩। নৈয়ায়িক গৌরমোহন ন্যায়ালঙ্কার।
৪। " রাম রাম তর্কালঙ্কার।
৫। স্মার্ত্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যানিধি।
৬। " ভৈরবচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
৭। " বৈয়াকরণিক ও নৈয়ায়িক রামরুদ্র ন্যায়ালঙ্কার।
৮। " রামপ্রাণ বিদ্যাবাচস্পতি।
৯। " রামকানাই বিদ্যাচঞ্চু।
১০। " নৈয়ায়িক রামকুমার ন্যায়পঞ্চানন।
১১। " বৈদ্য রামগতি বিদ্যানিধি।
১২। " রামরত্ন তর্কসিদ্ধান্ত।
১৩। " বিশ্বম্ভর ন্যায়রত্ন।
১৪। " কেদারনাথ কবিকুণ্ঠ।
১৫। " কালীকিঙ্কর বিদ্যাভূষণ।
১৬। বৈয়াকরণিক [illegible]

১৭। „ কবি রামধন তর্কবাগীশ, কথক।

১৮। „ কথক উমাকান্ত শিরোমণি।

১৯। „ বৈয়াকরণিক ও বৈদ্য ভগবান্ বিদ্যালঙ্কার—জ্যোতিষী।

২০। „ রাজীব তর্কভূষণ।

২১। „ নৈয়ায়িক গোবিন্দচন্দ্র ন্যায়বাগীশ।

২২। „ কালাচাঁদ তর্কবাগীশ।

২৩। „ কালীচরণ বিদ্যারত্ন।

২৪। „ দশকর্ম্মবিদ্ হরমোহন সার্ব্বভৌম।

২৫। „ কথক ধরণীধর শিরোমণি।

২৬। „ যদুনাথ চূড়ামণি।

২৭। „ সাহিত্যাধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

অনন্তরাম বিদ্যাবাগীশ, কালীকিঙ্কর তর্কবাগীশ ও গৌরমোহন ন্যায়ালঙ্কার—খাঁটুরায় আসিয়া রূপনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের যে সমস্ত সন্তান সন্ততি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের সকলের মধ্যে উপরি উক্ত তিন মহাত্মাই শাস্ত্রানুশীলনে সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে প্রথমোক্ত দুইজন স্মৃতিশাস্ত্রবিশারদ ছিলেন। কালীকিঙ্কর তর্কবাগীশ, অনন্তরাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে উভয়ের মধ্যে মনান্তরছিল। কলিকাতার হাতীবাগানে অনন্তরাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের এক চতুষ্পাঠী ছিল এবং তিনি অনেক ছাত্রের অধ্যাপনাকার্য্য সমাধা করিতেন। শোভাবাজারের রাজবাটীতে অনন্তরামের বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। একদা ঘটনা ক্রমে অনন্তরাম রাজবাটীতে এক ব্যবস্থা দেন। ঐ ব্যবস্থা ভ্রম-সঙ্কুল। সুতরাং অন্যান্য অধ্যাপকগণ তাহাতে অনন্তরামের দোষ প্রদর্শন করিয়া অনন্তরামকে অপদস্থ করিবার উপক্রম করেন। তখন অনন্তরাম বিচারার্থী হইলেন। তদনুসারে শোভাবাজারপতি যাবদীয় ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া অনন্তরামের সহিত বিচার করিবার জন্য এক দিনস্থির করিলেন।

এদিকে অনন্তরাম স্বকীয় ব্যবস্থার ভ্রম দেখিতে পাইলেন এবং মহাভীত হইয়া সত্বরে কালীকিঙ্করের নিকট উপস্থিত হইলেন। কালীকিঙ্কর ছাত্রগণকে পাঠ বলিয়া দিতে ছিলেন, এমন সময়ে অনন্তরাম আসিয়া কালীকিঙ্করের

দ্বারে উপস্থিত হইলেন। কালীকিঙ্কর, শশব্যস্তে গাত্রোত্থান করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক গুরুদেবের পদধূলি গ্রহণ করিলেন এবং এরূপ অতর্কিত-ভাবে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

তখন অনন্তরাম কালীকিঙ্করকে নিভৃতে লইয়া গিয়া কহিলেন,—"বৎস॥ কালি! এইবার আমার সর্ব্বনাশ হইল!—তখন কালীকিঙ্কর মহা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "কেন? কি হইয়াছে?"

অনন্তরাম আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিলেন। তখন কালী-কিঙ্কর গুরুকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন—"ভয় নাই! কালি যখন আপনি সভায় গমন করিবেন, তখন শিষ্যবেশে আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন এবং নিজে বিচার না করিয়া আমার উপরেই বিচার-ভার প্রদান করিবেন। পরে যখন আমি বিচারে পরাভূত হইব, তখন কথা কহিবেন।—

কালীকিঙ্কর গুরুকে এইরূপ প্রবোধ প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন এবং সে দিন ছাত্রবর্গকে আর পাঠ না দিয়া, উক্ত ব্যবস্থার পক্ষপূরক একখানি ব্যবস্থা চূর্ণক প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। সমস্ত দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া কালীকিঙ্কর সেই চূর্ণক খানি প্রস্তুত করিলেন এবং ২১৫ হইতে আরম্ভ করিয়া উক্ত চূর্ণকের পত্রাঙ্ক প্রদান করিলেন। পরে চূর্ণক খানি যথাস্থানে স্থাপন করিয়া স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া গুরুদেবের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে, তাঁহার গুরুদেবও যথা সময়ে উপস্থিত হইলেন। কালীকিঙ্কর গুরুর সমভিব্যাহারে রাজবাটীতে গমন করিলেন। গমনকালে কালীকিঙ্কর একজন ছাত্র সঙ্গে লইয়া গেলেন।

এদিকে, অধ্যাপকগণ সকলেই অনন্তরামের প্রতীক্ষা করিতেছেন এবং অনন্তরাম আসিতেছেন না দেখিয়া, অনন্তরাম লজ্জায় পলায়ন করিয়াছেন, সকলেই এই বলাবলি করিতেছেন, এমন সময়ে অনন্তরাম সশিষ্য সভায় উপ-স্থিত হইলেন এবং সর্ব্বাগ্রে কালীকিঙ্করকে দেখাইয়া ছাত্রের সহিত বিচার করিতে কহিলেন। কালীকিঙ্করের সহিত সকলেরই ঘোরতর বিচার হইল, কিন্তু কেহই কালীকিঙ্করকে পরাভব করিতে পারিলেন না। বরং কালীকিঙ্কর সেই চূর্ণকের দোহাই দিয়া জয়লাভ করিলেন। তখন অধ্যাপকমণ্ডলী সেই চূর্ণক স্বচক্ষে দেখিতে চাহিলেন। কালীকিঙ্কর

চূর্ণকখানি যেস্থানে ছিল, বলিয়া দিয়া আনিতে আদেশ করিলেন এবং কহিলেন সমস্ত চূর্ণকখানি না আনিয়া শুদ্ধ চূর্ণকের ২১৫ পৃষ্ঠা হইতে ২৫০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত আনিও। ছাত্র তাহাই করিলেন। তখন অধ্যাপকবর্গ প্রকৃত চূর্ণক দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ও কালীকিঙ্করের নিকট পরাভব স্বীকার করিলেন। পরে গুরু ও শিষ্য উভয়েই মহাহর্ষে বাটীতে আগমন করিলেন।

এদিকে কালীকিঙ্কর ভাবিলেন, সভায় জয়লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু এ ব্যবস্থানুসারে কার্য্য হইলে, কার্য্যটী নিতান্ত পণ্ড হয়। তজ্জন্ত তিনি তৎ পরদিন গুরুদেবের সহিত রাজ বাটীতে গমন করিয়া রাজাকে কহিলেন—"মহারাজ! মতান্তরে এইরূপ ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু বঙ্গদেশে এ মতানুসারে কোন কালে কার্য্য হয় নাই। অধ্যাপক মহাশয়গণ যে ব্যবস্থা দান করিছেন তদনুসারেই ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। সুতরাং আমার মতে অধ্যাপক মহাশয়গণের ব্যবস্থানুসারেই আপনি কার্য্য সমাধা করুন। কালীকিঙ্করের এই যুক্তিযুক্ত কথা শুনিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন ও একবাক্যে সকলেই কালীকিঙ্করকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

এক্ষণে অনন্তরাম ও কালীকিঙ্কর উভয়েই পরলোকগত হইয়াছেন। কিছুদিন হইল, গোবিন্দ ন্যায়বাগীশ নামে খাঁটুরাতে যে একজন নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন, তিনি অনন্ত বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের প্রপৌত্র। কালীকিঙ্করের চন্দ্রকান্ত নামে এক পুত্র ছিল। কিন্তু এক্ষণে কালীকিঙ্কর নির্ব্বংশ হইয়াছেন। ইঁহার রচিত অনেক কবিতা আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকে। ইনি স্বহস্তে যেসকল গ্রন্থ লিখিয়াছেন সেই সকলের শেষেই নিজ নামের ভনিতা ও যে শকে লিখিত তাহার এক একটী কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা ১১৫৯ সালে কালীকিঙ্কর বিদ্যমান ছিলেন। এই কালীকিঙ্কর কোন সরকারি কার্য্যে বেতন গ্রহণ করিয়া, ম্লেচ্ছের বৃত্তি গ্রহণ অপরাধে স্বজাতীয়ের নিকট বিলক্ষণ অপদস্থ হন।

গৌরমোহন ন্যায়ালঙ্কার—ইনিও রূপনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বৃদ্ধ প্রপৌত্র। কলিকাতায় হাতিবাগানে ইঁহারও চতুষ্পাঠী ছিল এবং তাহাতে ছাত্রগণ অধ্যয়ন করিত। চিনিপটীর বিখ্যাত দোকানদার ভবানীপ্রসাদ

দ্বারা সময়ে সময়ে বিশেষ আনুকুল্য পাইতেন। ইহারই বৃদ্ধ প্রপৌত্র যদুনাথ চূড়ামণি একজন গুণশালী কথক হইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহাঁর গুণগ্রাম প্রসারিত না হইতে হইতেই ইনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। যদুনাথের পুত্র অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

রামরাম তর্কালঙ্কার—ইনিও রূপনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অন্যতম বৃদ্ধ প্রপৌত্র এবং ইনিই বর্ত্তমান বড়বাড়ীর শাণ্ডিল্যগণের আদিপুরুষ। খাঁটুরায় আসিয়া রূপনারায়ণের যে সকল সন্তান সন্ততি হয় তাঁহাদিগের সকলের মধ্যে ইনি সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানালোকসম্পন্ন ও বিখ্যাত। চিকিৎসা শাস্ত্রেও ইনি বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। ইনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র শম্ভুচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন। ইহাঁর নির্দ্দিষ্ট চতুষ্পাঠি ছিল না। ইনি সর্ব্বশাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন বটে, কিন্তু ইনি প্রধানতঃ চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ইহার সময় হইতেই বড়বাড়ীর শাণ্ডিল্যেরা ধনাঢ্য হইয়া উঠেন। ইহার সম্বন্ধে একটী গল্প প্রচলিত আছে।

এক সময়ে ইনি কোন অধ্যাপক সভায় বিচারার্থে নিমন্ত্রিত হন। সেই সময়ে মহারাজ শম্ভুচন্দ্রের সভাপতিও তথায় নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করেন। পরস্পর বিচারাদির পরে, ইনি কথায় কথায় মহারাজ শম্ভুচন্দ্রের নিন্দাবাদ করেন।

কিয়দ্দিবস পরে মহারাজ শম্ভুচন্দ্রের সভাপণ্ডিত সেই কথা মহারাজের কর্ণগোচর করেন। তাহাতে মহারাজ নিতান্ত কুপিত হইয়া রামরামকে ধরিবার জন্য চারিজন সোয়ার (অশ্বারোহী সৈন্য) পাঠাইয়া দেন। রামরাম এই কথা শুনিতে পাইয়া, দুই দিন বাটীর মধ্যে লুক্কায়িত থাকেন। কিন্তু পরিশেষে দেখেন, এরূপ লুকাইয়া থাকা বিড়ম্বনা মাত্র। আজি কালি বা দুই দিন পরে অবশ্যই ধরা পড়িতে হইবে। এই ভাবিয়া রামরাম অগত্যা ধরা দেন এবং উক্ত অশ্বারোহী চতুষ্টয়ের সহিত রাজ সভায় গমন করেন। রাজ সভায় উপস্থিত হইবামাত্র মহারাজ শম্ভুচন্দ্র কিছুমাত্র বিচার না করিয়া, রামরামকে যাবজ্জীবনের জন্য কারাবদ্ধ করেন।

থাকেন। রাজ সংসারে তখন দুইজন খ্যাতনামা রাজবৈদ্য ছিলেন। তাঁহারা ক্রমাগত কয়েক দিন পর্য্যন্ত দেখিয়া, রাজকুমারের পীড়ার কিছুমাত্র শান্তি করিতে পারিলেন না। একদিন রাজমহিষী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃপুরচারিণী সকলেই কাঁদিয়া উঠিল ও অন্তঃপুরে মহা গোলোযোগ উপস্থিত হইল।

এই কথা মহারাজের কর্ণগোচর হইল। সুতরাং মহারাজ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া শশব্যস্তে মহিষী সমীপে আগমন করিলেন। মহিষী নরপতিকে দেখিয়া আরও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন এবং কহিলেন—

"মহারাজ! যদি খাঁটুরার রামরাম তর্কালঙ্কার হইতেন, তাহা হইলে এত দিন কোন্ কালে রাজকুমার আরোগ্য লাভ করিতে পারিতেন। আপনার অনেক মহিষী আছেন, অনেক পুত্র সন্তান হইবারও সম্ভাবনা আছে। কিন্তু মহারাজ! দুঃখিনীর এইটীই একমাত্র অঞ্চলের ধন, অন্ধের যষ্টি! আমি ইহাকে হারাইয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিব?

শুনিয়া মহারাজের হৃদয় বিগলিত হইল; নয়ন যুগল অকস্মাৎ জলভারে পূর্ণ হইয়া আসিল। মহারাজ আর অন্তঃপুরে থাকিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে রাজসভায় আসিয়া, মন্ত্রীকে কহিলেন—"মন্ত্রিন্! এখনই খাঁটুরায় সোয়ার পাঠাইয়া রামরাম তর্কালঙ্কারকে লইয়া আইস। রাজ্ঞীর মুখে শুনিলাম উক্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় নাকি জনৈক বিখ্যাত কবিরাজ। যখন রাজবৈদ্যেরা এই কয় দিনে কিছুই করিতে পারিলেন না, তখন একবার তাঁহাকে আনাইয়া দেখান কর্ত্তব্য। আয়ু কেহই দিতে পারিবে না; তবে মনের ক্ষোভ রাখিবার প্রয়োজন নাই।"

শুনিয়া মন্ত্রী কহিলেন—"মহারাজ! খাঁটুরায় সোয়ার পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। রামরাম তর্কালঙ্কার রাজবাটীতেই বন্দীভাবে বাস করিতেছেন। তিনি রাজনিন্দাপরাধে যাবজ্জীবন কারাবদ্ধ আছেন।—"

মন্ত্রীর কথা শুনিয়া মহারাজ তৎক্ষণাৎ রামরামকে কারাগার হইতে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন এবং স্বয়ং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

আদেশ করিলেন এবং যাহাতে রাজকুমার সে যাত্রা রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন।

রাজার কথা শুনিয়া রামরাম কহিলেন—"মহারাজ! যখন বৈদ্যকুলতিলক প্রসিদ্ধ রাজবৈদ্যদ্বয় কুমারের চিকিৎসা করিতেছেন, তখন আমি সামান্য লোক হইয়া কিরূপে কুমারের চিকিৎসা করিব?—তবে যখন মহারাজ আদেশ করিতেছেন, তখন আমি অবশ্যই দেখিতেছি।—" এই বলিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় কুমারকে বিশেষ করিয়া দর্শন করিলেন। পরে কহিলেন—মহারাজ! কুমারের পীড়া অতি সামান্য মাত্র। বোধ হয় তিন দিনেই এ পীড়া আরাম হইতে পারে। কিন্তু মহারাজ! আমার নিকট কোনও ঔষধ নাই। পরের প্রস্তুত ঔষধও আমি ব্যবহার করি না।"

কুমারকে তিন দিনে আরাম করিবার কথা শুনিয়া, মহারাজ নিরতিশয় বিস্মিত হইলেন কিন্তু ঔষধের গোলযোগ শুনিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্নও হইলেন। এবং তর্কালঙ্কার মহাশয়কে তাহার উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন।

তখন তর্কালঙ্কার মহাশয় কহিলেন—"মহারাজ চিন্তিত হইবেন না। যখন আমার উপর মহারাজ এককালে নির্ভর করিয়াছেন, তখন অবশ্যই আমি উহার উপায় অবধারণ করিতেছি।" এই বলিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় দুই জন ভৃত্য সঙ্গে লইয়া জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং দুই চারিটী গাছ গাছড়া সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। পরে তাহাতেই তৎক্ষণাৎ ঔষধ প্রস্তুত করিয়া কুমারকে সেবন করাইলেন। দুইদিন ঔষধ সেবন করাইয়াই কুমার বিজ্বর হইলেন। তৃতীয় দিবসে কুমারকে পথ্য দিবার বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু ইহাতে মহারাজের বিশ্বাস হইল না। সুতরাং তিনি রাজবৈদ্যদ্বয়কে অন্তঃপুরে আহ্বান করিলেন এবং কুমারের রোগমুক্তি হইয়াছে কি না পরীক্ষা করিতে আদেশ করিলেন।

রাজবৈদ্যদ্বয় কুমারকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, কিন্তু রোগের কোনও লক্ষণ দেখিতে পাইলেন না। সুতরাং রাজবৈদ্যদ্বয় আর কোনও আপত্তি না করিয়া অগত্যা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ব্যবস্থায় সম্মতি প্রদান করিলেন। এবং উহা আসুরিক চিকিৎসা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

মহারাজ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের এই অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন এবং রাজসভায় আহ্বান করিয়া, এক যোড়া সূতার কাঁপড় ও নগদ ৫৲ টাকা প্রদান করিয়া, রাজকুমারের প্রাণের নিষ্ক্রয় স্বরূপ তর্কালঙ্কার মহাশয়কে কারামুক্ত করিয়া প্রাণ দান করিলেন।

তর্কালঙ্কার মহাশয় মুক্তি লাভ করিয়া, মহারাজকে যথোচিত আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং যথেষ্ট পুরস্কৃত হইয়াছেন বলিয়া বারম্বার ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

মুক্তি লাভ করিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় নিজভবনে প্রত্যাগমন করিতে অভিলাষ করিলেন এবং মহারাজের আদেশ প্রার্থনা করিলেন কিন্তু আরও দুই চারি দিন থাকিয়া কুমারকে স্নান করাইয়া, স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে মহারাজ আদেশ করিলেন। সুতরাং তর্কালঙ্কার মহাশয় আরও ২।৪ দিন রাজবাটীতে অবস্থিতি করিয়া অসংশয়িতরূপে কুমারকে আরোগ্য করিয়া স্বভবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

তর্কালঙ্কার মহাশয় মহারাজের নিকট হইতে বিদায় হইলে, রাজ্ঞী তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বিদায়বার্ত্তা শ্রবণ করিলেন এবং পুত্রের প্রাণদাতা কবিরাজের রীতিমত পারিতোষিক হয় নাই শুনিয়া পুনরায় কাঁদিতে লাগিলেন।

সেই কথা মহারাজের কর্ণগোচর হইল। মহারাজ আবার কোন বিপদাশঙ্কা করিয়া শশব্যস্তে রাজ্ঞীর নিকটে আগমন করিলেন এবং রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

তখন মহিষী কহিলেন—"মহারাজ! এখন দেখিতেছি, যখন একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রণের সহিত আমার পুত্রের প্রাণ এক করিয়াছেন, তখন আমার পুত্র আরোগ্য হওয়া অপেক্ষা মৃত হইলেই ভাল হইত। কারণ, আপনার পুত্রের প্রাণরক্ষা করিয়াছে বলিয়া, আপনিও ব্রাহ্মণকে কারামুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং আমার পুত্রের প্রাণ ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রাণ আপনার বিবেচনায় একই দাঁড়াইয়াছে। অতএব আমার পুত্রের মরণই ভাল ছিল।

ইহা শুনিয়া মহারাজ অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং রাজ্ঞীকে সান্ত্বনা করিয়া তৎক্ষণাৎ রাজসভায় আগমন করিলেন ও পুনরায় তর্কালঙ্কারকে আনাইবার জন্য সোয়ার পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রায় রাত্রির

নিকট আসিয়া পৌছিয়াছেন, দুই এক ক্রোশ মাত্র অবশিষ্ট আছে, এমন সময়ে অশ্বারোহীগণ আসিয়া পথিমধ্যে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পথরোধ করিল ও মহারাজের আদেশ জ্ঞাপন করিল। সেই কথা শুনিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় সাতিশয় ভীত হইলেন ; কিন্তু কি করিবেন, রাজাদেশ অবশ্যই পালন করিতে হইবে, এই ভাবিয়া পাল্‌কী ফিরাইয়া পুনরায় রাজসভায় উপনীত হইলেন।

রাজসমীপে উপস্থিত হইবামাত্র রাজা কহিলেন—তর্কালঙ্কার মহাশয়! আপনি যে পুরস্কার পাইয়াছেন তাহা কুমারের পথ্য প্রদান করিবার জন্যই আপনাকে দেওয়া হইয়াছে, নতুবা আপনি এখনও প্রকৃত পুরস্কার প্রাপ্ত হন নাই। আজি হইতে খাঁটুরার সন্নিকটে আপনাকে ২৫০ বিঘা ভূমি ব্রহ্মোত্তর দান করিলাম। আপনি পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে তাহা ভোগ করিবেন এবং এই লাল ঘোড়াটী ও নগদ ৫০০০ টাকা পাথেয় স্বরূপে গ্রহণ করুন।—"

এই বলিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয়কে বিদায় করিলেন। মহিষীও উপযুক্ত দানের কথা শুনিয়া যথেষ্ট প্রীত হইলেন। খাঁটুরার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরা যে ব্রহ্মোত্তর উপভোগ করেন, সেই ব্রহ্মোত্তর তর্কালঙ্কার মহাশয়ই এইরূপে মহারাজের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রামরাম তর্কালঙ্কার মহাশয় রামহরি, রামশঙ্কর, শিবশঙ্কর, কালী-শঙ্কর ও রামপ্রাণ এই পাঁচ পুত্র রাখিয়া বৃদ্ধ বয়সে কাশী যাত্রা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার মৃত্যু খাঁটুরাতেই হইয়াছিল। পরবর্ত্তী প্রস্তাবে পাঠকগণ তদ্বিষয় জ্ঞাত হইবেন।

রামপ্রাণ—বিদ্যাবাচস্পতি।—ইনি রাম রাম তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। বাল্যজীবনে রামপ্রাণ অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত ও দুরাচার বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। সেই জন্য ইঁহার পিতা ও ভ্রাতৃগণ কেহই ইঁহাকে তাদৃশ ভাল বাসিতেন না। এক সময়ে কথায় কথায় এক দিন তর্কালঙ্কার মহাশয় রামপ্রাণকে অতিশয় ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করেন এবং "যা আমার বাটী হইতে দূর হ," আমি তোর্ মুখাবলোকন করিতে চাহি না" বলিয়া বাটী হইতে চলিয়া যাইতে আদেশ করেন।

এই কথা শুনিয়া রামপ্রাণ যার পর নাই দুঃখিত হন, এবং ...

না বলিয়া, বিবাগী হইবার ইচ্ছায়, বাটী হইতে বহির্গত হন। রামপ্রাণ বাটী ত্যাগ করিয়া ক্রমাগত পদব্রজে চলিয়া রঙ্গপুরে উপস্থিত হন। রামপ্রাণ তথাকার চতুষ্পাঠীতে বিদ্যাবাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হইলেও, পিতার ব্যবসায়ের অনুসরণ করেন। সুতরাং রঙ্গপুরে গিয়া তাহাই তাঁহার জীবিকার্জ্জনের একমাত্র উপায় স্বরূপ হইল।

এই সময়ে রঙ্গপুরে জনৈক কুঠিয়াল ইংরাজ সস্ত্রীক বাস করিতেন। কোনও দিন তাঁহার পরিবারের পীড়া হয়। সেই সময়ে রঙ্গপুরে রামপ্রাণেরই বিশেষ প্রসর বৃদ্ধি হইয়াছিল। সুতরাং কুঠিয়াল সাহেব রামপ্রাণকে স্ত্রীর চিকিৎসা করিবার জন্য নিয়োগ করেন। ভাগ্যক্রমে রামপ্রাণের চিকিৎসাতেই বিবি নিষ্কৃতি লাভ করেন। ইহাতে সাহেব রামপ্রাণের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হন।

বিবি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিলে সাহেব রঙ্গপুর ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে কৃতসংকল্প হন। সুতরাং তিনি এক দিন রামপ্রাণকে ডাকিয়া বলেন যে, কবিরাজ মহাশয়! এক্ষণে আমার আর এখানে থাকিবার ইচ্ছা নাই। আমি এক্ষণে কলিকাতায় গিয়া থাকিব। আমার এখানে যাহা কিছু আছে, আমি সেই সমস্তই আপনাকে দিয়া যাইতেছি। আপনি সমস্তই বুঝিয়া লউন্।—"

রামপ্রাণ, সাহেবের অভিলাষানুরূপ কার্য্য করিলেন এবং সাহেব রঙ্গপুর হইতে বিদায় গ্রহণ করিলে, রামপ্রাণও সেই স্থান ত্যাগ করিয়া বাটী আসিতে ইচ্ছুক হইলেন। সুতরাং সাহেবপ্রদত্ত যাহা কিছু সম্পত্তি পাইয়াছিলেন, সমস্তই বিক্রয় করিয়া বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিলেন এবং ছালা বন্দী করিয়া গোযানে বোঝাই দিয়া, সেই বিপুল ধনরাশি নিজ বাটীতে আনয়ন করিলেন।

বাটীতে আসিয়া রামপ্রাণ মহাড়ম্বর সহকারে বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে, নানাবিধ ক্রিয়া কলাপেরও অনুষ্ঠান করিলেন। ইহা দেখিয়া রামপ্রাণের অন্যান্য ভ্রাতৃগণ বিষম ঈর্ষান্বিত ও কুপিত হইয়া উঠিলেন এবং রামপ্রাণের নিকট বিষয়ের অংশ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামপ্রাণ কিছুতেই ভ্রাতৃগণকে স্বোপার্জ্জিত ধনের অংশ দিতে স্বীকৃত হইলেন না। প্রত্যুত, রামপ্রাণ ভ্রাতৃবিরোধের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার ইচ্ছায় বাঘোড়ের ধারে ৺চণ্ডী পীঠের দক্ষিণাংশে এক কালীবাড়ী ও নিজ ভদ্রাসন

বাটী নির্ম্মাণ করাইলেন। এবং ভ্রাতৃগণের সহিত পৃথকৃভাবে বাস করিতে লাগিলেন।"

এদিকে, ভ্রাতৃগণ কোন রূপেই রামপ্রাণকে বশীভূত করিতে না পারিয়া, ৺ কাশীধামে পিতৃ সন্নিধানে সম্বাদ প্রেরণ করিলেন। এবং স্বদেশে আসিয়া পিতাকে বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। বৃদ্ধ রামরাম কি করেন, পুত্রগণের সেই অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া, অগত্যা ৺ কাশীধাম ত্যাগ করিয়া বাটী আসিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখানে আসিয়া সপ্তাহ-কাল অতীত না হইতে হইতেই, বিষম জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া এই খানেই তনুত্যাগ করিলেন এবং যে কাশীলাভ ইচ্ছায় বহুদিন ধরিয়া কাশীবাসী হইয়াছিলেন, সেই কাশী প্রাপ্তির আশয়ে ভস্ম নিক্ষেপ করিলেন। পুত্রগণকে রামপ্রাণের উপার্জ্জিত অর্থের অংশপ্রদান করাইতে পারিলেন না, নিজের কাশীলাভও ঘটিয়া উঠিল না। যাহা হউক, এই সময় হইতেই রামপ্রাণ দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি যাবদীয় ক্রিয়া কলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং নিজগুণে খাঁটুরার মধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন।

পিতা ও ভ্রাতৃগণের সহিত সম্প্রীতি না থাকিলেও, রামপ্রাণ, উদার, পরোপকারী ও অত্যন্ত স্বজনপ্রিয় ছিলেন। তিনি চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া, অনেকেরই প্রাণরক্ষা করিতেন। এতদ্ভিন্ন, প্রতিদিন প্রত্যূষে ও বৈকালে সকলের বাটীতে বাটীতে ভ্রমণ করিয়া, কে কেমন আছে, কাহার কিরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে, কাহার সন্তান ভ্রাতা বা স্বামী রীতিমত সংসার খরচ পাঠাইতেছেন কি না, প্রভৃতি বিষয়ের সম্বাদ লইতেন। উহার মধ্যে যদি কাহারও অর্থের অপ্রতুল নিবন্ধন সংসার অচল দেখিতে পাইতেন তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাহার অভাবানুরূপ অর্থ প্রদান করিতেন এবং নিজে তাহাদিগের অভিভাবকের নিকট কলিকাতায় বা তাহাদের কর্ম্ম-স্থানে সম্বাদ লিখিয়া নিজের টাকা আদায় করিয়া লইতেন। রামপ্রাণের এই সদাশয়তার জন্য সকলেই রামপ্রাণকে প্রাণের মত ভাল বাসিত ও দেবতার ন্যায় পূজা করিত। কদাচ কেহ তাঁহার বাক্যের অন্যথাচরণ করিতে পারিত না। গ্রামে কে কোন বিবাদ বিসম্বাদ হইত, রামপ্রাণই তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন।

ব্যবহারের জন্য, আজিও তাঁহার বাটী "বড় বাটী" বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

রামপ্রাণ মৃত্যুকালে পাঁচ পুত্র রাখিয়া গতায়ু হন। (১) রামরতন (২) কেদার, (৩) রামধন, (৪) রাধামোহন ও (৫) উমাকান্ত।

রামপ্রাণের সময়ে অনেকগুলি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত খাঁটুরাভূমি আলোকিত করেন। উহাঁদিগের মধ্যে রামরুদ্র ন্যায়বাচস্পতি ও গৌরমণি ন্যায়ালঙ্কার সর্ব্বপ্রধান। বলিতে কি, ইঁহারাই কুশদ্বীপের মুখ উজ্জ্বল করেন এবং ইঁহাদিগের চতুষ্পাঠীতে নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, কাশী ও দ্রাবিড় প্রভৃতি সকল স্থান হইতে ছাত্রগণ আসিয়া অধ্যয়ন করিতেন। ইঁহাদের উভয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া, খাঁটুরার অনেকেই বিলক্ষণ জ্ঞানালোক সম্পন্ন হইয়াছিলেন। বস্তুত খাঁটুরার ব্রাহ্মণমণ্ডলী একদিন যে অলৌকিক জ্ঞানালোকে দাক্ষিণাত্য ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি পর্য্যন্ত বিমোহিত করিয়াছিলেন, দিগ্বিজয়ী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বলিয়া সর্ব্বত্র আখ্যাত হইয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ মাত্রেই অন্ততঃ ব্যাকরণ, সাহিত্য ও দর্শকর্ম্মজ্ঞান সম্পন্ন হইতেন, তাহা রামরুদ্র ন্যায়বাচস্পতি এবং গৌরমণি ন্যায়ালঙ্কারের অসাধারণ অধ্যাপনারই মধুময় ফল। ইঁহাদিগের সময়েই খাঁটুরা যেমন সমৃদ্ধিশালী ও একখানি গণ্ডগ্রাম রূপে পরিণত হইয়াছিল, তেমনই এই সময়েই বিদ্যার বিমল জ্যোতিতে ভাস্বর হইয়া উহা সকলের ভক্তি শ্রদ্ধা ও আদরের স্থল হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে রামরুদ্র ন্যায়বাচস্পতি মহাশয় যে চতুষ্পাঠী স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা খাঁটুয়ার বক্ষঃস্থলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং দেশীয় ছাত্রসংখ্যা ইহাতে যেমন অধিক পরিমাণে হইয়াছিল, বৈদেশিক ছাত্রও তেমনই সংখ্যায় ন্যূন ছিল না। এই সময়ে গৌরমণি ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় কলিকাতার হাতীবাগানে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া ছাত্রগণের অধ্যাপনাকার্য্য সমাধা করিতেন।

রামরুদ্র ন্যায়বাচস্পতির ছাত্রগণের মধ্যে, চন্দ্রকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত, রামকুমার ন্যায়পঞ্চানন, রামরতনতর্কসিদ্ধান্ত, কেদারনাথ কবিকণ্ঠ, রামধন তর্কবাগীশ, উমাকান্ত শিরোমণি, বিশ্বম্ভর ন্যায়রত্ন এবং কালীকিঙ্কর কবিভূষণ প্রভৃতি খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ প্রধান। ইঁহাদিগের মধ্যে চন্দ্রকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত ও রাম-

শিক ছাত্রগণকে শাস্ত্রাধ্যয়ন করাইতেন। অধ্যাপনা ও শাস্ত্রব্যবসায়ই ইহাদিগের প্রধান অবলম্বন! রামরতন তর্কসিদ্ধান্ত, কেদারনাথ কবিকণ্ঠ, বিশ্বম্ভর ন্যায়রত্ন, রামগতি বিদ্যানিধি ও কালাকিঙ্কর কবিভূষণ প্রভৃতি খ্যাতনামা ও সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যুৎপন্নকেশরী ছিলেন বটে কিন্তু ইঁহারা প্রধানতঃ চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন।

রামধন তর্কবাগীশ ও উমাকান্ত শিরোমণি কথক ব্যবসায়ী ছিলেন। ইঁহাদিগের জ্যেষ্ঠ রামরতন তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় শাস্ত্রে ও আয়ুর্ব্বেদে সুপণ্ডিত হইলেও, একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাগ্মী ছিলেন এবং কথকতাও অভ্যাস করিয়াছিলেন। কিন্তু কখন কথকতা ব্যবসায় অবলম্বন করেন নাই। কিন্তু চিকিৎসা ব্যবসায়ে ইনি বিলক্ষণ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

এক সময়ে ইনি কোন দূরদেশে চিকিৎসা করিতে যান। তখনকার লোক প্রধানতঃ পাল্কী করিয়াই চিকিৎসা করিতে যাইতেন। তদনুসারে ইনিও একদিন ডেওপুলের ভিতর দিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে দুই তিন জন লোক আসিয়া তাঁহার গতিরোধ করিল। বেহারাগণকে তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন যে, উহাদিগের এক জনের পুত্রের অত্যন্ত পীড়া হইয়াছে। তাহাদিগের ইচ্ছা তাঁহা দ্বারা পুত্রটীর চিকিৎসা করায়। কিন্তু ডেওপুলের বেদেরা ভয়ানক চোর ও দস্যু বলিয়া যদি তিনি ভয়ক্রমে না আইসেন, এই সন্দেহ করিয়া তাহারা তাঁহার বাটীতে যায় নাই। রামরতন দস্যুদলের কাতরতা ও বিনীতপ্রার্থনায় দয়ার্দ্র হইলেন এবং প্রাণের ভয় না করিয়া, সেই দস্যুর বাটীতে গমন করিয়া দস্যুপুত্রের পীড়া আরোগ্য করিয়া দিলেন। তাহাতে দস্যুদল এককালে রামরতনের করতলস্থ হইল এবং যথাসাধ্য অর্থাদি লইয়া একদিন রামরতনের বাটীতে আসিয়া, একখানি সুবৃহৎ থালা, একটী প্রকাণ্ড কাঁসার বাটী ও কিছু অর্থ প্রদান করিল এবং স্পষ্টাক্ষরে এই কথা বলিয়া গেল যে, আপনার সপ্তম পুরুষের মধ্যে আপনার বাটীতে ডাকাইতি হইবে না। এইরূপ প্রবাদ আছে, যে, তাহারা একটী কি দ্রব্য সদর দ্বারের নিম্নে প্রোথিত করিয়া গিয়াছিল। সেই দ্রব্য গুণেই রামরতনের বাটীতে চৌর্য্য বা ডাকাতি হয় না। ফলতঃ প্রবাদ যাহাই থাকুক, প্রায় পঞ্চম পুরুষ উ[illegible] হইয়া যাইতেছে; এ পর্যন্ত রামরতনের বাটীতে চৌর্য্য

বা ডাকাতি হয় নাই এবং আমরা দেখিয়াছি, তাঁহার বাটীর পরিবারগণ প্রায়ই সদর ও খিড়কী রীতিমত বন্ধ না করিয়াই রাত্রিকালে নিদ্রা গিয়া থাকেন। কিন্তু এপর্য্যন্ত কাহারও একগাছি তৃণও স্থানান্তরিত হয় নাই।

রামরতন বৃদ্ধ বয়সে ৺ কাশীধামে গিয়া বাস করেন। পুত্র ও কন্যাতে ইহার ২১টী সন্তান হয়। সেই সমস্ত সন্তানের মধ্যে তাঁহার ৩য় পুত্র দীনবন্ধুর জ্যেষ্ঠসন্তান বর্ত্তমান হারাণচন্দ্র ডাক্তার মহাশয় এক্ষণে তাঁহার একমাত্র বংশধর।

রামরতনের চতুর্থ ভ্রাতা রাধামোহন অপুত্রক ছিলেন এবং সর্ব্বদাই পুত্রের নিমিত্ত ক্ষোভ করিতেন। সেই জন্য রামরতন তাঁহার এক পুত্রকে দত্তকরূপে রাধামোহনকে দান করেন। এই দত্তক পুত্রের নাম মহেন্দ্রনাথ ছিল এবং বর্ত্তমান নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত মহেন্দ্রনাথ ও রাধামোহনের বংশধর।

রামরতনের তৃতীয় সহোদর রামধন তর্কবাগীশ মহাশয় ও শাস্ত্র ব্যবসায়ী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। ইনি রামরুদ্র ন্যায় বাচস্পতি মহাশয়ের অতি প্রিয়তম ছাত্র। ইনি রামরুদ্র ন্যায় বাচস্পতির নিকট ব্যাকরণ, সাহিত্য ও কিয়ৎ পরিমাণে ন্যায় শিক্ষা করিয়া ভট্টপল্লীতে গিয়া ন্যায় ও স্মৃতি শাস্ত্রের অধ্যয়ন শেষ করেন। পরে কৃতবিদ্য হইয়া ভট্টপল্লী হইতে প্রত্যাগত হইয়া বাচস্পতি মহাশয়ের পরামর্শানুসারে একটী চতুষ্পাঠী করিবার অনুষ্ঠান করেন। এই সময়ে তাম্বুলীগণের মধ্যে সিদ্ধিরাম রক্ষিত নামক এক ব্যক্তি দালালী কার্য্য করিয়া বিলক্ষণ সঙ্গতিশালী হইয়া উঠেন এবং নানা প্রকার সৎক্রিয়া দ্বারা দেশ মধ্যে অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী হন।

সিদ্ধিরাম রক্ষিত স্বকীয় বাস ভবনে পুরাণ দিবার সংকল্প করেন। তৎকালে বাঁশবেড়িয়া নিবাসী ৺ গদাধর শিরোমণি ও কৃষ্ণহরি ভট্টাচার্য্য নামক দুই জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথক ছিলেন। উঁহাদের মধ্যে গদাধরই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

সিদ্ধিরাম প্রথমত গদাধরকে আনিবারই চেষ্টা করেন এবং তাঁহাকে পাঁচ টাকা বায়না পর্য্যন্ত ও দিয়া আইসেন। কিন্তু গদাধর বায়না লইয়া শুনিলেন যে, খাঁটুরা অগঙ্গা দেশ এবং তথায় কৃষ্ণ ভক্ত লোক নাই। ইহা শুনিয়া

দেন। ইহাতে সিদ্ধিরাম অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া, কৃষ্ণহরি ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে পুনরায় বায়না করেন। এবং রামধনকে ধারক নিযুক্ত করেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে এই পুরাণ শেষ হইয়া যায়। রামধনও এই সময়ে কিরূপে কথকতা করিতে হয় তাহা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লন।

ঘটনাক্রমে এই সময়ে একদিন রামধন, ন্যায়বাচস্পতি মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে বসিয়া রহিয়াছেন এমন সময়ে রামধনের মধ্যম ভ্রাতা কেদারনাথ কবিরঞ্জন পাল্‌কী করিয়া খাঁটুরার উত্তরদিগবর্ত্তী বিষ্ণুপুরাভিমুখে চিকিৎসার্থ গমন করিতেছিলেন। বেহারার কণ্ঠস্বর শুনিয়া ন্যায়বাচস্পতি মহাশয় রামধনকে ডাকিয়া বলিলেন—"রামধন! দেখ ত, কে যাইতেছে?—" রামধন বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহারই মধ্যম সহোদর। রামধন, বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"মধ্যম দাদা মহাশয় যাইতেছেন।—" পরিশেষে আক্ষেপ করিয়া বলিলেন যে, "মহাশয়! আমাদের বাটীর সকলেই পালকী করিয়া যাতায়াত করেন এবং বিশেষ সুখসচ্ছন্দেই কালযাপন করিতেছেন। কিন্তু আমি এমনই কুলাঙ্গার ও আমার এমনই দুরদৃষ্ট যে, একখানি পিত্তলের থালা ও অষ্টআনা পয়সার জন্য আট ক্রোশ পথ পদব্রজে ভ্রমণ করিতে হইতেছে।—"

শুনিয়া বাচস্পতি মহাশয়ও নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। ন্যায়বাচস্পতি মহাশয় পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন রামধনের রচনাশক্তি অতীব প্রখরা। অতি সামান্য বিষয়ও তিনি অতি প্রাঞ্জল মধুময়ী ভাষায় রচনা করিতে পারিতেন। সেইজন্য রামধনকে বলিলেন—"রামধন! কৃষ্ণহরি যে প্রণালীতে কথকতা করিয়া থাকেন, তাহা তুমি সংপ্রতি বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ; তোমার কণ্ঠস্বরও কৃষ্ণহরির কণ্ঠস্বর অপেক্ষা কর্কশ নহে, বরং অতীব মধুর সুতরাং আমার ইচ্ছা, তুমিও এইরূপ কথকতা বৃত্তি অবলম্বন কর। ইহাতে বিলক্ষণ দুই পয়সা উপার্জ্জনের সম্ভাবনা আছে।—"

কৃষ্ণহরির কথকতার প্রণালী দেখিয়া রামধনেরও পূর্ব্ব হইতে এক প্রকার বিরক্তি জন্মিয়াছিল এবং এই প্রণালী সংশোধন ও রচনাদি সুললিত করিয়া লইলে, কথকতা দ্বারা সাধারণকে যেমন জ্ঞানশিক্ষা প্রদান করিতে পারা যায় তেমনই উহাতে দুই পয়সা

শাস্ত্রানুমোদিত বৃত্তিও বটে, এই ধারণা জন্মে। বিশেষতঃ তদীয় গুরুদেব ও তাঁহাকে এই ব্যবসায় অবলম্বন করিতে উপদেশ প্রদান করিতেছেন দেখিয়া রামধন কথকতার এক পরিশোধিত প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া এই ব্যবসায় অবলম্বন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। এই সময়ে রামধনের বয়স অষ্টাদশ বর্ষ।

সিদ্ধিরামের পুরাণ শেষ হইলে, রামধন ভাগবৎ পাঠ করিবার জন্য কলিকাতার জনৈক প্রসিদ্ধ ভাগবতীয় পণ্ডিতের নিকট গমন করিয়া, শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, ও অন্যান্য পুরাণাদি পাঠ করেন এবং উহাতে কৃতবিদ্য হইয়া, নিজে শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভাঙ্গিয়া কথকতার উপযোগী করিয়া লন। কিন্তু এই সময়ে নিজে কোনও পদাবলী রচনা করেন নাই। পরে তাঁহার নিজ রচিত ভাগবত ও পুরাণ চূর্ণিকা কিরূপ হইয়াছে পরীক্ষা করাইবার জন্য তিনি মহাব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

এই সময়ে চক্রদ্বীপ বা চাকদহের নিকটবর্ত্তী নারায়ণপুর নামক গ্রামে রাম শ্যাম নামে দুই ভ্রাতা প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। রামধন স্ব রচিত চূর্ণিকা পরীক্ষা করাইবার জন্য, কলিকাতা হইতে স্থলক্রমে চাকদহ হইয়া খাটুরায় আগমন করেন এবং নারায়ণপুরে আসিয়া রাম শ্যামের সাক্ষাৎকারলাভ করেন। রামশ্যাম নীচজাতীয় ব্রাহ্মণ হইলেও, গায়কবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বহুল পরিমাণে সঙ্গতিশালী হইয়াছিল এবং বহুতর ধনাঢ্যলোকের নিকট পরিচিত হইয়াছিল। রামশ্যাম, রামধনের এই অলৌকিক অধ্যবসায় দেখিয়া এককালে বিস্মিত হইল এবং যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া, কয়েক দিন পর্য্যন্ত রামধনের স্বরচিত ভাগবত ও পুরাণের চূর্ণিকা শ্রবণ করিয়া মোহিত হইল। কিন্তু উক্ত চূর্ণিকার শব্দবিন্যাস ও মাধুর্য্য যাদৃশ দেখিতে পাইল, পদাবলীর ছটা তাদৃশ দেখিতে পাইল না। সেই জন্য কহিল যদি আপনি কিছুদিন সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া মহাজনী পদাবলী ইহার সহিত সংযোগ করেন, তাহা হইলে আপনার এই কথকতার প্রণালী অতি উৎকৃষ্ট হয়। এরূপ অদ্ভুত সৃষ্টি আমি আর কখনও শুনি নাই।

শুনিয়া রামধন মনে মনে অত্যন্ত সন্তুষ্টি লাভ করিলেন এবং বাটীতে

পাড়া নিবাসী ৺ রাধানাথ দত্তের সহিত রামধনের অত্যন্ত সম্প্রীতিছিল; সুতরাং রামধন সেই কথা রাধানাথকে জানাইলেন। তাহাতে রাধানাথ দত্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়া একজন প্রসিদ্ধ হিন্দুস্থানী গায়ককে মাসিক বেতন দিবার অঙ্গীকার করিয়া খাঁটুরায় পাঠাইয়া দিলেন। রামধন তাহার নিকট দুই বৎসর কাল গান শিক্ষা করিয়া সঙ্গীত শাস্ত্রেও বিশেষ দক্ষতা লাভ করিলেন। সঙ্গীত শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া রামধন পদাবলী রচনা করেন এবং যে অমৃতসাগর সৃজন করিয়া, শুদ্ধ কুশদ্বীপ বলিয়া নহে সমগ্র বঙ্গভূমিকে মোহিত ও চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই অমৃতসাগর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিলেন। যথার্থ কথা বলিতে কি, রামধনের পূর্ব্বে গদাধর শিরোমণি ও কৃষ্ণহরি ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি যে কথকতা করিতেন, তাহা মহাভারত ও ভাগবতীয় কথা বলিয়াই সাধারণের ভক্তি আকর্ষণ করিত ও তাহাই লোকে একমনা হইয়া শ্রবণ করিত। কিন্তু তৎপরে রামধন যে প্রণালী উদ্ভাবন করিলেন, তাহা সাধারণের ধর্ম্ম শিক্ষার ও ভক্তি আকর্ষণের যেমন মহাস্ত্র-স্বরূপ হইয়াছিল, উহার রচনাপারিপাট্য, সঙ্গীত সমাবেশ, সাময়িক বর্ণনা, সুললিত বাক্যবিন্যাস যোগ্যতা প্রভৃতি ও লোকসাধারণের তেমনই প্রীতিকর হইয়াছিল। ফলতঃ সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক যিনি যে ভাবেই তাঁহার কথকতা শ্রবণ করিতেন, তিনি সেই ভাবেই চরিতার্থ ও মোহিত হইতে পারিতেন। বলিতে কি, রামধনের কথকতা এরূপ শ্রুতিমনোহর ও লোক-শিক্ষার অমোঘ উপায় হইয়া উঠিল এবং সাধারণে এতদূর আগ্রহ সহকারে তাঁহার কথা শ্রবণ করিত যে, দ্বিসহস্র আবালবৃদ্ধ বনিতার সমাবেশ সময়েও একটী সামান্য সূচীপাত স্বর অনায়াসে শ্রুতিগোচর হইত। ফলতঃ আমরা সাহঙ্কারে বলিতে পারি যে, কুশদ্বীপে বহুতর মহামহোপাধ্যায় সুধীমণ্ডলীর জন্মস্থান; কিন্তু সেই সকল খ্যাতনামা মহাপুরুষগণের জন্ম না হইয়া, কুশদ্বীপে এক রামধনই যদি জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলেও কুশদ্বীপের মুখচন্দ্র স্বতঃ আলোকিত হইত এবং কস্মিন্ কালেও সেই বিমল মুখমণ্ডল কলঙ্কিত ও রাহুগ্রস্ত হইত না।

যাহা হউক, রামধন কথকতার অভিনব প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া বঙ্গ-

গুণগ্রামে সকলকেই মোহিত করিয়া ক্রমে ক্রমে বিপুল ধনশালী হইয়া উঠিলেন। এমন কি, শুনিতে পাওয়া যায়, তদীয় পিতা রামপ্রাণ বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় রংপুর হইতে যে প্রভূত ধনরাশি উপার্জ্জন করিয়া আনিয়াছিলেন, কয়েকটী পুত্রের লালন পালনে ও নানাবিধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রায় সমস্তই নিঃশেষ হইয়াছিল ; কিন্তু এই সময়ে রামধন কৃতি হইয়া উঠিয়াছিলেন বলিয়াই পিতার পদমর্য্যাদা ও পৈতৃক ক্রিয়া কলাপ সংরক্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন।

যাহাহউক, রামধন যে কয়েকটী কথকতায় ব্রতী হন, সেই সকলের মধ্যে ধনিয়াখালির নিকটবর্ত্তী কোন এক গ্রামের কথকতাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, এই স্থানে সপ্তবেদীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়। কিন্তু একাকী রামধনই কথকতা কার্য্যে ব্রতী হন। এক দিন এই সপ্তবেদীর প্রধান বেদীর পাঠক ভাগবৎ ব্যাখ্যা করিয়া নির্বৃত্ত হইলে, রামধন সেই বেদীতে উঠিয়া কিয়ৎক্ষণ ভাগবৎ ব্যাখ্যা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু পাঠক মহাশয় প্রত্যাখ্যান করিয়া বলেন যে, "কথকতা করাই কথকের কর্ত্তব্য ; কথক কর্ত্তৃক ভাগবৎ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।—"

এই কথা শুনিয়া রামধন অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং নানা প্রকার আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহাতে অন্যান্য সকল অধ্যাপকের মনই দ্রবীভূত হইল এবং রামধনের ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য প্রধান পাঠককে অনুরোধ করিলেন। তখন প্রধান পাঠক অগত্যা স্বীকৃত হইলেন এবং বলিলেন "ভাল, যদি আপনি আমাদিগের সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারেন, তাহা হইলে ব্যাখ্যা করুন।—" তাহাতে রামধন "যথা জ্ঞানং করবাণি" এই উত্তর প্রদান করিয়া বেদীতে উপবেশন করিলেন এবং ভাগবৎ পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভাগবতের প্রথম শ্লোক "নারায়ণং নমস্কৃত্য" প্রভৃতি উচ্চারণ করিবামাত্র, অধ্যাপক মণ্ডলী ঐ শ্লোকই ব্যাখ্যা করিতে কহিলেন। রামধন ঐ শ্লোকের যথা রীতি ব্যাখ্যা করিলেন। কিন্তু উহার মধ্যে কয়েকটী কূট প্রশ্নের উত্থাপন করিয়া, সকলেই রামধনকে চাপিয়া ধরিলেন। রামধন তাহাতে বিন্দুমাত্র

সকলকেই নিরুত্তর করিলেন। তাঁহার সেই অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী অতীব বিস্মিত হইলেন এবং শতমুখে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সকলেই নিজ নিজ পরাভব স্বীকার করিলেন। কিন্তু প্রথম পাঠক ছাড়িলেন না; তিনি বেদান্তের উল্লেখ করিয়া, রামধনের পুরাণাদির প্রমাণ ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। তখন রামধন কি করেন, বেদান্তে দৃষ্টি নাই বলিয়া অগত্যা নিজের পরাভব স্বীকার করিলেন। কিন্তু রামধনের পূর্ণ সংশয় কিছুতেই অপনোদিত হইল না।

তৎপরে উক্ত বেদীয় কার্য্য যথাসময়ে শেষ হইলে, রামধন বেদাধ্যয়ন করিবার জন্য কাশীযাত্রা করেন এবং এক মহামহোপাধ্যায় তৈলঙ্গী পণ্ডিতের নিকট বেদাধ্যয়ন করেন। তৎপরে বেদে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার জন্মিয়াছে কিনা দেখিবার জন্য কাশীক্ষেত্র হইতে মিথিলা গমন করেন। মিথিলায় যতগুলি বৈদিক পণ্ডিত ছিলেন, একে একে সকলের সহিত বিচার করিয়া, রামধন স্বকীয় বৈদিক জ্ঞান দৃঢ়ীভূত করিলেন। তৎপরে তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া পুনরায় কাশীক্ষেত্রে আসিয়া গুরুদেবের পদধূলি গ্রহণ করিলেন এবং সেই সময়েই গুরুর নিকট বেদপাঠের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন। এই সময়ে পূর্ব্ব সমস্যা লইয়া, গুরুর সহিতও রামধনের বিচার হইল। কিন্তু সে বিচারে গুরুদেব তাঁহার মতই অভ্রান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন এবং পাঠকের তর্ক বেদের মতেও ভুল বলিয়া বুঝাইয়া দিলেন।

তখন রামধন যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া, গুরুদেবের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং স্বকীয় বাসভবনে আগমন না করিয়া, যে পাঠক বৈদিক মতানুসারে তাঁহার ব্যাখ্যার ভুল ধরিয়াছিল, তাঁহারই বাটীতে গমন করিলেন। পাঠক রামধনকে এইরূপ অতর্কিতভাবে আসিতে দেখিয়া মহা বিস্মিত হইয়া, তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রামধন সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া, তাঁহার নিকট পুনরায় বিচারার্থী হইলেন।

পাঠক রামধনের দৃঢ় অধ্যবসায় ও বিচক্ষণতা দেখিয়া আরও অধিক আনন্দিত হইলেন এবং রামধনের গুণের প্রকৃত পুরস্কার প্রদান করিবার জন্য একটী দিন স্থির করিয়া, যাবদীয় অধ্যাপককে বিচারার্থ আহ্বান করিলেন। পরে বিচার আরম্ভ হইলে ...

ধনের শাস্ত্রজ্ঞানের প্রশংসা করিয়া, রামধনকেই তদানীন্তন প্রধান পণ্ডিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

এইরূপে রামধন আর একবারও স্বকীয় শাস্ত্রজ্ঞানের অতি সম্মানার্হ পরীক্ষা প্রদান করিয়া বঙ্গদেশীয় অধ্যাপকমণ্ডলীকে মোহিত করিয়াছিলেন। সাধারণের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে সে ঘটনাটীও বিবৃত করিলাম। এই সময় রামধন বঙ্গদেশের মধ্যে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

কোন সময়ে ভট্টপল্লীতে রামধনের কথকতা হয়। প্রথমতঃ রামধন সেখানে সাধারণভাবেই কথা কহিতেছিলেন। তাহা দেখিয়া ভট্টপল্লীবাসী সুধীগণ, রামধন লেখাপড়ায় জল দিয়াছে বলিয়া ব্যঙ্গ করেন। কারণ, বাল্যকালে যখন তথায় অবস্থিতি করিয়া ন্যায় পাঠ করেন, তখন সকলেই তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান ও অলৌকিক প্রতিভা দেখিয়া অত্যন্ত মোহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কথকতায় তাঁহার সে জ্ঞানের কোনও পরিচয়ই পাইতেছেন না। কাজেই তাঁহারা পূর্ব্বোক্তরূপে রামধনকে ব্যঙ্গ করেন।

রামধন পণ্ডিতমণ্ডলীর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া সেই দিন বেদীতে উপবেশন করিয়াই সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ক্রমান্বয়ে একপক্ষ পর্য্যন্ত সংস্কৃতে কথা কহিতে লাগিলেন। রামধনের এই অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া পণ্ডিত মণ্ডলী যথোচিত সন্তুষ্ট হইলেন এবং সকলেই অতি সত্বরে আহারাদি করিয়া, কথকতার নির্দ্দিষ্ট সময় অপেক্ষাও বহু পূর্ব্বে সভাতে সমাগত হইবার জন্য বাটীর পরিবারবর্গের উপর তাড়না করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্ত্রীলোকগণ উক্ত কথকতার এক বর্ণও বুঝিতে না পারিয়া, কথকতার নিন্দা করিয়া সত্বরে রন্ধনাদি করিতে স্বীকৃতা হইলেন না। এই রূপে, ভট্টপল্লীর প্রায় ঘরে ঘরেই মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল।

এক পক্ষ কাল এইরূপে রামধন সংস্কৃতে কথা কহিয়া সকলকেই সন্তুষ্ট করিলেন। রামধনের এই অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইবার জন্য পণ্ডিতগণ স্ব স্ব পরিচিত অন্যান্য পণ্ডিতগণকেও আহ্বান করিয়া আনাইয়া রামধনের এই অপূর্ব্ব কথকতা শ্রবণ করাইলেন। এদিকে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। পুরুষেরা রামধনের কথকতা শুনিয়া শত মুখে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগি-

এই পনর দিন কথকতায় কেহ রামধনের একটী বর্ণও ভুল ধরিতে পারিলেন না। তখন সকলেই সুন্তুষ্ট হইয়া, পঞ্চদশ দিবসের কথা শেষ হইলে, রামধনকে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিলেন এবং শতমুখে আশীর্ব্বাদ করিয়া, রমণীগণের পুনরায় সন্তুষ্টি সাধনের জন্য পূর্ব্ববৎ সাধুভাষায় কথা কহিতে অনুরোধ করিলেন। তখন রামধন কয়েক দিন পুনরায় সাধুভাষায় কথা কহিয়া ভট্টপল্লীবাসিনী বামাগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া স্বকীয় বাসভবনে প্রত্যাগত হইলেন।

এইরূপে রামধন কথকতা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া যেমন প্রচুর ধনলাভ করিলেন, তেমনই বিপুল সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের যাবদীয় ধনী মানী ও জ্ঞানী লোকই রামধনের অতি প্রিয়তম সুহৃদ্ ছিলেন। বস্তুতঃ তিনি বিদ্বন্মণ্ডলী মধ্যে যেমন সকলের পূজনীয় হইয়াছিলেন, ধনাঢ্য জগতেও তেমনই আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন।

সুরধুনী কাব্যে কবিবর রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর ভাটপাড়ার বর্ণনাকালে এই কথকতার উদ্দেশ করিয়াই একদিন বীণানিন্দিত সুললিত কণ্ঠে গাহিয়াছিলেন যে :—

ভদ্র-জন বাসস্থান, গরিফা নৈহাটী,
ভাটপাড়া যথা চতুষ্পাঠী পরিপাটী।
পণ্ডিত মণ্ডলী করে শাস্ত্র আলাপন,
ব্যাকরণ ন্যায় স্মৃতি ষড় দরশন।
এই স্থানে রাম ধন কথক রতন,
কলকণ্ঠ কলে কল করিত কলন।
সুললিত পদ্যাবলী বিরচিত তাঁর,
সুকল কথক সুরে করিছে বিহার।
হলধর চূড়ামণি ন্যায় শাস্ত্রবিৎ,
ন্যায়ের টিপ্পন্নী সাধু যাঁহার রচিত।

সুরধুনী কাব্য। ২য় ভাগ। ২২ পৃষ্ঠা।

এই সময়ে রামধন বহুপরিবার বিশিষ্টও হইয়াছিলেন। এই সকলের লালন পালন ও শিক্ষার ভার রামধন একাকী-নির্ব্বাহ করিতেন। এতদ্ভিন্ন জ্ঞাতি-ভ্রাতা, ভগিনী, ভাগিনেয়, শ্যালক প্রভৃতি অনেককে লইয়া রামধন কলিকাতায় বিদ্যাভ্যাস করাইতেন।

রামধন খাঁটুরাস্থ সরখেল, বংশীয়া এক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। রামধন যেমন অলৌকিক গুণের আধার ছিলেন, রামধনের গৃহিণীও তেমনই লক্ষ্মী-স্বরূপিনী ছিলেন। ইনি রামধনের ছাত্র, আত্মীয়, জ্ঞাতি, কুটুম্ব প্রভৃতি সকলকেই অপত্যনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। আজিও সকলে রামধনের গুণোল্লেখ সময়ে ইঁহারই নামোল্লেখ করিয়া থাকে। এমন কি, সকলের বিশ্বাস যে, ইঁহার গুণেই রামধনের ভাগ্যলক্ষ্মী রামধনের অঙ্কশায়িনী হইয়াছিলেন। রামধনের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ইঁহার জন্য বাঘোড়ে একটী ঘাট ও সেই ঘাটের দুই পার্শ্বে দুইটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় ঘাটে ও মন্দিরে ক্ষোদিত করিয়া রাখিয়াছেন।

শাকেশবাঙ্ক শৈলেন্দৌ খারূঢ়া কঙ্কণাতটে।
তীর্থংসূর্য্যমণির্দ্দেবী নির্ম্মমে শ্রীসূরিদং॥
পঞ্চনব সপ্তশশী সংখ্যশকহায়নে”
ঘট্টতটতোরণ সুশোভি মঠযুগ্মকে
সূর্য্যমণিরগ্রজনুঃ রামধনগেহিনী
শ্রীশজননীশ যুগমত্র সমতিষ্ঠিপৎ।

রামধন ৬০।৬৫ বৎসরে গণেশ ও শ্রীশ এই দুই পুত্র ও সুখময়ী নাম্নী এক কন্যা রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন। কনিষ্ঠ শ্রীশ সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যারত্ন উপাধি লাভ করেন এবং ইনিই প্রথমে বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়া, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ মতের প্রচলন করেন। রামধনের ভ্রাতুষ্পুত্র ধরণীধরই ইঁহার নিকট কথকতা শিক্ষা করিয়া ইঁহার খ্যাতি সম্ভ্রম রক্ষা করেন এবং বঙ্গদেশে অদ্বিতীয় কথক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হন।

রামকানাই বিদ্যানিধি।—ইনিও রূপনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অন্যতম বংশধর এবং রামরুদ্র ন্যায়বাচস্পতি মহাশয়ের প্রিয় ছাত্র। ইনি রামরুদ্র ন্যায়বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণ ও সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া নবদ্বীপে গিয়া, স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নিজগ্রামে এক চতুষ্পাঠী স্থাপনের জন্য কৃষ্ণনগরে মহারাজ গিরিশচন্দ্রের অনুমতি গ্রহণ করিবার জন্য গমন করেন।

একদিন যথা সময়ে রাজসভায় উপস্থিত হইলে, মহারাজ তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া, তাঁহাকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। সুতরাং মহারাজ "কিমর্থী" এই প্রশ্ন করিলেই, রামকানাই তৎক্ষণাৎ বিচারার্থী বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বিশেষ জ্ঞানী ও শাস্ত্রদর্শী না হইলে, নবদ্বীপাধিপতির রাজসভায় কেহই বিচারার্থী হইয়া গমন করিতে পারিতেন না। কিন্তু রামকানাই যেরূপ গাম্ভীর্য্য সহকারে উত্তরদান ও বিচার প্রার্থনা করিলেন, তাহাতে সকলেই তাঁহার সেই অসামান্য ভাব দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইল। যাহাহউক, মহারাজ পরক্ষণেই আর আর পণ্ডিতগণকে ডাকাইয়া তাঁহার সহিত বিচার করিতে আদেশ করিলেন। রাজসভার নিয়মানুসারে বিচারার্থী প্রধানতঃ পূর্ব্বপক্ষই অবলম্বন করিতেন। মহারাজও তদনুসারে রামকানাইকে পূর্ব্বপক্ষ অবলম্বন করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু রামকানাই যথোচিত সম্মান সহকারে মহারাজকে কহিলেন—"মহারাজ! আমার পূর্ব্বপক্ষ উত্তরপক্ষ নাই। আমার বিচার্য্য বিষয় এই উত্তরপক্ষে ইহার উত্তর এইরূপই হইবে, বলিয়া রামকানাই সেই বিষয়ের মীমাংসা পর্য্যন্ত প্রমাণ করিলেন। পরে কহিলেন—কিন্তু যদি ইহা এইরূপ না হইয়া, এইরূপই হয়, তাহা হইলে তাহার মীমাংসা কি হইবে আমি তাহাই জানিতে ইচ্ছা করি।

সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী রামকানাই বিদ্যানিধি মহাশয়ের সেই কূট প্রশ্নের গুরুত্ব দেখিয়া, নীরব হইয়া রহিলেন। কেহই কোন কথার উত্তর দিতে পারিলেন না। তখন মহারাজ সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর পরাভব স্থির করিয়া রামকানাইকেই সেই প্রশ্নের উত্তর দান করিতে অনুরোধ করিলেন। রামকানাই অতি পরিষ্কাররূপে সেই কূট প্রশ্নের

তখন মহারাজ রামকানাই বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও বিচক্ষণতা দর্শন করিয়া মহতী প্রীতি লাভ করিলেন এবং স্বকীয় অভিনব রাজধানী শ্রীনগরের নিকটবর্ত্তী শিমুলিয়া গ্রামে একটী চতুষ্পাঠী নির্ম্মাণ করাইয়া রামকানাইকে সেই স্থানে বাস করিতে আদেশ দিলেন।

এইরূপে, রামকানাই মহারাজের অনুগ্রহে এক চতুষ্পাঠী ও আবাস স্থান এবং যথোপযুক্ত বৃত্তি পাইয়া সচ্ছন্দে বহুসংখ্যক ছাত্রকে শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। বঙ্গদেশে রামকানাইএর সুখ্যাতির ন্যূনতা ছিল না। কিন্তু ইহার উপর আবার রামকানাই মহারাজের অনুগ্রহ লাভ করিয়া আরও যশস্বী ও অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া সর্ব্বত্র আদৃত হইলেন। এই সময়ে রামকানাই বিদ্যানিধির যশঃপ্রভা এতদূর প্রসারিত হইল যে, দাক্ষিণাত্য ও কাশী প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চল হইতে দলে দলে ছাত্রবৃন্দ রামকানাইএর চতুষ্পাঠীতে শাস্ত্র শিক্ষা করিবার জন্য শিমুলিয়ায় আগমন করিতে লাগিল।

এই সময়ে রামকানাইও বিশেষ যত্ন সহকারে ছাত্রগণের শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। রামকানাইএর পরিবারগণ খাঁটুরায় অবস্থিতি করিলেও রামকানাই অধিক সময় শিমুলিয়াতেই অবস্থিতি করিতেন। নিতান্ত প্রয়োজন হইলে, দুই একটী ছাত্র সমভিব্যাহারে শিমুলিয়া হইতে খাঁটুরায় সন্ধ্যার পরে আগমন করিতেন এবং অতি প্রত্যূষে উঠিয়াই শিমুলিয়ায় যাইতেন।

একদিন রামকানাই বাটী আসিয়াছেন কিন্তু কোন এক তাম্বুলীর বাটীতে মাসব্রাহ্মণব্রতের নিমন্ত্রণ থাকাতে, সে দিন অবকাশমতে আর শিমুলিয়া প্রত্যাগত হইতে পারেন নাই। রামকানাই মধ্যাহ্ন কালে স্নানাহ্নিক কার্য্য সমাপন করিয়া, উক্ত তাম্বুলীর বাটীতে নিমন্ত্রণে গমন করিলেন। জলযোগ সমাপন করিয়া, রামকানাই দুগ্ধে চিপিটক নিক্ষেপ করিয়া আহার করিতেছেন, এমন সময়ে একটী ছাত্র রামকানাইএর গৃহিণীর মুখে সেই তাম্বুলীর বাটীতে আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, রামকানাইএর অনুসন্ধানে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়াই দেখিল, গুরুদেব শূদ্রের বাটীতে আহারে উপবেশন করিয়াছেন। দেখিয়াই অবাক্ হইয়া সেই ছাত্র আবার আর আর ছাত্রগণকে গুরুর আচরণের কথা প্রকাশ করিল। তৎকালে কি গুরু;

নিকট শিক্ষালাভ করিয়া তাহারাও পাপী হইয়াছে, এই বলিয়া মহারাজ গিরীশচন্দ্রের নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা প্রকাশ করিল।

মহারাজ সেই কথা শুনিয়া, ক্রোধে এককালে হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া রামকানাইকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। রামকানাই রাজসভায় উপস্থিত হইলে, মহারাজ রামকানাইয়ের দোষোল্লেখ করিয়া যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করিলেন এবং রামকানাইকে চতুষ্পাঠী ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিতে আদেশ করিলেন। রামকানাই বহুবিধ অনুনয় ও বিনয় করিয়া মহারাজের কৃপা ভিক্ষা করিলেও, মহারাজ আর রামকানাইয়ের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অপিচ, রামকানাইকে রাজসভা হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

তখন রামকানাই নিতান্ত দুঃখিত ও ব্যথিত হইয়া খাঁটুরায় বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং অতীব মনের দুঃখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে, রামকানাই রামপ্রাণ বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের শরণাগত হইলেন। একে রামকানাই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন, তাহার উপর আবার রামপ্রাণ বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের জ্ঞাতিভ্রাতা সুতরাং রামকানাই, বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের কৃপা লাভে বঞ্চিত হইলেন না।

এই সময়ে ভূকৈলাসের রাজা বিখ্যাত জয়নারায়ণ ঘোষাল মহাশয় দীর্ঘকাল ব্যাপী এক পুরাণের অনুষ্ঠান করেন। বাচস্পতি মহাশয়ই এই বৃহদ্ব্যাপারের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনিই জয়নারায়ণ ঘোষাল মহাশয়কে বলিয়া রামকানাইকে সেই বেদীর ধারকতা কার্য্যে দীক্ষিত করেন। ঘোষাল মহাশয়ের গুরুদেব সেই বেদীর পাঠক ছিলেন।

এইরূপে রামকানাই কিছুদিন সেই বেদীতে ধারকতা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এখানেও রামকানাইয়ের বিষম বিসদৃশ ঘটনা সংঘটিত হইল। ঘটনাক্রমে পাঠক যদি কোন বিষয় ভুল বলিয়া যাইতেন, রামকানাই তাহাই সংশোধন করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু পাঠক তাঁহার কথায় কর্ণপাত ও করিতেন না। আপন মনেই পাঠ আবৃত্তি করিয়া যাইতেন।

এইরূপে ১০।১২ দিন অতীত হইলে, রামকানাই অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন।

কিন্তু পাঠক তাদৃশ অসদ্ব্যবহার করিলেও, রামকানাই স্বকীয় কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইতেন না। এক দিন পাঠক পুনঃ পুনঃ ভ্রমও আবৃত্তি করিতেছেন, রামকানাইও পুনঃ পুনঃ সেই ভ্রম সংশোধন করিয়া দিতেছেন, কিন্তু পাঠক কিছুতেই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিতেছেন না দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সভামধ্যে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, যদি ভ্রম সংশোধন করিয়া আবৃত্তি না কর তাহাহইলে তোমার বাপান্ত দিবা।" এইরূপ লাঞ্ছনাকর বাক্য শুনিয়া পাঠক তখনই পাঠ বন্ধ করিলেন এবং বেদী হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, তৎক্ষণাৎ স্বকীয় বাসাভিমুখে গমন করিলেন।

তৎপরে, পাঠক, কাহারও সহিত দ্বিরুক্তি না করিয়া, আদিগঙ্গায় স্নান করিয়া আসিলেন এবং যথাবিধি মধ্যাহ্নিক কার্য্য সমাপন করিয়া অন্যান্য দিনের ন্যায় কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। পরে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে, পাঠক জয়নারায়ণ ঘোষাল মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং রামকানাইয়ের আচরণের কথা সমস্তই প্রকাশ করিলেন কিন্তু নিজের দোষ স্বীকার করিলেন না। তখন ঘোষাল মহাশয় রামকানাইকে ডাকাইয়া আনিলেন ও সভাস্থলে এরূপ অসদ্ব্যবহার করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রামকানাই নিজে কোনও কথা না কহিয়া সদস্য ও অন্যান্য ব্রতীগণকে জিজ্ঞাসা করিতে কহিলেন। রামকানাই পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেও, রামকানাইয়ের কথা অগ্রাহ্য করিয়া পাঠক মহাশয় যে নিতান্ত প্রগল্ভতা প্রকাশ করিয়াছেন, সকলেই তাহা মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিলেন এবং তাহাতেও যে পুরাণের অঙ্গ হানি হইয়াছে তাহাও প্রকাশ করিতে কেহই বিরত হইলেন না। ফলতঃ তাদৃশ স্থলে পাঠক মহাশয়েরই দোষ স্থিরীকৃত হইল কিন্তু রামকানাইকে কেহই দোষী করিতে পারিলেন না। তৎপরে ঘোষাল মহাশয়, যাহাতে পুরাণের অঙ্গ হানি না হয়, তদ্বিষয়ে গুরুদেবকে নিবেদন করিয়া বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিলেন। কিন্তু পাঠক মহাশয়ের জাতক্রোধ কিছুতেই প্রশমিত হইল না।

এদিকে, যথা সময়ে পুরাণপাঠ সাঙ্গ হইল ও অধ্যাপকগণের বিদায়ের সময় উপস্থিত হইল। বিদায়ের ভার গুরুদেবের হস্তেই ন্যস্ত হইল। গুরুদেব সকলকেই যথোপযুক্তরূপে বিদায় করিলেন; কিন্তু রামকানাইকে মধ্যবিধ

অতিশয় বিরক্ত ও ঘোষাল মহাশয়কে মুক্তকণ্ঠে নিন্দা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামকানাই তাহাতে একটী কথাও বলিলেন না। বরং গুরুদেবের গর্ব্ব খর্ব্ব দেখিয়াই পরম প্রীতি লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

এদিকে, জয়নারায়ণ ঘোষাল মহাশয় স্বকীয় গুরুদেবের এই অসদাচরণের কথা শুনিয়া যার পর নাই ক্ষুব্ধ হইলেন এবং রামকানাইকে নিভৃতে ডাকিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, গুরুদেবের অপরাধ মার্জ্জনা করিতে কহিলেন। পরে, তাঁহাকে সর্ব্বোচ্চ বিদায় প্রদান করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিলেন।

এই সময় হইতে রামকানাইয়ের ভাগ্যলক্ষ্মী পুনরায় সুপ্রসন্ন হইল এবং তিনি অধ্যাপকমণ্ডলী মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সর্ব্বত্র আদৃত হইলেন। এবং ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ বিদায় রামকানাইয়েরই একায়ত্ত হইয়া আসিল।

রামকানাই বৃদ্ধ বয়সে ৺ কাশীধামে গিয়া বাস করেন। কিছুদিন তথায় বাস করিয়াই, তিনি ৺ কাশীলাভ করেন। ইঁহার নিজের কোনও সন্তান সন্ততি নাই।

উমাকান্ত শিরোমণি।—ইনি রামপ্রাণ বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। ইনি সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন বটে, কিন্তু কয়েক ভ্রাতার মধ্যে ইনি সকলের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠ রামরতন তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় ইঁহাকে স্বকীয় পুত্রাপেক্ষাও অধিক ভাল বাসিতেন। উমাকান্ত বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে অতি সামান্যরূপ লেখা পড়া শিক্ষা করেন। পরে, রামরুদ্র ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ ও সাহিত্য অভ্যাস করেন। উমাকান্ত যেমন প্রতিভাশালী ছিলেন তেমনই অসাধারণ স্বরবান্ ও ছিলেন। ফলতঃ উমাকান্ত যদিও একজন বিখ্যাত কথক বলিয়া ভবিষ্যতে পরিচিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইনি কাহারও নিকট রীতিমত শিক্ষালাভ করিয়া কথক-ব্যবসায়ে ব্রতী হন নাই।

প্রসিদ্ধি আছে উমাকান্তের উপনয়নের কিছু পরেই এক দিন শিমুলিয়া কাঁসারিপাড়া নিবাসী গদাধর মিত্র উমাকান্তের স্বরনৈপুণ্য নিরীক্ষণ করিয়া

পারিস্ ? তাহাতে উমাকান্তও ব্যঙ্গচ্ছলে উত্তর করিলেন যে, "যখন দাদার হাতে কথকতার জন্ম, তখন আমি কথকতা করিতে কেন না পারিব" ?—গদাধর বাবু উমাকান্তের এই সপ্রতিভ উত্তরে যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন, এবং বাস্তবিক, উমাকান্ত কথকতা করিতে পারে কি না দেখিবার জন্ত বলিলেন—"ভাল, তুই যদি কথকতা করিতে পারিস্, তবে আমি তোর কথা দিব!—" কিন্তু দেখিস্ যেন ঠকিস্ না।—

তাহাতে উমাকান্ত উত্তর করিলেন—"কেন ঠকিব ? আপনি দিয়া দেখুন, হারি কি পারি ?—"

ইহা শুনিয়া গদাধর বাবু অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও কৌতুহল পরবশ হইয়া, একমাস কাল উমাকান্তের কথা দিবার জন্ত সমস্ত আয়োজন করিলেন। কিন্তু এই সময়ে উমাকান্ত দাদার দুই একটী পদাবলী ভিন্ন আর কিছুই অভ্যাস করেন নাই। সুতরাং গদাধর বাবুর আয়োজনে বাস্তবিক নিতান্তই বিপদ্‌গ্রস্ত হইলেন। তিনি গদাধর বাবুকেও উদ্যোগ করিতে বলিয়াছেন; এক্ষণে আর না বলিতেও পারেন না। কাজেই জ্যেষ্ঠ সহোদর রামরতনকে সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া বলিলেন, এবং উপস্থিত বিপদে কিরূপে পরিত্রাণ পান, তাহারই উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন।

শুনিয়া রামরতন অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং উমাকান্তকে অভয় প্রদান করিয়া কহিলেন—ভাই! "ভয় কি, তুমি বংশের উপযুক্ত কথাই বলিয়াছ। তুমি দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া আর দুই চারিটী পদাবলী ও বর্ণনা কয়েকটী অভ্যাস কর। তাহা হইলেই কথকতা করিতে পারিবে। যে দিন যে কথা কহিবে, আমি প্রতিদিন তোমাকে তাহাই শিখাইয়া দিব, তুমি সেইগুলি গুছাইয়া বলিতে পারিলেই উত্তম কথকতা করিতে পারিবে।"

তখন উমাকান্ত দাদার বলে বলীয়ান হইয়া গদাধর বাবুর সঙ্কল্পিত রামায়ণে ব্রতী হইলেন এবং বেদীতে উপবেশন করিয়া [illegible]ার শিক্ষানুসারে কথকতা করিতে লাগিলেন। আহা! কি অপূর্ব্ব প্রতিভা [illegible]বিকাশ! দাদা যাহা বলিয়া দিয়াছেন, তাহাত উমাকান্তের তুণ্ডাগ্রে, তাহা[illegible] উপর আবার নিজের প্রতিভার অপূর্ব্ব বিকাশ! কাযেই সে কথা যে অ[illegible]তের নদী সৃজন করিবে, তাহাতে সন্দেহ কি ? বাস্তবিক তাহাই হইল। ৮।১০ দিন কথা

না হইতে হইতেই উমাকান্তের মেঘাচ্ছাদিত যশঃপ্রভা চারিদিকে বিস্তৃত হইল। চারি দিক্ হইতে লোক কাতারে কাতারে ভাঙ্গিয়া উমাকান্তের কথকতা শুনিতে ধাবিত হইল। এই সময়ে খ্যাতনামা গদাধর, কৃষ্ণহরি, ও রামধন তিন জনেই কলিকাতায় কথকতায় ব্রতী ছিলেন। কিন্তু উমাকান্তের এই নূতন কথকতায় সকলেরই গৌরবরাশি ছায়াবৃত হইল। উহাঁদিগের কথকতা আর কেহই শুনিতে চাহে না। সকলেই উমাকান্তের কথা শুনিতে ধাবিত হইতে লাগিল।

এই অলৌকিক ঘটনা দেখিয়া লব্ধনামা গদাধর, কৃষ্ণহরি, ও রামধন সকলেই চমৎকৃত হইলেন। পরে একদিন প্রত্যূষে গদাধর ও কৃষ্ণহরি উভয়ে রামধনের বাটীতে আসিয়া রামধনকে ডাকিয়া বলিলেন— দেখ রামধন! শুনিলাম তোমার কনিষ্ঠ উমাকান্ত নাকি উত্তম কথা কহিতেছে। সম্ভবও বটে, কেন না দেখিতেছি, আজি কালি আমাদের দুই জনের বেদীতে তো মূলেই লোক হইতেছে না—তোমার বেদীতে কিরূপ জানি না।

শুনিয়া রামধন কহিলেন—আমার বেদীতেও লোক নাই।

তখন গদাধর কহিলেন—"ঐ দেখ, সমস্ত লোকই আজি কালি উমাকান্তের কথা শুনিতে আসিতেছে। যাহা হউক, চল, আমরা তিন জনেই একদিন তাহার কথা শুনিয়া আসি।—"

তাহাতে রামধন উত্তর করিলেন—মহাশয়! উমাকান্ত আপনার কীটাণুও নহে। সে নিতান্ত বালক, আমরা তাহার সভায় উপস্থিত হইলে সে একটী কথাও কহিতে পারিবে না।—"

শুনিয়া কৃষ্ণহরি চূড়ামণি কহিলেন—"ইহার মধ্যে আর একটী কায করিতে হইবে। গদাধর বাবুকে বলিয়া গোপনে আমাদিগকে একটী ঘরে বসিতে হইবে এবং গোপনে উমাকান্তের কথা শুনিতে হইবে। তদ্ভিন্ন অন্য উপায় নাই।—"

তদনুসারে গদাধর বাবুকে জানান হইল; গদাধর বাবুও সেই কথা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং কথকত্রয়কে মহা সমাদরে স্বকীয় তোষাখানায় বসাইয়া নিজে তাঁহাদের ...

মান বচনপরম্পরা ও অলৌকিক স্বরনৈপুণ্য দেখিয়া সকলেরই বিগলিত-ধারে আনন্দাশ্রু পতিত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া মিশ্র মহাশয় বাটীর মধ্যে গমন করিলেন এবং গৃহিণীকে ডাকিয়া, বালক পুত্র মাধবের সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া দিতে আদেশ করিলেন। গৃহিণী গদাধর বাবুর এই অসম্ভাবিত কাণ্ড দেখিয়া প্রথমে অলঙ্কার অর্পণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু গদাধরের নিতান্ত নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখিয়া, সেই গহনাগুলি আর রাখিতে পারিলেন না। একখানি রৌপ্যময় থালে করিয়া, সেই অলঙ্কাররাশি গদাধরের সম্মুখে আনিয়া দিলেন। তখন গদাধর বাবু আনন্দে পুলকিত হইয়া, সেই অলঙ্কাররাশিপূর্ণ রৌপ্যময় থালাখানি সভামধ্যে আনিয়া উমাকান্তের বেদীর উপর রক্ষা করিলেন। দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া রহিল। এদিকে, গদাধর ও কৃষ্ণহরি দুই হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে সভামধ্যে প্রকাশমান হইলেন।

পাঠক অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, গদাধর ও কৃষ্ণহরি এই উভয় কথকই রামধনের গুরুস্থানীয় সুতরাং যখন সেই পরমপূজ্য কথকদ্বয় সভাস্থলে উপনীত হইলেন, তখন উমাকান্তের বেদীতে বসিয়া থাকা নিতান্ত ধৃষ্টতার কার্য্য। সেইজন্য, উমাকান্তও গললগ্নীকৃতবাস ও কৃতাঞ্জলি হইয়া উভয়ের পদধূলি মস্তকে প্রদান করিলেন। তৎপরে, উভয়েই শতমুখে প্রশংসা করিতে করিতে কহিলেন—"ভাই! তুমি এইরূপে আমাদের মুখরক্ষা কর, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা ও একমাত্র আশীর্ব্বাদ।—"

পরে উভয়ে গদাধর বাবুকেও শতমুখে প্রশংসা ও আশীর্ব্বাদ করিয়া সভাস্থল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সে দিন আর কথা হইল না; এই গোল-যোগেই কাটিয়া গেল।

এদিকে, রামধনও বাটীতে আসিয়া সকলের নিকট এই বিষয় গল্প করিতে লাগিলেন। পরে, রামরতনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"দাদা! উমা এমন উৎকৃষ্ট কথা কহিতে কোথায় শিখিল?—সে আজি যেরূপ কথা কহিল, তাহা বোধ হয় আমারও অসাধ্য। কিন্তু সে এরূপ কোথায় শিখিল?—"

বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি তাহাকে যাহা শিখাইয়া দেন, তাহাই সে এরূপ গুছাইয়া মধুময় করিয়া বলিতে পারে যে তাহা অন্যের অসাধ্য।

এই ঘটনার পর হইতে রামধন, উমাকান্তের জন্য এক জন পশ্চিম দেশীয় প্রসিদ্ধ গায়ক নিযুক্ত করিয়া কিছুদিন সঙ্গীত শিক্ষা প্রদান করেন এবং নিজে তাঁহাকে কথকতা শিখাইয়া এক উৎকৃষ্ট কথক করিয়া তুলেন।

আর একটী ঘটনাও উমাকান্তের প্রতিভা বিকাশের এক মহীয়ান্ দৃষ্টান্ত। কোন সময়ে উমাকান্ত বরাহনগরে তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতার বাটীতে গমন করিয়াছিলেন। সেই স্থানে অবস্থিতিকালে এক দিন বেলা নয়টার সময় উমাকান্ত টাকীর মুন্সী মহাশয়দিগের বাটীর সম্মুখ দিয়া ৺ গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেছিলেন। আসিবার সময় দেখিলেন, মুন্সী মহাশয়দিগের বৈঠকখানায় তানপুরা, পাকোয়াজ প্রভৃতি লইয়া কয়েক জন সম্ভ্রান্ত লোক বসিয়া গান বাদ্য করিতেছেন। দেখিয়া উমাকান্ত কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া সেই বৈঠকখানার দ্বারদেশে গিয়া ভিজা কাপড়ে দণ্ডায়মান হইলেন। যে গায়ক গান করিতেছিলেন, তিনি এক জন বিখ্যাত গায়ক; কিন্তু মুন্সী মহাশয়ের বেতনভোগী গায়কদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য তানপুরা অতি অল্প পরিমাণে বিসুরা করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং মুন্সী মহাশয়ের গায়কগণ তাহা ধরিতে পারে কি না, তাহাই পরীক্ষা করিতেছিলেন। এক ঘণ্টা কাল এইরূপ গান বাজনা চলিতেছিল; কিন্তু কেহই তাহা ধরিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু উমাকান্তের কর্ণে যেমন সেই কদর্য্য সুর প্রবেশ করিল, অমনই উমাকান্ত আর থাকিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন কালোয়াৎজী তানপুরা বিসুরা হ্যায়”!—উমাকান্তের এই বাক্য কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিবামাত্র, গায়ক তৎক্ষণাৎ তানপুরা রাখিয়া উমাকান্তকে সসম্ভ্রমে সেলাম করিলেন এবং নিজ পার্শ্বে বসাইবার জন্য হস্ত ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিলেন। কিন্তু উমাকান্ত তখন মাত্র ৺ গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন; সুতরাং গায়কের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। অন্য সময় আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন এই অঙ্গীকারও করিলেন না। কিন্তু গায়ক একাক্ষরেই উমাকান্তের লয় বোধ জানিতে পারিয়াছিলেন, সেই জন্য কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়ি-

সজল বসন পরিত্যাগ করাইয়া স্বকীয় পার্শ্বে অতি সসম্ভ্রমে উপবেশন করাইলেন।

পরে, কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের গান বাদ্য হইলে, পশ্চিম দেশীয় গায়ক উমাকান্তকে একটী পদ গাহিতে অনুরোধ করিলেন। উমাকান্ত সেই সময়ে উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া একটী পদ গান করিলেন। উমাকান্তের কণ্ঠস্বর ও স্বরনৈপুণ্য দেখিয়া সকলেই অবাক্ ও বিস্মিত হইলেন। পরে, মুন্সী মহাশয়ও উমাকান্তের গুণে নিতান্ত বশীভূত হইয়া উমাকান্তের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন উমাকান্ত নিজের পরিচয় প্রদান করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন। কিন্তু উমাকান্তের অভিনব গায়ক বন্ধু কিছুতেই উমাকান্তকে ত্যাগ করিলেন না। প্রত্যুত, উমাকান্তের কুটুম্বের বাটীতে সম্বাদ দিয়া যে কয় দিন তিনি মুন্সী মহাশয়দিগের বাটীতে অবস্থিতি করিলেন, সেই কয়দিনই উমাকান্তকে আপনার নিকট রাখিয়া দিলেন।

এই সুযোগে উমাকান্ত ও মুন্সী মহাশয়দিগের নিকট বিশেষ পরিচিত হইলেন। এমন কি সেই অবধি শিবনাথ বাবু তাঁহাকে ক্ষণকালের জন্য স্থানান্তরিত হইতে দিতেন না। মুন্সী মহাশয়দিগের সাহায্যে উমাকান্তের অবস্থাও বিলক্ষণ উন্নত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু কালের কি অলঙ্ঘনীয় প্রভাব! কাল যাহাকে যাহা করিতে দেয়, তাহার অতিরিক্ত তিনি আর কিছুই করিতে পারেন না। উমাকান্তের অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিল। এই সময় উমাকান্ত পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ না হইতে হইতে কালের ডঙ্কানিনাদ উমাকান্তের শ্রুতিগোচর হইল। অমনই উমাকান্ত একটী মাত্র শিশু কন্যা, যৌবনের মধূচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণী, অতুল, অপ্রমেয় স্নেহের অনন্ত প্রস্রবণ সোদর চতুষ্টয় এবং অন্যান্য বহু সংখ্যক পরিজন পরিত্যাগ করিয়া, বিশেষতঃ কোমল প্রাণ কবিশেখর রামধনের শিরীষকুসুম প্রাণে কুলিশ প্রহার করিয়া বিসূচিকা রোগে ইহধাম ত্যাগ করিলেন। বস্তুতঃ রামধন ইহসংসারে যে সমস্ত সাংসারিক দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, সেই সকলের মধ্যে এই কনিষ্ঠবিয়োগ শোক সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। ইহাতেই তাঁহার মর্ম্মাস্থি বিচূর্ণিত হয় এবং সমস্ত জীবনেও ইহার প্রখর প্রতাপ

ভগবান্ বিদ্যালঙ্কার।—এই খ্যাতনামা মহামহোপাধ্যায় শাণ্ডিল্যবংশীয় নহেন। ইনি বাৎস্য গোত্রীয় ছিলেন। ইঁহার পৈত্রিক নিবাস খাঁটুরার দক্ষিণদিগবর্ত্তী দত্তপুখুরিয়ার সন্নিকট দোগাছিয়া গ্রাম। বর্ত্তমান সময়ে এই দোগাছিয়াকেই পাটডাঙ্গা দোগাছিয়া বলিয়া থাকে। ইঁহার পিতার নাম কাশীনাথ তর্কভূষণ এবং মাতার নাম পদ্মমণি। ইঁহার মাতা খাঁটুরাস্থ রাজচন্দ্র সরখেল মহাশয়েরই তৃতীয়া সহোদরা। এই রাজচন্দ্র সরখেল মহাশয়েরই কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীশজননী স্বর্ণমণি দেবী রামধনের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। সুতরাং শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় ইঁহার মাতৃস্বস্রীয় ভ্রাতা ছিলেন। পদ্মমণি যেমন নিরীহ তেমনই শান্ত প্রকৃতি ছিলেন। ইঁহার চারি সহোদর ও ছয় সহোদরা ছিল। সুতরাং তৎকালে খাঁটুরার সরখেল বংশীয়েরা বিশিষ্ট গৃহস্থ থাকিলেও, পরিবার সম্বন্ধে জাজ্জল্যমান ছিলেন এবং ইছাপুরের চৌধুরী মহাশয়দিগের প্রসাদে গ্রামমধ্যে বিশেষ সম্ভ্রমশালীও হইয়াছিলেন। যাহা হউক, পদ্মমণি দয়া, মায়া, ভক্তি, অযাচিত পরিশ্রম ও বিশেষ নিষ্ঠাবতী ছিলেন বলিয়া সকল ভ্রাতা ভগিনীরই বিশেষ স্নেহের পাত্রী ছিলেন। ইঁহার উপর আবার খাঁটুরা অপেক্ষা দোগাছিয়া গ্রাম অপেক্ষাকৃত গণ্ডগ্রাম। সুতরাং আহারাচ্ছাদনেও দোগাছিয়া যে খাঁটুরা অপেক্ষা সমধিক উৎকৃষ্ট ছিল বোধ হয় না। সেই জন্য পদ্মমণি বিবাহের পরেও অধিক সময় পিত্রালয়ে বাস করিতেন।

কাশীনাথ তর্কভূষণ অধিকাংশ সময় দোগাছিয়াতেই বাস করিতেন। একে ইনি কবিরাজী ব্যবসায় করিতেন. তাহার উপর আবার ইঁহার মধ্যবিধ তেজারতী ও মহাজনী ব্যবসায় ছিল। এতদ্ভিন্ন, ইঁহার কয়েক বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি এবং বাগান ও পুষ্করিণী ছিল। সেই সকল ব্রহ্মোত্তর জমীর মধ্যে ১০।১৫ বিঘা ভূমি নিজাবাদে কর্ষিত হইয়া, বাৎসরিক ব্যয়োপযোগী শস্যাদিও উৎপন্ন হইত। সুতরাং কাশীনাথ বিপুল ধনশালী না হইলেও, সামাজিক অবস্থানে নিতান্ত নিঃস্ব ছিলেন না। এই সকল কার্য্যের পরিদর্শন জন্য কাশীনাথ সময়ে সময়ে খাঁটুরায় আসিয়া পদ্মমণির প্রেমসুধা পান করিতেন।

কালচক্রে আজি ভারতের ভাগ্য পরিবর্ত্তিত! আজি সমস্ত ভারত চাকুরী চাকুরী করিয়া পাগল, কিন্তু এক সময়ে এই সামান্য ব্রাহ্মণ গুলাই ম্লেচ্ছের পদসেবার নাম শুনিয়াই চমকিয়া উঠিতেন। তাঁহারা পরকাল নষ্টের [illegible]

ম্লেচ্ছের একটী কপর্দ্দকমাত্রও স্পর্শ করিতেন না। জননী জন্মভূমির পদসেবা করিয়া, কৃষি ও রাজদত্ত বৃত্তি উপভোগ করতঃ স্বাধীন জীবন যাপন করিয়া দেব পুরুষের ন্যায় এই ধরাধামে বিচরণ করিতেন। নিতান্ত সামান্য আয় থাকিলেও, সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। ঘটনাক্রমে অন্নাচ্ছাদনের কষ্ট হইলেও স্ব স্ব কর্ম্মান্তিক ভোগ বলিয়া সকল দুঃখ অনায়াসে সহ্য করিতেন; তথাপি পরপদসেবা অথবা নিজের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন করিতে যাইতেন না। কিন্তু আজি ভারত ঘোর বিলাস ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান। সে সামান্য ধনে আজি বিলাসের আয়োজন শেষ হয় না—গৃহিণীর বাঁকমলের রুণু রুণু শব্দে প্রাণ সিহরিত হইয়া আইসে না। কাজেই ভারত, সোণার বিনিময়ে কাচ লইয়া ঘরে ফিরিতেছে—ধেনু-ধান্যের মর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়া দুই খানি কাগজের লোভে দিশাহারা হইয়া ঘুরিতেছে! কিন্তু কাশীনাথ তুমি একদিন পদ্মমণির প্রেমসুধা পান করিবার জন্য যে ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াছিলে, দেবলোক হইতে আশীর্ব্বাদ করিও, দেব! তোমার বংশধরগণ যেন সেই ক্ষেত্রেই বিচরণ করে। ধেনু-ধান্য বিস্মৃত হইয়া, কাচ ও কাগজের প্রত্যাশায় দিশাহারা হইয়া যেন পরপদসেবী না হয়। স্বধর্ম্মনিরত হইয়া আর্য্যগৌরব রক্ষা করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহও পরম সুখ, কিন্তু পরপদসেবা করিয়া রাজভোগেও তৃপ্তি নাই।

চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে পদ্মমণির গর্ভসঞ্চার হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় পুংসবন সংস্কার সম্পাদিত হইলেই অর্থাৎ চতুর্থমাসে কাশীনাথ তনুত্যাগ করিয়া অকালে স্বর্গারোহণ করেন। পদ্মমণি এইরূপ অতি অল্প বয়সে বিধবা হইয়াই আজীবন পিত্রালয়ে বাস করেন। কাশীনাথ দেখিতে যেমন সুপুরুষ ছিলেন, পদ্মমণিকেও তেমনই অকপট হৃদয়ে ভাল বাসিতেন। দুরন্ত কাল পদ্মমণির সকল সুখের মূল এককালে ছেদন করিল বটে, তথাপি এক দুরাশার ক্ষীণরশ্মি পদ্মমণির হৃদয় কন্দরে স্তিমিত আলোক প্রদান করিতে লাগিল। পদ্মমণি বিধবা হইলে, এক প্রসিদ্ধ গণক বলিয়াছিলেন, পদ্মমণি সুসময়ে এক পুত্ররত্ন লাভ করিবেন। এখন পদ্মমণির তাহাই একমাত্র আশ্বাসস্থল হইল এবং সেই পুত্রের আশাতেই পদ্মমণি নিদারুণ পতিশোক

সূর্য্যমণিও প্রায়ই আসিয়া পদ্মমণিকে দেখিয়া যাইতেন ও নানাবিধ কথা প্রসঙ্গে পদ্মমণির প্রবোধের চেষ্টা পাইতেন। ফলতঃ বলিতে কি, এই সময়ে রামধন পদ্মমণির তাদৃশ মনস্তুষ্টি সাধনের চেষ্টা না পাইলে, সেই দারুণ পতিশোকেই পদ্মমণির জীবনদীপ নির্ব্বাণ হইত।

যাহা হউক, দশমাস দশদিন অতীত হইলেই, ১২০৯ সালে পদ্মমণি এক পরম সুন্দর পুত্ররত্ন লাভ করিলেন। পুত্রের রূপ দেখিয়া সূতিকাগৃহে যেন শত-চন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পদ্মমণির মধ্যম ভ্রাতা রাজচন্দ্র সরখেল মহাশয় অতীব যত্ন সহকারে ভাগিনেয়ের জাতকর্ম্ম সম্পাদন করিলেন। পুত্রও দিন দিন শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া, ক্রমে ষষ্ঠমাসে উপনীত হইল। তখন রাজচন্দ্র অন্যান্য ভ্রাতৃগণের সাহায্যে ভাগিনেয়ের অন্নপ্রাশনের বিপুল আয়োজন করিলেন। এই সময়ে খাঁটুরার নিত্যসমাজে অম্লাহারে অনূন ২০০ শত ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইতেন। রাজচন্দ্র সরখেল মহাশয় এই দুই শত ব্রাহ্মণ, গ্রামস্থ যাবতীয় ব্রাহ্মণকন্যা (ন্যূনাধিক ৩০০) ও নিজের যজমানগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া, মহা সমারোহে ভাগিনেয়ের মুখে অন্ন প্রদান করিলেন এবং ভগবচ্চন্দ্র এই নাম রক্ষা করিলেন।

ভাগিনেয়ের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে ভ্রাতৃগণের আনন্দময় মহোৎসব দেখিয়া, পতিবিরহিণী পদ্মমণির বিশুষ্ক-হৃদয়ে কিয়ৎ পরিমাণ আশাবারির সঞ্চার হইল। বালবিধবার নীরস-হৃদয়, কিছুতেই সরস হইবার নহে। আজ পদ্মমণি যে বয়সে বিধবা হইয়াছেন, সে বয়সে অনেকের ভাগ্যে পতি-সহবাসই ঘটিয়া উঠে না। বস্তুতঃ সে সময়ে সমাজচক্র যে ক্ষেত্রে ঘূর্ণিত হইতেছিল, সেই ক্ষেত্রে বালা স্ত্রী পতিসহবাস দূরে থাকুক, অরুণোদয় হইতে বাটীর সকলের সুষুপ্তি পর্য্যন্ত পতির সহিত কথা কহিতে এমন কি পতির মুখাবলোকন করিতে ও পাইতেন না; করিবার আশা ও করিতেন না। তখন সহধর্ম্মিণী পতির সহচারিণী হওয়া দূরে থাকুক, পতির মুখাবলোকন করিয়াই অপার লজ্জাসাগরে নিমগ্ন হইতেন; উভয়ের হৃদয়নিহিত প্রেমপ্রবাহিনী হৃদয়ের গভীরতম নিভৃত প্রদেশ দিয়া তীব্রতেজে প্রবাহিত হইলেও সে বিপুল প্রেমগঙ্গা কাহারও নয়নগোচর হইত না, কিন্তু সেই চণ্ড প্রবাহিনীর উভয় তীরে দয়া, মায়া, ভক্তি, শ্রদ্ধা, সরলতা, স্বজন প্রিয়তা, অর্জ্জনস্পৃহা, উপচীকির্ষা, ন্যায়পরতা

পরোপকার, দেশানুরাগ, বাৎসল্য, বন্ধুতা প্রভৃতি সংসার বন্ধনের অমোঘ রজ্জুস্বরূপ যে সকল মনোহর লতাপাদপ অবস্থিতি করিত, সেকলকেই, প্রবাহিনী সুধাসলিলে অভাবনীয় রূপে সতেজও সম্বর্দ্ধিত করিত। দেখিতে দেখিতে তাহাতে সমস্ত সংসার মধুময় হইয়া উঠিত—নিতান্ত নীরস কঠিন পাষাণও অঙ্কুরিত হইয়া আসিত। পদ্মমণিরও তাহাই হইয়াছিল। কিন্তু পদ্মমণির সে নদী শুকাইয়া গিয়া বিশুদ্ধ এক ভীষণ আঘাত মাত্র হৃদয়মধ্যে নিহিত ছিল। এই আঘাতে যে পদ্মমণির সমস্ত লতাপাদপের সমাধি হইত না, তাহা কে বলিতে পারে? আমরা বলি, নিশ্চয়ই হইত। তবে শুদ্ধ এক ভগবচ্চন্দ্ররূপ নবীন মেঘের উদয় হইয়া, এই আঘাত সরস ও ভিন্ন প্রকৃতির প্রেমসুধায় প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল। সেই জন্যই পদ্মমণির চক্ষে এই বিষের আধার সংসার পুনর্বায় সুধার আধার হইয়া উঠিয়াছিল। এবং ইহার উভয়তীরস্থ সমস্ত লতাপাদপও পুনর্জ্জীবিত ও মুকুলিত হইয়া পতিশোকবিধুরা বালবিধবাকে নবীন তপস্বিনীরূপে পরিণত করিয়াছিল।

মাতা, মাতৃষ্বসা, মাতুল ও মাতুলানীগণের অকপট স্নেহ ও যত্নে ভগবান পঞ্চমবর্ষে পদার্পণ করিলেন। সকলেই পরমানন্দে শুভদিনে ভগবানচন্দ্রের হাতে খড়ি দিয়া, গ্রাম্য গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করিতে পাঠাইলেন। এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র দাস নামক জনৈক ব্যক্তি চন্দ্রশেখর তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের বাটীর নিকটে এক বৃহৎ পাঠশালা স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই স্থানেই ভগবানচন্দ্রের বাল্য শিক্ষা আরম্ভ হইল। ভগবানচন্দ্র অল্পদিনের মধ্যেই এরূপ হস্তাক্ষরের উৎকর্ষ সাধন করিলেন ও দুরূহ দুরূহ অঙ্ক সকল করিয়া দিতেন যে তাহা দেখিয়া সকলেই অবাক হইয়া থাকিতেন। ফলতঃ অতি অল্পদিনের মধ্যেই ভগবানচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্রের পাঠশালার বাল্য শিক্ষা সমাপন করিলেন।

পাঠশালার শিক্ষা শেষ হইলে, রাজচন্দ্র ভাগিনেয়কে শাস্ত্রশিক্ষা দিবার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন। তৎকালে খাঁটুরায় খ্যাতনামা পণ্ডিতের অভাব ছিল না। কিন্তু চন্দ্রশেখর তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় ভগবানকে দেখিয়া অবধি পুত্রনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। সুতরাং রাজচন্দ্র ভগবানের শিক্ষার কথা উত্থাপন করিবামাত্র, চন্দ্রশেখর আহ্লাদে পুলকিত হইয়া স্বকীয় পুত্র

মধুসূদন দ্বারা ভগবানকে ডাকিয়া আনিলেন এবং নিজেই পঞ্জিকা দেখিয়া একটী শুভদিন ধার্য্য করিয়া, ভগবানকে স্বকীয় চতুষ্পাঠীতে আনিয়া ব্যাকরণ আবৃত্তি ও ব্যাকরণ স্বহস্তে লিখিয়া লইতে আদেশ করিলেন। এই সময়ে চন্দ্রশেখর তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের চতুষ্পাঠীর ন্যায় চতুষ্পাঠী, কুশদ্বীপের কথা দূরে থাকুক, সমগ্র বঙ্গদেশেও দেখিতে পাওয়া যাইত না। যাহা হউক, ভগবানচন্দ্র এই চতুষ্পাঠীতে প্রবেশ করিয়া অতি অল্পকাল মধ্যেই ব্যাকরণে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান হইলেন এবং দুই বর্ষ উত্তীর্ণ না হইতে হইতেই ব্যাকরণ ও অভিধানে ব্যুৎপন্নকেশরী হইয়া উঠিলেন।

এইরূপে ভগবান চন্দ্র ব্যাকরণ ও অভিধানে ব্যুৎপন্ন হইলে, তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় ভগবান চন্দ্রকে ভট্টী কাব্য পাঠ করিতে আদেশ করিলেন। ছাত্র প্রতিভাশালী হইলে, শিক্ষকের আহ্লাদের সীমা থাকে না এবং রাত্রি দিন, শয়নে জাগরণে সেই ছাত্রকে শিক্ষা দিয়াও বোধ হয় শিক্ষকের অধ্যাপনা-বৃত্তি পরিতৃপ্ত হয় না। সেই জন্য, তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া, ভগবানকে পাঠ বলিয়া দিতেন। কোনও সভায় অধ্যাপকমণ্ডলীর নিমন্ত্রণ হইলে, তিনি সর্ব্বাগ্রে ভগবানকে সঙ্গে করিয়া লইতেন এবং সভামণ্ডপে বিচারকালে ভগবানকে প্রায় উত্তর পক্ষ অবলম্বন করিতে আদেশ করিতেন। এই সময়ে তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে অন্যূন ২০০ ছাত্র অধ্যয়ন করিতেন। এই দুই শত ছাত্রের মধ্যে ভগবান্ তাঁহার যেমন আদর ও স্নেহের পাত্র হইয়াছিলেন, এমন আর কেহই হইতে পারেন নাই। যথার্থ কথা বলিতে কি, এই সময়ে মধুসূদন ও রাজীব নামক তাঁহার দুইটী পুত্রও তাঁহার চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিতেন। কিন্তু ভগবানের আগে মধু ও রাজীব ও তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের নিকট স্থান পাইতেন না।

এইরূপে, ব্যাকরণ, অভিধান ও সাহিত্যে সম্পূর্ণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলে, তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় ভগবানকে মাধব নিদান পাঠ করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা আজি কালি অধ্যাপক ব্যবসায়ে তাদৃশ উপার্জ্জন নাই কিন্তু কবিরাজী ব্যবসায়ে বিলক্ষণ উপার্জ্জন হইবার সম্ভাবনা। ভগবানেরও টাকার অনেক অভাব রহিয়াছে। যদিও দোগাছিয়াতে ভগবানের পাকা বাটী, পুষ্করিণী, বাগান, ও ধান্য জমি প্রভৃতি সব ছিল, কিন্তু ...

মাতুল, মাতুলানী, মাতৃস্বসা মাতৃস্বসৃপতি প্রভৃতি কেহই ভগবানকে ছাড়িয়া থাকিতে অনিচ্ছুক। তাঁহাদের সকলেরই ইচ্ছা, ভগবান খাঁটুরাতেই বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। ফলতঃ তৎকালে ভগবানের বয়স চতুর্দ্দশ বর্ষ মাত্র। সুতরাং মাতুল রাজচন্দ্র ভগবানকে আরও কিছুদিন পড়াইতে অভিলাষী হইলেন। এদিকে ভগবানেরও ইচ্ছা, ভগবান আর কিছুদিন অলঙ্কার ও জ্যোতিষ এই দুইটী শাস্ত্র পাঠ করেন। কিন্তু খাঁটুরায় থাকিয়া অলঙ্কার ও জ্যোতিষ পাঠের সুবিধা নাই। সেই জন্য ভগবান ভট্টপল্লীতে গমন করিয়া উক্ত বিষয় দুইটী পাঠ করিতে ইচ্ছুক হইলেন।

এদিকে, ভগবান পাঠাভ্যাস করিবার জন্য বিদেশে যাইবেন, এই কথা পদ্মমণির কর্ণগোচর হইবামাত্র, পদ্মমণি বাতাভিহতা কদলীর ন্যায় ভূপতিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রাজচন্দ্র তাঁহাকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিলেন, কিন্তু পদ্মমণি কিছুতেই ভগবানকে বিদেশে পাঠাইতে চাহিলেন না। কিন্তু যখন রাজচন্দ্র কহিলেন, আমি স্বয়ং ভগবান্‌কে সঙ্গে লইয়া ভাটপাড়ায় রামাক্ষয় ঠাকুরের বাটীতে রাখিয়া আসিব, তখন পদ্মমণি কিয়ৎ পরিমাণে শান্তি লাভ করিলেন। রামাক্ষয় ঠাকুর পদ্মমণির গুরুদেব ছিলেন। সেই সূত্রে তিনি বৎসরের মধ্যে দুই একবার পদ্মমণিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইতেন। যখন রামাক্ষয় ঠাকুর পদ্মমণিকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিতেন, তখন সর্ব্বাগ্রে ভগবানকে কাছে লইয়া স্বহস্তে পদধূলি গ্রহণ করিয়া পুত্র বৎসল পিতার ন্যায় অনবরত আশীর্ব্বাদ করিতেন। জলযোগ বা আহারান্তে সর্ব্বাগ্রে ভগবানকে প্রসাদ প্রদান করিতেন। বিশ্রামের সময়েও ভগবানকে কাছে বসাইয়া, যতক্ষণ নিদ্রা না আসিত, ততক্ষণ তিনি নানা প্রকারে ভগবানের জ্ঞান বুদ্ধির পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন এবং ভগবান তাদৃশ অল্প বয়সেও তেমন অগাধ বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছেন দেখিয়া মহা সন্তুষ্ট হইয়া পদ্মমণিকে আশ্বাস প্রদান করিতেন। আবার সময়ে সময়ে তাঁহাকে ভাটপাড়ায় লইয়া গিয়া নিজের কাছে রাখিয়া শাস্ত্র শিক্ষা করাইবেন, পদ্মমণির সহিত পরামর্শ ও করিতেন। ফলতঃ এক্ষণে ভগবানের ভাটপাড়ায় গিয়া পড়িবার সময় হইয়াছে শুনিয়া, পদ্মমণি ভগবানকে রামাক্ষয় ঠাকুরের নিকট রাখিয়া আসিতে জ্যেষ্ঠ সহোদরকে অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে ভগবান মাতুল রাজচন্দ্রের সহিত ভাটপাড়ায়

গমন করিয়া গুরুগৃহে উপস্থিত হইলেন। গুরুদেব ভগবানের সাধু অভিপ্রায়ের কথা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং পরম আদরে ভগবানকে স্বগৃহে রাখিয়া দিলেন।

ভগবান দুই বর্ষকাল গুরুগৃহে বাস করিয়া, সাহিত্যদর্পণ, ভাবপ্রকাশ ও রসগঙ্গাধর প্রভৃতি অলঙ্কার গ্রন্থ, আটাইশ তত্ত্ব স্মৃতি, ও জ্যোতিষের কিয়দংশ শিক্ষা করিলেন। জ্যোতিষ শাস্ত্র অতি উত্তমরূপে শিক্ষা করিবার তাঁহার সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তাহা বহুদিন সাপেক্ষ বলিয়া সে ইচ্ছা সফল করিতে পারিলেন না। যাহাহউক, ভগবান পাঠ সাঙ্গ করিয়া ভাটপাড়া হইতে প্রত্যাগত হইলেন এবং সর্ব্বাগ্রে মাতার চরণ বন্দনা করিয়া, বাল্য গুরু তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের শ্রীচরণ দর্শন করিলেন। অধীতবিদ্য ভগবানকে দেখিয়া সকলেই পরম পুলকিত হইলেন।

আজি অজাতশ্মশ্রু ষোড়শবর্ষীয় বালক ভগবানচন্দ্র মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত। কিন্তু এ পর্য্যন্ত অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার নাম নিবিষ্ট হয় নাই। সুতরাং তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়, জমীদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে অনুরোধ করিয়া ভগবানের নাম অধ্যাপকমণ্ডলী মধ্যে নিবিষ্ট করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াসী হইলেন। সমাজপতি কালীপ্রসন্ন বাবু তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়কে বিশেষ ভক্তি করিতেন; সুতরাং তাঁহার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। কি নিত্য সমাজ, কি কুশদহ সমাজ, উভয় সমাজেই ভগবানের নাম নিবিষ্ট হইল। এখন চারিদিক হইতেই ভগবানেরও অধ্যাপকের পৃথক্ পত্র আসিতে লাগিল। ভগবানও অধ্যাপক সভায় আহুত হইয়া যেখানে যেখানে বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন, সেই স্থানেই জয়লাভ করিতে লাগিলেন। কাযেই উচ্চ বিদায় ক্রমে তাঁহার একায়ত্ত হইয়া আসিল।

এই সময়ে চক্রদ্বীপ (চাকদহে) এক জন খ্যাতনামা চিকিৎসক বাস করিতেন। তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় ভগবানকে তাহার নিকট গিয়া চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার পরামর্শ দিলেন। চিকিৎসাব্যবসায় ভগবানের জাতিবৃত্তি সুতরাং তাহাতে ভগবানেরও নিতান্ত ইচ্ছা হইল। চাকদহের জনৈক কর্ম্মকুশল কবিরাজের নিকট গিয়া সুদুরূহ চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। সে সময়ে বিক্রমপুর

অন্য কোন উপায় ছিল না। কিন্তু বিক্রমপুরে চিকিৎসা ব্যবসায় শিক্ষা করিতে যাইব বলিলেও তাঁহার মাতা ও অন্যান্য গুরুজন তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবেন না এই ভয়ে ভগবান চক্রদ্বীপেই চিকিৎসাব্যবসায় শিক্ষা করিতে যাইবেন এই কথা প্রকাশ করিলেন। চক্রদ্বীপ খাঁটুরা হইতে দশক্রোশের অধিক নহে; সুতরাং ইহাতে কাহারও অমত হইল না। কিন্তু পদ্মমণি তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন না। তখন ভগবান মহা বিপদে পড়িলেন। চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা করিবার জন্য তাঁহার মনও নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। কাযেই ভগবান মাতার অজ্ঞাতসারেই চলিয়া যাইবেন, এই সংকল্প স্থির করিলেন এবং একদিন কনিষ্ঠা মাতুলানীর নিকট হইতে আটটী মাত্র পয়সা চাহিয়া লইয়া, প্রত্যূষে উঠিয়া চক্রদ্বীপ রওনা হইলেন।

এ দিকে, বাটীর সকলেই বুঝিতে পারিলেন, ভগবান জননীর অজ্ঞাতসারে চক্রদ্বীপে চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার্থে প্রস্থান করিয়াছেন—এই কথা শুনিয়া পদ্মমণি এককালে ধরাশায়িনী হইলেন। তাঁহার আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া গেল। অনেকেই তাঁহাকে অনেক প্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মনে প্রবোধের উদয় হইল না। এ দিকে, ভগবান না বলিয়া যাওয়াতে রাজচন্দ্রও অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। সেই দিন ও রাত্রি মাত্র যে কোন প্রকারে কাটাইয়া দিয়া, তৎপর দিন প্রত্যূষেই রাজচন্দ্র চক্রদ্বীপ যাত্রা করিলেন। বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইলে, রাজচন্দ্র চক্রদ্বীপের নীলকমল কবিরাজ মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইলেন, এবং সেই স্থানেই ভগবানচন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন। তখন রাজচন্দ্রের দুই গণ্ড বহিয়া আনন্দাশ্রু পড়িতে লাগিল। রাজচন্দ্র শশব্যস্তে ভগবানকে ক্রোড়ে লইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে নানাবিধ মিষ্ট ভৎর্সনা করিলেন। এই সময়ে কবিরাজ মহাশয় বাটীর ভিতর বিশ্রাম করিতেছিলেন। তিনি এই ঘটনার কথা শুনিতে পাইয়া সত্বরে বহির্ব্বাটীতে আগমন করিলেন এবং রাজচন্দ্রকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া, প্রকৃত কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজচন্দ্র আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।

তখন কবিরাজ মহাশয় ব্রাহ্মণের আহার হয় নাই শুনিয়া, ভৃত্যকে ডাকিয়া

তৈল আনিয়া দিল। রাজচন্দ্র হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করিয়া, অল্পমাত্র বিশ্রাম করিয়াই ৺ গঙ্গাস্নান করিতে গমন করিলেন। এদিকে, ভৃত্য রাজচন্দ্রের জলযোগের উদ্যোগ করিয়া দিয়া, চুল্লী ধরাইয়া দিল ও ভগবানকে মাতুলের জন্য রন্ধন করিয়া রাখিতে পরামর্শ দিল। ভগবান্ তাহাই করিলেন। রাজচন্দ্র ৺ গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া যৎকিঞ্চিৎ মাত্র জলযোগ করিয়াই আহারে বসিয়া গেলেন।

পথশ্রম নাশ করিবার জন্য আহারান্তে ভৃত্য রাজচন্দ্রের জন্য এক সুকোমল শয্যা প্রস্তত করিয়া দিল। রাজচন্দ্র সেই শয্যায় শয়ন করিবামাত্র গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই রাজচন্দ্রের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তখন রাজচন্দ্র গাত্রোত্থান করিয়া মুখ ও হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করিলেন। পরে, ভৃত্য সন্ধ্যাহ্নিকের আয়োজন করিয়া দিল। রাজচন্দ্র তখন সায়াহ্নকৃত্য সমাপন করিলেন। ভৃত্য পুনরায় জলযোগের আয়োজন করিয়া দিতে ছিল, কিন্তু অপরাহ্নে আহার হইয়াছে বলিয়া রাজচন্দ্র আর জলযোগ করিলেন না। এদিকে, নীলকমল সেন মহাশয়ও সায়াহ্নিক কৃত্য সমাপন করিয়া বহির্ব্বাটীতে আগমন করিলেন এবং রাজচন্দ্র সরখেল মহাশয়কে সান্ধ্য অভিবাদন করিয়া নিকটে উপবিষ্ট হইলেন।

নীলকমল সেন মহাশয় দেখিতে খর্ব্বাকৃতি কিন্তু সুপুরুষ। এই সময়ে তাঁহার বয়স অন্যূন ত্রিংশৎবর্ষ হইবে। ইনি ব্রাহ্মণভক্ত, সদাচার সম্পন্ন, দয়ালু, মিষ্টভাষী ও সদালাপী ছিলেন। ছাত্রগণের প্রতিও তাঁহার বিলক্ষণ যত্ন ছিল। এই সময়ে ভাগীরথির প্রবাহ সমধিক প্রবল থাকাতে চক্রদ্বীপ একটী সুসমৃদ্ধ বন্দর হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং তখন এই স্থানে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী ও অধিবাসীগণের আবাস স্থান ছিল। মাঘী পূর্ণিমার সময়, তখন এখানে এক দীর্ঘকালব্যাপী মেলা ও তদুপলক্ষে বিশেষ সমারোহ হইত। অনেক দূর হইতে স্ত্রী ও পুরুষ যাত্রীগণও তখন এই সময়ে ৺ গঙ্গাস্নান করিতে এইখানে আগমন করিত। ফলতঃ তৎকালে এই স্থান বিলক্ষণ সম্ভ্রান্ত ও সমৃদ্ধিশালী ছিল। নীলকমল সেন মহাশয়ের পিতা বিক্রমপুর হইতে আসিয়া এখানে বাস করিয়াছিলেন। পিতার কাল হইলে, ইনি আর বিক্রমপুরে ফিরিয়া যান নাই।

স্থান হইয়াছিল। ইঁহার পিতাও এইস্থানে চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেন। এক্ষণে পুত্রও সেই পৈতৃক বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন এবং শাস্ত্রজ্ঞান অধিক থাকাতে পিতা অপেক্ষা সমধিক বিখ্যাত হইয়াছেন। বস্তুতঃ এই সময়ে ইঁহার সুযশ এত প্রসারিত হইয়াছিল যে সাতক্ষীরা, টাকী ও যশোহর প্রভৃতি স্থানেও ইঁহাকে সময়ে সময়ে চিকিৎসা করিতে যাইতে হইত।

নীলকমল ভগবানের কথা লইয়াই সর্ব্বাগ্রে রাজচন্দ্রের সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। রাজচন্দ্রও ক্রমান্বয়ে ভগবানের পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস হইতে ভাটপাড়ায় শাস্ত্রশিক্ষা পর্য্যন্ত যাবদীয় বিষয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন এবং ভগবান যে এই অল্প বয়সেই প্রায় সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা হইয়া মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হইয়াছেন, তাহাও প্রকাশ করিলেন। কবিরাজ মহাশয় ভগবানের প্রগাঢ় বিদ্যাবুদ্ধির কথা শুনিয়া ভগবানকে নিকটে আহ্বান করিলেন এবং নানাপ্রকার আশ্বাস বাক্য প্রদান করিয়া কহিলেন—"বাবা! এ যাত্রা তোমাকে বাটী যাইতে হইবে; তুমি সকলকে বলিয়া না আসাতে ভাল হয় নাই। বাটীতে গিয়া এক সপ্তাহ থাকিয়া, সকলকে বলিয়া কহিয়া একটী শুভদিন দেখিয়া এখানে আসিও। আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তুমি দ্বিতীয়বার এখানে আসিলে, আমি তোমাকে বিশেষ যত্ন করিয়া নিদানাদি শিখাইব। আসিবার সময় পদব্রজে আসিও না। একখানি ডুলি বা গোযান করিয়া আসিও। উহার পাথেয় স্বরূপে আমি তোমাকে পাঁচ টাকা দিতেছি। ইহাতে তোমার যাওয়া আসা উভয়ই চলিবে।—কালি প্রত্যূষেই বাটীতে গিয়া মাতাকে সান্ত্বনা কর।"

শুনিয়া ভগবান কহিলেন—"কেন, মামা ত আমাকে এখানে দেখিয়া যাইতেছেন। তিনি গিয়া মাকে বলিলে কি মা শুনিবেন না?—"

কবিরাজ মহাশয় পুনরপি কহিলেন—না বাবু! হয়ত তাহাতে তোমার মাতার বিশ্বাস হইবে না। তুমি একবার গিয়া দেখা দিয়া আসিলেই তিনি ঠিক্ বুঝিবেন যে তুমি এই খানেই ছিলে। নতুবা তিনি অন্যরূপ ভাবিতে পারেন।

এই কথা শুনিয়া ভগবান আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। কবিরাজ মহাশয়ের প্রদত্ত টাকা পাঁচটী প্রথমে লইতে অস্বীকার করিলেন; কিন্তু কবিরাজ

মহাশয় পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করাতে গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না এবং তৎপর দিন প্রত্যূষেই বাটী যাত্রা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

পরদিন বেলা ৩টার সময় রাজচন্দ্র ভগবানকে সঙ্গে লইয়া থাঁটুরার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ভগবানকে দেখিয়া পদ্মমণি কাঁদিয়া উঠিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, তিনি সান্ত্বনা লাভ করিলে, রাজচন্দ্র ও ভগবান স্নান করিয়া আহার করিলেন। এইরূপে, প্রায় সপ্তাহকাল অতীত হইলে, ভগবান রাজচন্দ্রকে চাকদহে যাইবার কথা নিবেদন করিলেন। রাজচন্দ্র ও পদ্মমণিকে নানাপ্রকার বুঝাইয়া, ভগবানের চাকদহে কবিরাজী শিক্ষার্থে যাইবার যাত্রিক দিন স্থির করিলেন। কবিরাজ মহাশয় ও তাঁহার মাতা ভগবানকে যে নিতান্ত স্নেহ-চক্ষে দেখিয়াছেন, রাজচন্দ্র সরখেল মহাশয় তাহাও পদ্মমণির নিকট প্রকাশ করিতে বিরত হইলেন না। পদ্মমণি শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইলেন এবং নির্দ্ধারিত দিনে ভগবানকে যাইতে আদেশ করিলেন।

এ দিকে, রাজচন্দ্র ভগবানের পথকষ্ট নিবারণ করিবার জন্য একখানি শিবিকা স্থির করিয়া রাখিলেন এবং নীলকমল সেন মহাশয়কে পাঠাইয়া দিবার জন্য একভাঁড় উৎকৃষ্ট নলেন গুড় ও দুইটা মানকচু কিনিয়া আনিলেন। এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক, এতদঞ্চলে যেরূপ উৎকৃষ্ট নলেন গুড় প্রস্তত হইয়া থাকে, অন্য কোন স্থানে সেরূপ উৎকৃষ্ট গুড় দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা হউক, তৎপর দিন প্রত্যূষে ভগবান বেলা নয়টার মধ্যে স্নানাহার সমাপন করিলেন এবং মাতা, মাতৃস্বসা, মাতুল ও মাতুলানীগণের পদধূলি গ্রহণ করিয়া শিবিকারোহণে চাকদহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

থাঁটুরা হইতে চাকদহ দশ বার ক্রোশের অধিক নহে; সুতরাং ভগবান সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বেই কবিরাজ মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ভগবানকে দেখিয়া নীলকমল ও তাঁহার মাতা সাতিশয় হর্ষিত হইলেন। ভগবান রাত্রিতে আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন। এ দিকে, বেহারা চারিটীকে নীলকমলের ভৃত্য আহারাদি করাইয়া শয়ন করিবার স্থান দেখাইয়া দিল। তাহারাও সেইস্থানে সমস্ত রাত্রি থাকিয়া প্রত্যূষে চলিয়া আসিল।

পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া নীলকমল ভগবানকে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আদেশ করিলেন এবং গৃহ হইতে নিজের পুঁথি আনিয়া ভগবানকে

পাঠ বলিয়া দিতে লাগিলেন। ভগবান সেই পুঁথি স্বহস্তে লিখিয়া লইতে লাগিলেন। সাহিত্য ব্যাকরণে ভগবানের অপরিসীম জ্ঞান ছিল সুতরাং নিদান নিজে নিজেই অধ্যয়ন ও কণ্ঠস্থ করিলেন। তবে মধ্যে মধ্যে যে গুলি নিতান্ত দুরূহ বলিয়া বোধ হইত, তাহাই কবিরাজ মহাশয়ের নিকট বুঝিয়া লইতেন। এইরূপে, প্রায় দুই বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি চিকিৎসা-গ্রন্থ ভগবান কবিরাজ মহাশয়ের নিকট থাকিয়া অভ্যাস করিলেন। ফলতঃ এই সময়ে ভগবান চিকিৎসা ব্যবসায়েও এরূপ দক্ষ ও ব্যুৎপন্ন হইলেন যে, নীলকমল সেন মহাশয় নিজে প্রায় কোনও রোগী দেখিতে যাইতেন না; সর্ব্বত্রই ভগবানকে পাঠাইয়া দিতেন। তবে নিতান্ত কঠিন পীড়া দেখিলে, ও দূরদেশ হইতে আহূত হইলেই নিজে রোগী দেখিতে যাইতেন। নতুবা ভগবানই সকল রোগীর তত্ত্বাবধারণ করিতেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই সময়ে চাকদহ বিশিষ্ট সমৃদ্ধিশালী বন্দর ছিল। তৎকালে এখানে অনেক সম্ভ্রান্ত ধনী ও ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে চৌগাছা নিবাসী তারিণীচরণ ঘোষের পিতৃব্য সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন ও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি ভগবানকে দেখিয়া অবধি পুত্রাধিক স্নেহ ও যত্ন করিতেন। তাহার উপর আবার যখন তাঁহার অগাধ শাস্ত্রজ্ঞানের কথা শ্রবণ করেন, তখন তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করেন। অধিকন্তু, এই দুইবৎসর কাল চাকদহে বাস করাতে ও দৈনন্দিন সহবাসে উঁহাদের পরস্পরের সংস্রব আরও প্রবল ও ঘনীভূত হইয়া আসিল। সেই সূত্রে তারিণীচরণ ঘোষও ভগবানকে জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় জ্ঞান করিতেন এবং তদীয় কনিষ্ঠ কালীচরণ ঘোষ মহাশয় ভগবানকে পিতার ন্যায় সম্মান ও ভক্তি করিতেন। বলিয়া রাখা আবশ্যক, এই কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ই ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও কলেকক্টর হইয়া এক সময়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট বিপুল সম্ভ্রম লাভ করিয়াছিলেন।

যাহাহউক, চাকদহে থাকিয়া, যতদূর পারিলেন, ভগবান্ চিকিৎসা গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার জ্ঞান তৃষ্ণা দূর হইল না। তৎকালে বঙ্গদেশের মধ্যে বিক্রমপুর ভিন্ন আর কুত্রাপি চিকিৎসাশাস্ত্র শিখিবার সুবিধা ছিলনা। সেইজন্য ভগবান নীলকমল সেনের নিকট পাঠ সাঙ্গ করিয়া,

অন্ততঃ একবৎসর কালও বিক্রমপুরে থাকিয়া চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ভগবানের দারুণ পাঠতৃষ্ণা থাকিলেও, নীলকমল সেন ভগবানকে এখন হইতেই ব্যবসায় করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু ভগবান বিনয়পূর্ণ কাতর বচনে গুরুর নিকট স্বকীয় মনোগত ভাব প্রকাশ করিলেন। ভগবানের কাতরতা দেখিয়া নীলকমল ভগবানকে আর বারণ করিলেন না।

অতঃপর ভগবান্, ঘোষ মহাশয়ের নিকটেও স্বকীয় মনোভাব প্রকাশ করিলেন। ঘোষ মহাশয়ও ভগবানের অধ্যবসায় ও ভগবানের কথায় যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। সেই সময়ে ঢাকা বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক বৃহৎ বৃহৎ পণ্য নৌকা চাকদহে উপস্থিত হইত। এমন কি, প্রতিমাসে, ঘোষ মহাশয়ের দোকানেও তাদৃশ নৌকা ২।৪ খানি পাওয়া যাইত। যাহা হউক, ঘোষ মহাশয় ভগবানের প্রতি সদয় হইয়া বিনা ভাড়ায় তাদৃশ এক খানি নৌকা স্থির করিয়া দিলেন। এবং পাথেয়-স্বরূপে ভগবানের হস্তে দশটী টাকা প্রদান করিলেন। পরে ভগবান সেই নৌকারোহণ করিয়া যথাসময়ে বিক্রম [illegible] উপস্থিত হইলেন। বিক্রমপুরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিরাজ রামদুর্লভ সেন মহা[illegible]য় নীলকমল সেন মহাশয়ের পিতৃব্য ছিলেন। সুতরাং নীলকমল সেন মহাশয়ও এক খানি পত্র লিখিয়া, ভগবানের অবস্থা পিতৃব্য মহাশয়কে জানাইয়া, ভগবানকে বিশেষ যত্ন সহকারে শিক্ষাপ্রদান করিতে অনুরোধ করিলেন। সেই পত্র পাইয়া নীলকমলের পিতৃব্য রামদুর্লভ অতি সম্ভ্রম সহকারে ভগবানকে গ্রহণ করিলেন। এ দিকে, পীতাম্বর সেন প্রমুখ বিক্রমপুরবাসী যাবদীয় পণ্ডিতমণ্ডলী ভগবানের অগাধ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া ভগবানকে বিশেষ সমাদর ও ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে একবৎসরকাল ভগবান বিক্রমপুরে থাকিয়া, চিকিৎসাশাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞান লাভ করিলেন। বর্ষান্তে রামদুর্লভ সেন কবিরাজ মহাশয় ভগবানকে ডাকিয়া কহিলেন—"ভগবান! চিকিৎসাশাস্ত্রে তুমি অসাধারণ জ্ঞান লাভ করিয়াছ। আজি কালি তোমার সমকক্ষ লোক বঙ্গদেশে নিতান্ত বিরল। সুতরাং তুমি এক্ষণে অধ্যয়নে বিরত হইয়া, স্বদেশে গমন কর এবং

ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া, যাহাতে তোমার বিদ্যানুরূপ অর্থাগম হয় তাহার উপায় দেখ।”

এই বলিয়া কবিরাজ মহাশয় পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়াই বিক্রমপুরের তদানীন্তন যাবদীয় চিকিৎসা ব্যবসায়ী পণ্ডিতগণকে একটী প্রকাশ্য সভায় আহ্বান করিলেন। পণ্ডিতমণ্ডলী সমাগত হইলে, কবিরাজ মহাশয় তাঁহাদের সমক্ষে ভগবানের চিকিৎসাশাস্ত্রে অসামান্য দক্ষতার বিষয় প্রকাশ করিলেন। এবং এক্ষণে তাঁহাকে তাঁহার জ্ঞানানুরূপ উপাধিভূষণে ভূষিত করিয়া, তাঁহার পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার দিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করিলেন। পণ্ডিত-সভায় ভগবানের সহিত অনেক চিকিৎসাব্যবসায়ী পণ্ডিতের বিচার হইল। তাঁহারা সকলেই চিকিৎসাশাস্ত্রে ভগবানের অগাধ ব্যুৎপত্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং সেই সভাতে সকলেই একমত হইয়া, ভগবানকে “কবিকিশোর” উপাধি প্রদান করিলেন। ভগবান ভারতের তদানীন্তন শিরোভূষণ বিক্রমপুর সমাজের অধ্যাপকমণ্ডলীর নিকট প্রশংসাপত্র পাইয়া, যারপর নাই পুলকিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি ভাটপাড়ায় অলঙ্কার, জ্যোতিষ ও স্মৃতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া, যে ‘বিদ্যালঙ্কার’ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা “কবিকিশোর” উপাধিতে তিনি মনে মনে আপনাকে আরও গৌরববান্ মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভগবান কবিকিশোর উপাধিতে বিখ্যাত না হইয়া, বিদ্যালঙ্কার উপাধিতে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

এইরূপে ভগবান পাঠ সাঙ্গ করিয়া, সকলের নিকট যথাবিধানে বিদায় লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইতে অভিযাষী হইলেন। সুবিধামতে ভগবান একখানি মহাজনী ভড়ের সন্ধান পাইলেন। সেই ভড়খানি বিক্রমপুর হইতে নানাবিধ পণ্যজাত লইয়া চাকদহে আগমন করিবে। ভগবান তাহাতে আরোহণ করিয়াই, চাকদহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিবার সময় তাঁহার গুরুদেব তাঁহাকে পাথেয় স্বরূপে পাঁচটী টাকা দিয়াছিলেন। ভগবান তাহাতেই নৌকার ভাড়া চুকাইয়া দিলেন এবং আপনার নিকট যাহা ছিল, তাহাতে স্বকীয় আহারাদি ব্যয় নির্ব্বাহ করিলেন।

ভগবান চাকদহে পৌঁছিলে, নীলকমল সেন ও ঘোষ মহাশয় প্রভৃতি

ভগবানের আত্মীয়গণের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। ভগবান সে দিন সেন মহাশয়ের বাটীতে থাকিয়া আহারাদি সমাপন করিলেন এবং তৎপর দিন প্রত্যুষে খাঁটুরায় আগমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এ দিকে, সেন মহাশয় ভগবানকে বাটী পাঠাইবার জন্য আটজন বেহারা স্থির করিয়া রাখিলেন।

নির্দ্ধারিত দিনের প্রত্যুষে বেহারাগণ পাল্কী লইয়া উপস্থিত হইলে, সেন মহাশয় ভগবানকে সেই পাল্কীতে আরোহণ করিয়া বাটী আসিতে কহিলেন এবং পাথেয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য দশটী টাকা প্রদান করিলেন। ইতিপূর্ব্বে ঘোষ মহাশয়ও ভগবানকে আর দশটী টাকা প্রদান করিয়া আগামী ৺ শারদীয়া পূজার সময় ভগবানকে তাঁহার চৌগাছার বাটীতে আগমন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ভগবানও ঘোষ মহাশয়ের অনুরোধে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করেন।

ভগবান ভাদ্রমাসের শেষভাগে শাস্ত্র-সাগর মন্থন করিয়া, ঊনবিংশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে, খাঁটুরার বাসভবনে আসিয়া উপনীত হইলেন। যে এক বৎসরকাল ভগবান বিক্রমপুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই এক বৎসর পদ্মমণি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, অহর্নিশ কেবল হা ভগবান্!—যো ভগবান!! করিতেছিলেন। অঞ্চলের ধন, অন্ধের যষ্টি, সংসার-সাগরের একমাত্র তরণী ভগবানকে পাইয়া আজি পদ্মমণির শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। পদ্মমণি ভগবানকে ক্রোড়ে করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। তখন সকলে আসিয়া পদ্মমণিকে সান্ত্বনা করিল। এদিকে, ভগবানের নিকটে যে কয়েকটী টাকা ছিল, ভগবান্ মাতার পদতলে সেই কয়েকটী টাকা অর্পণ করিয়া মাতার পদরেণু মস্তকে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু পদ্মমণি টাকা কয়টী স্পর্শ না করিয়া স্বকীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজচন্দ্রকে অর্পণ করিতে আদেশ করিলেন। ভগবানও তাহাই করিলেন। অবিলম্বে টাকা কয়টী উঠাইয়া লইয়া, মাতুল মহাশয়ের পদতলে রক্ষা করিয়া প্রণাম করিলেন। রাজচন্দ্র পদপ্রান্ত হইতে কুলতিলক ভগবানচন্দ্রকে উঠাইয়া লইয়া স্নেহভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া অবিরল আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পুত্র ও কন্যাতে রাজচন্দ্রও আটনয়টি সন্ততি লাভ করিয়াছিলেন।

বিপুল আনন্দলাভ করিলেন, তাঁহার কোনও সন্ততিদ্বারা কস্মিন্‌কালে সেরূপ আনন্দ উপভোগ করিতে পান নাই। বস্তুতঃ সন্তানের প্রতি লোকের অপার স্নেহ জন্মিয়া থাকে বটে; সে স্নেহও খরস্রোতা তীব্র তটিনীর ন্যায় উভয় প্রান্ত ভাসাইয়া বিপুলবেগে চলিয়াও গিয়া থাকে সত্য; কিন্তু যে ভাগিনেয় বা কনিষ্ঠ সহোদরের গঠনকার্য্য স্বহস্তে নিজের তত্ত্বাবধারণে সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহা সন্তানস্নেহে কদাপি প্রতিহত হইতে পারে না—সেই তীব্রতটিনীর খরস্রোতও নিম্নোক্ত স্নেহপ্রবাহের নিকট নিতান্ত ত্রাসিত হয়—নিতান্ত অপদস্থ হইয়া স্থিরমূর্ত্তি ধারণ করে। যাহাহউক, ভগবানের প্রদত্ত টাকা কয়টী যেন লক্ষাধিক স্বর্ণমুদ্রা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। রাজচন্দ্র সাদরে টাকা কয়টী উঠাইয়া লইয়া, গ্রাম্য দেবতা চণ্ডিকা দেবীর পূজা ও ব্রাহ্মণভোজন উদ্দেশে তুলিয়া রাখিলেন। বেহারাদিগের ভাড়া তিনি নিজ হইতেই প্রদান করিলেন।

দুই এক মাসের মধ্যেই ভগবান শাস্ত্র ব্যবসায়ে যেমন অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন, চিকিৎসাব্যবসায়েও তেমনই অসামান্য প্রতিপত্তিভাজন হইয়া উঠিলেন। যাবতীয় ক্রিয়কাণ্ডে দুই একজন করিয়া প্রায় সকলেই তাঁহাকে ডাকিতে লাগিল। বিশেষতঃ চন্দ্রকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় ভগবানের শুভ-কামনায় প্রাণপাত করিতেও প্রস্তুত হইলেন। এই সময়ে রাজকুমার সরখেল নামক জনৈক ব্রাহ্মণের অনেকগুলি তাম্বুলী যজমান ছিল। ইনি শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকাণ্ড তাদৃশ উত্তমরূপে করিতে পারিতেন না। একজন সহযোগী পুরোহিত দ্বারাই যজমানগণের ক্রিয়াকাণ্ড সমাপন করাইতেন। বিশেষতঃ তিনি এই সময়ে খাঁটুরা ত্যাগ করিয়া বরাহনগরে আসিয়া বাস করিতেন। সুতরাং তাঁহার একজন নায়েব পুরোহিতের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল। চন্দ্রকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত, কালীকুমার দত্ত, বংশীধর পাল ও রামগতি পাল মহাশয়গণের অনুরোধে রাজকুমার, ভগবানচন্দ্রকেই সেই ভার প্রদান করিলেন। সুতরাং এই সময়ে পালপাড়ার প্রায় সমস্ত তাম্বুলীই ভগবানের যজমান হইলেন। এই যজমানগণ সংখ্যায় অন্যূন ২০।৩০ ঘর হইবে। এতদ্ভিন্ন উত্তরপাড়াস্থ বড় রক্ষিতেরাও পূর্ব্বহইতে ভগবানের যজমান হইয়াছিলেন। এইরূপে, [illegible] ঘর সমস্ত তাম্বুলী ভগবানের যাজনাধীন হইল।

হইতে লাগিল। এই সময়ে বিশ্বম্ভর ন্যায়রত্ন মহাশয়ই খাঁটুরায় খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। ভগবান চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করিলে, ক্রমে ক্রমে তাঁহারও পসার হ্রাস হইয়া আসিল। এই সময়ে ভগবান্ বিদ্যালঙ্কারকেই প্রায় সকলেই ডাকিতে লাগিল। তবে নিতান্ত উৎকট পীড়া হইলেই ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রয়োজন হইত। এতদ্ভিন্ন, ইচ্ছাপুরের বৈদ্যনাথ চৌধুরী মহাশয় তৎকালে বিলক্ষণ প্রতিপত্তিশালী ও গণ্য মান্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ গিরিশচন্দ্র ইঁহার ভগিনীপতি ছিলেন। এই সূত্রেও ইনি অনেকের শ্রদ্ধাস্পদ ও সম্মানার্হ হইয়া উঠেন। যাহাহউক, ভাগ্য ক্রমে ভগবান ইঁহার প্রীতি-চক্ষে পতিত হন। সেই জন্য, চৌধুরী মহাশয় ভগবানের চিকিৎসার একান্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠেন এবং সামান্য শিরঃপীড়া বা উদরাময় হইতে উৎকট উৎকট ব্যাধি পর্য্যন্ত সকল রোগেই ভগবান ভিন্ন আর কাহাকেও জানিতেন না।

এদিকে চৌগাছার সম্ভ্রান্ত ঘোষ- পরিবার ও কি শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকাণ্ড, কি চিকিৎসা ব্যাপার সকল স্থলেই ভগবান্ বিদ্যালঙ্কারকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ফলতঃ উঁহারা ভগবানের উপর এরূপ শ্রদ্ধাবান হইয়া উঠিয়া ছিলেন, যে, মাসের মধ্যে অন্ততঃ ২।৩ বার ভগবানকে চৌগাছার বাটীতে না লইয়া গিয়া, থাকিতে পারিতেন না। বলিতে গেলে, তৎকালে বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ই তারিণীচরণ ঘোষপ্রমুখ মহোদয়গণের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

ভগবান অধ্যয়ন সমাপন করিয়া, স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে, অনেকেই ভগবানকে কন্যা দান করিবার জন্য প্রয়াস পাইতে ছিলেন। কিন্তু রাজচন্দ্র, দানিয়াড়ী মহাশয়ের ত্রিপুরাসুন্দরী নাম্নী এক রূপবতী কন্যার সহিত ভাগিনেয়ের পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। দুই একটী বাহিরের লোক দ্বারাও এই সম্বন্ধের কথাবার্ত্তাও হইয়াছিল। কিন্তু দানিয়াড়ী মহাশয় ত্রিপুরাসুন্দরীকে পরিবর্ত্ত করিয়া স্বীয় জ্যেষ্ঠ তনয় হরমোহনের বিবাহ দিতে কৃত সংকল্প হইয়াছিলেন। রাজচন্দ্র লোক পরম্পরায় সেই কথা শুনিতে পাইয়া স্বকীয়া জ্যেষ্ঠা কন্যা থাকমণিকে পরিবর্ত্ত করিয়া ভগবান্ বিদ্যালঙ্কারের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। দানিয়াড়ি মহাশয় তাহাতে আর কোনও আপত্তি করিলেন না।

বিবাহের পরে ভগবান আর মাতুলের গলগ্রহ হইয়া থাকা নিতান্ত অন্যায় বিবেচনা করিয়া, কালীকুমার দত্ত, বংশীধর পাল ও রামগতি পাল প্রভৃতি স্বকীয় প্রধান সহায়গণকে স্বকীয় মনোভীষ্ট অবগত করাইলেন। উঁহারা সকলে উদ্যোগী হইয়া, রাজচন্দ্র প্রভৃতি মাতুলগণকে বলিয়া, তাঁহার বাটীর পার্শ্বে ভগবানের বাটী প্রস্তুত করিতে পরামর্শ দিলেন। তদনুসারে ভগবান উক্ত স্থানে প্রথমে এক খানি খড়ের ঘর প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু ২।৩ বৎসর অতীত না হইতে হইতে কিছু ইষ্টক প্রস্তুত করিয়া বর্ত্তমান বাটী প্রস্তুত করিলেন। এই সময়ে রামগতি পালের অবস্থা অত্যন্ত উন্নত হইয়া আসিয়াছিল। সুতরাং তিনি খড়ের চণ্ডীমণ্ডপ উঠাইয়া দিয়া পূজার দালান প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। কাযেই চণ্ডীমণ্ডপের আর কোন্ প্রয়োজন নাই দেখিয়া বিদ্যালঙ্কার মহাশয়-কেই চণ্ডীমণ্ডপ উঠাইয়া লইয়া তাঁহার বাটীতে বাঁধিতে অনুরোধ করিলেন। বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ও সে সুবিধা ত্যাগ করিলেন না।

এইরূপে ভগবান খাঁটুরাতে এক প্রকার বদ্ধমূল হইলে, ভগবান একটী চতুষ্পাঠী স্থাপন করিবার অভিপ্রায় করিলেন। তিনি এই কথা স্বকীয় বাল্য-গুরু চন্দ্রকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের নিকট উত্থাপন করিবামাত্র, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন, দেখ ভগবান! এক্ষণে আমি প্রাচীন হইয়া পড়িয়াছি, ১৫০ বা ২০০ ছাত্রকে পাঠ বলিয়া দেওয়া এক্ষণে প্রায় আমার সাধ্যাতীত হইয়াছে। সুতরাং তুমিই এই চতুষ্পাঠীর কার্য্যভার গ্রহণ কর। তাহাতে ভগবান কহিলেন, আমি রামগতি প্রভৃতিকে বলিয়া একটী চতুষ্পাঠীর স্থান নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছি। তাঁহারা আমাকে গৃহাদি প্রস্তুত করিয়া দিবার কথাও বলিয়াছেন। এক্ষণে কেবল আপনার ও জমিদার কালীপ্রসন্ন বাবুর সম্মতি হইলেই, সকল কার্য্যশেষ হইয়া যায়। সুতরাং আমি এখানে আসিয়া ছাত্রগণকে না পড়াইয়া আপনি যতগুলি ছাত্রের পাঠ দিতে পারিবেন, ততগুলি রাখিয়া দিন। অবশিষ্ট ছাত্র আমাকে প্রদান করুন।

এই কথা শুনিয়া চন্দ্রকান্ত তাহাতেই সম্মত হইলেন এবং নিজের চতুষ্পাঠীতে মাত্র ১০।২০ জন ছাত্র রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত ছাত্রই ভগবানের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ভগবান ও সেই সকল ছাত্র পাইয়া মহানন্দিত হইয়া,

পরম সুখে ছাত্রগণকে শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন এবং ভগবান ও কুশদহ সমাজে যেমন একজন মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক, তেমনি একজন লব্ধনামা চিকিৎসক বলিয়া সর্ব্বত্র আদৃত হইলেন। খাঁটুরার খ্যাতনামা শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, ধরণীধর চূড়ামণি, গোবিন্দ ন্যায়বাগীশ, হরমোহন সার্ব্বভৌম, কালীচরণ বিদ্যারত্ন প্রভৃতি সকলেই ভগবানের ছাত্র। ইহাঁদের মধ্যে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভগবানের নিকট ব্যাকরণ ও সাহিত্য পাঠ করিয়া আসিয়াই কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন এবং সাহিত্য ও রচনাতে সকলের অপেক্ষা উচ্চাসন লাভ করিয়া, কবিতা রচনার যাবতীয় পুরস্কার একায়ত্ত করিয়াছিলেন।

বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই ত্রিপুরাসুন্দরীর গর্ভে ভগবানের দুই পুত্র-সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। ভগবান প্রথমটীর নাম গোপালচন্দ্র ও মধ্যমের নাম দ্বারকানাথ রাখিলেন। এই দুই পুত্র ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, ভগবান উহা-দিগের উপনয়ন সংস্কার ও প্রথমের বিবাহ ক্রিয়া পর্য্যন্ত সমাধা করিলেন।

এই সময়ে তাহার মাতৃস্বস্রীয় ভ্রাতা শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপক হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি উক্ত দুই ভ্রাতাকে কলিকাতায় আনিয়া লেখা পড়া শিখাইবার জন্য ভগবানের নিকট অনুরোধ করিলেন। ভগবানও শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে এতদূর ভাল বাসিতেন যে তাহাতে দ্বিরুক্তি করিলেন না। সুতরাং শ্রীশচন্দ্র গোপালকে মেডিকেলকলেজে বাঙ্গালা শ্রেণীতে ও দ্বারকানাথকে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। গোপাল কালক্রমে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, কিছুদিন আরঙ্গাবাদে ও তৎপরে জঙ্গীপুরে থাকিয়া আজি কালি লোক যাত্রা সম্বরণ করিয়াছেন। দ্বারকানাথ আজি ও বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।—৺বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয় বৈয়া-করণিক ও বৈদ্য ভগবান্ বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। এই বিপিন-বিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ই এই কুশদ্বীপ কাহিনী গ্রন্থের রচয়িতা। দুর্ভাগ্য-ক্রমে অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়াতে তিনি এ গ্রন্থের ৯ ফর্ম্মা পর্য্যন্তই মুদ্রাঙ্কন করেন, গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। ১২৫৯ সালে তাঁহার জন্ম হয়, ১৩০৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তাঁহার

৪৭ সাতচল্লিশ বৎসরমাত্র জীবিত ছিলেন। তিনি একজন প্রকৃত স্বদেশানুরাগী ও সাহিত্যসেবী মহাত্মা ছিলেন। বঙ্গভাষায় পুস্তক সকল লিখিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের উন্নতি করা তাঁহার একটী জীবনব্রত ছিল। বঙ্গভাষার উপর তাঁহার ক্ষমতাও অসীম ছিল। এক একস্থানে তাঁহার ভাষা রচনার পারিপাট্য দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। তিনি ডন্‌কুইক্‌সোট্‌ নামক গ্রন্থ অবলম্বনে যে অদ্ভুত দিগ্বিজয় নামক নভেল প্রকাশ করেন, উহা পাঠ করিয়া তদানীন্তন সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ উহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। রেণল্ডস্‌-কৃত মিষ্ট্রীজ অব্‌ লণ্ডন ও মিষ্ট্রীজ অব্‌ কোর্টের সচিত্র বঙ্গানুবাদও তাঁহার লেখনীপ্রসূত। সোলজার্স ওয়াইফ্‌ অবলম্বনে তিনি সৈনিক সীমন্তিনী গ্রন্থের প্রকাশ করেন। এতদ্ব্যতীত কোরাণ সরিফ প্রভৃতি তাঁহার অনেকগুলি পুস্তক আছে। স্বদেশের উন্নতি কামনায় তিনি "মধ্যবঙ্গ দীপিকা" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকার আয়োজন করিয়াছিলেন। তিনি আজীবনই বঙ্গীয় সাহিত্যের সেবা করিয়াছিলেন এবং অধিকাংশ সাহিত্য-সেবীর ন্যায় অতিকষ্টে দিনযাপন করিয়াছেন। সাহিত্যসেবায় জীবিকার কষ্টে পড়িয়া, এমন কি, তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে অল্প বেতনে চাকুরী স্বীকারও করিতে হইয়াছে। সাহিত্যসেবায় তাঁহার এত অনুরাগ ছিল যে, নিজের ও পরিবারবর্গের সমূহ কষ্টকেও তুচ্ছজ্ঞান করিয়া তিনি দিবারাত্রি সাহিত্য-চর্চ্চাতেই নিবিষ্ট থাকিতেন। আত্মীয় স্বজনের নিকট তিনি নিজের দুরবস্থা বর্ণন করিয়া যে সকল পত্র লিখিয়াছেন, উহার দু একখানি পাঠ করিয়া আমরা অশ্রুসম্বরণ করিতে পারি না। মনে হয়, এদেশে সহানুভূতি কাহাকে বলে, তাহা কেহ জানে না। বিদ্যার অনুরাগ বা বিদ্যার প্রতি সম্মান এদেশীয় লোকের নাই। সকলেই কঠোরহৃদয় বণিক্‌সম্প্রদায়ে পরিণত। তাই বিপিন বাবু এত কষ্ট পাইয়া ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার যজমানবর্গ সকলেই মহাধনশালী। কিন্তু তাহাহইলে কি হয়, ব্রাহ্মণমর্য্যাদা বা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ তাঁহাদের ততটা নাই। সুতরাং বিপিন বাবুকে স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া জীবনের শেষভাগে অতি কষ্ট পাইয়া জীবনলীলা সম্বরণ করিতে হইয়াছে।

করিয়াছেন। ঈশ্বরেচ্ছায় যদি আরও কিছুদিন জীবিত থাকিতেন, তাহাহইলে এই গ্রন্থখানিকে তিনি পূর্ণাবয়ব প্রদান করিয়া যাইতে পারিতেন। তাঁহার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হস্তলিপি দেখিয়া আমরা এই পুস্তকখানি প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সুতরাং এই পুস্তকখানিতে অনেক ভ্রমপ্রমাদ থাকিবার সম্ভাবনা। অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়াতে এই পুস্তকখানি তাঁহার ভূয়োভূয়ঃ ও সমগ্র চিন্তা হইতে বঞ্চিত হইয়া কোথায় বা অতিরঞ্জিত দোষে দূষিত হইয়াছে—কোথাও বা অসৎ ও অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনে ক্ষুব্ধ রহিয়াছে এবং কোথাও বা সংগ্রহের অভাবে বিকলাঙ্গ হইয়াছে। কিন্তু যতই দোষ থাকুক্ না, ইহা যে বঙ্গীয় সাহিত্যে একটী অভিনব বস্তু, তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন।

একটী গ্রাম বা কতকগুলি গ্রাম লইয়া তাহার পুরাবৃত্ত সংগ্রহ করিবার প্রয়াস বঙ্গীয় সাহিত্যে প্রায়ই দেখা যায় না। যদি আমাদের দেশে এইরূপ পুরাবৃত্ত সংগ্রহের প্রথা প্রচলিত থাকিত, যদি প্রত্যেক গ্রামের লোকে মিলিয়া তাহাদের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিত, তাহা হইলে আমাদিগকে এত অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিতে হইত না। আমরা যদি সম্যক্ জানিতাম যে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ কিরূপে দিনপাত করিয়া গিয়াছেন, কিরূপ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তাঁহাদের আচার, ব্যবহার ও রীতি নীতি কিরূপ ছিল—তাঁহাদের জীবিকা সংস্থান কিরূপ ছিল, তাহাদের সামাজিক অবস্থানই কিরূপ—তাঁহাদের সময়ে পথ ঘাট বাটই বা কিরূপ—দ্রব্যাদির মূল্যই বা কিরূপ ছিল—কিরূপ চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বনেই বা তাঁহারা রোগমুক্ত হইতে সক্ষম ছিলেন—এই সকল এবং এবম্প্রকার প্রাচীন তত্ত্ব সকল জানা থাকিলে ঐ জ্ঞানরূপ দিগ্‌দর্শনের সাহায্যে আমরা এই সংসারসাগরের পরপারে যাইতে বলীয়ান্ হইতে পারিতাম। আমরা প্রাচীন ও নব্য উভয় কালকে তুলনা করিয়া উন্নতি বা অবনতি কোন্ পথ দিয়া যাইতেছি তাহা নিরাকরণ করিতে পারিতাম—কিরূপে জনসমাজে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন স্রোত প্রবাহিত হয় তাহা বুঝিতে পারিতাম—প্রাচীন পরিচয়ে আমারা সকলেই সকলের প্রতি সহানুভূতি বিস্তার করিতে পারিতাম—সংক্ষেপে এরূপ জ্ঞান আমাদিগকে অনেক অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিতে পারিত। পুরাবৃত্ত পাঠের ফল বিচার

তাহা সকলেই অবগত আছেন, পরন্তু নিজবংশের বা নিজগ্রামের পুরাবৃত্ত পাঠে অসীমমঙ্গল সাধিত হয়। পরস্পরের পূর্ব্বপরিচয় জানা থাকিলে—পূর্ব্ব পুরুষগণকৃত উপকার সকল জানিতে পারিলে বা প্রাচীন সম্বন্ধ সকল নির্ণীত হইলে অথবা গ্রামের প্রাচীনকীর্ত্তি সকলের জ্ঞানলাভ থাকিলে—গ্রামবাসীগণের প্রতি যে কতদূর সহানুভূতি বিস্তৃত হয়, তাহা বলা যায় না। দেশের উন্নতিপক্ষে ইহা যে কি প্রশস্তসাধন তাহা এই সংক্ষিপ্ত স্থানে বর্ণনা করা যায় না। যাহাহউক, বিপিন বাবু এই "কুশদ্বীপ কাহিনীর" সূচনা করিয়া এক নূতন পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। যদি ও দুর্ভাগ্য ক্রমে তাঁহার সংগ্রহ সকল যথাযথ ও পূর্ণ না হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার এই উদ্যম যে ভবিষ্যৎ কাহিনী লেখকের পক্ষে অনেক সাহায্য করিবে তদ্বিষয়ে আর সংশয় নাই। কুশদ্বীপবাসী মাত্রেই একারণ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ।

"কুশদ্বীপ" পূর্ব্বে বঙ্গসমাজের শীর্ষ স্থানীয় ছিল। ইহা পণ্ডিত মণ্ডলীর আবাস স্থান ছিল—বিপুল ধনশালী ভাগ্যবান্ লোকে এখানে বসতি করিত—যমুনা নদী অতি বিস্তৃত থাকাতে ইহা বাণিজ্যের পক্ষে প্রশস্ত ছিল—প্রাচীন ঐতিহাসিক অনেক ঘটনার ইহা লীলা ক্ষেত্র। সুতরাং কুশদ্বীপকাহিনী যে কুশদ্বীপবাসীরই আদরের বস্তু তাহা নহে। উহা বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই আদরণীয়। এই ক্ষেত্রে পৌরাণিক ঘটনার ও কিয়ৎ পরিমাণে আভাস পাওয়া যায়। দেশের প্রতি ভক্তি বশতঃই হউক, অথবা যথার্থই হউক, এদেশে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে কুরুপাণ্ডবীয় যুদ্ধের পূর্ব্বে যখন মধ্যম পাণ্ডব বিরাটরাজের ভবনে অজ্ঞাত বাস করেন, তখন তিনি দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইয়া কুশদ্বীপে আগমন করত উহাকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজধানীর অন্তর্ভুক্ত করেন। একারণ কুশদ্বীপকে পৌণ্ড্রদেশ কহে। মালদহ ও দিনাজপুরের মধ্যবর্ত্তী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরীতে আজও বিরাট রাজের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে। আবার এদেশে এরূপ ও প্রবাদ শুনা যায় যে ভীমাগ্নিকৃত এই নূতন পৌণ্ড্ররাজ্য স্থাপিত হইলে পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এখানে পদার্পণ করিয়া এদেশকে মহাভাগ্যযুক্ত ও পরম পবিত্র করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে যে সকল পরিচারক, গোপ ও গোপাঙ্গনাগণ আসিয়াছিলেন, তাঁহারা এই দেশের

স্বীয় দেশে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না। গোবরডাঙ্গার সন্নিহিত যমুনা নদীর দক্ষিণ পারে যে অসংখ্য গোপের বসবাস ছিল, তাহার নিদর্শন স্বরূপ আজিও গোপিনী পোতা সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। বহুদিনের কথা নয়, ঐ সকল স্থান জলধৌত হইলে পর উহাতে দুগ্ধ ভাণ্ড প্রভৃতি গোপগণের সজ্জা সকল দেখা যাইত। এ পর্য্যন্ত কেহই ঐ সকল পোতা বা গৃহভিত্তির উপর বসবাস করিতে সাহস করিত না। কেবল যে যমুনাতীরস্থ গোপিনীপোতা, কানাই নাট্যশালা প্রভৃতি, গোপগণ সহ শ্রীকৃষ্ণের এখানে শুভাগমনের পরিচায়ক বলিয়া লোকের বিশ্বাস, তাহা নহে। পরন্তু এখানকার অধিকাংশ গ্রামই গোপ ও গো সম্বন্ধীয় বলিয়া লোকের ধারণা ঐরূপ। গবীপুর, গোবরডাঙ্গা, গোপিনীপোতা, গয়েশপুর, গোময়, গোপাল, গোপালপুর প্রভৃতি নামীয় স্থান সকল দৃষ্টে বুঝা যায় যে এদেশে গোপগণেরই অধিক বসবাস ছিল। ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে কানাইনাট্যশালা গ্রামের ভূমি খনন করিতে করিতে অনেকানেক উত্তম উত্তম মন্দিরের ভিত্তি বাহির হইয়াছিল। তাহাতে অনেকানেক সুবৃহৎ বৃক্ষ ও বৃহৎ বৃহৎ মনুষ্যকঙ্কাল দেখা গিয়াছিল। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে বহুপূর্ব্বকালে এদেশটী মহাসমৃদ্ধ জন পদ ছিল—এক্ষণে কালের চক্রে মজিয়া গিয়া আবার তাহার উপর নূতন বসবাস আরম্ভ হইয়াছে। মাটকুমড়ার পশ্চিম হিংলাট সহরে খনন করিতে করিতে অনেকানেক বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ও অতি প্রাচীনকালের ইষ্টক সকল দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাহউক, এই স্থানটী যে পুরাতত্ত্ব জিজ্ঞাসুর কৌতূহলক্ষেত্র, তাহাতে আর সংশয় নাই।

বিপিন চক্রবর্ত্তী মহাশয় এমন একটী স্থানের পুরাবৃত্ত সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকিয়া যে যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা বিপিন বাবুর জীবনচরিত লিখিতে লিখিতে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি। সুতরাং এই স্থানেই ক্ষান্ত রহিলাম।

ধরণীধর কথক।—ইনি যদুনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র ও দেশ প্রসিদ্ধ কথক রামধন তর্কবাগীশ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। ইনি রামধন তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট কথকতা শিক্ষা করেন। আনুমানিক ২০।২৫ বৎসর হইল ইনি [illegible]

দ্বিতীয় ব্যক্তি আর এদেশে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। ধরণীধরের সুমিষ্ট-স্বর, রাগ রাগিণী সমন্বিত সঙ্গীত শক্তি, মনোহারী বক্তৃতা, এবং পদাবলীর ছটা অতুলনীয় ছিল। আজ ও অনেকের মুখে শুনা যায় যে ধরণীধরের কথকতা শুনিয়া অতি পাষাণ হৃদয় দূরে থাকুক, পক্ষীগণও মুগ্ধ থাকিত। আজও ধরণীর শিষ্য সম্প্রদায় বর্ত্তমান আছেন, তন্মধ্যে অনেকেও কথকতা ব্যবসায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, কিন্তু ধরণীর ন্যায় খ্যাতি প্রতিপত্তি কাহারও হয় নাই। এবং হইবে বলিয়া সম্ভবও নাই। তিনি স্বভাব সিদ্ধ গুণাবলীতে ভূষিত ছিলেন। বিধাতা যেন তাঁহাকে কথক করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। রামধন তর্কবাগীশ মহাশয় নিজ যত্নে বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া এই ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিয়া দেশ প্রসিদ্ধ কথক হইয়াছিলেন। ধরণীধরের বিদ্যাসাধ্য তদ্রূপ ছিল না। নিজে ও রামধনের ন্যায় প্রকৃত চরিত্রবান্ ছিলেন না—নিজের অনেক গুলি দোষ ছিল—তথাপি সমুদয় দোষ সত্ত্বেও লোকে তাঁহার প্রতি এরূপ অনুরাগী ছিল, যে তাঁহার কথকতা শুনিবার জন্য লোকে দেশ বিদেশ হইতে সমাগত হইত—তিনি যথায় কথকতা করিতেন, তথায় লোকে লোকারণ্য হইত—তাঁহার স্বরজালে মুগ্ধ হইয়া লোকে অবাক্ হইয়া এক মনে তাঁহার কথকতা শুনিতে থাকিত।

প্রকৃত পক্ষে রামধন ও ধরণীধর অস্তগত হইবার পর এদেশে কথকতা বৃত্তির উপর লোকের আর ততটা অনুরাগ নাই। লোকে এক্ষণে উহাকে ব্রাহ্মণগণের জীবিকা নির্ব্বাহের এক অপ্রশস্ত পথ মনে করে। কথকতা বৃত্তি দ্বারা জনসমাজের যে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়, লোকের এই ধারণা দিন দিন লোপ পাইতেছে। পুরাণ কথা সকল—নূতনভাবে—জীবন্তভাবে লোকের মনে জাগরূক করিয়া দেওয়া—ধর্ম্ম নীতি সকল দৃষ্টান্তের সহিত দেখাইয়া ভক্তি শ্রদ্ধার উদ্রেক করাইয়া লোককে ধর্ম্মের প্রতি চৈতন্যবান্ করা—দেব-ঋষি ও পিতৃ লোকের মহিমা কীর্ত্তনে লোককে চরিত্রবান্ করা—যাঁহাদের শাস্ত্রানুশীলন করিবার সামর্থ্য নাই—ঋষি সহবাসে—আত্ম চিন্তায়—আপনাকে পবিত্র করিবার সাবকাশ নাই—সেই সকল অশিক্ষিত ও বিষয়ী লোককে চিন্তাশীল করা—দিবারাত্রি বিষয় চর্চ্চায় পর দুচারি ঘণ্টাকাল কথকতা দ্বারা বিশুদ্ধ আনন্দ প্রদান করা—এই সকল কল্যাণময় কার্য্য কথকতা

স্বৃত্তিতে এক্ষণে সংসাধিত হয় না। এক্ষণে যে সকল লোকের হস্তে এই সমাজ-শিক্ষার ভার অর্পিত আছে—তাঁহারা বিষয়ী লোক অপেক্ষাও বিষয়ী। নিজেই শ্রদ্ধা ভক্তি বর্জ্জিত—কাণ্ডাকাণ্ড শূন্য—সুতরাং কি প্রকারে লোকের মনে শ্রদ্ধা ভক্তির সঞ্চার করিবেন,—কি প্রকারেই বা লোকের ধর্ম্ম শিক্ষার হেতুভূত হইবেন? এই জন্যই আজ কাল এই বৃত্তির উপর লোকের আর ততটা শ্রদ্ধা নাই। পূর্ব্বে কোন গ্রামে রামায়ণ বা ভাগবতের কথা উপস্থিত হইলে গ্রামবাসী সকলেই কিছুক্ষণ বিষয় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আগ্রহের সহিত কথকতা শুনিতে ব্যস্ত থাকিত—যাহার যেরূপ সাধ্য কথক মহাশয়ের জন্য সকলেই কিছু কিছু অর্থপ্রদান করিত—এমন কি গৃহস্থ রমণীগণও কথক মহাশয়ের জন্য যথাসাধ্য আহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহ করিত—পল্লীস্থ সকলেই কথকতা শ্রবণ করিয়া আপনাদিগকে পবিত্র ও ভাগ্যবান্ বোধ করিত—কিন্তু হায়! এই বৃত্তিটী এক্ষণে অপাত্রে ন্যস্ত হওয়াতে ইহা দ্বারা লোকের মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, শাস্ত্র ও পুরাণের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ও ভক্তির হ্রাস হইতে চলিল। কিন্তু রামধন ও ধরণীধর এই ব্যবসায়কে জীবিত রাখিয়াছিলেন। রামধন দেখাইয়া গিয়াছেন যে কতটা প্রগাঢ় অধ্যবসায়, বিদ্যা-বুদ্ধি ও ধর্ম্মভাব থাকিলে তবে এই কথক পদের উপযুক্ত হইতে পারা যায়—এবং ধরণীধর ও দেখাইয়া গিয়াছেন যে কতটা স্বর মাধুরী, গাম্ভীর্য্য ও শিক্ষাপ্রদান শক্তিও বক্তৃতা সামর্থ্য থাকিলে লোকের মনে পুরাণ প্রসঙ্গ সকল নবীন ও জীবন্তভাবে সঞ্চারিত করিতে পারা যায়।

রামধন যে সকল পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছিলেন, ধরণীধর সেই সকল পদাবলীই প্রায় ব্যবহার করিতেন। আজিও অনেক কথক রামধনের পদাবলী ব্যবহার করেন। রামধনের পদাবলী জানিবার জন্য অনেকেরই কৌতূহল আছে। একারণ আমরা এস্থলে রামধনের পদাবলী যতগুলি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

রাগিণী তোড়ী ভৈরবী।

১। জনরঞ্জন হে। পামর জন পাবন ত্রিভুবনবন্দন
চরণরেণু কণহে। ব্রজ নরপতি নন্দন যদু-
নন্দন রঘুনন্দন জয় জগদানন্দন হে॥

রাগিণী কানেড়া।

২। ভব প্লব মাধব রাম হরে। কেশব কৃষ্ণ মুকুন্দ মুরারে। উদ্ধর মামতি দীনং হীনং পতিতং হত সংসারে ॥

রাগিণী—মালকোষ।

৩। হে হরে মুরারে। শ্রীযদুনন্দন মাধব-মধুসূদন। হে দীন জন প্রতিপালক পশুপালক বালক গোপীজন ধন ॥

রাগিণী—বিভাস।

৪। হে মানসমভিপূরয় পুরুষোত্তম জয় জগদীশ হরে। জয় জয় মীনরূপধর জয় বরাহবর কচ্ছপ জয়নৃহারে।

রাগিণী—মুলতান।

৫। হে বিভো বিতরকরুণামনুদীনং। ভবদব দহন দাহমনুবারয়, তারয়মামতি দীনং। ভব-পয়োনিধৌ পতিতং গতি হীনং ॥

রাগিণী—মুলতান।

৬। কুরুদীনে ময়ি করুণালেশং। বিধি ভব-ভাবিত চরণ সরোরুহ হর মম ক্লেশমশেষং ॥ হে নন্দ তনুজ মে যাচিতমেবং বারয় শমনপুর-স্প্রতিযানম্ সভয়ে রামধন বহুজন সঞ্চিত কলিকৃত দুরিত বিশেষং ॥

রাগিণী—সিন্ধু।

৭। পামর মানস চিন্তয়সে কিং। কুরু কেশবপদ ভজন সমাধিং তেন বিমোচয় মূঢ় মমাধিং॥

রাগিণী—ভৈরবী।

৮। হরে দামোদর হর মম ভবজলধৌ জননং মরণং। জনরূহদলচঞ্চলমিবসলিলং জীবনধন যৌবনমতিচপলং॥

রাগিণী—ভৈরবী।

৯। কেশব কৃপানিধান। করুণাবলোকয় কুরু করুণাং ময়ি দীনহীন জনে। তব পদ ভজন যজন যাজন পূজন বন্দন মননবিহীনে॥

রাগিণী—ঝিঁঝিট।

১০। ব্রজরাজ কিশোর সনাতন রূপং। ভাবয় মানস মে সদা। তং প্রতি সম্প্রতি কিং কথয়ামি জীবনং সফলং মে ভাবি তদা॥

রাগিণী—খাম্বাজ।

১১। পীত বসন বনচারী। সুললিত নটবর রাস-বিহারী। রমণীমথকৃত মুরলী কূজিত গোপিত গোপীসূত প্রেম বিতারি॥

রাগিণী—ঝিঁঝিট।

১২। করুণানিধান কমলাপতে। কুরুকরুণাং ময়ি দীনগতে। কুবলয়, করিবর, কেশি-নিধনকর কুপিত কালিয় কংসাঘাতে।

বেহাগ।

১৩। ময়ি দীনজনে কুরুকরুণাব্দলেশং। অপার ভব ঘোরে মামুদ্ধর নিজদাসং। যাচে নহিহ মুরলীমোহন ধন জন যৌবন মানং। দর্শয় মামতি দীন মনুক্ষণ মনুপম নটবর বেশং॥

পূরবী।

১৪। যদুনন্দন তারয় দীনগতে। রঘুনন্দন তারয় দাশরথে। জয় জয় ভীষ্মক তনয়াবর মামনু-কম্পয় জয় জয় সীতা প্রাণপতে॥

মন্দার।

১৫। মনো মে কিং কুরুসে। রাধাবল্লভ চরণ-সেবন মৃতে। ভ্রমসি ভৃশং বৃথা বিষয় সন্ধানে ভবিতা গরলং তদপিশেষে।

মুলতান।

১৬। চিন্তয় চিন্তামণি গোকুলচন্দ্রং। নতুর্বা বিফলং যাতি জননং। মোহনমুরলী মুখরিত বিজনং অলকালঙ্কৃত ভালং। মৌক্তিক-পঙ্‌ক্তি বিনিন্দিত দশন কুণ্ডলমণ্ডিত গণ্ডং। যদি ভবপারং যাসি বিপারং ধনগদিতং কুরুসারং। গোপী-নন্দন চরণ ব্যুহিত্বং তত্র সমর্পয় সর্ব্বং॥

এই সকল এবং অপরাপর পদাবলী যখন তাল মান লয়ে ধরণীধর গান করিতেন, তখন লোকে মুগ্ধ থাকিত। এমন সুশ্রাব্য সঙ্গীত, কেহ কখন শুনে নাই, লোকে এই কথাই বলিত। দেশ বিদেশ হইতে প্রভূত অর্থ

দিয়া লোকে ধরণীকে কথা শুনিবার জন্য লইয়া যাইত। একা বর্দ্ধমানের রাজবাটীতে তিনি বৎসরে পাঁচ ছয় হাজার টাকা পাইতেন। কথকতা ব্যবসায়ে তিনি এত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন যে প্রভূত ব্যয়ও দান করিয়াও মৃত্যুকালে তিনি লক্ষাধিক টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন।

মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি খাঁটুরাগ্রাম নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ধরণীধর কথকের পুত্র। সন ১২৭২ সালে ইঁহার জন্ম হয়। বাল্যাবস্থায় বাটীতে থাকিয়া বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ৩।৪ খানি পুস্তক পাঠ করিয়া ইনি কলিকাতাস্থ সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন। পরে ক্রমশঃ নিজ অধ্যবসায় গুণে প্রবেশিকা ও ফাষ্ট আর্টস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিএ পরীক্ষায় অনারে পাশ করেন। এবং বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সোণার মেডেল প্রাপ্ত হন। কিছুদিন পরে ইনি সংস্কৃতে এম্, এ পরীক্ষা দেন এবং এম্, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শাস্ত্রী উপাধি লাভ করেন। ইঁহার স্বভাব অতি পবিত্র—ইনি বিনয়ী, সত্যবাদী ও শান্ত প্রকৃতির লোক। এম্, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার কিছুদিন পরে কটকের র‍্যাভেন্‌সা কালেজে ১৫০\ দেড় শত টাকা বেতনে ইনি প্রফেসারী পদে নিযুক্ত হয়েন এবং অদ্যাবধিও সেই কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ইনি বৎসর বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী হয়েন।

শ্রীশবিদ্যারত্ন। ইনি বিখ্যাত কথক রামধন শিরোমণির পুত্র। ইঁহার জন্মভূমি খাঁটুরাগ্রাম। ইনি প্রথমে ভগবান বিদ্যালঙ্কারের টোলে ব্যাকরণ ও সাহিত্যাদি পড়িয়া সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং তথায় সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া অনেকবার বৃত্তিও পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। ইনি যখন সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতেন সেই সময়ে প্রাতস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ কলেজের অধ্যক্ষতা পদে ব্রতী ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে সংস্কৃত কলেজ তখন বিশেষ শ্রীসম্পন্ন ও উন্নত ছিল। একদিন গবর্ণর জেনেরাল লর্ডহার্ডিঞ্জ ফোর্টউইলিয়ম কলেজ দেখিতে আসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করেন। কথাপ্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়, সংস্কৃত কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্রগণের প্রতি গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ নাই বলিয়া আক্ষেপ করেন। একমাত্র জজ্‌পণ্ডিতের পদ ছিল তাহাও উঠাইয়া দেওয়াতে সংস্কৃত শিক্ষায় লোকের অনুরাগ হ্রাস হইতেছে—সংস্কৃত

কালেজের ছাত্রসংখ্যাও ক্রমশঃ অল্প হইতেছে। এজন্য তিনি সংস্কৃত কালেজের ছাত্রগণের জন্য কিছু করা আবশ্যক বলিয়া গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। সেই অনুরোধ ক্রমে লর্ডহার্ডিঞ্জ বাহাদুর ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে অর্থাৎ ১২৫৩ সালে সমগ্র বঙ্গদেশে ১০১টী বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া সংস্কৃত কালেজের উত্তীর্ণ ছাত্রবর্গকে ঐ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কার্য্য প্রদান করিবার আদেশ করেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে দেশীয় ভাষা শিক্ষার্থী সাহেবগণের মধ্যে সীটনকার, কষ্ট, চ্যাপ্‌মান্‌, গ্রে, গ্র্যাণ্ট, হ্যালিডে, বিডন্‌ ও ইডেন্‌ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত সিবিলিয়ান্‌গণ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। উহাদিগের মধ্যে রবার্টকষ্ট সাহেব অবসর পাইলেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটে আসিতেন, ও তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। কষ্টসাহেবের নামে সংস্কৃতে একটী শ্লোক রচনা করিয়া দিবার জন্য কষ্ট বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনুরোধ করেন। তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্ষণকালমাত্র ভাবিয়া লইয়া নিম্নলিখিত দুইটী কবিতা প্রস্তুত করিয়া দেন।

শ্রীমান্‌ রবার্টকষ্টোঽস্য বিদ্যালয় মুপাগতঃ।
সৌজন্যপূর্ণৈরালাপৈ র্নিতরাং মামতোষয়ৎ ॥১
সহি সদ্‌গুণসম্পন্নঃ সদাচাররতঃসদা।
প্রসন্নবদনোনিত্যঃ জীবত্বব্দশতং সুখী ॥২॥

কষ্ট এই দুটী শ্লোকের রচনা দেখিয়া ও ব্যাখ্যা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। এবং বিদ্যাসাগর মহশেয়কে ২০০৲ দুইশত টাকা পুরস্কার প্রদান করেন। কিন্তু তিনি উক্ত দান গ্রহণ না করিয়া, সংস্কৃত কালেজের সংস্কৃত রচনার উৎকর্ষসাধন জন্য, ঐ টাকা সংস্কৃত কলেজে জমা রাখিতে বলেন। তাহাতে ৫০৲ টাকা করিয়া চারি বৎসর ঐ টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়। এইরূপে বিবিধ উপায়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কালেজের উন্নতি সাধন

উহা উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন বিদ্যাসাগরপ্রমুখ সুপ্রসিদ্ধ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও অন্যান্য মহামহোপাধ্যায়গণ ঐ কালেজের অধ্যাপক ছিলেন। সুতরাং শ্রীশ বিদ্যারত্ন তথনকার সংস্কৃত কালেজের প্রধানতম ছাত্র ছিলেন বলিলে কম গৌরবের বিষয় ছিলনা। এজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে একান্ত ভাল বাসিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যমভ্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন শ্রীশবিদ্যারত্নের সহপাঠী ছিলেন। তিনিও কৃতিত্বে শ্রীশ হইতে ন্যূন ছিলেন না। তথাপি সময়ে সময়ে এরূপও হইত যে বিদ্যাসাগর মহাশয় দীনবন্ধুকে উল্লঙ্ঘন করিয়া শ্রীশের পক্ষ অবলম্বন করিতেন। ইহার একটী সামান্য দৃষ্টান্ত এস্থলে দেওয়া যাইতেছে।

উপরোক্ত কষ্ট-প্রদত্ত বৃত্তি পরীক্ষায় দ্বিতীয় বৎসরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ও শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হন। রচনা দুইজনেরই সমান সুন্দর হইয়াছিল। শ্রীশচন্দ্রের ব্যাকরণ ভুল ছিল, দীনবন্ধুর তাহাও ছিল না। দীনবন্ধুর দুর্ভাগ্য যে পরীক্ষার ফলাফল নির্দ্ধারণ ও পুরস্কার দানের ভার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর ন্যস্ত ছিল। দীনবন্ধু সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইলেও পুরস্কার পাইলেন না। শ্রীশ বিদ্যারত্নই ঐ পুরস্কার লাভ করিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ও শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন উভয়ের মধ্যে সখ্যতা বদ্ধমূল ছিল। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন মাইকেল মধুসূদন দত্তকে ভার্শেলিস্ নগরে পাঠাইয়া দেন, তখন শ্রীশচন্দ্রেরই নিকট হইতে বিস্তর টাকা ধার লন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবা বিবাহের উদ্যোগী হন, তখন শ্রীশ বিদ্যারত্ন মহাশয় সর্ব্বাগ্রে তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ইনিই প্রথমে বিধবা বিবাহ করেন।

শকাব্দা ১৭৭৮, সন ১২৬৩ সাল, ইংরাজী ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে অগ্রহায়ণ বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথমে এই বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসে এই দিন, শুভদিন বা দুর্দ্দিন, তাহা কে বলিতে পারে? পরন্তু এইরূপ সমারোহের বিবাহ, এইরূপ অভূতপূর্ব্ব বিবাহ, পূর্ব্বে এদেশে কেহ কখন দেখে নাই।

সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বিবাহ উপলক্ষে নিজে দশহাজার টাকা ব্যয় করেন।

বিবাহের কিছুদিন পূর্ব্বে কন্যা কালীমতী দেবী জননী সহ কলিকাতার সুকিয়াষ্ট্রীটে বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে বাস করিতে ছিলেন। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের বিশেষ আত্মীয় ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুগ্রহেই ইনি প্রেসিডেন্সী কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক হন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসা প্রথমে ঐ বাটীতেই ছিল। বর শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন কলিকাতায় আসিয়া সুবিখ্যাত রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে উঠিয়াছিলেন। ২৩শে অগ্রহায়ণ রবিবার দিবস সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে নানাস্থানের পণ্ডিত মণ্ডলী ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মহাশয়গণ বিবাহ বাটীতে সমাগত হইলেন। পুরাঙ্গনারা কন্যাকে সময়োপযোগী বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া বরাগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সুকিয়াষ্ট্রীট ও তন্নিকটবর্ত্তী রাজপথসমূহ লোকারণ্যে পরিণত হইয়াছে; যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, মনুষ্যমূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। পরিচিত অপরিচিত ইতর ভদ্র গায়ে গায়ে মাথায় মাথায় দাঁড়াইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এইরূপ জনতা ও বাধাবিঘ্নের আশঙ্কা করিয়া পূর্ব্ব হইতে পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তদনুসারে সুকিয়াষ্ট্রীটে এবং যে পথে বর আসিবে, সে পথে প্রত্যেক দুই হস্ত অন্তর পুলিশ পাহারা রাখা হয়। যখন বর ও বরযাত্রীরা বিবাহ বাটীতে আসিলেন, তখন বর দেখিবার জন্য পথে এত জনতা হইল যে, বরের পাল্কী লইয়া অগ্রসর হওয়া সুকঠিন ব্যাপার হইয়া পড়িল। নূতন ব্যাপারের পথ প্রদর্শক হইতে গিয়া বরের সদা চিন্তিত ও চমকিতচিত্তে এই জনতাতে আশঙ্কার উদয় হইতেছিল। বাগ্মীবর রামগোপাল ঘোষ, জজ্ হরচন্দ্র ঘোষ, হাইকোর্টের জজ্ শম্ভুনাথ পণ্ডিত ও দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি বিদ্যাসাগরের বন্ধুমণ্ডলী বরের দক্ষিণে ও বামে পাল্কী ধরিয়া উৎসাহ ও আনন্দবর্দ্ধন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে ছিলেন। এইরূপ সমারোহ ও জনতার মধ্য দিয়া বর ও বরযাত্রীগণ বিবাহ বাটীতে প্রবেশ করেন। বিবাহসভায় সংস্কৃত কলে-

প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও ছিলেন। বিবাহ সভা, বিবাহের নিমন্ত্রণ ও আয়োজন কিরূপ হইয়াছিল, এবং বিবাহ সম্বন্ধে লোকের মতামত কিরূপ ছিল তাহা ১৭৭৮ শকাব্দার অগ্রহায়ণ মাসের তত্ত্ববোধিনী দেখিলে জানিতে পারা যায়।

শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সংস্কৃত-কলেজ পরিত্যাগের পর কিছুদিন ৫০৲ টাকা বেতনে উক্ত কলেজের আসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত থাকেন। পরে উক্ত কালেজের সাহিত্যাধ্যাপকের পদ খালি হওয়ায় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে ৯০ নব্বই টাকা বেতনে ঐ পদে ভর্ত্তি করেন। কিছুদিন ঐ কর্ম্ম করিয়া তিনি মুর্শিদাবাদে ১৫০ দেড় শত টাকা বেতনে জজ্ পণ্ডিত পদে নিযুক্ত হইয়া যান। জজ্ পণ্ডিত অবস্থায় তাঁহার পত্নী বিয়োগ হওয়ায় তিনি বিধবা বিবাহ করেন। তদানীন্তন বঙ্গের লোট লাট হ্যালিডে সাহেবের নিকট বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তিনি হ্যালিডে সাহেবকে অনুরোধ করেন যে বিধবা বিবাহের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ বিধবাবিবাহকারীকে গবর্ণমেণ্ট যেন একটী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী পদ দেন। হ্যালিডে সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট এ বিষয়ে প্রতিশ্রুত থাকেন। সুতরাং শ্রীশচন্দ্র বিধবা বিবাহ করাতে তাঁহার পদোন্নতি হইয়া তিনি অচিরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ পদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি ত্রিশ বৎসর যাবৎ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট্ থাকিয়া পরে পেন্‌সান্ গ্রহণ করেন। পেন্‌সান্ লওয়ার অল্পকাল পরেই পক্ষাঘাত রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বিধবা বিবাহের জন্যই যে শ্রীশচন্দ্র বিখ্যাত, তাহা নহে। সংস্কৃত সাহিত্যে ও তাঁহার যশঃ ছিল। সংস্কৃতে কবিতা রচনা করিতে তদানীন্তন প্রায় কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। একারণ রায় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় তাঁহার সুরধুনী কাব্যে শ্রীশচন্দ্রের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"সাহিত্য-সবিতা শ্রীশ সুমিষ্ট পাঠক।
বিধবা সধবা করা পথ প্রদর্শক॥
লভিয়াছে পাঠালয়ে খ্যাতি চমৎকার।
কবিতার পুরস্কার একায়ত্ত তার॥

শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এক জন স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা ছিলেন। তিনি দেশের অনেক ছাত্রকে অন্ন বস্ত্র ও কলেজের বেতন দিয়া পড়াইতেন। তিনিই খাঁটুরার বিদ্যালয়টী স্থাপিত করেন। যখন তিনি গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপালিটীর চেয়ারমান্ থাকেন, তখন অনেক দেশ হিতকর কার্য্য তদ্দারা সংসাধিত হয়। বামোড় তীরে জননীর নামে যে ঘাট ও তৎসংলগ্ন শিবমন্দিরদ্বয় নির্ম্মাণ করাইয়া উৎসর্গ করেন, উহা ও তাঁহার একটী কীর্ত্তি। সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি এই যে তাঁহারই বিশেষ যত্নে ও চেষ্টায় বারাশাত সব্‌ডিভিশানটী স্থাপিত হয়। পূর্ব্বে খাঁটুরা গোবরডাঙ্গা বশীরহাট মহকুমার অন্তর্গত ছিল। ইহাতে অত্রত্য অধিবাসীগণের বিস্তর অসুবিধা ও অনর্থক অর্থ ব্যয় হইত। বারাশাতে মহকুমা হওয়াতে লোকের যে কি সুবিধা হইয়াছে তাহা বলা যায় না। সুতরাং আমরা অনেক পরিমাণে এই সুবিধার জন্য শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট ঋণী আছি।

শ্রীশচন্দ্রের দ্বিতীয় পক্ষে বিধবাবিবাহজাত পুত্র কন্যাদি জন্মে নাই। তাহাতে আবার বিধবা বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই ঐ বিধবাটীর মৃত্যু হয়। সুতরাং তাঁহাকে স্বসম্প্রদায় ভুক্ত হইতে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হয় নাই। কিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয় করিয়া দশটী ক্রিয়া কলাপ করাতেই আবার তিনি হিন্দুসমাজ মধ্যে গৃহীত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম বিবাহজাত দুইটী পুত্র থাকে। প্রথমটী অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। এবং দ্বিতীয়টী বর্ত্তমান আছেন।

ইহাঁর দ্বিতীয় পুত্রের নাম বঙ্কুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহাঁর জীবনে লিখিবার উপযোগী কোন ঘটনাই দেখা যায় না। বরং ভাবিবার বিষয় অনেকই আছে। ইনি বাল্যকালে প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষিত হন নাই। ইংরাজী স্কুলে এণ্ট্র্যান্স্ ক্লাস্ পর্য্যন্ত পড়া শুনা করেন। এক্ষণে বড় বাজারে চিনির কারবার করেন এবং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট স্থিত সুরম্য প্রাসাদে বাস করেন। এবম্বিধ জীবনবৃত্ত পাঠে সাধারণের কি উপকার হইবেক? বরং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া লোকে কি কারণে পূর্ব্ব গৌরব বিস্মৃত হইয়া বিদ্যাব্রহ্মণ্য ত্যাগ করিয়া আধুনিক সভ্যতার স্রোতে পড়িয়া বিষয় চর্চ্চাতে মান সম্ভ্রম এবং জীবনের সাফল্য লাভ করিতে

উদ্যোগী হইল, ইহাই চিন্তনীয়। শুদ্ধ বঙ্কু বাবু কেন, এমন সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত আছে যদ্দ্বারা দেখাইতে পারা যায় যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশে আর বিদ্যা ব্রহ্মণ্য নাই—ব্রাহ্মণপণ্ডিতের স্রোত লোপ হইতে চলিল। যে ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে জ্ঞান ও ধর্ম্মের আদর্শ স্বরূপ ছিলেন; যাঁহার পবিত্র চরিত্রের অনুকরণ করিবার জন্য সকল বর্ণই ব্যস্ত থাকিত, যিনি সমগ্র সমাজের হিতকামনায় পূর্ব্বে বিষয়চর্চ্চায় জলাঞ্জলি দিয়া শাস্ত্রানুশীলনে ব্যাপৃত থাকিতেন; যাঁহার তপস্যা বলে পূর্ব্বে সমগ্র সমাজে জ্ঞানস্রোত ও পুণ্য স্রোত প্রবাহিত ছিল; কঠোর দারিদ্র্য ও যাঁহাকে স্বীয় কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত করিতে পারিত না—এক্ষণে সেই ব্রাহ্মণ বংশের এইরূপ পরিণাম—চিন্তা ও দুঃখের বিষয় তাহাতে আর সন্দেহ কি?

শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জীবন চরিত লিখিবার প্রসঙ্গে আমরা তাঁহার ভগিনী সুখময়ী দেবীর কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সুখময়ী, রূপে লক্ষ্মী ও গুণে সরস্বতী ছিলেন। বাল্যকাল হইতে পিতা রামধন তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট শুনিয়া শুনিয়া ইনি অনেক শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ব্যাকরণ ও কাব্যে ইহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। একারণ ইনি অনেক বিষয়ে পিতার সাহায্য করিতে পারিতেন। আমরা ইহাঁর হস্তলিখিত পুথি সকল দেখিয়া ইহার লিপি নৈপুণ্য ও ভাষাবোধে চমৎকৃত হইয়াছি। আমাদের দেশে বিলাতী ধরণের স্ত্রী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত নাই বলিয়া—এ দেশের স্ত্রীলোকগণ অজ্ঞানান্ধকারে থাকে বলিয়া—যাহাদের ধারণা, তাঁহারা সুখময়ী দেবী প্রভৃতির ন্যায় স্ত্রী চরিত্র আলোচনা করুন। আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে প্রাচীন ও নব্য শিক্ষায় প্রভেদ কত—প্রাচীন জ্ঞান যে প্রকারে আমাদিগের চরিত্রকে রক্ষা করিয়া আমাদিগকে মঙ্গলময় পথে লইয়া যাইত, আধুনিক জ্ঞান সে বিষয়ে কতদূর সক্ষম; প্রাচীন ভাবে শিক্ষিতা স্ত্রীলোকগণ যেরূপ চতুর্ব্বর্গ সাধনের উপযুক্ত ছিল, নব্যশিক্ষিতাগণ তদ্রূপ সমর্থা কি না—ইত্যাকার নানা বিষয় আমরা এবম্প্রকার আলোচনায় শিখিতে পারি। সুতরাং সুখময়ী দেবীর ন্যায় নিষ্ঠা ও বিদ্যাবতী স্ত্রীলোকের উল্লেখ করা এ স্থানে অপ্রাসঙ্গিক নয়।

ব্রাহ্মণ মণ্ডলী

ও

গোবরডাঙ্গার জমীদার বাবুদিগের বৃত্তান্ত।

কুশদ্বীপ বাসীর পরিচয়ে অগ্রে অধ্যাপক মণ্ডলীর পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য। আবার ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে অগ্রে জমীদার বাবুদিগের বৃত্তান্ত উল্লেখ-যোগ্য। হিন্দুসমাজে সর্ব্বাগ্রে জ্ঞান ও ধর্ম্মের সম্মান, তৎপরে আভিজাত্য ও বিষয় বিভবাদির সম্মান। এই কারণেই হিন্দুসমাজে একজন নিঃস্ব কৌপীন ধারী ব্রাহ্মণকে দেখিয়া দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী রাজসিংহাসনোপবিষ্ট ক্ষত্রিয়রাজ মস্তক অবনত করিয়া থাকেন। এই কারণেই আবার একজন সদাচার সম্পন্ন বৈশ্য দরিদ্র হইলেও অতুল বিষয় বিভবশালী কুকর্ম্ম-পরায়ণ শূদ্রের গৃহে জল গ্রহণ করাকে ও পাপ মনে করেন। এই কারণে একজন সাধ্বী পতিব্রতা কুরূপা এবং অতি দরিদ্রা হইলেও পূজিতা হইয়া থাকেন। এবং একজন বারাঙ্গনা মহাধনশালিনী হইলে ও তাহার ছায়া স্পর্শকরাকে ও হিন্দুসমাজ পাপ বলিয়া মনে করে। অর্থ গণনাতেই অপরাপর জাতিগণের মধ্যে উচ্চ নীচ গণনা হয়। সহস্র দুষ্কর্ম্ম পরায়ণ হইলে এবং জ্ঞান-ধর্ম্মে একেবারে বঞ্চিত থাকিলেও যদি কেহ বিভবশালী হয়, তবে তাঁহার সম্মান অপরাপর জাতির মধ্যে অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু হিন্দুসমাজে তাহা হইবার সুযোগ নাই। হিন্দুশাস্ত্রে বলে, "বিত্তং বন্ধুঃ বয়ঃ কর্ম্ম বিদ্যা ভবতি পঞ্চমী। এতানি মান্য স্থানানি গরীয়ো যদ্যদুত্তরং"॥ অর্থাৎ বিত্ত, বন্ধু, বয়স, সদাচার ও বিদ্যা—এই পাঁচটী মানের স্থান; ইহার মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা পর পর শ্রেষ্ঠ। এবং এই বিবেচনা করিয়াই আমরা অগ্রে অধ্যাপক মণ্ডলী ও পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর অবতারণা করিয়াছি। এবং ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর মধ্যে অগ্রে গোবরডাঙ্গার জমীদারদিগের বৃত্তান্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কেন না, মান্য বিবেচনায় ইহারা অধ্যাপক মণ্ডলীর পরেই উল্লেখ যোগ্য।

গোবরডাঙ্গার জমীদার বাবুদিগের আদিপুরুষ শ্যামরাম মুখোপাধ্যায়।

মুখোপাধ্যায় একদা গঙ্গাস্নান উপলক্ষে ইচ্ছাপুরে আইসেন ও তথায় ন ঠাকুরের বাটীতে অতিথি হন। গৃহস্বামী তাঁহার বিশেষ পরিচয়াদি লইয়া তাঁহার একটী কন্যাকে বিবাহ করিতে তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করেন। এবং তিনি তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন।

তিনি যখন বাটীতে আসিলেন তাঁহার অগ্রজ মহাশয় এই সকল কথা শুনিলেন এবং তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়া বাটী হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন। তখন তিনি নিরুপায় হইয়া ঐ গ্রামে একটি গন্ধ বণিকের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিছুদিন তথায় অবস্থান করিয়া ঐ গন্ধ বণিক মহাশয়ের বাটীতে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুইটী পুত্র হয়। তিনি জ্যেষ্ঠের নাম জগন্নাথ ও কনিষ্ঠের নাম খেলারাম রাখিলেন।

এই খেলারাম মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অদৃষ্টশ্রী আজিও গোবরডাঙ্গার বাবুদিগের অদৃষ্টকে উদ্‌ভাসিত রাখিয়াছে।

খেলারাম বাল্যকালে অতিশয় দুরন্ত ছিলেন। যখন তাঁহার বয়স ১০।১২ দশ বার বৎসর, তখন একদিন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কোন কারণে তাঁহাকে তিরস্কার করায় তিনি বাটী হইতে বহির্গত হইয়া ইচ্ছাপুরে মাতুলালয়ে গিয়া বাস করেন। এইরূপে কিছুদিন মাতুলালয়ে থাকার পর একদা তাঁহার মামী ঠাকুরাণী কোন কারণ বশতঃ তাঁহাকে বিশেষ রূপ তিরস্কার করায় তিনি মনের দুঃখে সেই দিন বাটী হইতে নিস্ক্রান্ত হইয়া যশোহরের কালেক্টর মহোদয়ের সেরেস্তাদারের বাসায় গিয়া উপনীত হয়েন। তিনি সেরেস্তাদার মহোদয়ের বাসায় কিছুদিন থাকিতে থাকিতে সকলের প্রিয় পাত্র হইলেন এবং ঐ সেরেস্তাদারের পুত্রাদির সহিত বাটীতে লেখা পড়া শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার লেখা পড়ায় বিশেষ যত্ন দেখিয়া সেরেস্তাদার মহাশয় তাঁহাকে অধিকতর ভাল বাসিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে তিনি কিছু লেখা পড়া শিখিলেন। এবং উক্ত সেরেস্তাদারের কৃপায় কালেক্টারির কাছারিতে সামান্য বেতনে একটী মুহুরিগিরি চাকরী পাইলেন। কিছুদিন ঐ কার্য্য করিতে করিতে কায কর্ম্ম ভাল শিক্ষা হইলে একদা সেরেস্তাদার মহাশয় [illegible]

খেলারাম কার্য্য কর্ম্ম বেশ শিখিয়াছেন দেখিয়া অন্য কাহাকেও একটিনী না দিয়া খেলারামকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। খেলারাম নিজের বুদ্ধিমত্তা প্রভাবে কার্য্য সুচারু সম্পাদন করিতে লাগিলেন। কালেক্‌টর সাহেব ও তাঁহার কার্য্যাদি দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। দুর্ঘটনাবশতঃ সেরেস্তাদার মহাশয়ের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার ঐ কার্যটী স্থায়ী হইয়া গেল। অল্প দিন মধ্যে সেরেস্তাদারি কার্য্যে খেলারাম বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন ও সাহেবের প্রিয় পাত্র হইলেন।

ঘটনাক্রমে কালেক্‌টর সাহেব কৃষ্ণনগরে বদলী হইবেন ও আসিবার কালীন খেলারামকে সঙ্গে আনিলেন। এবং খেলারাম যে পদে নিযুক্ত ছিলেন, সেই পদেই নিযুক্ত রহিলেন। একদা খাজনাদি অনাদায় বশতঃ গোবরডাঙ্গা নিলাম হইবার ঘোষণা হওয়ায়, উক্ত সাহেব খেলারামকে কহিলেন, "খেলারাম, গোবরডাঙ্গাগ্রাম নিলামে বিক্রয় হইবে, তুমি খরিদ করিবে কি?" ইহা শুনিয়া খেলারাম কহিলেন—যে আমি অতি সামান্য লোক ও সামান্য বেতনে এখানে চাকরী করিতেছি। বিশেষতঃ আমার অর্থ নাই—আমি কি করিয়া জমীদারী খরিদ করিব? ইহা শুনিয়া সাহেব মহোদয় বলিলেন, "আমি তোমাকে বিনা সুদে টাকা কর্জ্জ দিতে পারি। তুমি ক্রমশঃ পরিশোধ করিও।" খেলারাম কহিলেন, "যদি সুদ না লয়েন তাহা হইলে আমি টাকা কর্জ্জ লইতে পারিব না। কারণ হিন্দু শাস্ত্রে কথিত আছে—ঋণের টাকার সুদ না লইলে ঐ টাকা দানের মধ্যে পরিগণিত হয়। একারণ সুদ না লইলে আমি টাকা লইতে পারিব না।" সুতরাং কলেক্‌টর সাহেব বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি সামর্থ্যানুযায়ী সুদ দিও"। গোবরডাঙ্গা নিলামে খেলারামের হইল। এই ঘটনার কিছুদিন পরে খেলারাম নিজ গ্রামে যাইয়া প্রথমে গন্ধ বণিকের বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। তৎপরে নিজের বাস ভবন নির্ম্মাণ করান। কিছুদিন পরে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগন্নাথকে উক্ত নিজ বাস ভবন ও তিন সহস্র টাকা মূল্যের সম্পত্তি প্রদান করেন। তিনি তৎপরে গোবরডাঙ্গায় আসিয়া ভট্টাচার্য্য পাড়ায় কাছারী বাটী প্রস্তুত করান। এবং মধ্যে মধ্যে ঐ কাছারী বাটীতে আসিয়া বাস করেন। তিনি তখনও তাঁহার পদ পরিত্যাগ করেন নাই। কাছারী বাটী প্রস্তুত

হইলে পর তিনি বর্ত্তমান যমুনাতীরে প্রকাণ্ড বাস ভবন নির্ম্মাণ করাইয়া পুনরায় কৃষ্ণনগরে নিজ কর্ম্মে যান। তথায় কিছুদিন কার্য্য করিলে পর তাঁহার সাহেব মুরশিদাবাদে বদলি হন এবং তিনি ও সাহেবের সঙ্গে মুরশিদাবাদে যাইয়া উক্তপদে নিযুক্ত থাকিয়া কার্য্য করিতে থাকেন। কিছুদিন পরে উক্ত সাহেব পুনরায় মুরশিদাবাদ হইতে কৃষ্ণনগরে বদলী হইয়া আইসেন এবং তিনিও উক্ত সাহেবের সঙ্গে আইসেন। ইহার কিছুদিন পরে খেলারাম কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া গোবরডাঙ্গায় আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

খেলারামের জন্ম হইলে তাঁহার মাতামহ তাঁহাকে তাঁহার খাঁটুরার জমীদারীর দুই আনা অংশ যৌতুক স্বরূপ দান করেন। প্রত্যেক প্রজার নিকট হইতে ঐ দুই আনা অংশ আদায় করা হইত। কালক্রমে অপর অংশীদারগণ খর্ব্ব হইলে তিনি এই দুই আনা অংশের সত্বাধিকারী হইয়া প্রজার উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন সুতরাং অন্যান্য ভূম্যধিকারীকে স্বত্ব ত্যাগ করিবার পন্থা অন্বেষণ করিতে হইল।

এইরূপে অতুল বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হইয়া খেলারাম ইংরাজী ১৮১৭ সালে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার দুই পুত্র,—কালীপ্রসন্ন ও বৈদ্যনাথ। ইহারা পরস্পর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। শ্রীমতী দ্রৌপদী দেবী কালীপ্রসন্ন বাবুর মাতা এবং বৈদ্যনাথ বাবুর মাতার নাম আনন্দময়ী দেবী। খেলারামের মৃত্যুর পর উভয় ভ্রাতা একত্রে থাকিয়া বিষয় সম্পত্তি ভোগ করিতে থাকেন। ইংরাজী ১৮২২ সালে বৈদ্যনাথের মৃত্যু হয়। বৈদ্যনাথের সন্তানাদি ছিল না। তাঁহার মৃত্যুর ৭।৮ বৎসর বাদে তাঁহার বিধবা পত্নীর ও মৃত্যু হয়। সুতরাং বৈদ্যনাথ বাবুর মাতা আনন্দময়ী দেবী তাঁহার বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হন। কালী-প্রসন্ন বাবু বার্ষিক ৪৮০০ চারি হাজার আটশত টাকার বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া আনন্দময়ী দেবীর নিকট হইতে বৈদ্যনাথ বাবুর সমুদয় স্বত্ব ক্রয় করেন। আনন্দময়ী ঐ বৃত্তি পাইয়া ৺ কাশীধামে বাস করেন। কালীপ্রসন্ন বাবু এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ আনন্দময়ী যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহাকে এই বৃত্তি দিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান গোবরডাঙ্গা ইষ্টেটের সমৃদ্ধ অবস্থা কালীপ্রসন্ন বাবুর সংসাধিত

হয়। যমুনাকূলে "প্রসন্ন ভবন", দ্বাদশ শিবমন্দির সম্বলিত ৺ আনন্দময়ীর বাটী প্রভৃতি দূর হইতে দৃশ্যমান সৌধরাজি মধ্যবঙ্গ লৌহবর্ত্মগামী পথিককে কালী-প্রসন্নের স্মৃতি জাগরিত করিয়া দিয়া থাকে। কালীপ্রসন্ন অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত ও প্রবল প্রতাপান্বিত ছিলেন। তিনি স্বীয় প্রভাববলেই জমীদারী বহু বিস্তৃত করেন। এক্ষণে গোবরডাঙ্গার জমীদারগণের প্রধান আয়কর জমীদারী খুলনা জেলার অন্তঃপাতী যে চিরুলিয়া মধুলিয়া পরগণা, উহা কালীপ্রসন্ন বাবুরই স্বোপার্জ্জিত। ঐ জমীদারী পূর্ব্বে কলিকাতার প্রসিদ্ধনামা ছাতু বাবুদিগের ছিল। তথাকার প্রজারা অবাধ্য থাকায় তাঁহারা কোন মতে জমীদারী শাসন করিতে পারেন নাই। তাঁহারা কালীপ্রসন্ন বাবুকে এ বিষয়ের উপযুক্ত ভাবিয়া উঁহাকে ঐ পরগণা ইজারা দেন। কালীপ্রসন্ন বাবু বিস্তর দাঙ্গা হাঙ্গামা করিয়া ঐ পরগণা শাসন করেন। এমন কি এই বিবাদ সূত্রে তাঁহাকে কয়েক দিন জেলে ও থাকিতে হইয়াছিল। পরে সুপ্রীমকোর্টে আপীল করিয়া তিনি মুক্তিলাভ করেন। ঐ পরগণার এবম্ভুত অবস্থা দেখিয়া উহার সত্ত্বাধিকারীগণ, কালীপ্রসন্ন বাবুকে উহা বিক্রয় করেন। ঐ পরগণা হস্তগত হইবার পর গোবরডাঙ্গার ভাগ্যলক্ষ্মী দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এইরূপে কালীপ্রসন্ন বাবু জমীদারীর আয় সর্ব্বসাকল্যে লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত বাড়াইয়াছিলেন।

কালীপ্রসন্ন বাবু ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে অন্যূন পঞ্চাশৎবর্ষ বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি যখন মরেন, তখন সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এই পুত্রদ্বয় নাবালক থাকায় তিনি এক উইল করিয়া যান। তাহাতে সারদাপ্রসন্নের মাতা বিমলা দেবীকে এবং তারা প্রসন্নের মাতা শ্যামাসুন্দরীকে আপনার বিষয় সম্পত্তির একজিকিউট্রিক্স এবং কলিকাতার খ্যাতনামা আশুতোষ দে ও প্রমথনাথ দে (যাহাদিগকে লোকে ছাতু বাবু ও লাটু বাবু বলিত)—ইহাদিগকে সম্পত্তির একজিকিউটার নিযুক্ত করেন। কালীপ্রসন্ন বাবুর মৃত্যুর পাঁচবৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৪৯ সালে তারাপ্রসন্ন বাবুর মৃত্যু হয়। তারাপ্রসন্ন বাবুর সন্তান সন্ততি হয় নাই।

তারাপ্রসন্ন বাবুর মৃত্যুর পর সারদাপ্রসন্ন বাবুই বিষয়ের উত্তরাধিকারী-হন। কিন্তু তারাপ্রসন্নের মাতা সারদা বাবুকে নিষ্কণ্টকে বিষয় ভোগ করিতে

দেন নাই। উনি সপত্নী পুত্র বলিয়াই হউক অথবা স্বাভাবিক বিদ্বেষ বুদ্ধি-তেই হউক, সারদা বাবুর উপর ঘোর শত্রুতাচরণ করেন। এমন কি সারদা বাবুকে প্রাণে, মারিবার জন্য অনেক বার চেষ্টা করেন। তাহাতে কিছু না করিতে পারিয়া ইনি ইচ্ছাপুরের রামধন চোধুরী মহাশয়ের সাহায্যে (ইহাঁ-দিগকেই ইচ্ছাপুরে নঠাকুর বলে) সারদা বাবুর সঙ্গে এক দাঙ্গা উপস্থিত করেন। ঐ দাঙ্গায় বিস্তর লোকের মৃত্যু হয়। এবং ঐ দাঙ্গা লইয়া অনেক দিন মোকদ্দামা চলিতে থাকে। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া তারাপ্রসন্নের স্ত্রী দ্বারা এবং নিজে ও পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিবার চেষ্টা পান। কিন্তু সারদা বাবুর ভাগ্যক্রমে তারাপ্রসন্নের বিধবা পত্নী ও তাঁহার মাতা যে পোষ্য পুত্র লইবেন বলিয়া স্থির করেন—উভয়েই মারা যায়। তারাপ্রসন্নের মাতা অনেক দিন ধরিয়া এইরূপে সারদা বাবুর সহিত মোকদ্দমা করেন। শেষে আদালত হইতে স্থির হয় যে তারাপ্রসন্নের মাতা বিষয় হইতে বার্ষিক চৌদ্দহাজার টাকা মুনফা পাইবেন। তিনি এই মুনফা পাইয়া বহুদিন ধরিয়া কাশীতে বাস করেন এবং তথায় থাকিয়া শিব প্রতিষ্ঠাদি অনেক সৎকার্য্য করেন। এমন কি, তাঁহার সৎকার্য্যের প্রভাবে কাশীতে তাঁহাকে গোবরডাঙ্গার রাণী বলিত। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার অংশ সারদা বাবুর পুত্রেরা প্রাপ্ত হয়েন। সারদা বাবু এইরূপে একাকী সমুদয় জমীদারীর উত্তরাধিকারী হন।

সারদা বাবু ইংরাজী ১৮৩৪ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকালে ইনি শীল সাহেব নামক একজন ইংরেজ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। উনি বরাবর ইহার গৃহশিক্ষক ছিলেন। যখন তারাপ্রসন্ন বাবুর মার সঙ্গে ইহার দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়, তখন ঐ সাহেব চাকুরি ছাড়িয়া দেন। সাহেব কর্ম্মছাড়িলে পর বরাহনগরের মুরারিমোহন শীল উঁহার গৃহ-শিক্ষক-পদে নিযুক্ত হন। এইরূপে সারদা বাবু ইংরাজীতে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি ইংরাজীতে বিলক্ষণ শিক্ষিত হইলে ও নিজের জাতীয় ধর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই। প্রতিদিন সন্ধ্যা আহ্নিক, কালীবাড়ীতে যাতায়াত, শ্রাদ্ধ শান্তি প্র নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতেন। জমীদারী কার্য্যে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। এজন্য তিনি নিজ চেষ্টায় জমীদারীর আয় ২০।২৫ হাজার টাকা বৃদ্ধি করেন।

সারদা বাবুর ন্যায় পরোপকারী লোক আর দেখা যায় না। গোবরডাঙ্গায় যে সকল বড় বড় রাস্তা ঘাট দেখিতে পাওয়া যায়, উহা সারদা বাবুর চেষ্টায় ও অর্থানুকূল্যে নির্ম্মিত হয়। দুর্ভিক্ষের সময় ইনি প্রতিদিন ৫।৭ হাজার লোককে অন্ন দান করিতেন। এবং এই রূপ অন্ন দান ৮।১০ মাস পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার আতিথেয়তা এতদূর ছিল, যে তাঁহার সময়ে গোবরডাঙ্গার বাজারে কাহাকে ও রাঁধিবার জন্য হাঁড়ি কাঠ কিনিতে হইত না। গ্রামে বা বাজারে আগুন লাগিলে তিনি লোকের ঘর দ্বার সব নির্ম্মাণ করাইয়া দিতেন। যে যে সদ্‌গুণ থাকিলে লোকরঞ্জন হওয়া যায়, সারদা বাবুর সে সমুদয় সদ্‌গুণই ছিল। তিনি একজন আদর্শ-জমীদার ছিলেন। গ্রামের চতুষ্পাঠীতে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। গোবরডাঙ্গাতে তিনি নিজব্যয়ে একটী উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। দেশের লোকে যাহাতে চিকিৎসা অভাবে কষ্ট না পায়, একারণ তিনি গোবরডাঙ্গায় একটী ডিসপেন্‌সারী স্থাপন করেন। তিনি যমুনা নদীর উপরে একটী সেতু প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। ১২৭৫ সালে বঙ্গদেশে যে ভীষণ বাত্যা হয়, তাহাতে অনেকেই গৃহহীন ও নিঃস্ব হইয়া যায়, কিন্তু সারদা বাবুর অনুগ্রহে সে সময়ে গোবরডাঙ্গা ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের লোকে কোন কষ্ট অনুভব করিতে পারে নাই। এসময়ে তিনি যে পরিমাণে অর্থ সাহায্য ও নিজের শ্রম ও যত্ন দ্বারা লোকের উপকার করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া তদানীন্তন স্কুল ইন্‌স্পেকটার উড্রো সাহেব তাঁহার এডুকেশান রিপোর্টে লেখেন, যে সারদা বাবু বিগত ভীষণ বাত্যায় যেরূপ অর্থ-ব্যয় ও কায়িক শ্রম করিয়া প্রজা পুঞ্জের উপকার সাধন করিয়াছেন, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যে যদি গবর্ণমেণ্টের নিকট উপাধি লাভ করিবার তাঁহার মানস থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাকে অনেক উপাধিতে ভূষিত করিতে হইত। তিনি সাধারণ হিতকর যে যে গুরুতর কার্য্য করেন, তাহা কাহাকে ও জানিতে দেন না। বাস্তবিক ও সারদা বাবুর ন্যায় পরোপকারী ও দয়াবান্ লোক জমীদার সম্প্রদায়ের মধ্যে এক্ষণে অতি বিরল। আমরা তাঁহার বদান্যতার ভূয়োভূয়ঃ উদাহরণ অবগত আছি। কিন্তু স্থান সংক্ষেপ

একজন ব্রাহ্মণ সারদা বাবুর পিতার নিকট ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা কর্জ্জ লইয়াছিল। অনেক দিন যাবৎ ঐ টাকা অনাদায়ী থাকায় ব্রাহ্মণকে বারম্বার তাগিদ্ করা হয়। কিছুতেই টাকা আদায় না হওয়ায় দ্বারবানেরা ব্রাহ্মণকে একদিন দুপরবেলায় জমীদারী কাছারিতে ধরিয়া লইয়া আইসে। সারদা বাবু তখন বৈঠকখানায় ছিলেন। মুন্সী ঐ ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণের পোষাক পরিচ্ছদ ও মুখশ্রী দেখিয়া, বিশেষতঃ অনাহারী অবস্থায় দুপর বেলা তাঁহাকে আনা হইয়াছে বলিয়া, সারদা বাবু আমলাদিগকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং ব্রাহ্মণকে অগ্রে ভোজন করাইতে বলিলেন। আহারের পর ব্রাহ্মণ যখন সারদা বাবুর নিকট আনীত হইল, তখন তিনি ব্রাহ্মণের বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইলেন। এবং সমুদায় আমলাদিগের সম্মুখে ঐ ব্রাহ্মণের পাঁচ হাজার টাকার খত ছিঁড়িয়া দিলেন। এবং ব্রাহ্মণকে আর দেনা দিতে হইবেক না বলিলেন। অধিকন্তু উহাকে পাঁচ টাকা পাথেয় দিয়া বিদায় করিলেন। আজ ও গোবরডাঙ্গায় অনেকে সারদা বাবুর সহৃদয়তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই কথার উল্লেখ করিয়া থাকেন।

পল্লীস্থ কোন ব্যক্তির পীড়ার সম্বাদ পাইলে সারদা বাবু তৎক্ষণাৎ ঔষধ ডাক্তার ও পথ্যাদি পাঠাইয়া দিতেন। কোন কোন সময়ে নিজে ও রাত্রি দুপ্রহর পর্য্যন্ত পীড়িতের বাটীতে উপস্থিত থাকিতেন। একবার গবীপুরের ৺ মাধব বাঁড়ুজ্যে মহাশয়ের উরুস্তম্ভ পীড়া হয়। পীড়া অত্যন্ত সাংঘাতিক ছিল। ডাক্তারেরা তাঁহাকে বরফ ও মাংস ব্যবহার করিতে বলে। কিন্তু তাঁহাদের অবস্থা বড় ক্ষুন্ন ছিল। বরফ ও মাংস যোগাইবার ক্ষমতা ছিল না। ৺ মাধব বাঁড়ুজ্যে মহাশয়ের ১০।১২ বৎসরের একটী বালক ছিল। সে পিতার এরূপ সাংঘাতিক পীড়া ও চিকিৎসার এরূপ ব্যবস্থার জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে বাজারে যাইতে ছিল। সারদা বাবু উপর হইতে দৈবঘটনায় তাহা দেখিতে পান। এবং বালকটীর নিকট তাহাদের অবস্থা ও তাহার পিতার পীড়ার বিবরণ বিশেষ অবগত হইয়া বালকটীকে সান্ত্বনা করিলেন। এবং তাহার পিতার কারণ কলিকাতা হইতে বরফ ও মাংস আনিবার জন্য ডাক বসাইয়া দিলেন। যত দিন ৺ মাধব বাঁড়ুজ্যে মহাশয় জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি উঁহাকে বরফ ও

মাংস যোগাইয়া ছিলেন। কিন্তু অধিকদিন তাঁহাকে বাঁচিতে হয় নাই। ঐ উরুস্তম্ভ পীড়াতেই সত্বর তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

সারদা বাবুর সহৃদয়তা সম্বন্ধে এরূপ অনেক গল্প প্রচলিত আছে। বাহুল্য ভয়ে আমরা সে সকল এস্থানে দিলাম না। দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ সারদা বাবু অপরিণত বয়সে ১৮৬৯ সালে ইহলোক ত্যাগ করেন। ইহার চারিটী পুত্র। গিরিজাপ্রসন্ন, অন্নদাপ্রসন্ন, জ্ঞানদাপ্রসন্ন ও প্রমদাপ্রসন্ন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, ইহাঁরা যেন পিতৃগুণের অধিকারী হন।

মাটিকোম্‌রা।

রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার হইতে তাঁহার বর্ত্তমান বংশধর শশীভূষণ স্মৃতিরত্ন।

খুল্‌না জেলার অন্তঃপাতি খাঁসরা কাটিপাড়া গ্রামে রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কারের জন্ম হয়। ইনি রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের সমসাময়িক লোক ছিলেন। ইচ্ছাপুরের রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ই ইহাঁকে মাটিকোম্‌রা গ্রামে আনিয়া বসবাস করান। কিম্বদন্তী এইরূপ, রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার গুটিকাসিদ্ধ ছিলেন। তিনি প্রতিদিন নিজগ্রাম হইতে ৩০ ত্রিশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী ত্রিবেণীতে প্রাতে গঙ্গাস্নান সমাধা করিয়া বাটী গিয়া ছাত্রবর্গকে অধ্যয়ন করাইতেন। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তিনি ঐ সন্ধান জানিতে পারিয়া রামভদ্রকে আপনার উপগুরুপদে বরণ করিলেন। এবং মাটিকোমরা গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় যমুনাতীরে ৩৬/ ছত্রিশ বিঘা জমী দান করিয়া তথায় তাঁহাকে বসবাস করান। কালক্রমে যমুনা নদী তথা হইতে দূরে গমন করায় ছাত্রবর্গের তথা হইতে জল আনিয়া পাকশাক করিয়া খাইতে কষ্ট হওয়ায়, ঐ মাটিকোমরা গ্রামের মাজের পাড়ায় যেখানে তাঁহার বংশধরেরা এক্ষণে বাস করিতেছেন, তথায় পুনরায় জমীদান করিয়া বাস করান।

মাটিকোমরা গ্রামটী যমুনা নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। এই গ্রাম দৈর্ঘ্যে এক মাইল ও প্রস্থে আধ মাইল। যমুনা নদী এখানে যেরূপ

গভীর, এরূপ কুত্রাপি ও দৃষ্ট হয় না। গ্রীষ্মকালে এখন ও এখানে ২০।২৫ হস্ত জল থাকে। ঘটকেরা ও বাদ্যকরেরা এই গ্রামের আদিম অধিবাসী ছিল। পরে অন্য ব্রাহ্মণগণ ক্রমে এখানে আসিয়া বাস করেন। এখন ও এই গ্রামের সাধারণ লোকে বলে "বাঁশ বাজনে ঘটকেরা, তিন নিয়ে মাট-কোমরা"।

রামভদ্র কুশদহের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। "নদের গদা, কুশদহের ভদা" এই প্রবাদ বাক্যটী আবহমানকাল শুনা যাইতেছে। নবদ্বীপের গদাধর শিরোমণি যেরূপ প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন, কুশদহের রামভদ্র তর্কসিদ্ধান্ত ও ন্যায়শাস্ত্রে সেইরূপ খ্যাতনামা ছিলেন। গদাধর শিরোমণি এবং রামভদ্র তর্কসিদ্ধান্ত উভয়ে সহাধ্যায়ী ছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রের শেষ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে উভয়ে একসময়ে মিথিলায় গমন করেন। সে সময়ে মিথিলায় ন্যায়শাস্ত্রের বিশেষ চর্চ্চা ছিল। এক্ষণে লোকে যেমন নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে যায়, তৎকালে সেইরূপ মিথিলায় ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে যাইত। গদাধর শিরোমণি, রামভদ্র তর্ক-সিদ্ধান্ত ও পূর্ব্বাঞ্চলের (নগদ্বীপ বলিয়া খ্যাত) অজ্ঞাতনামা সিদ্ধান্ত উপাধিধারী কোন এক পণ্ডিত—এই তিনজন এক সময়ে মিথিলায় অধ্যয়ন করিতে যাইয়া আপনাদের এইরূপ পরিচয় প্রদান করেন:—"কুশদ্বীপ, নগদ্বীপ নবদ্বীপ নিবাসিনঃ। তর্কসিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্ত, শিরোমণি মনীষিণঃ।

রামভদ্র অতি সরল ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। লোকে তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ লোক বক্ষ্যমাণ ঘটনার উল্লেখ করিয়া থাকে। তৎকালে মিথিলা দেশবাসী পণ্ডিতবর্গের নিয়ম ছিল যে বিদেশস্থ কেহ অধ্যয়ন করিতে যাইলে তাঁহারা তাঁহাদিগকে অধ্যয়ন করাইতেন বটে কিন্তু তাঁহাদিগকে কোন রূপ টীকা টিপ্পনী দিতেন না। গদাধর শিরোমণি ও রামভদ্র তর্ক সিদ্ধান্ত এই নিয়মে তথায় পাঠ অভ্যাস করিতেন বটে কিন্তু প্রতিদিন আপন আপন বাসায় আসিয়া গুরু মুখে যেরূপ টীকা টিপ্পনি শুনি-তেন, তাহাই পুস্তকাকারে সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। যখন উভয়ে এইরূপ অপ্রাপ্ত গ্রন্থের পাঠ শেষ করিয়া মিথিলা হইতে বাটী ফিরিয়া আইসেন, তখন পথে নৌকায় বসিয়া পরস্পর পরস্পরের গুরু মুখী টিকা টিপ্পনি মিলাইতে

লাগিলেন। টীকা মিলাইয়া দেখেন, যে রামভদ্রী টীকা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। গদাধর রামভদ্রের টীকা দেখিয়া বলিলেন, মহাশয়, আমি এত পরিশ্রম করিয়া যে টীকা প্রস্তুত করিলাম, তাহা বিফল হইয়াছে। আপনার টীকা থাকিতে আমার টীকা কোন মতেই প্রচলিত হইবে না। রামভদ্র এত উদার ছিলেন যে গদাধর দুঃখিত হইবেন বলিয়া নিজের এত যত্ন ও শ্রমের টীকা টীপ্পনি সমুদয় অতল জলে নিক্ষেপ্ত করিলেন।

দায়-ভাগের ও ন্যায় শাস্ত্রের কোন কোন গ্রন্থের রামভদ্রী টীকা এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায়। রামভদ্র দেশে তর্কসিদ্ধান্ত ও পরে মিথিলায় যাইয়া ন্যায়ালঙ্কার উপাধি প্রাপ্ত হন। রামভদ্র ৺ কাশীধামে শিব প্রতিষ্ঠা করেন।

রামভদ্রের দুই পুত্র—বিশ্বেশ্বর তর্কবাগীশ ও রমাকান্ত বিদ্যাবাগীশ। বিশ্বেশ্বর তর্কবাগীশ ও কাশীধামে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বিশ্বেশ্বর তর্কবাগীশের দুই পুত্র—কেশবরাম ও বিষ্ণুরাম সিদ্ধান্ত। বিষ্ণুরামের দুই পুত্র—রামশরণ ন্যায় বাচস্পতি ও রামদুলাল ভট্টাচার্য্য। রামশরণ ন্যায় বাচস্পতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক লোক ছিলেন। রামশরণের চারিটী পুত্রই খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। রামশরণ নিজেও ন্যায় স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তৎকালীন তাঁহার সমকক্ষ লোক অতি বিরল ছিল। তাঁহার নিষ্ঠা ও পাণ্ডিত্য এতদূর ছিল, যে দেশ বিদেশস্থ বহুতর ব্রাহ্মণ সন্তান তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিল। রামশরণের চারি পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম কাশীনাথ সার্ব্বভৌম, দ্বিতীয়ের নাম জগন্নাথ বিদ্যা পঞ্চানন, তৃতীয়ের নাম সদাশিব ন্যায় পঞ্চানন ও চতুর্থের নাম হরচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত ছিল। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র জগন্নাথ বিদ্যাপঞ্চানন অতি ধার্ম্মিক ছিলেন। স্মৃতি শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধীয় তিনি যে ব্যবস্থা দিতেন তাহা অকাট্য ছিল। গোবরডাঙ্গার জমীদার কালীপ্রসন্ন বাবু তাঁহার ব্যবস্থার বিশেষ আদর করিতেন।

জগন্নাথ বিদ্যাপঞ্চাননের চারিটী পুত্র—রামচন্দ্র শিরোমণি (২) অমৃতলাল ভট্টাচার্য্য (৩) রামকমল চূড়ামণি এবং (৪র্থ) তারিণীচরণ ভট্টাচার্য্য। রামকমল চূড়ামণি অতি ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন। তিনি স্মৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র (১) কালীদাস ভট্টাচার্য্য (২) নব-

কুমার ভট্টাচার্য্য, (৩) মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (৪) কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য এবং (৫) শশীভূষণ ভট্টাচার্য্য।

শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য—ইঁহিই রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কারের বর্ত্তমান বংশধর। সন ১২৬২ সালের ৩রা মাঘ তারিখে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার জন্মের পূর্ব্বেই ইঁহার পিতার অপর চারিটী পুত্রই উপযুক্ত হইয়া কালকবলে পতিত হওয়ায় ইঁহার পিতা রামকমল চূড়ামণির ইঁহার জীবনের প্রতি তাদৃশ আস্থা ছিল না। ইনি বাল্যকালে গ্রাম্য পাঠশালায় সামান্য শিক্ষা লাভ করিয়া ইচ্ছাপুরের বঙ্গবিদ্যালয়ের ২য় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়া শুনা করেন। সপ্তমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইঁহার পিতৃ বিয়োগ ও দশমবর্ষ বয়সে ইঁহার মাতৃ বিয়োগ হয়। সুতরাং ইনি নিরুপায় হইয়া আপনার জ্যেষ্ঠতাত রামচন্দ্র শিরোমণির সংসারে থাকিয়া তাঁহার নিকট সুপদ্ম ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের সময় আপনার জ্ঞাতি পিতৃব্য ৺ বীরেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নিকট যাইয়া ৺ কাশীধামে ঐ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে তথায় অসুবিধা হওয়ায় দেশে প্রত্যাগমন করিয়া হুগলীজেলার অন্তঃপাতি বৈঁচি গ্রামে উমেশচন্দ্র তর্করত্নের নিকট সমগ্র ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে তথা হইতে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের স্থাপিত মুলাযোড়ের সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া সন ১২৮৬ সালে গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপিত উপাধি পরীক্ষায় সাহিত্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পুরস্কার সহ বিদ্যালঙ্কার উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তৎপরে অসীম যত্ন ও পরিশ্রমে তিনবৎসরের মধ্যে সমগ্র নব্যস্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ১২৮৯ সালে নব্য স্মৃতিশাস্ত্রে ও দায় ভাগের পরীক্ষা দিয়া স্মৃতি রত্ন উপাধি ও ৫০ পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েন। ১২৯০ সালে দেশে আসিয়া চতুষ্পাঠী করিয়া ব্যাকরণ, সাহিত্য ও স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপন করাইতেছেন। সুপদ্ম ব্যাকরণ অতিশয় দুরূহ বলিয়া ইনি ঐ ব্যাকরণ অবলম্বনে সরল প্রণালীতে সুপদ্ম চন্দ্রিকা নামে একখানি ব্যাকরণ প্রস্তুত করিয়াছেন। অতি শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইয়া নিজের যত্ন ও শ্রম বলে কিরূপে বিদ্যা লাভ করা যায়, শশিভূষণ তাহার দৃষ্টান্ত। রামভদ্রের বংশে ইনিই এক্ষণে একমাত্র শাস্ত্র ব্যবসায়ী ও বর্ত্তমান কুশদহসমাজের মধ্যে ইনিই এক্ষণে সর্ব্বোচ্চ বিদায় প্রাপ্ত হয়েন।

রামভদ্রের বংশাবলি পরিচায়ক শ্লোক।—

গৌড় দ্বীপ প্রকীর্ত্তী রতিপতিজনকে গ্রন্থকর্ত্তাতিভক্ত,
ভূলোকৈঃ পূজিতো ঽভূৎ অতুলকুল যশো রামভদ্রশ্চ ধীমান্।
ভট্টাচার্য্যোঽতিধৈর্য্যঃ সকল গুণযুতশ্চণ্ড মার্ত্তণ্ডমুর্ত্তিঃ,
ন্যায়ালঙ্কার ধীরঃ স খলু পরিদদৌ মন্দিরঞ্চাপি কাশ্যাং ॥ ১ ॥
তৎপুত্রৌ সর্ব্বশাস্ত্রাশয়বিনয়দয়াপুণ্য সৌজন্যযুক্তৌ,
বেদান্তৈং গীয়মানৌ ক্ষিতিতল বিদিতৌ পুতিবংশোদ্ভবৌ দ্বৌ।
সদ্‌গর্ব্বৌ বিশ্ব পূর্ব্বেশ্বর ইতি চ রমাকান্ত নামা সুধীমান্।
সুশ্রীমান্ সাধুশীলঃ পরমকুলভবঃ পাপলেশৈক হীনঃ ॥ ২ ॥
বিশ্বে বিশ্বেশ্বরস্য প্রতিনিধি রতুলঃ শ্রীল বিশ্বেশ্বরাখ্যঃ,
সৎশীলঃ পুণ্যপুঞ্জঃ সকল গুণময় স্তর্কবাগীশ শেষঃ।
কাশ্যাং তস্যাপি কীর্ত্তিঃ সকল গুণযুজো বিদ্যতেঽদ্যাপি সৌমা,
স প্রাদাৎ জ্যেষ্ঠ কন্যাং পরমকুলভবে কৃষ্ণমুখ্যে সুপাত্রে ॥ ৩ ॥
নীলাদ্যে কণ্ঠচট্টে তদনুবহুগুণে রূপযুক্তে চ ধীরে,
তৎপুত্রৌ কেশবাখ্যঃ সুমতিরতিধনো বিষ্ণুরামশ্চ ধীরঃ।
আসীৎ শ্রীবিষ্ণুরামঃ ক্ষিতিবিদিততমঃ সাধুশীলঃ,
সিদ্ধান্তাখ্যোপি সর্ব্বোপরি পরিগণিত স্তস্য নাসীৎসদৃক্ষঃ ॥ ৪ ॥
সৎশীলঃ শ্রীলগোপালক মুখ কুলজে চেন্দ্রনারায়ণাখ্যে,
শ্রীযুক্তে কেবলাদ্যে তদনুচ তনুজাং রামশেষে দদৌ সঃ।
জাতঃ পুত্রোঽস্য রামাদিক ইতি শরণো ন্যায় বাচস্পতির্হি,
রেজে যস্তর্ক সাঙ্খ্যাগম নিগম বিদাং মাননীয়ো মহাত্মা ॥ ৫ ॥
সোঽয়ং বন্দ্যো তনুজাং রঘুসুতচরণে শ্রীভবান্যাদিকেহু,
দত্বা শ্রীকাশীনাথে মুখকুলজবরে ভাতি ধীরঃ পৃথিব্যাং।
চত্বারস্তস্য পুত্রা বিবুধগুরুসখা ভান্তি শাস্ত্রপ্রবীণাঃ,
জ্যেষ্ঠঃ শ্রীকাশীনাথঃ সুরপুরমগমৎ সার্ব্বভৌমো [illegible] ॥ ৬ ॥

তেষাং যো মধ্যমোঽসৌ বিবিধগুণযুতঃ শ্রীজগন্নাথ নামা,
বিদ্যাপঞ্চাননাস্তঃ স্মৃতিষু সুনিপুণঃ প্রাতরাদিত্যমূর্ত্তিঃ।
স প্রাদাৎ স্বীয় কন্যাং নিলমণিমুখজে বন্দ্যবংশাবতংসে
খ্যাতস্তস্যানুজোঽসৌ শিব বিরতি সদা ন্যায়ালঙ্কার ধীরঃ॥ ৭॥
চন্দ্রান্তঃ শ্রীহরাদিঃ খলু তদবরজস্তর্কসিদ্ধান্তশেষঃ,
ইত্যেতৈঃ শূরপুত্রৈঃ স খলু পরিবৃতো সোমবৎ সৌম্যযুক্তঃ।
শিষ্যৈর্ভাগৈর্যশোভির্ধনজননিগমৈ স্তস্য নাসীৎ সদৃক্ষঃ,
দূরাদাগত্য বিপ্রা বিবিধগুণযুজস্তস্য শিষ্যাবভূবুঃ॥ ৮॥
যোঽয়ং জগন্নাথবুধো বভূবস্তস্যাপি বেদান্তনয়া বভূবুঃ।
জ্যেষ্ঠস্তু তেষাং স্মৃতিশাস্ত্রশূরঃ শ্রীরামচন্দ্রঃদি শিরোমণি র্হি॥ ৯॥
তস্যানুজোঽসাবমৃতাদিলাম্নঃ শাস্ত্রার্নভিজ্ঞো দশকর্ম্মযুক্তঃ।
তস্যানুজো যঃ স মৃতো হি বাল্যে শ্রীতারিণীর্বৈ চরণান্ত সংজ্ঞঃ॥১০॥
সর্ব্বানুজোঽসৌ কমলাভিরামশ্চূড়ামণি খ্যাতিযুতঃ সুধীরঃ।
স্মার্ত্তঃ সুশীলঃ কিল সৌম্যমুর্ত্তিঃ সদা সহাস্যো মিত সত্যবাদী॥১১॥
ভার্য্যানুরূপা চ বভূবস্তস্য বিশ্বেশ্বরী নাম সদানুরক্তা।
দেবদ্বিজার্চ্চানুরতা সুশীলা পতিব্রতাভর্তৃমতানুবর্ত্তিনী॥ ১২॥
তস্যাং স জনয়ামাস পঞ্চপুত্রান্ মহামতিঃ॥
অধুনা বিদ্যতে তেষাং কনিষ্ঠঃ শশিভূষণঃ॥ ১৩॥

মাটিকোমরা গ্রামের মধ্যে কেবল যে রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় ও তদীয় বংশধরগণ পরিচয় দিবার যোগ্য তাহা নহে, পরন্তু এই গ্রামে আরও অনেকানেক বর্দ্ধিষ্ণু লোক আছেন, যাঁহাদের নামোল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক নহে। ঘটক মহাশয়েরাই এই গ্রামের মধ্যে প্রাচীন ও বর্দ্ধিষ্ণু। লোকে আজও কথায় কথায় বলিয়া থাকে, "বাঁশ বাজানে ঘটকেরা, তিন নিয়ে মাটিকোমরা"। এই গ্রামে বাঁশ, বাদ্যকর ও ঘটক বহুল পরিমাণে ছিল। সেই ঘটক মহাশয় দিগের আর পূর্ব্ব শ্রী নাই—তাঁহাদের মধ্যে নামোল্লেখ

করিবার লোক অতি বিরল। বর্ত্তমান এই বংশে শ্যামাচরণ ঘটক নামে একব্যক্তি আলিপুরে মুন্সেফ্ কোর্টে ওকালতী করিতেছেন। ইনি যৎসামান্য বাঙ্গালা লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া ওকালতী ব্যবসায়ে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। ইনি অতিশয় ধার্ম্মিক ও সৎক্রিয়াশীল এবং সেই গুণে সমাজে বিশেষ পরিচিত ও সম্মানিত।

এই গ্রামে নিবারণচন্দ্র ঘটক নামে এক ব্যাক্তি আছেন। ইনি যদিও উপরোক্ত ঘটকবংশ সম্ভূত নহেন, তথাপি ইনি একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। ইনি সৎগুণান্বিত ও ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত। এক্ষণে ইনি নাটোরের ডেপুটী মেজেষ্টরের পদে ব্রতী আছেন।

গৈপুর।

যমুনার পশ্চিমতীরে গৈপুর গ্রাম অবস্থিত। গ্রাম খানি দৈর্ঘ্যে প্রায় ১ মাইল ও প্রস্থে অর্দ্ধ মাইল। গৈপুর গোপীপুরের অপভ্রংশ মাত্র। এই গ্রামে অন্যূন ৪।৫০০ ঘর ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাস। অপর শ্রেণীর লোক এখানে বিরল। গৈপুরের কায়স্থ মজুমদারেরা এ গ্রামের প্রথম অধিবাসী। তৎপরে লয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরপুরুষ মথুরানাথ এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। গৈপুরের বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের মধ্যে বাবু কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সবজজ্ হইয়ছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের দৌহিত্র সন্তান বেগের গঙ্গোপাধ্যায়-বংশীয় বাবু সূর্য্যকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ডাক বিভাগের প্রথম শ্রেণীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। সামান্য বেতনে তিনি ডাক বিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত হন। পরে স্বীয় ক্ষমতাগুণে ৫০০৲ পাঁচশত টাকা বেতনের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অসুস্থতা বশতঃ কার্য্য ত্যাগ করিতে না হইলে তিনি সম্ভবতঃ ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার জেনেরালের পদে উন্নত হইতে পারিতেন।

এই গ্রামের বাবু পতিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় গবর্ণমেণ্টের অধঃস্তন বিচার বিভাগে কার্য্য করিতেন। পরে পাকুড় রাজএষ্টেটের ম্যানেজার হইয়া এষ্টেটের অনেক উন্নতি-সাধন করেন। রাজা সতীশচন্দ্র পাঁড়ে উহাঁকে ভ্রাতৃবৎ স্নেহ করিতেন।

রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার পুত্রগণ ও তাঁহার দৌহিত্র লালচাঁদ

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অতিথি সেবা ও ক্রিয়া-কলাপাদি করিয়া গিয়াছেন।

গৈপুর গ্রামের তারকনাথ শিরোমণি মহাশয়ের পুত্র গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সদনুষ্ঠান ও পাণ্ডিত্যগুণে পিতৃপিতামহের পদমর্য্যাদা রক্ষা করিতে অপারক হইয়া এক্ষণে কলিকাতায় আসিয়া কাপড়ের দোকান করিয়াছেন।

এই গ্রামে পূর্ব্বে অনেক ন্যায়শাস্ত্রবিৎ ও ধর্ম্ম শাস্ত্রজ্ঞ অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে তাহার আর কিছুই নাই।

গোবর ডাঙ্গা।

গোবরডাঙ্গা আধুনিক গ্রাম। কুশদ্বীপ সমাজের মধ্যে এই গ্রামটী মিউনিসিপাল টাউন। মুখোপাধ্যায় জমিদার মহাশয়গণ হইতেই এই গ্রামের যাহা কিছু শ্রীবৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রামের আদি ইতিবৃত্ত জানিবার জন্য আমরা অনেকবার অনেক ব্যক্তিকে এখানে পাঠাইয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিনাই। লেখকও নিজে এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ। তবে আমরা লোক পরম্পরা দু এক জনের বিষয় যাহা জ্ঞাত হইতে পারিয়াছি, তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকটিত করিলাম।

ভবানীপুরে চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট্ বলিয়া যে ষ্ট্রীট্টী বর্ত্তমান আছে, ঐ চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিবাস গোবরডাঙ্গায় ছিল। তিনি আলিপুরের জজ্ আদালতের একজন প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন। বক্তৃতার ক্ষমতা অপেক্ষা আদালতের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করণে তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। তিনি স্বদেশ হইতে যদিও দূরে থাকিতেন, তথাপি তিনি দেশের কল্যাণে রত ছিলেন। ইঁহার পিতা শিবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এক জন মহাশয় লোক ছিলেন। তিনি গবর্ণমেন্টের বিচার বিভাগে কার্য্য করিতেন। স্বদেশবাসীদিগের দুঃখ মোচন জন্য তিনি নিজ অর্থ ব্যয়ে একটী প্রশস্ত রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। আজও ঐ অঞ্চলে "শিবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের রাস্তা" তাঁহার স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছে। তিনি পরিণত বয়সে ৺কাশীধামে বাস করেন এবং সর্ব্বপ্রথম কাশী বাস করাতে কুশদ্বীপবাসীদিগের কাশীপ্রাপ্তির পথ প্রদর্শক।

ইহারই পৌত্র ডাক্তার ক্ষীরোদপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একজন আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন। মহাকালী পাঠশালার অবৈতনিক সম্পাদক বলিয়াও অনেকে তাঁহাকে চিনেন।

হরদেব ভট্টাচার্য্য (স্মৃতিরত্ন)—খাঁটুরিয়ার পণ্ডিতমণ্ডলীর গুণকীর্ত্তন করিতে গিয়া আমরা কুশদ্বীপকাহিনীর কলেবর বর্দ্ধিত করিয়াছি। কিন্তু নীলমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বর্গারোহণ করায় খাঁটুরা এক্ষণে অধ্যাপকশূন্য হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা লইতে হইলে খাঁটুরা বাসী দিগের এক্ষণে গোবর ডাঙ্গার হরদেব স্মৃতিরত্নের শরণ গ্রহণ ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই।

কিন্তু আজকাল লোকের স্বধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি এতদূর অনাস্থা যে হরদেব এপর্য্যন্ত খাঁটুরাতে একটী স্বতন্ত্র চতুষ্পাঠী করিতে পারিলেন না। তিনি শাস্ত্ররক্ষার জন্য খাঁটুরার কোন পাঠশালায় অধ্যাপনা করিতে যান। পাঠশালাটী বিজাতীয়-রাজসাহায্যে পরিচালিত। সুতরাং ঐ পাঠশালার পরিদর্শক আসিতেছে শুনিলেই তাঁহাকে পলাইতে হইত। জাতীয় দুর্দ্দশার পরিচয় ইহা অপেক্ষা আর কি আছে?

খাঁটুরা।

সকলেই ইচ্ছা করেন, তাঁহার নিজের ও পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরব কাহিনী প্রচারিত হয়। ইতিবৃত্ত লেখকের পক্ষে সকলের বিবরণ সাধারণের স্মৃতিপথে জাগরিত রাখা কিন্তু দুরূহ ব্যাপার। রামকুমার ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় খাঁটুরার এক জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। নিজ বাটীতে তাঁহার চতুষ্পাঠীও ছিল। কথিত আছে, কোন সময়ে নড়ালের প্রসিদ্ধ জমীদার রতনরায়ের বাটীতে পণ্ডিতগণের একটী মহতী সভা আহূত হয়। নানা দিক্ দেশ হইতে পণ্ডিতগণ ঐ সভায় আগমন করেন। সেই সভাতে ন্যায়শাস্ত্রের বিচার হয় রামকুমার স্বীয় বিদ্যাবলে তর্ক বিতর্কে সমুদয় পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাস্ত করিয়া জয়ী হয়েন। তাহাতে জমীদার বাবু অত্যন্ত খুসী হইয়া সভার মধ্যে রামকুমারকে একটী সোণার পৈতা প্রদান করেন। এবং তাহাকে

সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ বিদায় দেন। খাঁটুরা বাসীর পক্ষে ইহা কম গৌরবের বিষয় নয়। পরন্তু এই সকল মহামহোপাধ্যায়ের বংশে এক্ষণে জ্ঞানস্রোত ও ধর্ম্ম স্রোতের আর বিন্দুমাত্রও প্রবাহ দেখা যায় না। রামকুমারের অধস্তন এক পুরুষ পর্য্যন্তও পাণ্ডিত্যের কথঞ্চিৎ চর্চ্চা দেখা যায়। কেন না, তাঁহার মধ্যমপুত্র রাজীবলোচন কোন সময়ে সাতক্ষীরার প্রাণনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপণ্ডিত ছিলেন।

ইঁহার শেষ বংশধর বাবু উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় যদিও একজন পণ্ডিত নহেন, অথবা কোন বিশিষ্টতার জন্য জনসমাজে পরিচিত নহেন, তথাপি ইনি এই কুশদ্বীপ কাহিনীর একজন প্রধান সহায় বলিয়া আমরা কৃতজ্ঞতার অনুরোধে তাঁহার নামোল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রভূত ধন মান বা বিদ্যা উপার্জ্জন করার পক্ষে ইঁহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন নয় বটে; পরন্তু তীর্থযাত্রা ও নানাদিক্ দেশ ভ্রমণ দ্বারা জীবনের কথঞ্চিৎ সার্থকতা লাভ ইঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে। আজকাল ইয়ুরোপ, আফ্রিকা বা আমেরিকা ভ্রমণকারী, ভারতবাসীর নিকট যেমন ভ্রমণজনিত গৌরব প্রাপ্ত হয়েন, পঞ্চাশ-বৎসর পূর্ব্বে যে বঙ্গদেশীয় লোক কাশী প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণে যাইতেন, তাঁহাকে লোকে যথেষ্ট ভাগ্যবান্ ও পুণ্যাত্মা বিবেচনা করিত। খাঁটুরা গ্রামের কয়জন লোকের ভাগ্যেই বা দুই চারিটী তীর্থ দর্শন ঘটিয়াছে? উপেন্দ্র বাবু কিন্তু ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া উহার দক্ষিণপ্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছেন। উনি যে কত নদ নদী হ্রদ সরোবর, বন উপবন, পাহাড়, পর্ব্বত, ও পৌরাণিক স্থানসকল দেখিয়া নয়ন ও মনের পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন—তাহার বিশেষ বিবরণ লিখিতে গেলে একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক হইয়া পড়ে। বাঙ্গালীর পক্ষে বিশেষতঃ খাঁটুরা বাসীর পক্ষে এ ভাগ্যও কিছু কম নয়।

সময়ের উপযোগিতা অনুসারে অধ্যাপকমণ্ডলীর বংশধরগণ শাস্ত্রামৃত রসাস্বাদ পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে চিনির ব্যবসায়ের মিষ্টতা আস্বাদন করিতে-ছেন। উপেন্দ্রনাথের খুল্লতাতপুত্র শ্রীযুত কুশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিট্‌মূলোৎপাদিত শর্করার ব্যবসায়ে লক্ষেশ হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান শাস্ত্রব্যবসায়ীর শিষ্য না হইয়া এক্ষণে শর্করাব্যবসায়ীর শিষ্যত্ব স্বীকার করিতেছেন।

খাঁটুরাস্থ শাণ্ডিল্য গোত্রীয়ের বংশাবলী।

খাঁটুরাস্থ শাণ্ডিল্য গোত্রিয়গণ সর্ব্বানন্দীমেল। ইহারা কাঁটাদিয়া বন্দিঘাটী। প্রথমে গঙ্গাগতি বন্দোপাধ্যায় মহাশয় খাঁটুরাতে আগমন করেন। বর্ত্তমান যে সকল শাণ্ডিল্য গোত্রীয়গণ খাঁটুরাতে আছেন, সকলেই উঁহার বংশধর। গঙ্গাগতি বন্দোপাধ্যায়ের বংশাবলীর ক্রম এইরূপ। যথা :—

ক (১) গঙ্গাগতি বন্দোপাধ্যায়; (২) উঁহার পুত্র গোবিন্দ; (৩) গোবিন্দের পুত্র রূপনারায়ণ; (৪) রূপনারায়ণের পুত্র রাম, লক্ষণ, যাদবেন্দ্র, বাসুদেব, ও মহাদেব। (৫) রামের পুত্র গঙ্গাধর, বিশ্বেশ্বর, রমাকান্ত ও মুকুন্দ। (৬) গঙ্গাধরের পুত্র কৃষ্ণদেব ও রামনারায়ণ; (৭) কৃষ্ণদেবের পুত্র দুর্গাপ্রসাদ ও রামরুদ্র; (৮) দুর্গাপ্রসাদের পুত্র সদাশিব ও কালীপ্রসাদ; (৯) সদাশিবের পুত্র চন্দ্রকান্ত; (১০) চন্দ্রকান্তের পুত্র দীননাথ; এবং দীননাথের পুত্র দ্বিজনাথ, রসরাজ, ভজহরি, বরুণ ও অভিমুক্ত।

খ। ৮ নং দুর্গাপ্রসাদের পুত্র যে সদাশিব ও কালীপ্রসাদ, তন্মধ্যে সদাশিবের বংশ বিস্তার বলা হইয়াছে। এক্ষণে কালীপ্রসাদের বংশবিস্তার এইরূপ। যথা :—কালীপ্রসাদের পুত্র উমাচরণ; উমাচরণের পুত্র ফকির, সন্ন্যাসী ও ষষ্ঠি।

গ। ৭ নং কৃষ্ণদেবের পুত্র যে দুর্গাপ্রসাদ ও রামরুদ্র, তন্মধ্যে দুর্গাপ্রসাদের বংশ বিস্তার বলা হইয়াছে। এক্ষণে রামরুদ্রের বংশ বিস্তার এইরূপ। যথা :—রামরুদ্রের পুত্র রামকুমার; রামকুমারের পুত্র মাধব ও রাজীব লোচন; মাধবের পুত্র পাঁচকড়ি ও রামগোপাল বা নসীরাম; পাঁচকড়ির পুত্র উপেন্দ্র, ধরেন্দ্র বা কালীপ্রসন্ন, সুরেন্দ্র ও জ্ঞানেন্দ্র; এবং উপেন্দ্রের পুত্র সুরেন্দ্র ও জিতেন্দ্র।

(গ) চিহ্নিত প্যারায় রামকুমারের পুত্র যে মাধব ও রাজীব লোচন বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে রাজীব লোচনের পুত্র রাম, গণেশ, হরিশ ও মন্মথ। রামের পুত্র বঙ্কিম এবং গণেশের পুত্র সুপ্রভাত ও সুধীর।

(গ) চিহ্নিত প্যারায় মাধবের পুত্র যে পাঁচকড়ি ও রামগোপাল বা নসীরাম—তন্মধ্যে রামগোপাল বা নসীরামের পুত্র নব কৃষ্ণ অতুল অনুকূল

অতীন্দ্র ও ফণীন্দ্র। কুশের পুত্র জগৎচন্দ্র. অতুলের পুত্র অখিল এবং অনুকূলের পুত্র সুপ্রতুল।

(ক) চিহ্নিত প্যারায় ৬-নং গঙ্গাধরের পুত্র যে কৃষ্ণদেব ও রামনারায়ণ বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে রামনারায়ণের পুত্র ষষ্ঠীবর, রামনিধি ও কানাই। ষষ্ঠীবর নিঃসন্তান; রামনিধির পুত্র রামচন্দ্র ও কৃপারাম; এবং কানাইয়ের পুত্র কালাচাঁদ। রামচন্দ্রের পুত্র কালী, মঙ্গল, গোপাল, যদু ও গোবিন্দ। ইহারা সকলেই নিঃসন্তান। কৃপারামের পুত্র হীরালাল ও মহেশ। ইহারা দুজনেই নিঃসন্তান। এবং কালাচাঁদের পুত্র শ্যামাচরণ—ইনিও নিঃসন্তান।

(ক) চিহ্নিত প্যারায় ৫ নং রামের পুত্র যে গঙ্গাধর, বিশ্বেশ্বর, রমাকান্ত ও মুকুন্দের কথা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে বিশ্বেশ্বরের পুত্র গোপাল ও গোপালের পুত্র রামানন্দ। রমাকান্তের পুত্র বিষ্ণুরাম ও অনন্তরাম। বিষ্ণুরামের পুত্র কালীশঙ্কর; কালীশঙ্করের পুত্র রামসুন্দর, রামসুন্দরের পুত্র চণ্ডীচরণ এবং চণ্ডীচরণের পুত্র রসরাজ ও দ্বিজরাজ।

উপরিস্থিত প্যারায় রমাকান্তের পুত্র যে বিষ্ণুরাম ও অনন্তরাম বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে অনন্তরামের পুত্র ভবানীপ্রসাদ ও দেবীপ্রসাদ। ভবানীপ্রসাদের পুত্র গদাধর, গদাধরের পুত্র গোবিন্দ; গোবিন্দের পুত্র রামানন্দ ও হরি। এই দেবীপ্রসাদের পুত্র রাধানাথ, রাধানাথের পুত্র মধু; মধুর পুত্র রজনী ও ফনী।

(ক) চিহ্নিত প্যারায় ৫নং রামের পুত্র যে গদাধর, বিশ্বেশ্বর, রমাকান্ত ও মুকুন্দ বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে মুকুন্দের পুত্র নীলকণ্ঠ ও শ্রীকান্ত। নীলকণ্ঠের পুত্র গোপাল; গোপালের পুত্র কানাই; কানাইয়ের পুত্র রামনারায়ণ, রামনারায়ণের পুত্র বেণী, হারাণ, চন্দ্র ও নিমাই এবং চন্দ্রের পুত্র জ্ঞানেন্দ্র। মুকুন্দের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীকান্ত; শ্রীকান্তের পুত্র নবকুমার, নন্দ, কালী ও রামতারণ।

(ক)—চিহ্নিত প্যারায় ৪নং রূপনারায়ণের পুত্র যে রাম, লক্ষণ, যাদবেন্দ্র, বাসুদেব ও মহাদেব বলা হইয়াছে; তন্মধ্যে রামের বংশবিস্তার পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, লক্ষণ নিঃসন্তান ছিলেন; এক্ষণে যাদবেন্দ্রের বংশবিস্তার বর্ণিত হইতেছে। যথা:—

যাদবেন্দ্রের পুত্র রত্নেশ্বর, ...

পুত্র রামচরণ। রামচরণের পুত্র রামকান্ত। কাশীশ্বরের পুত্র কৃষ্ণরাম রামজীবন ও রামগোপাল। কৃষ্ণরামের পুত্র রামকিঙ্কর, রামজীবনের পুত্র রামকানাই এবং রামগোপালের পুত্র শ্রীরাম। রামকিঙ্করের পুত্র রামধন ও কালীকুমার; রামকানাইয়ের পুত্র রামগতি এবং শ্রীরামের পুত্র কালাচাঁদ। রামধনের পুত্র অর্দ্ধচন্দ্র ও কালীকুমারের পুত্র প্রসন্নচন্দ্র; রামগতির পুত্র গোবিন্দ ও রামতারণ এবং কালাচাঁদের পুত্র পূর্ণ ও হরিশ। অর্দ্ধচন্দ্রের পুত্র ক্ষেত্রচন্দ্র, ফণিরাম ও গদাধর। গোবিন্দের পুত্র পতিরাম; রামতারণের পুত্র রাসবিহারী ও কুঞ্জবিহারী।

যাদবেন্দ্রের তৃতীয় পুত্র শিবরাম বলা হইয়াছে, উহার রামকিশোর বলিয়া একটী মাত্র পুত্র ছিল। এবং রামকিশোর ও নিঃসন্তান।

যাদবেন্দ্রের চতুর্থ পুত্র কন্দর্প। এক্ষণে কন্দর্পের বংশাবলী বলা যাইতেছে। যথা—

কন্দর্পের পুত্র কালীচরণ ও রামরাম। কালীচরণের পুত্র রামকান্ত এবং রামরামের পুত্র কানাই। রামকান্তের পুত্র নবকুমার। এই নবকুমার এই বংশের শেষ সন্তান। কানাইয়ের পুত্র গৌর ও ভবানী। গৌরের পুত্র দীনবন্ধু এবং দীনবন্ধুর পুত্র বিশ্ববন্ধু। ভবানীর পুত্র কৈলাশ, মতিলাল ও হীরালাল। কৈলাশের পুত্র উপেন্দ্র এবং যোগীন্দ্র।

(ক) চিহ্নিত প্যারায় ৪নং রূপনারায়ণের পুত্র যে রাম, লক্ষণ, যাদবেন্দ্র বাসুদেব ও মহাদেব বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে রাম, লক্ষণ ও যাদবেন্দ্রের বংশবিস্তার দেখান হইয়াছে, এক্ষণে বাসুদেবের বংশবিস্তার বর্ণিত হইতেছে। যথা।—

বাসুদেবের পুত্র নন্দরাম ও রাজারাম। নন্দরামের পুত্র রামপ্রসাদ এবং রাজারামের পুত্র রামানন্দ, রামকিশোর ও ব্রজকিশোর। রামপ্রসাদের পুত্র রামকানাই ও রামদুলাল। রামকানাইয়ের পুত্র কালাচাঁদ ও রাম। তন্মধ্যে রাম নিঃসন্তান হইয়া মরেন। কালাচাঁদের পুত্র ষষ্ঠী ও রামচন্দ্র (দত্তক)। রামদুলালের পুত্র কালীদাস ও মধুসূদন। কালীদাসের পুত্র চারুচন্দ্র ও ঘনশ্যাম এবং মধুসূদনের পুত্র ধর্ম্মদাস (দত্তক)। চারুচন্দ্রের পুত্র অভিলাষ ও সুরেন্দ্র এবং ঘনশ্যামের পুত্র বীরেন্দ্র ও উপেন্দ্র।

রাজারামের যে রামানন্দ, রামকিশোর ও ব্রজকিশোর বলিয়া তিন পুত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে রামানন্দের পুত্র বিশ্বনাথ, বিশ্বনাথের পুত্র গোবিন্দ, গোবিন্দের পুত্র বিজয় ও গোপাল। বিজয়ের পুত্র সুশীল, সুধীর, সুধাংশু, সুরেশ ও সুকুমার এবং গোপালের পুত্র সত্যসাধন।

রামকিশোরের পুত্র গৌরমোহন ও রামমোহন। তন্মধ্যে রামমোহন নিঃসন্তান। গৌরমোহনের পুত্র জগন্মোহন ও শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ নিঃসন্তান। জগন্মোহনের পুত্র দ্বারকানাথ, অমৃতলাল, ও যদুনাথ। তন্মধ্যে দ্বারকানাথ নিঃসন্তান। অমৃতলালের পুত্র সারদাচরণ এবং যদুনাথের পুত্র অন্নদাচরণ। রাজারামের যে তৃতীয় পুত্র ব্রজকিশোর, উহার পুত্রের নাম শম্ভুচন্দ্র। শম্ভুচন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন। সুতরাং ব্রজকিশোরের বংশ বিস্তার নাই।

(ক) চিহ্নিত প্যারায় ৪ নং রূপনারায়ণের পুত্র যে রাম, লক্ষণ, যাদবেন্দ্র বাসুদেব ও মহাদেব বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে রাম, লক্ষণ, যাদবেন্দ্র, ও বাসুদেবের বংশ বিস্তার বলা হইয়াছে, এক্ষণে মহাদেবের বংশবিস্তার বর্ণিত হইতেছে। যথা :—

মহাদেবের পুত্র চন্দ্রশেখর বা রামভদ্র। রামভদ্রের পুত্র রাম রাম ও রামশঙ্কর। রাম রামের পুত্র রামহরি, কালীশঙ্কর, রামশঙ্কর ও রামপ্রাণ। রামহরির পুত্র রামগতি। রামগতির পুত্র শ্যামাচরণ, সৃষ্টিধর ও বীরেশ্বর। শ্যামাচরণের পুত্র প্রেমচাঁদ ও প্রতাপ। তন্মধ্যে প্রতাপ নিঃসন্তান। প্রেমচাঁদের পুত্র ননী ও ক্ষীরোদ। সৃষ্টিধর নিঃসন্তান। বীরেশ্বরের পুত্র নির্ম্মল, সুধীর ও সুশীল।

রামরামের পুত্র যে রামহরি, কালীশঙ্কর ও রামপ্রাণের কথা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে রামহরির বংশ বিস্তার লেখা গেল। পর এক্ষণে কালীশঙ্করের বংশ বিস্তার বলা যাইতেছে। যথা :—

কালীশঙ্করের পুত্র বিশ্বম্ভর ও রাজচন্দ্র; বিশ্বম্ভরের পুত্র ক্ষেত্রমোহন ও জয়গোপাল; রাজচন্দ্রের পুত্র কৃষ্ণমোহন, নীলমাধব, কেদারনাথ, দ্বারকানাথ, নবীন ও পূর্ণ। রাজচন্দ্রের সকল পুত্রই নিঃসন্তান, কেবল পূর্ণের পুত্র হরিধন ও রামময়। ক্ষেত্রমোহনের পুত্র সহায়নারায়ণ, বিহারী ও আদিত্য এবং

জয়গোপালের পুত্র কাশীনাথ ও তারকনাথ। সহায়নারায়ণ নিঃসন্তান; বিহারীর পুত্র দেবেন্দ্র এবং আদিত্যের পুত্র কানাই।

রামভদ্রের পুত্র যে রামরাম ও রামশঙ্কর বলা হইয়াছে, এবং রামরামের পুত্র যে রামহরি, কালীশঙ্কর ও রামপ্রাণ বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে রাম হরি ও কালীশঙ্করের বংশ বিস্তার লেখা হইয়াছে। এক্ষণে রামপ্রাণের বংশবিস্তার লেখা যাইতেছে। যথা—

রামপ্রাণের পাঁচ পুত্র—রামরতন, কেদার, রামধন, রাধামোহন ও উমাকান্ত। তন্মধ্যে রামরতনের আনন্দ, ভবানন্দ ও দীনবন্ধু প্রভৃতি পনরটী পুত্র জন্মে। ইহাঁরা সকলেই নিঃসন্তান; কেবল দীনবন্ধুর দুই পুত্র জন্মে—হারান ও শিবনাথ। শিবনাথ নিঃসন্তান। হারানের দুই পুত্র—পঞ্চানন ও হরি। রামরতনের শাখা বিস্তার এইরূপ।

কেদারের পুত্র যাদব ও ধরণী। যাদবের পুত্র বেণী। বেণী নিঃসন্তান। ধরণীর পুত্র মুরলীধর। মুরলীধরের পুত্র জ্যোতির্ম্ময় ও প্রভাময়। রামপ্রাণের দ্বিতীয় পুত্র কেদারের বংশ বিস্তার এইরূপ।

রামপ্রাণের তৃতীয় পুত্র রামধন। রামধনের পুত্র গণেশ ও শ্রীশ। গণেশ নিঃসন্তান। শ্রীশের পুত্র বঙ্কুবিহারী। বঙ্কুবিহারীর পুত্র সুরেশ (পালক) নরেশ ও যোগেশ। সুরেশের পুত্র শিবদাস। রামপ্রাণের চতুর্থ পুত্র রাধামোহন। রাধামোহনের পুত্র মহেন্দ্র (দত্তক); মহেন্দ্রের পুত্র নগেন্দ্র; এবং নগেন্দ্রের পুত্র দেবীদাস ও ষষ্ঠিদাস।

রামভদ্রের পুত্র যে রামরাম ও রামশঙ্কর বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে রামরামের বংশবিস্তার লেখা হইয়াছে। এক্ষণে রামশঙ্করের বংশ বিস্তার লিখিত হইতেছে। যথা:—রামশঙ্করের পুত্র গোবর্দ্ধন; গোবর্দ্ধনের পুত্র রাজকৃষ্ণ; এবং রাজকৃষ্ণের পুত্র তিনকড়ি। তিনকড়ি নিঃসন্তান। খাঁটুরাস্থ শাণ্ডিল্য গোত্রীয়গণের বংশাবলী এই কীর্ত্তিত হইল।

কায়স্থ।

কুশদ্বীপ সমাজে ইদানীন্তন কালে কায়স্থদিগের মধ্যে যেমন রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর সাহিত্যসেবী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন, এরূপ আর কেহই

নহে। একারণ আমরা কায়স্থবিষয়ক প্রবন্ধে অগ্রে রায় দীনবন্ধুর কথা আরম্ভ করিলাম। পরন্তু তিনি এরূপ দেশবিখ্যাত লোক ছিলেন যে তাঁহার জীবন চরিত স্বতন্ত্র প্রকাশিত হওয়াতে আমরা তাঁহার বিষয় এস্থানে বাহুল্য ভাবে লেখা নিষ্প্রয়োজনীয় মনে করি। বিশেষতঃ তিনি স্বকীয় জন্মভূমির সহিত যৌবনের প্রারম্ভে সংস্রব ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করেন বলিয়া কুশদ্বীপ সমাজ তাঁহার কাহিনীর প্রতি তত আস্থাবান্ নন্। তবে কুশদ্বীপের প্রকৃতিদেবী এরূপ একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তির জন্মদান করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা তাঁহার নামোল্লেখ মাত্রও গৌরবের বিষয় মনে করিলাম। পল্লীগ্রামের অবস্থা যে ক্রমশই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে, তৎপ্রতি নানা কারণ থাকিলেও ইহা একটী প্রধান কারণ বলিতে হইবেক, যে আজকাল পল্লীগ্রামের লোকের একটু শ্রীবৃদ্ধি হইলেই তাঁহারা জন্মভূমি ও প্রতিবেশীমণ্ডলকে চিরদিনের মত ত্যাগ করিয়া একেবারে রাজধানীতে আসিয়া নূতন প্রকারের সহানুভূতি রীতি নীতি ও বিলাসিতার চর্চ্চা করিয়া থাকেন। সুতরাং তাহাদের বাল্যবন্ধু বা আত্মীয় স্বজনের তাঁহাদের উন্নতিতে আর কোন প্রত্যাশাই থাকেনা।

পতিতপাবন সিংহ।—কায়স্থ পরিচয়ে ইনি একজন পরিচয় দিবার যোগ্য। ইনি কলিকাতা জান্‌বাজারের রাজচন্দ্র মাড় ও রাণী রাসমণির আমলে দেওয়ান্ ছিলেন। রাজচন্দ্রমাড়ের মৃত্যুর সময় লক্ষাধিক টাকার নোট পতিতপাবন সিংহ মহাশয়ের হস্তে ছিল। ঐ টাকা তিনি আত্মস্মাৎ করিলে কেহ তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিত না। কিন্তু পতিতপাবন সিংহ এতদূর ধার্ম্মিক ছিলেন, যে তিনি সমস্ত টাকা রাণী রাসমণির হস্তে সমর্পণ করেন। তাঁহার এইরূপ ধার্ম্মিকতা দেখিয়া রাণী রাসমণি মহোদয়া তাঁহার জীবদ্দশা পর্য্যন্ত তাঁহাকে পিতৃবৎ মান্য করিতেন। পতিতবান্ সিংহের ন্যায় চরিত্রবান্ পুরুষ একালে দেখা যায় না। লক্ষটাকার লোভ সম্বরণ করা দূরে থাকুক, যৎসামান্য অর্থের জন্য আজকাল উকীল ও মোক্তারাদি নবীন শিক্ষিত সম্প্রদায় কি না কুকার্য্য করিতেছেন? সেকালের লোক শিক্ষিত হউক বা না হউক, তাহাদের ধর্ম্মসংস্কার এতদূর জীবন্ত ও জাগ্রত ছিল, যে বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে শিক্ষিত লোকের ধর্ম্মসংস্কার তাহার নিকট লজ্জা পাইয়া থাকে। যাহা হউক,

পতিতপাবন সিংহ যে কেবল লক্ষটাকার লোভ সম্বরণ করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে তাহার সুযশ করে, তাহা নহে। তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিবার আরও একটী প্রধান কারণ এই যে, তাঁহার তুল্য অন্নদান সে কালে অনেকের ছিল না। প্রতিদিন তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসা বাটীতে বিস্তর লোক অন্নাচ্ছাদনে প্রতিপালিত হইত। তিনি রাণী রাসমণির ষ্টেটের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াও মৃত্যু-কালে যে এক কপর্দ্দকও স্ত্রীপুত্রাদির জন্য রাখিতে পারেন নাই, তাহার কারণ আর কিছু নয়। তাহার কারণ তাঁহার অতুলনীয় দান শক্তি। পাঠক! আজকাল ত অনেক লোকে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন; অনেক লোক ভ্রাতৃভাবের শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু এরূপ স্বার্থ ত্যাগের দৃষ্টান্ত কয়টী দেখাইতে পারেন?

গৈপুরের মিত্রদিগের ন্যায় সৎক্রিয়াবান্ লোক প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল যে দুর্গাপ্রসাদমিত্রের সৎক্রিয়ার কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে। তাঁহার পুত্র তারাপ্রসাদ এবং ভ্রাতুষ্পুত্র মধুসূদন, যাদবচন্দ্র ও রাধাপ্রসাদ মিত্র মহাশয়েরাও বিবিধ ক্রিয়াকর্ম্মে যেরূপ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, অনেক লক্ষপতিও সেরূপ অকাতর ব্যয় করিতে পারেন না। রামচন্দ্র মিত্র মহাশয় এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পোষ্টাপিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গের ডাকের সুব্যবস্থা করিয়া তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট সম্মানভাজন হইয়া ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নারায়ণচন্দ্র এক্ষণে আলিপুরে ওকালতী করিতেছেন।

গৈপুর নিবাসী ৺তারাপ্রসন্ন বসুর পুত্র বাবু প্রমথনাথ বসু গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিলাত গমন করেন। পরন্তু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি বিলাতের সিবিলসার্ভিস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। পরে B. S. E. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জিওলজিকেল সার্ভে বিভাগে প্রবিষ্ট হয়েন। এক্ষণে তিনি আসিষ্টাণ্ট সার্ভেয়ারের পদে কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালী উক্ত বিভাগে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই। প্রমথ বাবু প্রাচীন আর্য্যগণের রীতি নীতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে এক খানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ঐ পুস্তকখানিতে তাঁহার গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয়

তাম্বুলী।

কথিত আছে, খাঁটুরার বর্ত্তমান তাম্বুলিগণ খাঁটুরার আদিম নিবাসী নহেন। উহাঁরা পূর্ব্বে ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে সপ্তগ্রামে বাস করিতেন। বর্ত্তমান হুগলী সহরের অতি নিকটেই সপ্তগ্রাম অবস্থিত। তদানীন্তন কালে সপ্তগ্রামের তুল্য বন্দরস্থান বাঙ্গালা দেশে আর দ্বিতীয় ছিল না। বহুকালাবধি ঐ বন্দর সাতিশয় সমৃদ্ধিশালী থাকিয়া খ্রীষ্টীয় ষোড়শশতাব্দীতে ধ্বংসাবস্থায় পতিত হয়। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষোড়শশতাব্দীর মধ্য-ভাগে যখন জাফের খাঁ বঙ্গদেশের নবাবপদে অধিরূঢ় থাকেন, তৎকালে অত্যা-চারপীড়িত হইয়া বিস্তর লোক এখান হইতে নানা দিক্‌দেশে গিয়া বসবাস করেন। সেই সময়ে সপ্তগ্রামবাসী ৪২ বেয়াল্লিশ গ্রামী তাম্বুলিগণ কুশদহের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। উহা-দিগের মধ্যে কেহ কেহ বনগ্রামে, কেহ কেহ শান্তিপুরে, কেহ কেহ বড়া কড়েলা প্রভৃতি স্থানে, কেহ কেহ বাঁকড়ায়, কেহ কেহ মল্লিকপুরে, এবং কেহ কেহ বেড়েলা বৈঁচি প্রভৃতি গ্রামে আসিয়া বাস করেন।

খাঁটুরা গ্রামে আজকাল একত্রে যে অধিকাংশ তাম্বুলির বসবাস দেখা যায়, তাহা ইছাপুর গ্রামের জমীদার রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী চৌধুরী মহাশয়ের প্রসাদাৎ। তিনি আনুমানিক ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তাম্বুলিগণকে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে আনাইয়া খাঁটুরাগ্রামে বসতি প্রদান করেন। তাম্বুলিগণ খাঁটুরাগ্রামে বসবাস আরম্ভ করিলে পর, তাঁহারা তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন গণকেও দূরবর্ত্তী গ্রামসকল হইতে ঐ গ্রামে আসিতে আহ্বান করেন। তদনু-সারে আনুমানিক ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় ১০৭০ সালে মহেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বেড়েলা বৈঁচি হইতে এখানে আনীত হন। বড়বাড়ীর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণের আদিপুরুষ রূপনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও সেই সময়ে বেড়েলা বৈঁচি হইতে এই গ্রামে উঠিয়া আইসেন।

কেবল যে সপ্তগ্রামের ধ্বংসাবস্থায় এইরূপে কুশদ্বীপসমাজ তাম্বুলি উপা-দানে গঠিত হয়, তাহা নহে। পরন্তু বর্গীর হাঙ্গামা কালেও বিস্তর তাম্বুলি আসিয়া এখানে বাস করেন। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নবাব আলিবর্দ্দিখাঁর রাজত্ব। যদিও বর্গীর হাঙ্গামা পূর্ব্ব পূর্ব্ব নবাবগণের সময় হইতেই মহামারীরূপে বঙ্গদেশকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল, তথাপি এই

দশবৎসরকাল বঙ্গদেশের পক্ষে যে কি কালরাত্রি স্বরূপ ছিল, তাহা বলা যায় না। এই সময়ে যে কত পরিবার গৃহচ্যুত, প্রাণে নষ্ট, অনাহারপীড়িত ও দিক্ বিদেশে পলায়িত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। শুদ্ধ তাম্বুলিগণের কেন, বঙ্গে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি সমুদয় বর্ণের বর্ত্তমান বসবাসের মূল কারণ অন্বেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে বর্গীর হাঙ্গামা তাহার কারণ। যখন দুর্জ্জয় মহারাষ্ট্রবাহিনী ভীষণ মুখব্যাদান করিতে করিতে যবনকর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব বাঙ্গালীর ভগ্নাবশিষ্ট ধনপ্রাণ গ্রাস করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ বঙ্গদেশ আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করিয়া নেপোলিয়ান্‌নিপীড়িত ইউরোপবাসীর ন্যায় সন্ত্রস্ত ও শশব্যস্ত করিয়া তুলে, তখন যে যেদিকে পাইয়াছিল সে সেই দিকেই পলাইয়াছিল। আজিকালি পেলেগভয়ে ভীত হইয়া কলিকাতাবাসীগণ যেমন পুত্র কন্যা ভ্রাতা ভগিনী লইয়া দেশদেশান্তরে প্রস্থানপর হইয়াছে, এবং কলিকাতার বহির্ভাগে আসিয়া অপেক্ষাকৃত ভীতিশূন্য গন্তব্যস্থান অন্বেষণ করিয়া লইতেছে, বর্গীবিধ্বস্ত অথবা বর্গীভয়াকুল বাঙ্গালীও তখন উর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থান সকল অন্বেষণ করিয়া লইয়াছিল। কুশদহ পরগণার মধ্যে খাঁটুরা, গোবরডাঙ্গা, গৈপুর, ইছাপুর, প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রাম তৎকালে প্রকৃতিদেবী সহজেই দুরাক্রম্য করিয়াছিলেন। এই কয়েকখানি গ্রামের দক্ষিণ-দিকে বেগবতী স্রোতস্বতী ইছামতীর সঙ্গে যমুনানদী প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে এবং প্রসন্নসলিলা খরস্রোতা চালুন্দিয়া নাম্নী অপর এক হ্রাদিনী বিপক্ষের বল উপেক্ষা করিয়া ও শতশত পণ্যপোত বক্ষে লইয়া ইহার অপর তিন-দিক্ সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছে। কালের কুটিলগতিতে যদিও শেষোক্ত হ্রাদিনী নিয়তির অন্তঃস্তল স্পর্শ করিয়াছে, তথাপি আজিও ইহার কোন কোন অংশ নানাবিধ বিলখালে পরিণত হইয়া দুর্ভাগ্যের কঠোর পরিণাম প্রদর্শন করিতেছে। ইহারই কিয়দংশ আজও "কঙ্কণা" বা "বামোড়" নাম পরিগ্রহ করিয়া খাঁটুরা ও হয়দাদ্‌পুরের পূর্ব্বপ্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। বর্গির-হাঙ্গামাকালে চতুর্দ্দিক জলবেষ্টিত ও বংশবন সমাকীর্ণ অপেক্ষাকৃত ঈদৃশ দুরাক্রম্য স্থান সকলই সাধারণ ভদ্রমহাশয়গণের বাসোপযোগী বলিয়া নির্ণীত হইত। তদনুসারে তাম্বুলিগণ খাঁটুরা ও গোবরডাঙ্গা গ্রামই সর্ব্বাধিক বাসোপযোগী বলিয়া মনোনীত করেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ইছাপুরের চৌধুরী মহাশয়েরা তাম্বুলিগণকে পূর্ব্বোক্ত মল্লিকপুর, বনগ্রাম, বড়া, কড়েলা প্রভৃতি স্থান হইতে আনাইয়া চতুর্দ্দিক জলবেষ্টিত ও বর্গীগণের হঠাৎ অনাক্রমণীয় গ্রামে বাস প্রদান করেন। সাধারণের অবগতির জন্য আমরা উক্ত কয়েক বংশীয় তাম্বুলির নাম নিম্নে নির্দ্দেশ করিলাম। এই তাম্বুলিগণ যে যে স্থানে আসিয়া বাস করিয় ছিলেন, সেই সেই স্থানে তাঁহাদের বংশ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাঁহাদের নামানুসারে খাঁটুরা গ্রাম এক এক বিভিন্ন পল্লীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্যই খাঁটুরার প্রত্যেক পল্লীতে এক এক বংশীয় ভিন্ন অপর বংশীয় তাম্বুলী দৃষ্টিগোচর হয় না। খাঁটুরা প্রধানতঃ আশপাড়া, পালপাড়া, দাঁপাড়া, সেনপাড়া, বাজারপাড়া, রক্ষিতপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, তিওরপাড়া, কলুপাড়া, নিকারিপাড়া, কাওরাপাড়া, বা হাড়িপাড়া, ও কুমারপাড়া, এই কএক ভাগে বিভক্ত।

খাঁটুরাতে নিম্নলিখিত কয়েক ঘর তাম্বুলী প্রথমে বাস করেন। যথা :— দত্ত (১); সেন (২), আশ (৩); রক্ষিত (৪); চেল (৫); পাল (৬); দে (৭); কোঁচ (৮); কুণ্ড (৯) এবং কর (১০)।

* খাঁটুরা গ্রামের যৎকালে সমৃদ্ধ অবস্থা ছিল, তখন গোবরডাঙ্গা নিতান্ত হীনাবস্থ ছিল। খাঁটুরাতে তৎকালে একটী প্রসিদ্ধ বাজার ও একটী নিমক্ মহল ছিল। ঐ বাজারটী "এক্ষণে পুরাতন বাজার" বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ বাজারের দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করিয়াই, তদানীন্তন আর আর সন্নিহিত গ্রামবাসীগণের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হইত। গোবরডাঙ্গায় যেমন বর্ত্তমান বাজার আছে, খাঁটুরাতে ঐরূপ বাজার ছিল। অনুমান ১২৪৭ বঙ্গাব্দে কমল কর্ম্মকারের দোকনে প্রথমতঃ অগ্নি লাগিয়া পুড়িয়া যায়। পরে গোবরডাঙ্গার জমীদার কালীপ্রসন্ন বাবু গোবরডাঙ্গায় বাজার প্রবল করাতে ক্রমে ক্রমে এই বাজার ভগ্নাবস্থায় পতিত হইয়া এক্ষণে একেবারে লোকদৃশ্যের অগোচর হইয়াছে। এক্ষণে খাঁটুরা আমতলার হাটে বাজার হয়। সন ১২০৩ সালে ৺ শ্যামাচরণ সেনের দ্বিতীয় পত্নী বিনোদিনী দাসী ঐ স্থানে চাঁদনী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

কমল কর্ম্মকারের অগ্নিদাহের পর হইতে তাম্বুলিগণ দুই এক জন করিয়া

ক্রমে ক্রমে স্বদেশের মমতা ত্যাগ করিয়া বিদেশে উঠিয়া যাইতে আরম্ভ করেন। সর্ব্ব প্রথমে রাজকুমার আশ মহাশয় বরাহ নগর উঠিয়া আসেন। তৎপরে তাঁহার দেখাদেখি শরচ্চন্দ্র সেন, হারাণচন্দ্র পাল, দর্পনারায়ণ প্রভৃতি ও বরাহনগরে বাস করিতে আরম্ভ করেন।

তৎকালে এদেশে, তাম্বুলি ও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যেরূপ সৌহার্দ্দ্য দেখা যাইত. এরূপ আর কুত্রাপি ও ছিল না। তখন তাম্বুলিগণই খাঁটুরার ব্রাহ্মণ-গণের শ্রীবৃদ্ধির কারণ ছিলেন, এবং ব্রাহ্মণগণও তাম্বুলিগণের শ্রীবৃদ্ধির সহায়তা করিতেন। উভয় পরিবার পরস্পরের এতদূর হিতার্থী ও সুহৃদ্ ছিলেন, যে শুদ্ধ মাত্র পাকপৌষার প্রভেদ ভিন্ন ইহাদিগকে অন্য কোন রূপে প্রভেদ বলিয়া বোধ হইত না। উভয়ে উভয়কে এতদূর প্রীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, যে একটী সামান্য তাম্বুলি তনয়ের জন্য গ্রামস্থ ব্রাহ্মণমণ্ডলী প্রাণবিসর্জ্জন করিতেও সর্ব্বস্বান্ত হইতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

কিন্তু হায়! এক্ষণে আর সে দিন নাই। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যে ব্রাহ্মণ ও তাম্বুলীগণ এক স্থানে আহার, একাসনে শয়ন, এক স্থানে উপবেশন, এক লক্ষে লক্ষবান্. একার্থে অর্থবান্ এবং একের জন্যে অন্যে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেন, আজি কালি সহানুভূতির অভাবে কেহ কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত ও করেন না। বর্ত্তমান তাম্বুলিগণের পূর্ব্বপিতামহগণ ব্রাহ্মণ মণ্ডলীকে আহারে, বিহারে, শয়নে, উপবেশনে, দানে, দীক্ষায়, এমন কি, সামান্য ষষ্ঠী পূজা হইতে বৃহৎ বৃহৎ ক্রিয়া কাণ্ডে হোতা তন্ত্রধার ও সর্ব্বময় কর্ত্তা করিতেন। সেই জন্যই এখানকার ব্রাহ্মণমণ্ডলী গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা হইতে বিমুক্ত হইয়া অনায়াসে শাস্ত্রানুশীলন করিতেন। তাম্বুলিগণ বাণিজ্যের অনুসরণ করিয়া যেমন একদিকে লক্ষ্মীদেবীর বরপুত্ররূপে সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছিলেন, তেমনি অন্য দিকে এখানকার ব্রাহ্মণ মণ্ডলীও নির্ব্বিঘ্নে শাস্ত্রানুশীলন করিয়া সরস্বতীর বরপুত্ররূপে পরিণত হইতে পারিয়া ছিলেন। সুতরাং এই, উভয়জাতির সম্মিলিত চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যবসায়ে খাঁটুরা গোবরডাঙ্গাও এক সময়ে কুশদহের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল।

এক্ষণে খাঁটুরা গ্রাম তাম্বুলিগণের বাণিজ্য প্রভাবে যেমন মহাধনশালী হইয়া উঠিয়াছে, পূর্ব্বে উহার অবস্থা অন্যরূপ ছিল। তাম্বুলিগণ আজন্ম

ব্যবসায়-প্রিয়; কিন্তু আজিকালিকার ন্যায় তৎকালে কাহারও কোন নির্দ্ধারিত ব্যবসায় বা আড়তাদি ছিল না। শিমুলপুর, মধুসূদনকাটি, বিষ্ণুপুর, বড়া, কড়েগা, মল্লিকপুর প্রভৃতি যে সকল স্থান হইতে উহারা ইছাপুরের চৌধুরী মহাশয়গণের যত্নে খাঁটুরায় আসিয়া বাস করেন, সেই সেই স্থানে তাঁহারা এক একটী গোলাবাড়ী ও খামার করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহারা সেই খানে গিয়া তেজারতি ও মহাজনী কার্য্য করিতেন।

মহেশচন্দ্র দত্ত হইতে ফকির চাঁদ দত্তের সময় পর্য্যন্ত খাঁটুরার তাম্বুলিগণ এইরূপে মহাজনী ও তেজারতি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তৎপরে ফকিরচাঁদের সময় হইতেই ইহারা কলিকাতায় দোকান ও আড়তাদি করিয়া প্রকৃত ব্যবসায়ী হইতে আরম্ভ করেন ও বিপুল ধনসম্পত্তি লাভ করিয়া লক্ষ্মীর বরপুত্ররূপে পরিগণিত হন। আমরা শুনিয়াছি, ফকিরচাঁদ দত্ত প্রথমে বলদে, করিয়া চাঁছুড়িয়া প্রভৃতি স্থান হইতে ধান্যাদি ক্রয় করিয়া আনিয়া খাঁটুরার বাজারে বিক্রয় করিতেন। খাঁটুরার দত্তপরিবারেরা আজিও বিজয়াদশমী যাত্রার দিনে, ফকিরচাঁদ ও তদীয় পূর্ব্বপুরুষগণের সময় হইতে রক্ষিত কতকগুলি ছালা মাঙ্গল্য দ্রব্যরূপে প্রথমতঃ দর্শন ও প্রণাম করিয়া, পুরোহিত ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনগণের বাটীতে প্রণামাদি করিতে যাত্রা করিয়া থাকেন।

খাঁটুরাস্থ দত্ত বংশাবলী।

আদিপুরুষ মহেশচন্দ্র দত্ত হইতে বর্ত্তমান কালপর্য্যন্ত।

মহেশচন্দ্র দত্তের পুত্র গোবর্দ্ধন; গোবর্দ্ধনের পুত্র রামরাম; রামরামের পুত্র দীননাথ, শঙ্কর, রঘুনাথ ও বিজয়রাম। তন্মধ্যে দীননাথ ও শঙ্কর নিঃসন্তান। রঘুনাথের পুত্র ফকিরচাঁদ দত্ত। বাঙ্গালা ১১৭৫ সাল ইং ১৭৬৩ সালে ফকিরচাঁদের জন্ম হয় ও বাঙ্গালা ১২৪১ সালের ইং ১৮৩৫ সালের ১৫ই শ্রাবণ মঙ্গলবার ফকিরচাঁদের মৃত্যু হয়।

ফকিরচাঁদের পুত্র কালীকুমার, আনন্দমোহন ও বৈদ্যনাথ। কালীকুমারের পুত্র গিরিশচন্দ্র, প্রসন্নকুমার, মঙ্গলচন্দ্র, হারাণচন্দ্র, হরিশচন্দ্র ও

বিজয়চন্দ্র। গিরিশচন্দ্রের পুত্র মহেন্দ্রনাথ, শ্রীমন্তকুমার ও প্রমথনাথ। মহেন্দ্রনাথ নিঃসন্তান। শ্রীমন্তকুমারের পুত্র নরেন্দ্রকুমার ও ব্রজেন্দ্রকুমার এবং নরেন্দ্রকুমারের পুত্র নৃপেন্দ্রকুমার।

কালীকুমার দত্তের দ্বিতীয় পুত্র প্রসন্নকুমার। প্রসন্নকুমারের পুত্র বসন্তকুমার ও হেমন্তকুমার। হেমন্তকুমার নিঃসন্তান। বসন্তকুমারের পুত্র প্রমথনাথ, এবং প্রমথনাথের পুত্র অক্ষয়কুমার।

কালীকুমার দত্তের তৃতীয় পুত্র মঙ্গলচন্দ্র নিঃসন্তান। উহার চতুর্থ পুত্র হারাণচন্দ্র। হারাণের পুত্র বিনোদবিহারী। বিনোদের পুত্র কালীদাস, হরকালী ও কালীশঙ্কর।

কালীকুমারের পঞ্চম পুত্র হরিশচন্দ্র। হরিশের পুত্র অতুলকৃষ্ণ ও হৃদয়কৃষ্ণ (নিঃসন্তান)। অতুলের পুত্র অপূর্ব্বকৃষ্ণ ও অনুপকৃষ্ণ।

কালীকুমারের ষষ্ঠ পুত্র বিজয়চন্দ্র। বিজয়ের পুত্র সতীশচন্দ্র। ফকিরচাঁদ দত্তের প্রথম পুত্র কালীকুমারের বংশবিস্তার লেখা হইয়াছে। এক্ষণে দ্বিতীয় পুত্র আনন্দমোহনের বংশবিস্তার। যথা :—

আনন্দমোহনের পুত্র উমেশ, গোবিন্দ প্রতাপ ও পূর্ণ। তন্মধ্যে সকলেই নিঃসন্তান; কেবল পূর্ণের পুত্রের নাম শশীভূষণ।

ফকিরচাঁদ দত্তের তৃতীয় পুত্র বৈদ্যনাথ। বৈদ্যনাথের পুত্র ক্ষেত্রমোহন ও যোগেন্দ্র। ক্ষেত্রমোহনের পুত্র চারুচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র এবং যোগেন্দ্রের পুত্র বীরেন্দ্র।

ফকিরচাঁদ দত্তের বংশাবলী লেখা গেল। এক্ষণে রামরাম দত্তের চতুর্থ পুত্র বিজয়রামের বংশবিস্তার লেখা যাইতেছে :—

বিজয়রামের পুত্র কৃপারাম, গৌরিকান্ত এবং সহস্ররাম বা শিবরাম। কৃপারামের পুত্র শ্রীরাম ও বিশ্বরাম। শ্রীরাম নিঃসন্তান। বিশ্বরামের পুত্র তনুরাম।

গৌরিকান্তের পুত্র অনন্তরাম ও কাশীনাথ। অনন্তের পুত্র দুর্গাচরণ, দুর্গাগতি ও গুরুদাস। দুর্গাচরণ (নিঃসন্তান)। দুর্গাগতির পুত্র শ্রীনিবাস ও শ্রীহরি। শ্রীনিবাসের পুত্র সারদা। শ্রীহরি (নিঃসন্তান)। গুরুদাসের পুত্র শ্রীনাথ। শ্রীনাথ (নিঃসন্তান)।

গৌরিকান্তের দ্বিতীয় পুত্র কাশীনাথ। কাশীনাথের পুত্র ঠাকুরদাস, পুরুষোত্তম ও অতিথিদাস। ঠাকুরদাসের পুত্র চিন্তামণি। চিন্তামণি নিঃসন্তান। পুরুষোত্তমের পুত্র ষষ্ঠীবর। ষষ্ঠীবরের পুত্র নগেন্দ্রনাথ। অতিথিদাসের পুত্র কেদারনাথ। কেদারের পুত্র রামানন্দ ও লক্ষ্মীশচন্দ্র।

বিজয়রামের তৃতীয় পুত্র শিবরাম। শিবরামের পুত্র বংশীবদন। বংশী-বদনের পুত্র গোলোকচন্দ্র। গোলোকচন্দ্রের পুত্র শ্রীমন্তচন্দ্র। শ্রীমন্তের পুত্র আশুতোষ ও দ্বিজরাজ। আশুতোষ (নিঃসন্তান)। দ্বিজরাজের পুত্র ক্ষীরোদ, ননী ও মাখন।

খাঁটুরাস্থ দত্ত বংশাবলীর বিষয় এই বর্ণিত হইল।

ইছাপুরের জমীদার মহাশয়েরা যেমন নানা গ্রাম হইতে তাম্বুলিগণকে আনাইয়া খাঁটুরা গ্রামে বসবাস করান, তাম্বুলিগণের সমৃদ্ধ অবস্থায় উহাঁরা সেই ঋণের প্রতিদান করিতে বিস্মৃত হন নাই। ঘটনা এই, যখন ইছাপুরের জমীদার তিলকচাঁদ চৌধুরী মহাশয়ের জমীদারী সরকারি করের দায়ে বিক্রয় হইয়া যাইবার উপক্রম হয়, তখন এপ্রদেশবাসী তাম্বুলিগণ একতা অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে উপযুক্ত টাকা কর্জ্জ দিয়া তাঁহার জমীদারী রক্ষা করিয়া দিয়া ছিলেন। অনন্তর তিলকচাঁদের উত্তরাধিকারী শ্যামচাঁদ চৌধুরী মহাশয় যখন ঐ দেনা মায় সুদ ও আসল পরিশোধ করিতে আইসেন, তখন তাম্বুলিগণ অতি বিনীতভাবে তাঁহার নিকট বৃদ্ধির টাকা গ্রহণ না করিয়া বরং রাজসম্মান সূচক সকলে আসল হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রণামি স্বরূপ দিয়া তাঁহাকে ঋণজাল হইতে বিমুক্ত করিয়া দিলেন। ইহাতে জমীদার মহাশয় যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

তাম্বুলিগণের পারিবারিক বৃত্তান্ত।

প্রথম দত্ত বংশ।

এই বংশ অতি প্রাচীনকাল হইতেই খাঁটুরা গ্রামে অবস্থিত। প্রাচীনত্বে ইহা যে প্রকার শ্রেষ্ঠাসন লাভ করিয়াছে, খ্যাতি ও প্রতিপত্তিতে ও ইহা কোন অংশে ন্যূন নহে। এই বংশের পূর্ব্ব পুরুষ মহেশচন্দ্র দত্ত বর্গীর উৎপীড়নে ভীত হইয়া পূর্ব্ব বাসস্থান পরিত্যাগ করতঃ এই গ্রামে আসিয়া বসবাস করেন। এই গ্রাম কলিকাতা হইতে অষ্টাদশ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত ও খাঁটুরা নামে অভিহিত। মহেশচন্দ্র দত্তের বৃদ্ধ প্রপৌত্র ফকিরচাঁদ দত্ত ১১৭০ সালে খাঁটুরা গ্রামে জন্ম পরিগ্রহ করেন। ইঁহার পিতার নাম রঘুনাথ দত্ত। ফকির-চাঁদ দত্ত নিজ জন্মভূমির পার্শ্ববর্ত্তী ১০।১২ খানি গ্রামে ধান্য ও তৎসহ তেজা-রতি, মহাজনী এবং নগদ টাকার কার্য্য করিয়া অত্যল্পকাল মধ্যেই বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হয়েন। ইঁহার তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ কালিকুমার দত্ত, মধ্যম আনন্দমোহন এবং কনিষ্ঠ বৈদ্যনাথ দত্ত।

১১৯৭ সালের বৈশাখী অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে কালিকুমারের জন্ম হয়। বয়ঃ-প্রাপ্ত হইয়া কালিকুমার পিতার তেজারতি ও মহাজনী কার্য্য অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত করিয়া এবং ব্যবসা কার্য্যের উন্নতি করিয়া বিপুল অর্থ সঞ্চয় করেন। তাঁহার পিতা বর্ত্তমানে তিনি কলিকাতা বটতলায় তুলা ও সুতার কার্য্য আরম্ভ করেন। এবং বড়বাজার চিনিপটীতে চিনির কার্য্য করেন। ক্রমে ক্রমে ঐ কার্য্যে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বৈদ্যনাথ ও মধ্যম ভ্রাতুষ্পুত্র উমেশচন্দ্রকে নিযুক্ত করেন। উপরোক্ত ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য ও লাভবান্ হইয়া তিনি কলিকাতায় কয়েকটী বাটী এবং জমিদারী ক্রয় করেন। ইঁনি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরোপকারী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ লোক ছিলেন। ইঁহার জীবনের প্রধান কর্ম্ম অতিথিসৎকার। ইঁহার জ্ঞাতিপিতৃব্য স্বর্গীয় অনন্তরাম দত্ত এক জন দেশ বিখ্যাত অতিথিপরায়ণ লোক ছিলেন। সুতরাং সেই বংশে জন্ম

পরিগ্রহ করিয়া যে কালীকুমার পিতৃব্যের পথানুসরণ করিবেন, তাহা কিছু বিচিত্র নহে।

স্বর্গীয় অনন্তরামের পিতার নাম গৌরীকান্ত দত্ত। কিম্বদন্তী আছে, অনন্তরামের নাম করিলে দিন ভাল যায়। ইনি অতিথি সৎকারে যেরূপ দৃঢ়ব্রত ধারণ ও পালন করিয়া গিয়াছেন, শুনিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। তিনি এতদূর অতিথিপরায়ণ ছিলেন, যে প্রত্যহ অতিথিসৎকার না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। এইরূপ জনশ্রুতি আছে, যে তিনি পীড়িত লোকের গাত্রে হস্তার্পণ করিলে তাহার পীড়ার উপশম হইত। তিনি কতদূর অতিথিপরায়ণ ছিলেন নিম্ন লিখিত বৃত্তান্তে তাহা সুন্দররূপে প্রতীয়মান হইবে। কোন সময়ে তাঁহার বাটীতে দুই দিবস অতিথি সমাগম না হওয়ায় তিনি সস্ত্রীক দুই দিবস নিরম্বু উপবাসী থাকেন। অতঃপর তৃতীয় দিবসের মধ্যাহ্নকালে জনৈক কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার, কৃষ্ণ উপবীতধারী ও কৃষ্ণ বস্ত্র পরিধায়ী ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং কহেন যে, "অদ্য দ্বাদশী, আমি তোমার বাটীতে পারণ করিব। কিন্তু আমার যাহা খাইতে ইচ্ছা তাহা পূরণ করিতে হইবে। নতুবা এই মধ্যাহ্নকালে অনাহারে তোমার বাটী হইতে চলিয়া যাইব। ইহাতে তোমার সমূহ অকল্যাণ সাধিত হইবে।" অনন্তরাম করযোড়ে তাঁহার প্রার্থিত খাদ্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় ঐ ব্রাহ্মণ কাঁচা আম্র ও ইলিশ মৎস্য ভোজনের অভিলাষ প্রকাশ করেন। ইহা শুনিয়া (তৎকালে আম্র ও ইলিশ মৎস্য অপ্রাপ্য জানিয়া) অনন্তরাম পাছে অতিথি বিমুখ হইয়া চলিয়া যায়, এই আশঙ্কায় জড়ীভূত হইয়া রোদন করিতে করিতে জগৎপাতা জগদীশ্বরকে ডাকিতে লাগিলেন। বিলম্ব দেখিয়া ঐ অতিথি ব্রাহ্মণ অনন্তরামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ওহে ভক্ত অনন্তরাম! তুমি এতদূর অতিথিপরায়ণ যে ঈশ্বর কোন বিষয়েই তোমার অভাব রাখেন নাই। তুমি রোদন করিতেছ কেন? যাও, তোমার পুষ্করিণীতে জাল নিক্ষেপ কর, অচিরে ইলিশ মৎস্য পাইবে এবং ঘাটের অদূরে যে আম্র-বৃক্ষ আছে তাহাতে কাঁচা আম্র পাইবে।" ব্রাহ্মণের বাক্যে অনন্তরাম যেন মৃতদেহে প্রাণ পাইল। সত্বর পুষ্করিণীর নিকট গমন করিয়া বৃক্ষে অসময়ে আম্র ঝুলিতে দেখিয়া সবিস্ময়ে

লইয়া পুষ্করিণী হইতে ইলিশ মৎস্য উত্তোলন করিলেন। অতঃপর বিধিমতে অতিথিসৎকার করিয়া সস্ত্রীক প্রসাদ পাইলেন। আহারান্তে ঐ ব্রাহ্মণ অতিথিভক্ত অনন্তরামকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন; "অনন্তরাম! তোমার কার্য্য শেষ হইয়াছে, তুমি শীঘ্র গঙ্গাস্নানে গমন কর। আমাকে অদ্যই তীর্থযাত্রা করিতে হইবে।" এই কথা বলিয়া অতিথি প্রস্থান করিলেন। ভক্ত অনন্তরামও তাঁহার কথামত গঙ্গাস্নানে গমন করিয়া তথায় পতিতপাবনীর ক্রোড়ে সজ্ঞানে অনন্তকালের জন্য বিশ্রাম লাভ করিলেন। যাহা হউক, তিনি এতদ্রূপ পুণ্যশ্লোক লোক ছিলেন যে, অদ্যাবধি এ প্রদেশের স্ত্রীলোকেরা তাঁহার পবিত্র নামে ভগ্ন পাকস্থালি সংযোজিত হয় বিশ্বাসে চুল্লীতে তাঁহার নাম করিয়া হাঁড়ি চাপাইয়া থাকে। অনন্তরামের আতিথেয়তা সম্বন্ধে আরও যে একটী প্রচলিত জনশ্রুতি আছে, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

একদা এক অতিথি অনন্তরামের পান্থশালায় মলমূত্র পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে। এই বিষয় অবগত হইয়া অনন্তরাম স্বীয় ভার্য্যার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে ঐ পান্থশালা পরিষ্কার করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তাহাতে তাঁহার স্ত্রী অস্বীকৃতা হইলে, অনন্তরাম মনে মনে স্থির করিলেন, যে আমি নিজেই পরিষ্কার করিব। ইতিমধ্যে তদীয় কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ নিজে যাইয়া ঐ মলমূত্র পরিষ্কার করিয়া আসেন। অতঃপর অনন্তরাম পান্থশালায় প্রবেশ করিয়া মলমূত্র কিছুই দেখিতে না পাইয়া অন্তঃপুরে জিজ্ঞাসায় জানিলেন যে, তাঁহার কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ সেই মলমূত্র পরিষ্কার করিয়া আসিয়াছেন। ইহাতে তিনি সাতিশয় আনন্দিত হইয়া বলিয়াছিলেন, যে উনি আমার গৃহলক্ষ্মী। যাহাহউক, যে হস্তে উনি ঐ মলমূত্র পরিষ্কার করিয়াছেন, সেই হস্ত আমি স্বর্ণ বলয়ে শোভিত করিব।" বলা বাহুল্য, ঐ সময় স্বর্ণালঙ্কার প্রচলিত ছিল না। অনন্তরাম ঐ দিনেই আপন স্ত্রীকে উপেক্ষা করিয়া স্বর্ণকার ডাকাইয়া তাঁহার জন্য স্বর্ণ পৈঁচা গড়াইতে দিলেন। ইঁহার কলিকাতায় ঘৃত ও চিনির ব্যবসা ছিল এবং সেই সূত্রে ধনোপার্জ্জন করিয়া স্বীয় নাম ও বংশ মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন।

কালীকুমারও এই বংশের এক জন উন্নতমনা স্বনাম খ্যাত পুরুষ ছিলেন, তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বংকালে ভূতপূর্ব্ব বঙ্গেশ্বর সার

এস্‌লি ইডেন বারাসতের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, ঐ সময় তিনি একদা শীতকালে ভ্রমণার্থ গোবরডাঙ্গায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার আগমন সংবাদে কালীকুমার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। ইডেন বাহাদুর তখন তাঁবুতে তাঁহার খাস কামরায় উপবিষ্ট ছিলেন। কালীকুমার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন শুনিয়া ইডেন সাহেব স্বয়ং বাহিরে আসিয়া সাদরে কালিকুমারের হস্তমর্দ্দনানন্তর খাস কামরায় লইয়া গিয়া বসাইয়া নানা প্রকার কথোপকথনে পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। ইডেন সাহেব পূর্ব্ব হইতেই কালীকুমারের নাম শ্রুত ছিলেন। তাহার কারণ তৎকালে অত্রস্থ তাম্বুলিদিগের যশোহর জেলায় কেশবপুর, ত্রিমহনী, চাঁদপুর প্রভৃতি স্থানে চিনির কারবার ছিল। ঐ চিনি বিক্রয়ার্থ কলিকাতায় আসিত এবং প্রতি সপ্তাহে কলিকাতা হইতে লক্ষ টাকার উপর ঐ চিনি খরিদ করিবার জন্য প্রেরিত হইত। ঐ সমস্ত টাকা হাজার টাকার তোড়াবন্দী হইয়া সামান্য মুটের দ্বারা পাঠান হইত। উপরোক্ত মুটেরা যখন টাকা লইয়া কাছারির সম্মুখ দিয়া যাইত, তখন বিনা প্রহরীতে সামান্য মুটের দ্বারা এতটাকা পাঠান হেতু ইডেন বাহাদুর সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়া কুলীদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "কাহার এই সকল টাকা যাইতেছে?" তদুত্তরে কুলিগণ বলিত, "কালীকুমার দত্তের টাকা যাইতেছে।" যাহা হউক, খাসকামরায় বসিয়া কথা প্রসঙ্গে ইডেন সাহেব ঐ প্রকার কুলিমারফত টাকা পাঠান অত্যন্ত অসমসাহসিকের কায বলায়, কালীকুমার মুক্তকণ্ঠে বলিয়া ছিলেন যে, "আমরা প্রবল প্রতাপান্বিত বৃটিশাধিকারে নির্ব্বিঘ্নে ও স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছি। আমি ভয়ের বিষয় কিছু দেখি না।" ইহাতে ইডেন বাহাদুর তাঁহার উন্নত মনের ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া ছিলেন।

সন ১২৪১ সালের ১৫ই শ্রাবণ মঙ্গলবার ফকিরচাঁদ দত্ত মৃত্যুমুখে পতিত হন। পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে কালীকুমার বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়া ছিলেন। তিনি শ্রাদ্ধে দেশস্থ ও বিদেশস্থ বহুতর অধ্যাপক বিদায়, ব্রাহ্মণ ভোজন, স্বজাতি ভোজন ও কাঙ্গালী বিদায়ে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। ইহার পিতার সময় হইতে ইহাদের বাটীতে দুর্গা পূজা আরম্ভ হইয়া ইহার পৌত্র পর্য্যন্ত সমভাবে চলিয়া আসিতেছে।

প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী খনন, দোল প্রভৃতি ক্রিয়া কর্ম্মে অনেক অর্থ ব্যয় করিতেন। ইনি অত্যন্ত অপক্ষপাতী লোক ছিলেন। পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইলে ইনি সালিসী নিযুক্ত হইয়া বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিতেন এবং গ্রামে কোন স্থানে ক্রিয়া কাণ্ড উপস্থিত হইলে তিনি সেস্থানে অধ্যক্ষতা করিতেন। ব্যবসা ব্যতীত জমীদারিতেও ইঁহার বিশেষ কার্য্য কুশলতা পরিলক্ষিত হইত। ইনি ক্রিয়াবান্ ও বিবাদ মীমাংসক লোক ছিলেন। ১২৬৮ সালের ১৬ই অগ্রহায়ণ তারিখে ৭১ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইনি চারিটি পুত্র রাখিয়া কালকবলে পতিত হন।

হরিশ্চন্দ্র দত্ত স্বর্গীয় কালীকুমারের চতুর্থ পুত্র। ১২৩৭ সালের ১৪ অগ্রহায়ণ শনিবার হরিশ্চন্দ্রের জন্ম হয়। পশ্চাল্লিখিত দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ ইনি পূর্ব্ব সঞ্চিত অনেক ধন নষ্ট করিয়াছিলেন; কিন্তু পুনরায় শুভগ্রহ প্রযুক্ত পাটের কার্য্য করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধনশালী হইয়া জমীদারি ও অন্যান্য ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন। হরিশ্চন্দ্র সোরা, চাউল, প্রভৃতি নানা প্রকারের ব্যবসা করিয়া ছিলেন। ইনি পিতার ন্যায় বুদ্ধিমান্, অতিথিপ্রিয় ও ক্রিয়াবান্ লোক ছিলেন। ইঁহার একটী অলোকিক গুণ ছিল। কি পুত্র, কি বন্ধু, কি কর্ম্মচারী-সকলকেই সমচক্ষে দর্শন করিতেন। শুনা যায়, হরিশ্চন্দ্র একদা একটী সুমিষ্ট ফল কোথা হইতে আনিয়া ছিলেন। ঐ ফল সমভাগ করিয়া পুত্রের যে অংশ ভৃত্যেরও সেই অংশ রক্ষা করিয়া, সমদর্শিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া ছিলেন। যাহা হউক, ইঁহার জীবনে যদি কিছুমাত্র পক্ষপাতিত্ব থাকিত, তবে বোধ হয় পুত্রের জন্য অধিক পরিমাণে ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার এই অলোকিক সমদর্শিতার জন্য আজ তিনি সকলের স্মরণীয় ও বন্দনীয়। বাল্যকালে হরিশ্চন্দ্র গ্রাম্য পাঠশালায় যৎকিঞ্চিৎ বিদ্যাভ্যাস করেন। দশবৎসর বয়ঃক্রম কালে হরিশ্চন্দ্র গোবরডাঙ্গায় তাঁহার পিতার যে কারবার ছিল, সেই কারবারে কর্ম্ম শিক্ষার্থ প্রেরিত হন। তথায় হরিশ্চন্দ্র তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রসন্নকুমারের নিকট পাঁচ বৎসর কাল থাকিয়া ব্যবসা সম্বন্ধীয় লেখা পড়া ও দ্রব্যাদি খরিদ বিক্রয় সম্বন্ধে কতকটা অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে হরিশ্চন্দ্র তাঁহার পিতার নিকট

পুত্রের আগ্রহাতিশয্যে কালীকুমার তাঁহার বড় বাজারস্থ নিজ কুটির দ্বিতল গৃহে একটী কাপড়ের ব্যবসা করিয়া দেন। ঐ সময় কলিকাতায় লবণের স্থরতি খেলা হইত। সেই খেলাতে ভাগ্যবান্ হরিশ্চন্দ্র ৬০০০ ছয় হাজার টাকা প্রাপ্ত হন। ঐ ছয় হাজার এবং তাঁহার মাতার নিকট হইতে ১০,০০০ দশ হাজার একুনে ১৬,০০০ যোল হাজার টাকা মূল ধন লইয়া হরিশ্চন্দ্র কাপড়ের কায আরম্ভ করেন। উপর্য্যুপরি তিন বৎসর কাল কাপড়ের ব্যবসা সুন্দররূপে চলিয়াছিল। তাহাতে ইনি বিশেষরূপ লাভবান্ হন। এই সময় কালীকুমার ও বৈদ্যনাথ দুই ভ্রাতায় মনোমালিন্য হওয়ায় উভয়ের ব্যবসা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে চলিতে থাকে। কালীকুমার পুত্রের ব্যবসা সম্বন্ধে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও কার্য্য-দক্ষতা অবলোকনে বড়বাজারের সমস্ত কার্য্যভার তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। ক্রমে ক্রমে হরিশ্চন্দ্র নির্ব্বিবাদে প্রায় ১২ বৎসরকাল বড় বাজারে কার্য্য করিয়া পিতাকে দুই লক্ষ টাকা লাভ করিয়া দেন। এই সময়েই কালীকুমার দত্ত নিজাংশে চারি লক্ষ টাকা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। স্বর্গীয় মহাত্মা কালীকুমারের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাঁহার পুত্রগণ প্রায়—৩৫০০০ ৩৬০০০ সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। ১২৬৯ সালের পৌষ মাসে হরিশ্চন্দ্রের জননী ইহধাম ত্যাগ করেন। মাতৃ বিয়োগের অনুমান এক মাস মধ্যেই দুর্ভাগ্য লক্ষ্মী অলক্ষ্যে আসিয়া হরিশ্চন্দ্রকে আশ্রয় করিল। পশ্চিম দেশস্থ পাটনা, বাড় প্রভৃতি মোকাম্ হইতে তাঁহাদিগের সোরা, চিনি, ঘৃত প্রভৃতি নৌকাযোগে আমদানী হইত। ভাগ্য দোষে ঐ সময় ঐ সকল মাল নৌকা সমেত জলমগ্ন হয়। তাঁহাতে ইঁহাদের অন্যূন ৬০,০০০ ষষ্ঠি সহস্র মুদ্রা ক্ষতি হয়। তৎপরে ১২৭১ সালের মাঘ মাসে তাঁহার অগ্রজ গিরীশচন্দ্র দত্ত ৺ কাশী প্রাপ্ত হয়েন। অগ্রজের মৃত্যুতে হরিশ্চন্দ্র দারুণ মনস্তাপ পান। তৎপরেই অর্থাৎ ১২৭২ সালে অষ্টম লাটে উঁহাদের জমীদারী বিক্রয় হইল। সেই জমীদারীতে কলিকাতা জানবাজারস্থ প্রসিদ্ধ জমীদার রাণী রাসমণির মালিকান স্বত্ব ছিল এবং অদ্যাবধিও আছে। ১২৭২ সাল হইতে এই মোকদ্দমা আরম্ভ হয় এবং ১২৭৮ সালে বিলাতে ইহার মীমাংসা হয়। জজকোর্ট হইতে বিলাত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই এই মোকদ্দমায় হরিশ্চন্দ্র জয়লাভ করেন। দীর্ঘকাল মোকদ্দমার খরচ বহন, সাংসারিক ব্যয়, পৈতৃক ক্রিয়া কলাপাদির ব্যয়, পুত্র

কন্যাদির বিবাহ ইত্যাদি ব্যয়ে হরিশ্চন্দ্র জর্জ্জরীভূত হইয়া পড়িলেন। কারণ মোকদ্দমা তদ্বিরের জন্য ব্যবসা বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। ব্যবসায়ের উপায় ও জমীদারীর আয় সমস্ত বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ক্রমশঃ ইনি একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন। কিন্তু এরূপ অবস্থাতেও কাহারও নিকট এক কপর্দ্দকও ঋণগ্রস্ত ছিলেন না। কালের কুটিল গতিতে অতুল সম্পত্তির অধিকারী হরিশ্চন্দ্র আজ অর্থহীন ও নিঃস্ব! কিন্তু তাঁহার অটল ধৈর্য্য ক্ষণ কালের জন্যও তাঁহাকে বিচলিত করিতে দেয় নাই। তিনি ক্রমে ক্রমে পুনরায় অতুল অধ্যবসায়ে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ছিলেন। ১২৮৬ সালে হরিশ্চন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিজয়চন্দ্র তাঁহার ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণের সহিত পৃথক্ হইবার জন্য কোর্ট হইতে নোটীশ দেন। নোটীশ হস্তগত হইবামাত্র হরিশ্চন্দ্র একেবারে অতলস্পর্শ দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইলেন। কারণ বিজয়চন্দ্র পাঁচ সহোদরের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ। এই হেতু তাঁহার উপর ইঁহার বিশেষ স্নেহ মমতা ছিল। তিনি আত্মীয় স্বজনের নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেন, "যাহাতে ভ্রাতা বিজয়চন্দ্র আমার সহিত পৃথক্ না হন, আপনারা এইরূপ করিয়া দিন"। কিন্তু বিজয়চন্দ্র কাহারও কথা না শুনিয়া ১২৮৬ সালে হরিশ্চন্দ্রের সহিত পৃথক্ হইলেন। পৃথক্ হইবার পর হইতে হরিশ্চন্দ্রের অবস্থা উত্তরোত্তর উন্নত হইতে লাগিল। হরিশ্চন্দ্র তথাপি মধ্যে মধ্যে বিজয়কে একান্নবর্ত্তী করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু বিজয়চন্দ্র তাহাতে স্বীকৃত হন নাই।

এক্ষণে যে স্থানে বালি পেপারমিল অর্থাৎ কাগজের কল আছে, পূর্ব্বে ঐ স্থানে হাউয়ার্থ কোম্পানীর চিনির কল ছিল। ঐ কলে হালিসহর নিবাসী বাবু গিরিশ্চন্দ্র বসু মুৎসুদ্দি ছিলেন। উপরোক্ত বাবু মহাশয় হরিশ-চন্দ্রের নিকট হইতে চিনি লইতেন। চিনি লওয়ার হিসাবে উক্ত মুৎসুদ্দির নিকট হরিশ্চন্দ্রের অনেক টাকা পাওনা হয়। কলিকাতা সিমলার নিকট উপরোক্ত মুৎসুদ্দি বাবুদের সোরা রিফাইনের এক সুবৃহৎ কারখানা ছিল। মুৎসুদ্দি বাবুরা হরিশ্চন্দ্রের ঐ টাকা পরিশোধ করিতে না পারায় তাঁহার নিকট ৬০,০০০ ষাট হাজার টাকায় ঐ কারখানা বাটী বন্ধক দেন। এবং কিছুদিন পরে ঐ কলবাটী ফোরক্লোজ করিয়া লয়েন। যাহা হউক, হরিশ্চন্দ্র

ঐ সময় কল্পবাটী অনর্থক ফেলিয়া না রাখিয়া সোরা রিফাইনের কার্য্য করেন। ঐ কার্য্য যখন সুশৃঙ্খলে চলিতে ছিল, সেই সময়েই রাণী রাসমণির জামাতা মথুরমোহন বিশ্বাসের সহিত মোকদ্দমা আরম্ভ হয় এবং তদবধিই সঞ্চিত অর্থ ও অপরাপর ব্যবসার সমূহ ক্ষতি হয়।

সন ১২৭৯ সালের বৈশাখ মাসে কলিকাতা উল্টাডিঙ্গি নামক স্থানে হরিশ্চন্দ্র আড়ত করেন। তথায় চাউল, পাট, তিসি, গম ইত্যাদি দ্রব্য ব্যাপারিয়ান হিসাবে আমদানী হইত এবং নিজ হিসাবেও খরিদ বিক্রয় হইত। অদ্যাবধি ঐ স্থানেই ঐ কার্য্য চলিতেছে। সন ১২৮৭ সালে হরিশ্চন্দ্র প্রথম পাটের গাঁটের কার্য্য আরম্ভ করেন। সেই কার্য্যও অদ্যাবধি সমভাবে চলিতেছে। তিনি গাঁটের কার্য্যে যে প্রকার উন্নতি করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ সেরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। চাউলের কার্য্য পূর্ব্বের ন্যায় সমভাবেই চলিতেছে। ইনি ১২৯১ সালের ২৮শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার তাঁহার উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্রগণের হস্তে তাঁহার নাবালক পুত্রদ্বয়ের ভার অর্পণ করিয়া স্বর্গগত হন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণ তাঁহার পুত্রগণকে প্রতিপালন বিদ্যাশিক্ষা ও পৈতৃক ক্রিয়াকলাপাদিও সুশৃঙ্খলে সমাহিত করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীনিবাস দত্ত। ইনি স্বর্গীয় অনন্তরাম দত্তের পৌত্র। ইহার পিতার নাম দুর্গাগতি দত্ত। শ্রীনিবাস প্রথমে সামান্য মূলধন লইয়া কলিকাতায় পটলডাঙ্গায় দাগীসুতা প্রভৃতির একটী সামান্য দোকান করেন। ২।৪ বৎসর পরে ঐ দোকানে কিছু লভ্য হইলে সেই টাকায় বড়বাজার পগেয়াপটীতে একটী নূতন সুতার সামান্য খুচরা বিক্রয়ের দোকান খুলেন। কিন্তু তাহাতে ক্ষতি হওয়ায় ঐ দোকান তুলিয়া দেন। অতঃপর শ্রীনিবাসদত্ত তাঁহার শশুর উত্তমচন্দ্র রক্ষিতের নিকট হইতে ১৫০০ দেড় হাজার টাকা লইয়া কলিকাতা পটলডাঙ্গায় বিলাতী ইন্‌ডেন্ট হার্ডওয়ারের কার্য্য আরম্ভ করেন। ঐ সময় কলিকাতায় হার্ডওয়ারি ইন্‌ডেন্টের কার্য্য শিবকৃষ্ণ দাঁ ও শ্রীনিবাস দত্ত ভিন্ন আর কাহারও ছিল না। ৩।৪ বৎসর কাল ঐ কার্য্য সুন্দররূপে চলে এবং তাঁহাতে বিলক্ষণ লাভ হওয়ায় তিনি বিস্তারিতরূপে ঐ কার্য্য চালাইতে আরম্ভ করেন। শ্রীনিবাস দত্ত মৃত্যুকালে অন্যূন ৬০০০০ হাজার টাকা রাখিয়া

যান। ইঁহার একমাত্র পুত্র সারদাচরণ দত্ত বিপুল অর্থ পাইয়া পিতা অপেক্ষা বিস্তারিতরূপে লৌহের কার্য্য চালাইতে আরম্ভ করেন। তিনি ব্যবসা ও তেজারতি প্রভৃতিতে অনেক আয় বৃদ্ধি করেন। ইনিও পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান ও পরিমিত ব্যয়ী। কলিকাতাস্থ বাটীতে শারদীয়া পূজা প্রভৃতি ক্রিয়া কর্ম্মও করিয়া থাকেন। শ্রীনিবাসদত্ত স্বজাতির মধ্যে লৌহ ব্যবসায়ের পথ প্রথম উন্মুক্ত করেন। এক্ষণে কয়েকজন কুশদ্বীপবাসী তাঁহার প্রদর্শিত পথের অনুগামী হইয়া জীবিকার্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। দত্ত বংশ শর্করা ভিন্ন বহুবিধ ব্যবসা-কুশলতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্যবসায়ের বিষয় বর্ণনা করিতে হইলে তাহার উৎপত্তি, বর্ত্তমান অবস্থা ও ভাবী বিষয় সম্বন্ধে কিছু লেখা উচিত। ব্যবসায়ে যিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তিনি কিগুণে ও কি উপায়ে কৃতকার্য্য হইলেন, তাহা উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। যদি গোত্রহীন হইয়া থাকেন, কি দোষে ও কি প্রকারে নিঃস্ব হইলেন তাহাও বর্ণনীয়। কিন্তু এই সকল তত্ত্ব বুঝাইয়া বলিতে পারেন, লেখকের সমক্ষে এমন কেহ উপস্থিত হন নাই। সুতরাং ব্যবসায়ের নিগূঢ় কথা অব্যক্ত রহিল।

স্বর্গীয় কালীকুমার দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র অর্থাৎ বৈদ্যনাথ দত্ত মহাশয়ের পুত্র ক্ষেত্রমোহন দত্ত কলিকাতা হইতে কুশদহে ব্রাহ্মধর্ম্ম লইয়া যান। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বসন্তকুমার তাঁহার সহযোগী ছিলেন। তিনি ফার্ষ্ট আর্টস্ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া মেডিকেল কালেজে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। তিনি বিলাতে যাইয়া সিভিল সার্জ্জন হইবেন এই কামনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ অর্থসাহায্য না করায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রী বাবু রাজেন্দ্রচন্দ্র দত্তের নিকট সদৃশ চিকিৎসা শিক্ষা করিয়া বাঁশবেড়িয়া পুরে প্রথমে ব্যবসা আরম্ভ করেন। তিনি মিতাচারী ছিলেন না, এ জন্য অর্থ সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া ইনি চিকিৎসা বিষয়ে অনেক গুলি গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি ব্রাহ্মমত পরিহার করেন। তাঁহার জীবনান্ত হইলে তদীয় সহধর্ম্মিণী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মন্ত্র শিষ্যা হইয়াছেন। ক্ষেত্রমোহন বাবুর স্ত্রী বিশ্বাস ও কার্য্যের সামঞ্জস্য দেখাইয়া গিয়াছেন। ইহা মনুষ্যত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

হইয়াছে। ব্রাহ্ম অ্যাখান এই গ্রন্থের উপযোগী নহে। তজ্জন্য আমরা প্রথম পৃষ্ঠাটী মাত্র উদ্ধৃত করিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

"কলিকাতা নগরের অষ্টাদশ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতি খাঁটুরা গোবরডাঙ্গা নামক পল্লীগ্রামের খাঁটুরা গ্রামে ১২৫০ সালে কুমুদিনী জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ভগবতীচরণ দেব। তিনি শান্ত প্রকৃতি, হিন্দুধর্ম্মনিষ্ঠ এবং মধ্যবিত্ত বাণিজ্য ব্যবসায়ী লোক ছিলেন। বণিকদিগকে সচরাচর যেরূপ দুরাকাঙ্ক্ষ এবং অন্যায় আচারী দেখা যায়, তাঁহার স্বভাব সেরূপ দোষে দূষিত নয়। তিনি অপেক্ষাকৃত সন্তুষ্ট চিত্ত এবং ন্যায় পরায়ণ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। কুমুদিনী তাঁহার প্রথমা কন্যা ছিল।"

এই বংশে অনন্তরাম প্রমুখ কয়েক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়া কি প্রকারে অতিথি সেবা ও অর্থের সদ্ব্যয় করিতে হয় তাহা সাধারণকে দেখাইয়া গিয়াছেন। ইঁহারা যে কুলোজ্জ্বলকারী সন্তান তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। স্বর্গীয় অনন্তরাম তাঁহার একটী ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম অতিথিদাস রাখিয়াছিলেন। এই দত্ত বংশে কয়েকটী স্ত্রীলোক ও আতিথেয়তা ও পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। যৎকালে লর্ডবেণ্টিক রামমোহন রায়ের সহায়তায় সতী প্রথা নিবারিত করেন, সেই সময় অথবা তাহার কিছু পূর্ব্বে এই বংশের ৺ লাটুমোহন দত্তের মাতা পতি অনুগামিনী হইয়াছিলেন।

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় প্রথম দত্ত বংশের জন সংখ্যা।

১ ক্ষেত্রমোহন দত্ত ২ শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত ৩ যোগীন্দ্রনাথ দত্ত ৪ রাসবিহারী দত্ত ৫ বিনোদবিহারী দত্ত ৬ কালিদাস দত্ত ৭ হরকালী দত্ত ৮ কালীশঙ্কর ৯ শ্রীমন্তকুমার দত্ত ১০ নির্ম্মলচন্দ্র দত্ত ১১ ফণীন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে ব্রজেন্দ্রকুমার ১২ প্রমথনাথ দত্ত ১৩ সতীশচন্দ্র দত্ত ১৪ অতুলকৃষ্ণ দত্ত ১৫ অপূর্ব্বকৃষ্ণ দত্ত ১৬ অনুপকৃষ্ণ দত্ত ১৭ হৃদয়কৃষ্ণ দত্ত ১৮ সারদাচরণ দত্ত ১৯ আশুতোষ দত্ত ২০ সত্যচরণ দত্ত ২১ দ্বিজরাজ দত্ত ২২ ক্ষীরোদগোপাল দত্ত ২৩ ননীগোপাল দত্ত ২৫ কান্তিচন্দ্র দত্ত ২৬ নারাণচন্দ্র দত্ত ২৭ পাঁচুগোপাল দত্ত ২৮ মন্মথনাথ দত্ত ২৯ চন্দ্রনাথ দত্ত ৩০ কালিচরণ দত্ত ৩১ হরিমোহন দত্ত ৩২ হারাণচন্দ্র দত্ত

৩৩ সত্যচরণ দত্ত ৩৪ গণেশচন্দ্র দত্ত ৩৫ সত্যহরি দত্ত ৩৬ শশীভূষণ দত্ত ৩৭ নগেন্দ্রনাথ দত্ত ৩৮ লক্ষ্মণচন্দ্র দত্ত স্ত্রীলোক ৩৬ বালক ১০ এবং বালিকা ১২ সমষ্টি ৯৬।

দ্বিতীয় দত্ত বংশ।

এই বংশে উমাচরণ দত্ত নামে জনৈক লোক জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার জন্ম স্থান গোবরডাঙ্গা গ্রামে। অতি শৈশবকালে ইনি পিতৃহীন হন। ঐ সময় তাঁহার দুরবস্থার এক শেষ হইয়াছিল। তাঁহার মাতা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন বলিয়া অতি কষ্টে কোন রূপে গ্রাসাচ্ছাদন চালাইতেন। উমাচরণ গ্রাম্য পাঠ-শালায় যৎসামান্য লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন। কিন্তু বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত বিনয়ী ও অধ্যবসায়ী ছিলেন বলিয়া উত্তরকালে জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক হইতে পারিয়াছিলেন। যখন উমাচরণের বয়ঃক্রম ১০।১২ বৎসর তখন হইতে তাঁহার ব্যবসা কার্য্যে ঔৎসুক্য জন্মে, কিন্তু অর্থাভাব বশতঃ কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। একদা তিনি তাঁহার মাতার নিকট ব্যবসা করিবার জন্য কিছু টাকা প্রার্থনা করেন—কিন্তু তাঁহার হস্তে নগদ টাকা না থাকায় সামান্য দুই এক খানি অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া ঐ গ্রামেই সামান্যভাবে একটী চিনির কারখানা খুলেন। ব্যবসা কার্য্যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রভাবেই হউক বা শুভাদৃষ্ট বশতই হউক অত্যল্প কাল মধ্যেই উমাচরণ ব্যবসায়ে সমূহ উন্নতি লাভ করেন। এই ব্যবসায়ে তিনি অনুমান লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করেন। দান ও ক্রিয়া কলাপে তিনি মুক্ত হস্ত ছিলেন। দেশ হিতকর কার্য্যেও ইনি বহুল অর্থ ব্যয় করেন। ইনি প্রায় দুই সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া যমুনা নদীর তীরে নিমতলা নামক গ্রামের নিকট একটী বাঁধাঘাট ও রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন এবং অনুমান দেড় হাজার টাকা ব্যয়ে ইনি গোবরডাঙ্গার ইংরাজি বিদ্যালয়ের দুইটী গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। শেষ অবস্থায় ইনি যশোহর জেলার অন্তর্গত নারায়ণপুর ও ঘুঁটে নামক স্থানে অনুমান বিংশতি সহস্র টাকা ব্যয়ে দুইটী পুল নির্ম্মাণ করাইয়া জনসাধারণের বিশেষ উপকার করিয়া যান। এতদ্ব্যতীত ইনি গোপনে অনেককে অর্থ সাহায্য করিতেন।

ইনি এক জন বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, মাননীয়, ক্রিয়াবান ও সাতিশয় নির্ব্বিরোধী লোক ছিলেন। সন ১৩০২ সালের আশ্বিন মাসে পূর্ণিমার দিন উমাচরণ আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবকে শোকার্ণবে নিমগ্ন করিয়া অন্যূন ৭৭।৭৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ৺ কাশীধামে ইহলীলা সংবরণ করেন।

অনেক গুলি কারণ সমবেত হইয়া একটী কার্য্য উৎপাদন করে। উমাচরণ চিনির কারখানা করিয়া যেমন অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, অন্য কেহ তেমন অধিক পরিমাণে অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারেন নাই। তিনি গুড়ের প্রকৃতি অতি উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন। চাঁহুড়িয়ার হাটে গুড় ক্রয় করিবার সময় উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। কোন্ গুড়ে কিরূপ চিনি জন্মিবে বুঝিয়া মূল্য স্থির করিতেন। যখন বিত্তশালী হইয়া উঠিলেন, আড়তদারের নিকট টাকা লইয়া সুদ দিতে হইবে না, এমন সময়ে চিনির পর্য্যবসান কালে বিক্রয়ার্থ দলুয়া ও গোঁড় রাখিয়া দিতেন। অসময়ের সুবিধা তিনি এইরূপে নিজের আয়ত্ত করিয়া লইয়া ছিলেন।

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় দ্বিতীয় দত্ত বংশের জন সংখ্যা।

১ শ্রীনিবাশ চন্দ্র দত্ত, ২ শ্রীহরিদাস দত্ত, ৩ বিহারিলাল দত্ত, ৪ মহানন্দ দত্ত, ৫ যজ্ঞেশ্বর দত্ত, ৬ তারকচন্দ্র দত্ত, ৭ শিবচন্দ্র দত্ত, ৮ মাণিকচন্দ্র দত্ত। স্ত্রীলোক ৯, বালক ৪, বালিকা ৩, সমষ্টি ২৪।

তৃতীয় দত্ত বংশ।

এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে খাঁটুরা নিবাসী স্বর্গীয় রামপ্রাণ বিদ্যাবাচষ্পতি মহাশয় কোন কার্য্য উপলক্ষে একদা বৈঁচিগ্রামে গমন করেন। তথায় কালিচরণ দত্ত নামক জনৈক পিতৃমাতৃহীন বালককে নিঃসহায় অবস্থায় দেখিয়া, তাঁহার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইলে তিনি ঐ বালককে সঙ্গে করিয়া নিজ গ্রামে লইয়া আইসেন। তখন কালিচরণের বয়স অনুমান ১২।১৩ বৎসর হইবে। অতঃপর বাচষ্পতি মহাশয় ঐ গ্রামে

তাহাকে স্থাপিত করেন। এই বংশ বৈঁচির দত্ত বংশোদ্ভব। কালক্রমে ঐ বংশে কমলকান্ত নামক এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার চারিটী পুত্র হয়। তন্মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠের নাম দুর্গাচরণ। কমলকান্ত তেজারতি, মহাজনী কার্য্য করিয়া যৎকিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জ্জন করেন। কমলকান্তের মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার অন্যান্য পুত্রেরা ঐ তেজারতি কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। অতি শৈশবে দুর্গাচরণ পিতৃমাতৃ হীন হয়েন* যখন তাঁহার বয়স ১০।১২ বৎসর তখন তিনি কলিকাতার বৈঠকখানায় এক মুদির দোকানে সামান্য বেতনে চাকরীতে প্রবৃত্ত হন। কিছুদিন ঐ স্থানে কার্য্য করিয়া কলিকাতা বড়বাজার রামকুমার রক্ষিতের লেনে রামসেবক রক্ষিত মহাশয়ের দোকানে চাকুরী করেন। তৎপরে ঐ দোকানে ভালরূপ কার্য্য করিতে করিতে তাঁহার প্রভু তাঁহার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া ঐ দোকানের কিছু অংশীদার করিয়া দেন। অংশীদার হইয়া দুর্গাচরণ বিশেষ দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন এবং ঐ ব্যবসায়ে কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া ছিলেন। ঐ কার্য্য করিতে করিতে তাঁহার প্রভুর মৃত্যু হয়। প্রভুর মৃত্যুর পরেই অত্রস্থানে ৺শ্যামাচরণ রক্ষিত মহাশয়ের পুত্র কেদারনাথ রক্ষিত মহাশয়ের সহিত বথরায় একটী চিনির কারবার খুলেন। দুর্গাচরণ ঐ ব্যবসায়ে পর পর বিশেষ উন্নতি করিয়া ছিলেন। দুর্গাচরণের দোকানে প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে অন্নব্যয় ছিল। অনেক লোক তাঁহার দোকানে আহারাদি করিত। যদি কেহ কোন বিপদে পড়িত, দুর্গাচরণকে জানাইলে, তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া বিপন্ন ব্যক্তিকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে বিমুখ হইতেন না। ইনি পরিশ্রমী, পরোপকারী, বুদ্ধিমান ও মিতব্যয়ী ছিলেন। সন ১২৮৮ সালে কলিকাতার বেনেটোলার বাটীতে ইনি স্ত্রীপুত্র পরিজন গণকে শোকার্ণবে ভাসাইয়া ইহধাম ত্যাগ করেন। দুর্গাচরণ চিনি পটির ব্যবসায়ীদিগের অগ্রণী হইয়াছিলেন।

* এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে দুর্গাচরণের মাতা সহমৃতা হইয়াছিলেন। প্রতিবেশী মণ্ডলীর নিষেধ সত্বেও তিনি পতি সহগামিনী হন। ঐ সময় দুর্গাচরণ নিতান্ত শিশু। অনেকেই শিশু দুর্গাচরণের মুখ চাহিয়া তাঁহার মাতাকে এই কঠিন অধ্যবসায় হইতে বিরত থাকিতে কহিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বলিয়া

ছিলেন যে, "আমি আশীর্ব্বাদ করিয়েছি, আমার সন্তানের কোন কষ্ট হইবে না, বরং ভালই হইবে। অতএব তোমরা আর আমাকে বাধা দিও না। আমি কথনই এদেহ রাখিব না"। যথন প্রতিবেশীগণ দেখিলেন দুর্গাচরণের মাতা কিছুতেই কাহারও নিষেধ বাক্য শুনিলেন না, তখন তাঁহারা দুর্গাচরণের মাতাকে বলিলেন, "আচ্ছা, যদি সহমৃতা হইবে, অগ্রে এই দীপশিখায় তোমার একটী অঙ্গুলি দগ্ধ কর দেখি।" ইহা শুনিয়া তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ অঙ্গুলি ঐ দীপ শিখায় ধরিলেন। অঙ্গুলি পট্ পট শব্দে পুড়িতে লাগিল। পতির মৃত্যুতে তিনি এতাদৃশ শোকান্বিতা হইয়াছিলেন যে ইহাতে তাঁহার কোন যন্ত্রণা বা কষ্ট অনুভব হয় নাই। প্রতিবেশীগণ এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিয়া সকলেই সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন। ঐ সাধ্বী স্ত্রী তখন সময়োচিত বেশ ভূষায় সজ্জিত হইলেন। আত্মীয় স্বজন সমারোহের সহিত তাঁহার পতির শবদেহ শ্মশানস্থ করিল। তখন গৈপুরে যমুনা নদীর তীরে শ্মশান ঘাট ছিল। পতিব্রতা স্ত্রীও পদব্রজে তথায় উপনীত হইলেন। এই ঘটনা অচিরকাল মধ্যেই গ্রাম গ্রামান্তরে প্রচার হইয়া পড়িল। তৎকালীন গোবরডাঙ্গার জমীদার কালীপ্রসন্ন বাবু স্বদলে এই বিস্ময়কর ব্যাপার দেখিবার জন্য ঐ শ্মশান ঘাটে উপস্থিত হইলেন। শ্মশানঘাট ক্রমে ক্রমে জনতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেই এক বাক্যে পতিব্রতার প্রশংসা করিতে লাগিল। ক্রমে চিতা সজ্জিত হইল; পতিকে চিতায় শয়ান করাইলে ঐ সতী স্ত্রী চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া সহাস্যবদনে চিতায় ঝাঁপ দিলেন। চিতায় চন্দন কাষ্ঠ, ধুনা ও ঘৃত প্রচুর পরিমাণে দেওয়া হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে চিতা ক্রমশঃ ভস্মীভূত হইয়া গেল। এই পতিব্রতা স্ত্রী সতীত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন।

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় তৃতীয় দত্ত বংশের জন সংখ্যা।

১ শ্রীমহানন্দ দত্ত ২ সুরেন্দ্রনাথ দত্ত ৩ যোগীন্দ্রনাথ দত্ত ৪ বসন্তকুমার দত্ত ৫ হেমন্তকুমার দত্ত ৬ উমাকান্ত দত্ত ৭ জীবনকৃষ্ণ দত্ত। স্ত্রীলোক ৯, বালক ৪, বালিকা ৪ সমষ্টি ২৪।

আশ বংশের বৃত্তান্ত।

এই বংশ অতি প্রাচীন ও বৃহৎ গোষ্ঠীসমন্বিত। অনুমান দুই শত বৎসরের মধ্যে এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ শঙ্কর আশ সপ্তগ্রামের প্রতি কোন ব্রাহ্মণের অভিসম্পাত হওয়ায় সপ্তগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া এই প্রদেশে আসিয়া বাস করেন। এক্ষণে শঙ্কর আশ হইতে দশম পুরুষ পর্য্যন্ত চলিতেছে। ইহার পূর্ব্বের বিবরণ সংগ্রহ করা কঠিন। যাহাহউক এই বংশে অনেক ক্রিয়াবান্ ও খ্যাতনামা লোক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই ব্যবসা সূত্রে ও তেজারতি কার্য্যে উন্নত হইয়াছিলেন ও তদ্দ্বারা বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া নানা প্রকার ক্রিয়া কলাপাদি করিয়া আসিয়াছেন। শঙ্কর আশ, গোকুল আশ, রমানাথ আশ, কালিচরণ আশ, কীর্ত্তিচন্দ্র আশ, বিষ্ণুরাম আশ, রামজীবন আশ, রামগোপাল আশ, পার্ব্বতীচরণ, আশ, এবং মুরলীধর আশ। যদিও আশ বংশের এই দশম পুরুষ পর্য্যন্ত নাম পাওয়া যায় কিন্তু ইহাদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য কোন বৃত্তান্তই এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। এই বংশে বীরেশ্বর আশ নামধেয় জনৈক লোক জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি এক জন স্বদেশহিতৈষী লোক ছিলেন। বীরেশ্বর আশ এবং আরও কতিপয় গণ্য মান্য দেশহিতৈষী ব্যক্তি খাঁটুরাস্থ পালপাড়ায় রামজয় পাল মহাশয়ের বাটীতে জাতীয় একটি সভা গঠিত করেন। ঐ সভার কার্য্য প্রতি বৎসর বর্ষালি পূজার সময় আরম্ভ হইত। স্বজাতির মধ্যে যদি কেহ কোন দূষিত বা কোন গর্হিত কার্য্য করিত অথবা সমাজের বিরুদ্ধে কেহ কোন কার্য্য করিলে এক বৎসর অন্তে পুনরায় ঐ পূজার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে যে যে ব্যক্তি সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে অথবা কোন

দূষিত কার্য্য করিয়াছে, তাহাদিগকে সভায় আহ্বান করা হইত। সভার দিন স্বজাতিমণ্ডলী সকলেই ঐ সভাতে আসিতেন। সভায় বীরেশ্বর আশ প্রভৃতি কতিপয় প্রধান প্রধান লোক বিচার কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। স্বজাতিমণ্ডলী সকলে সভাস্থ হইলে সভার কার্য্য আরম্ভ হইত। বিচারে যাঁহারা দোষী সাব্যস্ত হইতেন, সভা তাঁহাদের প্রতি অর্থ দণ্ডের ব্যবস্থা করিতেন। আদেশ মাত্রেই ঐ টাকা সভায় জমা দিয়া আসিতে হইত। শুদ্ধ যে তিনি অর্থ দণ্ড দিয়া নিষ্কৃতি পাইতেন তাহা নহে, সভাস্থ স্বজাতিবর্গের নিকট তাঁহাকে কৃতাপরাধের জন্য ক্ষমাঃপ্রার্থনা করিতে হইত। এবং ঐ দণ্ডিত অর্থ সভা হইতে দাতব্যরূপে দীন, দুঃখী, অনাথদিগের মধ্যে বিতরিত হইত। তখন প্রত্যেক সমাজের মধ্যেই কেমন সুন্দর নিয়ম সকল প্রচলিত ছিল কিন্তু কাল প্রভাবে সমাজবন্ধন শিথিল হওয়ায় সমজের এই দুর্দ্দশা! এখন সকলেই স্ব স্ব প্রধান। সামাজিক নিয়ম সকলআজ কাল অতি অল্প লোকেই গ্রাহ্য করিয়া থাকেন।

১১৯৮ সালে খাঁটুরা গ্রামে রামজীবন আশ জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি অতিশয় নিঃস্ব ছিলেন। কলিকাতা বড় বাজারে চিনি পটীতে লক্ষ্মীনারায়ণ আশের দোকানে ইনি বেতন ভোগী রূপে কার্য্য করিয়া অতি কষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। অতঃপর ইংরাজ সওদাগর কুক্ কোম্পানির আপিসে চিনির দালালি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ঐ কার্য্যে তাঁহার বিশেষ উন্নতি হয়। তাঁহার দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ দ্বারকানাথ এবং কনিষ্ঠ রামগোপাল। ১২৩১ সালে দ্বারকানাথের জন্ম হয়, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে দ্বারকানাথ প্রথমতঃ পিতার সহিত দালালি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন এবং ঐ কার্য্যে যথেষ্ট অর্থউপার্জ্জন করেন। কিছুদিন দালালি কার্য্য করিয়া বিশেষ পারদর্শী হইলে পিতাকে কার্য্য হইতে অবসর দিয়া এবং নিজে কিছুদিন পরে দালালি কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পিতার অনুমতি অনুসারে কলিকাতা বড়বাজারে নাকদার ও ইংরাজ সওদাগরদিগকে চিনি বিক্রয় করিবার জন্য একটী দোকান খুলেন। ঐ চিনি কলিকাতায় আমদানীর জন্য কেশবপুর, বরণডালি, ত্রিমোহনা প্রভৃতি স্থানে তিনি চিনির মোকাম করেন। ২।৩ বৎসরের মধ্যে তিনি ঐ কার্য্যে বিলক্ষণ অর্থ উপার্জ্জন

৭০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে রামজীবন ইহধাম ত্যাগ করেন। দ্বারকানাথ পিতৃ শ্রাদ্ধে আনুমানিক ১২।১৪ হাজার টাকা ব্যয় করেন। ঐ শ্রাদ্ধ অত্যন্ত সমারোহে নিষ্পন্ন হইয়াছিল। দ্বারকানাথ পিতার মৃত্যুর পর দুই খানি জমিদারী ক্রয় করেন। এক খানি যশোহর জেলার অন্তর্গত তরফ যাত্রাপুর পত্তনি মহল। অপর খানি ডিহি সানটা কালেকটারি ভুক্তান। দুই খানি জমিদারী ক্রয় করিয়া তিনি কলিকাতা বড়বাজারে চিনির কার্য্য তুলিয়া দেন। দ্বারকানাথ সদ্বক্তা, ক্রিয়াবান্‌ ও সরলচেতা লোক ছিলেন। সন ১২৯৫ সালে ৬৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

আশবংশীয় মঙ্গলচন্দ্রের শ্রাদ্ধোপলক্ষে তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণচন্দ্র পিতার যে জীবনচরিত প্রকাশ করেন তাহা হইতে উদ্ধৃত :—

খাঁটুরার প্রসিদ্ধ আয়ুষ্মান্‌ ও বলবান্‌ আশবংশের মধ্যে রামকান্ত আশ নামে একজন প্রাচীন হিন্দু ক্রিয়াবান্‌ বৃহৎ গোষ্ঠীপতি ছিলেন। উক্ত রাম-কান্তের পৌত্র মঙ্গলচন্দ্র। ইনি ১২২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে মঙ্গলচন্দ্র গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করিয়া যৌবনাবস্থায় পৈতৃক ব্যবসা কার্য্যে নিযুক্ত হন। তাঁহার পিতামহ রামকান্ত আশের যেরূপ ধনসম্পত্তি ছিল তাঁহার পিতা বিশ্বনাথের সময় সেরূপ ছিল না। মঙ্গলচন্দ্র এবং তদীয় জ্যেষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র উভয়ে তজ্জন্য পিতার জীবদ্দশায় নিঃস্ব অবস্থায় স্বতন্ত্ররূপে ব্যবসা কার্য্য আরম্ভ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতি করিয়া উপার্জ্জিত অর্থ নিজ ইচ্ছানুসারে ব্যয় করিতে লাগিলেন। মঙ্গলচন্দ্র পরিবারস্থ সকলকে লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার ব্যবসায়ের উন্নতি হইতে লাগিল। পিতার মৃত্যুর পর পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার অবস্থা ক্রমে ক্রমে অনেক ভাল হইল। অনন্তর উপার্জ্জিত অর্থে তিনি কিছু ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া একমাত্র পুত্রের উপর তাহার ভার অর্পণ করিলেন এবং নিজে পৈতৃক ব্যবসা কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া তাঁহার কলিকাতাস্থ বেনেটোলার বাটীতে অল্পদিনমাত্র অবস্থিতি করিয়া নগরের কোলাহল হইতে পল্লীগ্রামের নির্জ্জন ভবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তাঁহার চরিত্রের মধ্যে একটী বিশেষ লক্ষণ এই যে তিনি অতিশয় শান্ত, ধীর এবং সহিষ্ণু ছিলেন। মনের ভিতরের ভাব এমন আশ্চর্য্যরূপে সম্বরণ করিতে পারিতেন যে অতিশয় অপ্রিয় আচরণেও কাহার প্রতি ক্রোধ-প্রকাশ বা দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতেন না। মনে দুঃখ বা আনন্দের উদয় হইলে বাহিরে তাহা প্রকাশ করিতেন না। লোকের সুখ্যাতি অখ্যাতি লক্ষ্য করিয়া তিনি কার্য্য করিতেন না। তাঁহার শ্রেণীস্থ লোকেরা যেরূপ ক্রিয়া কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান দ্বারা লোকের সুখ্যাতিভাজন হইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেন, তিনি সেরূপ করিতেন না—তাঁহার জীবন হইতে এইটী বিশেষ শিক্ষণীয়। খাঁটুরা, গোবরডাঙ্গা, গৈপুর, ইছাপুর প্রভৃতি গ্রামের মধ্যে যাহাদিগের অন্ন বস্ত্রের কষ্ট—এমন দুঃখী লোকদিগকে অনুসন্ধান করিয়া তিনি মাসিক অর্থ সাহায্য করিতেন। ইহাতে তাঁহার কিঞ্চিদধিক একশত টাকা মাসিক ব্যয় হইত। ভদ্রলোকের অন্ন বস্ত্রের কষ্ট হইলে লোকলজ্জায় প্রার্থনা করিতে পারে না, কিন্তু ইনি কোন ভদ্রপরিবার কষ্টে পড়িয়াছে কি না গোপনে তাহার অনুসন্ধান লইতেন এবং গোপনে যথাসাধ্য সাহায্যও করিতেন। কতিপয় অক্ষম দুঃখী লোকের থাকিবার জন্য তিনি আপনার বাগানের মধ্যে এক একখান পর্ণকুটীর বাঁধিয়া দিয়াছিলেন এবং প্রত্যহ নিজ বাটী হইতে তাহাদের জন্য অন্নব্যঞ্জনাদি পাঠাইয়া দিতেন। তিনি আড়ম্বর করিয়া প্রকাশ্যরূপে কোন কার্য্য করিতে ভাল বাসিতেন না। গ্রীষ্মকালে তিনি হিন্দু ও মুসলমান দিগের জন্য স্বতন্ত্র জলছত্র দিতেন। তৎসহ মিষ্ট দ্রব্যাদিরও ব্যবস্থা থাকিত। তিনি কোন কোন দিন নিজে জলছত্রের নিকট বসিয়া সুখানুভব করিতেন। রোগশয্যায় পড়িয়া তিনি একদিন জনৈক আত্মীয়কে বলিলেন, "তোমরা যাহা কিছু হয় সংবাদপত্রে ছাপাইয়া দাও কেন? আমার কোন বিষয় সংবাদপত্রে প্রকাশ করিবে না স্বীকার কর।" তিনি কাহাকেও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আদেশ করিয়া কোন কার্য্য করিতে বাধ্য করিতেন না। কোন বিষয়ে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইলে কেবল চক্ষু দিয়া জল পড়িত, মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইত না। তিনি একবার তিনমাস-ব্যাপী ভারত দিয়া ছিলেন। তাহাতে ব্রাহ্মণপণ্ডিত বিদায়, কাঙ্গালী বিদায় ও স্বজাতি ভোজনে অনেক ব্যয় করেন। ইনি সরলচেতা ও ক্রিয়াবান লোক

ছিলেন। ১২৯৩ সালের ২৬শে বৈশাখ শনিবার মধ্যাহ্নকালে ৬৮ বৎসর বয়ঃক্রমে ইনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

১২৫৪ সালে লক্ষ্মণচন্দ্রের জন্ম হয়। বাল্যাবস্থায় লক্ষ্মণচন্দ্র স্বভাবতঃ সাহসিক, বুদ্ধিমান ও চঞ্চল ছিলেন। অনাবিষ্টতা নিবন্ধন ইনি কোথাও সুচারুরূপে বিদ্যাভ্যাস করিতে পারেন নাই। ইঁহার পিত্রালয় ও মাতুলালয় এক গ্রামে ছিল। সুতরাং বাল্যকালে ইনি অধিকাংশ সময়ই মাতুলালয়ে অবস্থিতি করিতেন। পুত্রের বিদ্যাভ্যাসে অমনোযোগ নিবন্ধন তাঁহার পিতা কোন যত্ন বা শাসন করিতেন না। তাঁহার মাতুল শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন দত্ত যৌবনাবধি ব্রাহ্মসমাজের সংস্রবে থাকিয়া সুনীতি ও সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। স্বীয় ভাগিনেয়ের সুশিক্ষার নিমিত্ত তিনি অনেক চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইয়াছিল। কলিকাতার ইংরাজি বিদ্যালয়ে অধ্যয়নার্থ তাঁহার মাতুল লক্ষ্মণচন্দ্রকে কলিকাতায় আনয়ন করেন। তখন ইঁহার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর। লক্ষ্মণচন্দ্র কলিকাতার আহীরিটোলা ও বেণেটোলার বিখ্যাত দুশ্চরিত্র যুবকগণের সংসর্গে মিলিত হইয়া সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিল। ধনবান পিতার একমাত্র আদরের পুত্র সঙ্গীগণের কুমন্ত্রণায় গৃহ হইতে অর্থালঙ্কারাদি লইয়া অদৃশ্য হইত। তাঁহার পিতা অতিশয় নিরীহ স্বভাবের লোক ছিলেন। শাসন করিলে পাছে পুত্র নিরুদ্দেশ হইয়া যায় এই শঙ্কায় পুত্রকে অত্যন্ত অপ্রিয় ও গর্হিত কার্য্য করিতে দেখিলেও তিনি কোন কথা বলিতেন না। কেবল নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। তাঁহার মাতুল ভাগিনেয়ের এই অবস্থা দেখিয়া দুর্বৃত্তদিগের সংসর্গ হইতে স্বতন্ত্র করিবার জন্য নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এইরূপে চারি পাঁচ বৎসর গত হইল। বয়োবৃদ্ধির সহিত কতকাংশে তাঁহার দুর্বৃত্ততার হ্রাস হইয়া আসিল। অতঃপর অষ্টাদশ বা উনবিংশ বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার চরিত্রের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হয়। এই সময় তিনি অনুতপ্ত হৃদয়ে মাতুলের নিকট আত্ম সমর্পণ করেন। লক্ষ্মণচন্দ্র বাল্যকালে যেমন অসৎ সঙ্গানুরাগী, অসৎদ্বিষয়ে উৎসাহী ও সাহসিক ছিলেন, এখন তিনি তেমনই সদ্বিষয়ে উৎসাহী ও সাহসিক হইলেন। এক সময় তিনি অবাধ্যতা

ও দুর্বৃত্ততা করিয়া পিতা ও মাতুলকে কাঁদাইয়া ছিলেন, এখন তিনি সদাচার ও বাধ্যতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে সুখী করিতে লাগিলেন। এখন তিনি পিতার খরিদা-ভূসম্পত্তি রক্ষা ও বিষয় কর্ম্মে মনোযোগী হইলেন ও কি প্রকারে মাতুলের সাধারণ হিতকর কার্য্যে অর্থ সাহায্য করিতে পারিবেন তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিষয় রক্ষার্থ মোকদ্দমাদি উপস্থিত হইলে তিনি সময়ে সময়ে মাতুলের নিকট অর্থ গ্রহণ করিতেন। একদিকে রাণাঘাট অপরদিকে বনগ্রাম হইতে ছয় ক্রোশ দূরে ইচ্ছামতি নদীর তীরে ১২৭৮ সালে জমীদারির জন্য একটী কাছারি ঘর নির্ম্মিত হয়। ১২৮০ সালে লক্ষ্মণচন্দ্র মাতুলের নিকট হইতে অর্থ লইয়া তথায় এক নীলকুঠী নির্ম্মাণ করেন এবং তাহার তত্বাবধানের ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন। খাঁটুরা-গ্রামে যখন প্রথম ব্রহ্মমন্দির স্থাপিত হয়, লক্ষ্মণচন্দ্র বিশেষ উদ্যোগী হইয়া পরিশ্রম ও অর্থ সাহায্য দ্বারা মাতুলের অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার পিতা অর্থ সাহায্যের পক্ষে বাধা প্রদান করেন। লক্ষ্মণচন্দ্র পিতার অসন্তোষ জনক ভাব দেখিয়া একদিন কলিকাতার বাটীতে তাঁহার চরণ ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলেন, "বাবা! আমি ব্রাহ্ম হইয়া মাতুলের পথাবলম্বী হইয়াছি বলিয়া আপনি কিছু চিন্তা করিবেন না। আর আমি আপনাকে অসুখী করিব না। আমি আপনার জমীদারি কার্য্য চালাইব। ব্রাহ্মদিগের পক্ষে বিষয় কার্য্য করা নিষিদ্ধ নহে। আমার ধর্ম্ম বিশ্বাসানুসারে আমি চলিব, তাহাতে আপনি কোন বাধা দিবেন না. ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। তাঁহার গ্রামস্থ আত্মীয় স্বজনের সহিত মতৈক্য হইত না এবং গ্রামে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় যথায় প্রথমে জমীদারি কার্য্যের জন্য এক খানি ঘর প্রস্তুত করিয়াছিলেন সেই স্থানে গিয়া লক্ষ্মণচন্দ্র আপন পিতৃনামানুসারে সেই স্থানের নাম "মঙ্গলগঞ্জ" রাখিয়া তথায় আশ্রম নির্ম্মাণানন্তর বসবাস করিয়া ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্ম প্রচারের একটী প্রশস্ত ক্ষেত্ররূপে পরিণত করেন। মঙ্গলগঞ্জের নীলকুঠির আয় হইতে "মঙ্গলগঞ্জ" ব্রাহ্মমিশন ও তাহার ফণ্ড সংস্থাপিত হয়। তদ্দ্বারা মিশন প্রেস সংস্থাপিত হইয়া সুলভ সমাচার ও কুশদহ নামে সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র ও প্রকাশিত হইয়াছিল। পিতা যখন মৃত্যু শয্যায় শয়ান ছিলেন, সেই সময় পিতার অজ্ঞাতসারে লক্ষ্মণচন্দ্র অসবর্ণ বিবাহ করেন। এই স্থলেই

লক্ষ্মণচন্দ্রের তাম্বুলিজীবন শেষ হয়। এজন্য তাঁহার জীবনের পরবর্ত্তী ঘটনার সহিত আমাদের সংস্রব নাই। লক্ষ্মণচন্দ্রের পিতৃবিয়োগ হইলে তিনি যে অতুল সম্পত্তির অধিকারী হন, উপরোক্ত কারণে সেই সম্পত্তি বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যাইয়া বর্ত্তে। ইহাতে মঙ্গলচন্দ্রের পত্নী ও দুহিতৃগণ সে বিভবের সর্ব্ব প্রকার সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইলেন। লক্ষ্মণ বাবুর প্রথম পক্ষের স্বজাতীয়া পত্নীর গর্ভ সম্ভূতা স্নেহলতা প্রবেশিকা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া স্যারজন মেজর রসিকলাল দত্তের পুত্রের সহিত পরিণীতা হন। এই বিবাহ ও অসবর্ণ প্রযুক্ত তাম্বুলি বংশের জন সংখ্যায় তাঁহার নাম দিতে পারা গেল না।

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় আশ বংশের জন সংখ্যা।

১ শ্রীহরিভূষণ আশ, ২ সত্যচরণ আশ ৩ প্রভাতচন্দ্র আশ ৪ হরিসাধন আশ ৫ মহেন্দ্রনাথ আশ ৬ অঘোরচন্দ্র আশ ৭ খগেন্দ্রনাথ আশ ৮ নিতাইচরণ আশ ৯ ভবঘোর আশ ১০ ব্রজেন্দ্রনাথ আশ ১১ শ্রীমন্তচন্দ্র আশ ১২ ভবনাথ আশ ১৩ জানকীনাথ আশ ১৪ নেপালচন্দ্র আশ ১৫ বিনয়কৃষ্ণ আশ ১৬ নরেন্দ্রকৃষ্ণ আশ ১৭ গোপালচন্দ্র আশ ১৮ শ্রীরামচন্দ্র আশ ১৯ কার্ত্তিকচন্দ্র আশ ২০ প্রমথনাথ আশ ২১ হৃদয়মাণিক আশ ২২ সতীশচন্দ্র আশ ২৩ রামকল্প আশ ২৪ সারদাচরণ আশ ২৫ ইন্দ্রভূষণ আশ ২৬ রামগোপাল আশ ২৭ পার্ব্বতীচরণ আশ ২৮ কালিচরণ আশ ২৯ তারিণীচরণ আশ ৩০ অমূল্যচরণ আশ ৩১ মহামূল্য আশ ৩২ রাজমোহন আশ ৩৩ রাজকুমার আশ ৩৪ প্রভাত-চন্দ্র আশ ৩৫ জানকীনাথ আশ ৩৬ শশীভূষণ আশ ৩৭ রামরতন আশ ৩৮ সৃষ্টিধর আশ ৩৯ হরিদাস আশ। স্ত্রীলোক ৪৮, বালক ২৩, বালিকা ১৫, সমষ্টি ১২৫।

কোঁচবংশ।

এই বংশের আদিপুরুষ কে তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। সম্ভবতঃ প্রভুরাম কোঁচ ২৪ পরগণার অন্তর্গত বাদুড়িয়া নামক স্থান হইতে আসিয়া হয়দাদপুরে বাস করেন। প্রভুরাম কোঁচের পুত্র ৺বান্ধকরাম কোঁচ।

ইহার দুই বিবাহ। প্রথম পক্ষের পুত্রের নাম শিবচন্দ্র এবং দ্বিতীয় পক্ষের দুই পুত্র—রামচন্দ্র ও মহেশচন্দ্র। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ শিবচন্দ্রের এক পুত্র—নাম উমেশচন্দ্র। উমেশচন্দ্রের দুই পুত্র—হরিপদ ও বিষ্ণুপদ। রামচন্দ্রের তিন পুত্র—রাজকৃষ্ণ, বনমালী এবং সৃষ্টিধর। রাজকৃষ্ণ ও বনমালী যমজ সহোদর ছিলেন। এ বিষয়ে একটী কিম্বদন্তী আছে, তাহা নিম্নে প্রকটিত করিলাম।

একদা রামচন্দ্র সস্ত্রীক বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার পত্নী দুইটী ব্রজবালককে দেখিয়া মনে মনে ইচ্ছা করেন, যে যদি এইরূপ দুইটী বালক আমার হয় তবে আমি তাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করি। অতঃপর তাঁহারা গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলে কিছুদিন পরে তাঁহার স্ত্রীর গর্ভসঞ্চার হয় এবং সেই গর্ভে দুইটী যমজ সন্তান প্রসূত হয়। ঐ সময় কলিকাতা শোভাবাজারে স্বরূপচন্দ্র ঘোষ নামক জনৈক সিদ্ধপুরুষ বাস করিতেন। তাঁহার আদি নিবাস ঘোষ পাড়া। ত্রিকালজ্ঞ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। রামচন্দ্রের সহিত স্বরূপঘোষের সখ্যতা থাকায় ঘোষ মহাশয় মধ্যে মধ্যে বড়বাজারে রামচন্দ্রের গদিতে যাইতেন। একদিন বাটী হইতে একজন লোক ঐ যমজ সন্তানদ্বয়ের পীড়ার সংবাদ লইয়া বড় বাজারে উপস্থিত হয়। রামচন্দ্র লোকমুখে পুত্রদ্বয়ের পীড়ার কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিমনা হইলেন এবং বাটী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, ইত্যবসরে স্বরূপ ঘোষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। রামচন্দ্র শশব্যস্তে তাঁহাকে একটী টাকা প্রণামী দিলেন। ঘোষ মহাশয় ঐ টাকা হাতে করিয়া বলিলেন, "রামচন্দ্র এ টাকাটী যে মেকি দেখিতেছি।" ইহা শুনিয়া রামচন্দ্র ব্যস্ততা সহকারে আর একটী টাকা বাহির করিয়া ঘোষ মহাশয়ের হস্তে প্রদান করিলেন। দ্বিতীয় মুদ্রাটীকেও ঘোষমহাশয় মেকি বলিলেন। তাহার পর আর এক টাকা দিতেই ঘোষ মহাশয় বলিলেন, "রামচন্দ্র! এই বার যে টাকাটী দিলে এইটী খাঁটি। অর্থাৎ এইবার যে তোমার পুত্র হইবে, সেইটীই স্থায়ী হইবে। এবং সেই পুত্রের দ্বারা তোমার বংশের গৌরব বৃদ্ধি হইবে। পূর্ব্বকার শে টাকা দুইটী মেকি বলিলাম তাহার অর্থ এই যে, ঐ যমজ সন্তান দুইটী বাঁচিবে না। তুমি বাটীতে যাইতেছ, যাও। তোমার সহিত পুত্রদ্বয়ের

সাক্ষ্যাৎ হইবে। এই বলিয়া ঘোষ মহাশয় চলিয়া গেলে, রামচন্দ্র গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রামচন্দ্র বাটীর নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, ইত্যবসরে ঐ পুত্রদ্বয় তাহার মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা! ঐ বাবা আসিতেছেন।" রামচন্দ্র বাটীতে পৌছিয়া দেখেন, পুত্রদ্বয় পৃথক্ পৃথক্ ঘরে শয্যাগত হইয়া পড়িয়া আছে। পিতাকে দেখিয়া পুত্রদ্বয় কহিল যে "আমাদের জন্য আপনি ক্ষোভ করিবেন না। আমাদের সময় হইয়াছে। অতএব আমরা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করি। আমরা এতদিন চলিয়া যাইতাম, কেবল আপনার সহিত সাক্ষ্যাৎ করিবার অভিলাষে এখনও অপেক্ষা করিতেছি। যাহাহউক, আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইয়াছে। এক্ষণে প্রসন্নমনে আমাদিগকে বিদায় দিন। আমরা নিজ স্থানে চলিলাম।" রামচন্দ্র পুত্রদ্বয়ের মুখে এই কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার পত্নী কাতর ও করুণস্বরে বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন; রাজকৃষ্ণ, বনমালি! তোরা এই অভাগিনীকে ফেলিয়া কোথায় যাইতেছিস্? বাপ্‌রে! আমি তোদের ছাড়া হইয়া কি প্রকারে জীবন ধারণ করিব? তাহাতে ঐ বালকদ্বয় কহিল যে, আপনার কি স্মরণ হইতেছে না? একদা বৃন্দাবনে দুইটী ব্রজবালককে দেখিয়া আপনি মনে মনে বলিয়াছিলেন যে যদি আমার এইরূপ দুইটী সন্তান হয় তাহা হইলে আমি কিছুদিন লালন পালন করি। আমরা সেই জন্য আপনার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া এই দ্বাদশবর্ষ কাল সুখে কাটাইলাম। এক্ষণে আমরা বিদায় প্রার্থনা করিতেছি। ইহাতে তাহাদের মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, বাবা! আর কি তোদের দেখা পাইব না? একেবারেই কি তোরা এই অভাগিনীকে ত্যাগ করিয়া যাইবি? তাহাতে পুত্রদ্বয় কহিল, যে "পুনরায় যখন ৺ কাশীধামে যাইবেন, সেই সময়ে অন্নপূর্ণার বাটীর দ্বারদেশে আপনার সহিত সাক্ষ্যাৎ হইবে। এই কথা বলিতে বলিতে পুত্রদ্বয়ের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

এই ঘটনার বহুকাল পরে একদা রামচন্দ্র সস্ত্রীক কাশীধামে গমন করেন। ঐ সময় পুত্রদ্বয়ের মৃত্যুকালীন ভবিষ্যৎবাণী তাঁহার পত্নীর স্মরণ ছিল না। অতঃপর অন্নপূর্ণার দ্বারদেশে এক দিন দুইটী বালক রামচন্দ্রের পত্নীকে

সম্বোধন করিয়া বলে, যে "মা! আমরা প্রতিশ্রুত ছিলাম, যে অন্নপূর্ণার বাটীতে দেখা হইবে। কিন্তু মা! তোমার তাহা স্মরণ ছিল না। যাহাহউক, আমাদের সহিত এই শেষ দেখা।" এই কথা বলিয়াই ঐ বালকদ্বয় অন্তর্হিত হইয়া গেল।

রামচন্দ্রের তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কোঁচ বংশের মধ্যে সৃষ্টিধরই স্বনামধন্য পুরুষ এবং বংশের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান। ইঁহার ব্যবসাবুদ্ধি এরূপ প্রবল ছিল, যে ইঁহাকে মহাজনদিগের মধ্যে শীর্ষস্থান প্রদান করিলেও অসঙ্গত হয় না। ইনি যে কেবলমাত্র অর্থ উপার্জ্জন করিতে শিখিয়াছিলেন তাহা নহে, উপার্জ্জিত অর্থের কি প্রকারে সদ্ব্যয় করিতে হয়, তাহাও জন সাধারণকে শিখাইয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা ১৩০৮ সালের শ্রাবণ মাসের "মহাজন বন্ধু" ৬ষ্ঠ সংখ্যা হইতে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী উদ্ধৃত করিলাম।

"চিনিপটির কর্ম্ম-পরিচালনের রীতি-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন-সংস্কারাদির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে, সৃষ্টিধরকেই স্মৃতিপথে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার এই বুদ্ধিমত্তাই যে কেবল তাঁহার মহত্ত্বের কারণ, তাহা নহে,—বদান্যতায়—বিশেষতঃ! বর্ণগুরু ব্রাহ্মণগণের পোষণাদি ব্যাপারে—তাঁহার যশঃ—সৌরভ দিগন্ত-প্রসৃত হইয়াছিল। তাঁহার জীবনী বোধ হয়, মহাজন মাত্রেরই আদর্শবোধে বিশিষ্টরূপ বোধ্য ও অবগম্য বলিয়া তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদানে প্রবৃত্ত হইতেছি।

এই মহাপুরুষ চব্বিশপরগণার অন্তঃপাতী গোবরডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী হয়দাদপুর গ্রামে ১২৪১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺রামচন্দ্র কোঁচ। রামচন্দ্র কোঁচ মহাশয় বেশ সম্পন্ন লোক ছিলেন। তাম্বুলী-সমাজের মধ্যে রামচন্দ্র কোঁচ মহাশয় স্বচেষ্টায় বিবিধ ব্যাপারে ভগবৎকৃপাবলম্বনে স্বীয় ভাগ্যোদয়ের সহিত বেশ মান মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া জীবনাতিপাত করেন; সুতরাং আমাদিগের বর্ণনীয় জীবনচরিতের বিষয়ীভূত কোঁচ মহাশয় স্বীয় শুভাদৃষ্ট-বশে সম্পন্নপরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বজাতি-প্রতিপালনেও দরিদ্র-পোষণে যথাশক্তি মহত্ত্বের পরিচয় দিতে কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটি করেন নাই। বর্ত্তমান ভাগ্যলক্ষ্মীর অঙ্কশায়ী সুখাভিলাষী সম্পন্নযুবকদিগের

ন্তায় তাঁহার স্বাভিলাষপূরণে কেবল বিলাস-বিভ্রমের পরিচয় একদিনের জন্যও কেহ পাইয়াছেন বলিয়া শোনা যায় না। বিশিষ্ট অবধানতার সহিত তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিতে গেলে, মনে হয়, বর্ত্তমান শিক্ষা-দীক্ষার অভাবেই তাঁহার চরিত্র-বিকার ঘটে নাই। তাঁহার শিক্ষা তাৎকালিক দেশ-প্রচলিত ব্যবহারের উপযোগী পাঠশালায় বাঙ্গালা হিসাবে সম্পন্ন হইয়াছিল। তাঁহার জীবনের মধ্যভাগে পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষার প্রবল অধিকারের দিনেও, তাঁহার সেই অলৌকিকী শক্তি প্রতিহত হয় নাই। অথচ নিজে অনধিগত হইলেও, শিক্ষা বিষয়ে বিরাগের অভাবে বরং যথেষ্ট অনুরাগেরই কার্য্যতঃ প্রকাশ হইয়াছিল; তিনি অনেক দরিদ্র-সন্তানের উচ্চশিক্ষা-লাভে সাহায্য করিয়াছেন।

তাঁহার বাল্যজীবনের শিক্ষালাভের পর, কৈশোরে কার্য্যক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ হয়; তিনি পিতৃনিদেশে—স্বদেশের উপকণ্ঠে—বৈকাঁমা নামক স্থানের জলকষ্ট-নিরাকরণ করিবার জন্য, একটী প্রশস্ত পুষ্করিণীর খননকার্য্যের পরিদর্শনে ব্যাপৃত হন। আর এই দেশেও দশের হিত-চিকীর্ষায় এই পুণ্যময় ইষ্টাপূর্ত্তের সাধনে প্রথম ব্রতী হইয়াই, স্বীয় প্রকৃতির উপযুক্ত বৃত্তিতে বেশ শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন; দান ধর্ম্মের কার্য্যে ইহার কর্ম্মক্ষেত্রের অক্ষর পরিচয় বা প্রবেশ-প্রারম্ভ ঘটায়, ইনি যেন চিরদিনের জন্যই স্বকর্ম্মে সেই পুণ্যব্রতের সাধনে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছিলেন। মনে হয়, তাঁহার জীবন "ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ"—এই প্রবচনের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

তিনি পিতৃনিদেশ-প্রতিপালনে সবিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়া, পিতার আনন্দ বর্দ্ধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই, তাঁহার ব্যবসায় কার্য্যের শিক্ষানুশীলনের অনুকূল ব্যবস্থা করিতে কলিকাতায় চিনিপটির গদীতে তাঁহাকে আনয়ন করেন। তখনও বেঙ্গল সেণ্ট্রাল রেলওয়ের পত্তন-প্রস্তাব অণু-মাত্রও কল্পিত জল্পিত হয় নাই।—তখন কলিকাতা হইতে গোবরডাঙ্গায় যাইতে শকটযোগে প্রায় দেড় দিন সময় লাগিত,—পান্থশালাদিতে অবস্থান জন্য যথেষ্ট কষ্টস্বীকারও করিতে হইত। এই জন্য, গোবরডাঙ্গা অঞ্চলের লোকজনের পক্ষে কলিকাতায় যাতায়াত সবিশেষ অসুবিধাজনক থাকায়, রামচন্দ্র কোঁচ মহাশয়, পুত্র স্থষ্টিধরের কলিকাতায় অবস্থান জন্য, আহীরী-

টোলা হালদার পাড়ায় একটি বাটী ক্রয় করেন। পরে সৃষ্টিধর কোঁচ মহাশয় বাণিজ্য-ব্যপদেশে কমলার অর্চনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে স্বভাগ্যোন্নয়নে ঐ পিতৃক্রীত কলিকাতা-আবাসের শ্রীবৃদ্ধি ও পরিমাণ বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। এক্ষণেও সেই প্রাসাদোপম হর্ম্ম্যাবলীর মনোজ্ঞ দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁর জীবনে কেবল বাটীর উন্নতি নহে, ইনি কলিকাতায় বড়বাজার অঞ্চলে অনেকগুলি বাটী ক্রয় করেন। পরন্তু কর্ম্মস্থানের মমতায় আকৃষ্ট হইয়া স্বদেশ হয়দাদপুরকেও ভুলেন নাই,—ইহাঁর প্রিয় জন্মভূমি হয়দাদপুরেও প্রশস্ত উদ্যান অট্টালিকাদি দ্বারা তথাকার অলঙ্কার-বিধানে শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া দিয়াছিলেন। কলিকাতার উপনগরেও উদ্যানাদির সংস্থান করিয়া তদুৎপন্ন দ্রব্যাদির বিতরণে প্রতিবেশীদিগের তুষ্টিসাধন করিতেন। ব্যবহারতঃ তিনি স্থানীয় পরিচিত লোকদিগের নিকট বেশ সদালাপী, সদ্ভাবী ও সদ্ব্যবহারী বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেন।

চিনিপটির গদীতে আসিয়া অতি অল্প কালের মধ্যেই স্বীয় স্বাভাবিকী প্রতিভার পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইনি বিনয়, নম্রতা এবং সত্যনিষ্ঠায় অনেকের প্রিয়পাত্র হইয়া পড়েন। এই সকল সদ্গুণের জন্য তিনি তাৎকালিক ভারতের শর্করা-ব্যবসায়ের ভিত্তি স্বরূপ আমদানীকারী ব্যাপারীদিগকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তখন ভারতীয় চিনিতে দেশ বিদেশের মিষ্ট রসের আস্বাদন করাইতে হইত। তখন ভারতের চিনির অভাবে অন্যদেশের লোকের মিষ্ট রসাস্বাদের অন্তরায় ঘটিত। সেই সময় ভারতে শর্করা-শিল্পের প্রবল প্রসার ছিল—দেশী চিনির বৈদেশিক ব্যবসায়ের স্রোত একটানে চলিয়াছিল! এই সকল দেশী চিনির বিক্রয়ে প্রতি মণে তিন আনা হিসাবে কমিশনের ব্যবস্থা ছিল,—এখনও ঐ কমিশনীর বন্দোবস্ত আছে; কিন্তু সে ব্যবসায় এখন আর নাই; এখন বৈদেশিক চিনির প্রতিযোগিতাতে দেশী চিনির ব্যবসায় নষ্টপ্রায়। পূর্ব্বে দেশীয় চিনির ব্যবসায়ে বড়বাজারের দোকানদার—বা আড়তদারদিগের প্রতি মণে তিন আনা লাভ ছিল—লাভ লোকসানের দায় দফায় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত না। এখন বৈদেশিক চিনি ক্রয় করিয়া বিক্রয় করিতে গিয়া বাজারদরে লাভ লোকসান দুই-ই স্বীকার করিতে হয়। এক্ষণে বৈদেশিক চিনির ব্যবসায়ে

বিস্তর ক্ষতির আশঙ্কা আছে। পূর্ব্বে এই দেশী চিনির ব্যবসায়ে ক্ষতির আশঙ্কা না থাকায়, ব্যবসায়ীগণ নিরাতঙ্ক মনে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতে সমর্থ হইতেন। আমাদিগের সৃষ্টিধর বাবুও এইরূপ লাভকর ব্যবসায়ে বিশিষ্ট লাভবান্ হইয়াছিলেন।

ক্রমশঃ অর্থী হইয়া উঠিলে পর, ইনি চিনিপটির অপরাপর মহাজনদিগের আবশ্যকমত অর্থ প্রদান করিয়া কুসীদ গ্রহণে সঞ্চিত অর্থের ক্রমবৃদ্ধির পথ প্রসারিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। আবার যেমন অর্থের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তেমনই আত্মীয় এবং স্বদেশীয়দিগের পোষণকল্পে মধ্যে মধ্যে দোকান করিয়া দিয়া, তাহাদিগের কর্ণে ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রাসাদার্জ্জন মূলমন্ত্রের বীজ দান করিতে লাগিলেন। এইরূপে স্বজাতির মুখোজ্জ্বল করিতে যখন তাঁহার অদম্য উদ্যম--অসীম আগ্রহ, সেই সময় তাঁহার পিতা রামচন্দ্র কোঁচ যথাকালে উপরত হন। শুনা যায়, তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির সময় তাৎকালিক জীবিত একমাত্র সন্তান সৃষ্টিধর বাবু ও অন্যান্য তৎসংশ্লিষ্ট পরিবারবর্গ ১৭,০০০ সতের হাজার টাকা পাইয়াছিলেন। রামচন্দ্র কোঁচ মহাশয়ের ভ্রাতা মহেশচন্দ্র কোঁচের পুত্র নীলকমল বাবুও ঐ টাকার অংশ পাইয়া বিগলিত হন নাই; তবে ইঁহাদিগের এক পরিবারবর্ত্তী অপর স্বগোষ্ঠীয়—রামচন্দ্র কোঁচ মহাশয়ের পিতা মাতার অপর সন্তানের বংশস্রোতালব্ধ—উমেশচন্দ্র কোঁচ ইঁহাদের সঙ্গে উপযুক্ত অংশ লইয়া পৃথক্ হইয়াছিলেন। এক্ষণেও তাঁহার বংশধরগণ হরিপদ এবং বিষ্ণুপদ বাবু প্রভৃতির ব্যবহারে সম্পূর্ণ না হইলেও, আংশিক স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়।

তৎপরে কর্ম্মবীর সৃষ্টিধর কোঁচের জীবনের অন্য এক নূতন অঙ্কের সূত্রপাত হইল। তিনি চিনিপটিতে দেশী চিনির পার্শ্বে কলের চিনিকেও আশ্রয় দিলেন। পূর্ব্বে যখন কাশীপুরে চিনির কলের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন দেশের লোকের কলের চিনিতে যথেষ্ট বিরাগ ছিল। কেবল সাহেবদিগের জন্য ধর্ম্মতলায় ঐ কলের বিশুদ্ধ চিনি বিক্রয় চলিত। কোঁচ মহাশয় চিনিপটিতে এই কলের চিনি আমদানী করিয়া প্রথমতঃ দেশী কাচা চিনির বিক্রয়েও দ্বিতীয়তঃ কলের বিশোধিত শুভ্র চিনির বিক্রয়ে—যথেষ্ট প্রসার করিয়া দেন। এই প্রথায় কাজ করায়, এদেশে কলের কার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি-

সাধন-কল্পে একমাত্র কোঁচ মহাশয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হয়। ইঁহারই উদ্যমও চেষ্টায় দেশে দেশীচিনির পার্শ্বে কলের চিনির স্থান হওয়ায় ব্যবসায়ের প্রসার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। চিনির প্রধান উৎপত্তিস্থান—শর্করা-শিল্প ব্যবসায়ের প্রধান অধিষ্ঠান – কোটচাঁদপুরের কলের চিনি ব্যবসায়প্রসার করিতে—ইনি নিজে কমিশনের এজেণ্ট হন।

ব্যবসায়-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহার দৃষ্টি বিবিধ ব্যবসায়ে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল;—ইনি চিনির সহিত ঘৃতের ব্যবসায় করিতেছিলেন পূর্ব্ব হইতে। অপরতঃ অর্থসাহায্যে স্বীয় ভাগিনেয়দিগের শিক্ষাবিধানে যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়া, তাঁহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী করিয়া তুলেন। পরে পাটের ব্যবসায়ে বৈদেশিকদিগের বিশিষ্টরূপ সংস্রব থাকায়, ইংরেজীবিৎ ভাগিনেয়দিগের উপযোগী বলিয়া বোধ করায়, তাঁহাদিগের নামে "চেল এবং পাল কোম্পানী" নামে একটী পাটের গাঁটের ব্যবসায় করেন। এক্ষণেও সেই গাঁটের মার্কা বেচিয়া, বৎসর প্রতি পাঁচ ছয় হাজার টাকা আয় হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত তিনি বেশ সরল বিশ্বাসী লোক ছিলেন; এমন কি দীন দরিদ্রগণ একবার তাঁহার নিকট সকাতর প্রার্থনা করিতে পারিলে, অমনই তাহার প্রতি যে কোনরূপ কার্য্যের ভার অর্পণ করিতে ত্রুটি করিতেন না। তিনি এমনই দয়ার্দ্রচিত্ত ছিলেন, যে, জানিয়া শুনিয়াও, অনেক অকর্ম্মণ্যের কর্ম্মবিধানচ্ছলে তাহাদিগকে অন্নদান করিতেন। ইহাঁর আশ্রয়ে থাকিয়া অনেকে বেশ ধনী হইয়াছেন।

ইহাঁর কর্ম্মজীবনে যে পুণ্যব্রতের সূত্রপাতের পরিচয় দিয়া, ভাবী সৎকীর্ত্তির সূচনা করিয়াছি, তাহার ভূরিষ্ঠ পরিচয় তাঁহার জীবনে অনেক আছে; এস্থলে তাহার একটির আমরা পরিচয় দিতেছি,—প্রায় ২০ বিশ বৎসর অতীত হইতে চলিল, যখন দেশে একবার ভীষণ বন্যার সূত্রপাত হয়, তখন সৃষ্টিধর বাবু প্রত্যেক বন্যা-পীড়িত লোকের নিকট নৌকারোহণে উপনীত হইয়া, নিজে অন্নবস্ত্রের সহিত কর্ত্তব্যবোধে অর্থদান করিয়াছিলেন। এই সদনুষ্ঠানের ফলও ভগবদনুকম্পায় ঘটিয়াছিল বেশ। তাঁহার এই লোকহিতৈষণা মূলা

সৎকীর্ত্তির জন্য, তাৎকালিক গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর ইহাকে মহামান্যসূচক প্রশংসা পত্র প্রদান করেন।

ইহা ত সরকারীদানে মর্য্যাদা-বৃদ্ধির কথা। কিন্তু তাঁহার ক্রিয়াকলাপের পর্য্যালোচনায় মনে হয়, তিনি মর্য্যাদাবৃদ্ধির জন্য দান করিতেন না। তাঁহার ন্যায় সরলপ্রকৃতি, আত্মম্ভরিতাশূন্য, নিরহঙ্কার, নিষ্ঠবান্ লোকের ঐরূপ হীন দানে আস্থা থাকা অসম্ভব। তাই আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি, তিনি গুপ্তদানপ্রিয় ছিলেন; তিনি অনেক বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যার পোষণ, অনেক দরিদ্র পরিবারের আহার-বিধান করিয়া নিঃশব্দে জীবনাতিপাত করিতেন।

এতদ্ব্যতীত ব্রাহ্মণ-পোষণে তাঁহার আগ্রহ জীবনের প্রাক্‌কাল হইতে। মধ্যে তাঁহার প্রতিযোগী কোন ব্রাহ্মণ-জমীদার ব্রাহ্মণগণের পক্ষে তাম্বুলীর দানগ্রহণ অন্যায় বলিয়া, ভ্রষ্টাচারিত্বের আরোপ করিতে ত্রুটী করেন নাই। ঐ সময় সৃষ্টিধর বাবু স্বীয় বদান্যতায় প্রতিকূলতার দূরীকরণোদ্দেশে নূতন একটি ব্রাহ্মণের শ্রেণীর বা সমাজের গঠন করেন;—ইহা নিত্য সমাজ বা সৃষ্টিধরের সমাজ বলা হয়। চিনিপটির বারোইয়ারীতেইহার যথেষ্ট ক্ষমতা থাকায়, ইনি তাহাতেও অধ্যাপক-পণ্ডিত-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন। ইহা ভিন্ন পূজা-পার্ব্বণোপলক্ষে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন।

জীবনের শেষ দশায় ইনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র-বাবু সত্যপ্রিয় কোঁচ মহাশয়কে স্বীয় কারবার-পত্র বুঝাইয়া দিয়া, অবসর গ্রহণ করেন। ইনিও পিতার পরামর্শ গ্রহণে তাঁহার ন্যায় লোক-প্রতিপালক হইয়া উঠেন। কার্য্যের শ্রীবৃদ্ধিও সত্যবাবুর দ্বারা যথেষ্ট হইয়াছে।

এইরূপে কিছুকাল অবসর গ্রহণের পর ইনি ১৩০৬ সাল ২৩শে শ্রাবণ তারিখে ইহধাম ত্যাগ করিয়া স্বর্গগত হইয়াছেন। সেই দিন- চিনিপটির ব্যবসায়-সংক্রান্ত শুভাদৃষ্টে ভীষণ বজ্রাঘাত ঘটিল! চিনিপটির ইতিহাসে ২৩শে শ্রাবণ একটি অশুভ দিন ধরিতে হইবে।

ইনি সহিষ্ণুতার মূর্ত্তিমান্ অবতার ছিলেন। কারণ, যাঁহারই ইনি উপকার করিরয়াছেন, প্রায় তাঁহারাই ইহার কিছু না কিছু অনিষ্ট করিয়াছেন।

কিন্তু তিনি ঐরূপ বিরুদ্ধাচরণে প্রায়ই সহসা বিচলিত হন নাই। আরও সাংসারিক শোক-তাপে তাঁহার জীবনে অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের অঙ্ক দেখা যায়। তাহাতেও ইঁহার মতিভ্রংশ ঘটে নাই বলিয়া অনেকের মুখে শুনা যায়। তাঁহার পর আরও একটি সহিষ্ণুতার কথা বিশ্বস্তসূত্রে শোনা গিয়াছে। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় ডাক্তার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারি পদস্ফুট রোগে অস্ত্র-চিকিৎসায় সময় তিনি অবিচলিত চিত্তে নির্ভীকভাবে স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন। সেই সময়ে উক্ত ডাক্তার যে অংশে অস্ত্রপরিচালনা করিয়াছিলেন, তাহা যেন তাঁহার নিজের নহে, তিনি এইরূপ ভাব দেখাইয়াছিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া উক্ত ডাক্তার দত্ত মহাশয়কেও সম্পূর্ণ বিস্মিত হইতে হইয়াছিল। পূজা-পার্ব্বণে, অন্নদানে কিছুতেই ইনি ব্যয়-কুণ্ঠ ছিলেন না। ইনি ব্যবসায় হইতে অতুল ঐশ্বর্য্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

৺বালকরাম কোঁচের দুই পুত্র; যথা, ৺রামচন্দ্র কোঁচ এবং ৺মহেশচন্দ্র কোঁচ। তৎপরে ৺রামচন্দ্র কোঁচের তিন পুত্র; যথা, ৺বনমালী কোঁচ, ৺রাজকৃষ্ণ কোঁচ এবং ৺সৃষ্টিধর কোঁচ। পরন্ত ৺মহেশচন্দ্র কোঁচের তিন পুত্র,—৺নীলকমল কোঁচ, ৺রামকমল কোঁচ এবং ৺রামযদু কোঁচ। ইহার মধ্যে ৺নীলকমল কোঁচের দুই পুত্র,—শ্রীযুক্ত দ্বিজরাজ কোঁচ এবং শ্রীযুক্ত যোগজীবন কোঁচ।

৺সৃষ্টিধর কোঁচ মহাশয়ের তিন পুত্র; শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রিয় কোঁচ, শ্রীযুক্ত বাবু হরিপ্রিয় কোঁচ এবং ৺ধর্ম্মপ্রিয় কোঁচ।

শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রিয় কোঁচ মহাশয়ের সাত পুত্র,—শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ, শ্রীযুক্ত নিমাইকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত নিতাইকৃষ্ণ, শ্রীযুক্ত চৈতন্যকৃষ্ণ, শ্রীযুক্ত অদ্বৈতকৃষ্ণ, শ্রীযুক্ত মহাকৃষ্ণ এবং শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ কোঁচ।

ইঁহারা সকলেই স্বদেশহিতৈষী, সাহিত্যসেবী, দীন-প্রতিপালক, সদাশয়, এবং পরোপকারী। ভগবান্ ইঁহাদের মঙ্গল করুন।

বিশেষতঃ বাবু হরিপ্রিয় কোঁচ এবং বাবু দ্বিজরাজ কোঁচ মহাশয়দ্বয় "মহাজনবন্ধুর" বিশেষ পৃষ্ঠপোষক এবং উৎসাহদাতা।"

রামচন্দ্রের সময়ের একটী ঘটনা লিখিতে অবশিষ্ট আছে। এক্ষণে তাহা

বিবৃত করা যাইতেছে ;—খাঁটুরার সন্নিকট গাঙ্গনার বামতীরে নবাপাটনী নামক এক ব্যক্তি বাস করিত। ঐ ব্যক্তির সহিত রামচন্দ্রের বিশেষ প্রণয় ছিল। নবাপাটনী খুব বুজরুকি জানিত। অদ্যাপি এখানে এরূপ প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় যে, এতদ্দেশে যদি কেহ উৎকট পীড়াগ্রস্ত হইত এবং কোন চিকিৎসায় আরোগ্য না হইলে নবাপাটনীকে ডাকাইয়া আনিলে সে ঐ রোগীকে আরোগ্য করিত। বুজরুকি বলেই হউক, বা কোন মন্ত্র বলেই হউক, সে উৎকট উৎকট পীড়া আরাম করিত। এই নবাপাটনীর প্রতি রামচন্দ্রের অটল ভক্তি ও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। একদা রামচন্দ্রের ভ্রাতুষ্কন্যা ভূজঙ্গিণী দাসীর কোন কঠিন পীড়া হয় এবং অনেক চিকিৎসকের দ্বারা আরোগ্য না হওয়ায় নবাপাটনীকে ডাকা হয়। নবাপাটনী উপস্থিত হইয়া রোগীকে দেখিয়া কহিল যে, এ রোগী নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। তজ্জন্য তোমরা চিন্তিত হইও না। এই বলিয়া উক্ত পাটনী সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিল। অনেকেই বলিয়াছিল যে, ঐ রোগী কিছুতেই আরোগ্য হইবে না। কিন্তু নবাপাটনীর অসাধারণ ক্ষমতায় ঐ রোগী আরোগ্য হইল।

যাহাহউক রামচন্দ্র কুলোজ্জ্বলকারী পুত্র সৃষ্টিধরকে রাখিয়া আনুমানিক ৮৪।৮৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইহধাম ত্যাগ করেন।

মধুকৌল্য গোত্রীয় কোঁচ বংশের জন সংখ্যা।

১ শ্রীশ্যামাচরণ কোঁচ ২ সত্যপ্রিয় কোঁচ ৩ হরিপ্রিয় কোঁচ ৪ ধর্ম্মপ্রিয় কোঁচ ৫ বিনয়কৃষ্ণ কোঁচ ৬ দ্বিজরাজ কোঁচ ৭ যোগজীবন কোঁচ ৮ হরিপদ কোঁচ ৯ বিষ্ণুপদ কোঁচ ১০ হরিপদ কোঁচ। স্ত্রীলোক ১৫, বালক ১২, বালিকা ১৩, সমষ্টি ৪৭।

প্রামাণিক রক্ষিত বংশ।

সন ১২৪৭ সালে ৪ ঠা চৈত্র তারিখে খাঁটুরা গ্রামে রামগোপাল রক্ষিত জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম কেদারনাথ রক্ষিত। কেদারনাথ

গোবরডাঙ্গায় একখানি তুলার দোকান করিয়া কোনরূপে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। ইহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ রামগোপাল এবং কনিষ্ঠ নেপালচন্দ্র। খাঁটুরা গ্রাম নিবাসী কেদারনাথ পালের কন্যার সহিত রামগোপালের প্রথম বিবাহ হয়। তাঁহার গর্ভে একটি কন্যা জন্মে। রাম-গোপাল কোন কারণে একদা পিতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া কলিকাতায় আগমন করেন এবং উমেশচন্দ্র রক্ষিত মহাশয়ের দোকানে কার্য্য শিক্ষা করিতে থাকেন। রামগোপালের তীক্ষ্নবুদ্ধি ও কার্য্যকুশলতা দেখিয়া উমেশ বাবু মাসিক পাঁচ টাকা বেতন ধার্য্য করিয়া দেন। কিছু দিন এইরূপে গত হইলে রামগোপাল কার্ত্তিকচন্দ্র রক্ষিতের সহিত মিলিত হইয়া কলিকাতায় বড়বাজারে চিনিপটীতে একটি ঘৃত চিনির দোকান করেন। চাঁদপুরে চিনির মোকাম ছিল। ঐ কারবারে স্বর্গীয় কেদারনাথ পাল সর্ব্ব বিষয়ে জামাতার সাহায্য করিতেন। ঘৃত চিনির কার্য্য করিয়া রামগোপালের অবস্থা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। এই সময় হইতে রামগোপাল বাটীতে শারদীয়া পূজা ও অন্যান্য ক্রিয়া-কলাপ করিতে আরম্ভ করেন। অতি অল্প দিনের মধ্যে রামগোপাল অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ইনি কলিকাতা সূতাপটীতে সূতার দোকান করেন। সূতার কার্য্য করিয়াও ইনি বিশেষ লাভবান হন। অনন্তর রামগোপাল ১২৯৫ সালে ১১ই আশ্বিন গোবরডাঙ্গায় ষ্টেশনের নিকট দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। ঐ চিকিৎসালয় এতকাল তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র হরিবংশ রক্ষিত কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছিল। এই চিকিৎসালয়ে সাধারণতঃ প্রত্যহ ১০০ একশত রোগী চিকিৎসিত হইয়া থাকে। রামগোপালের জীবনে ইহাই প্রধান কীর্ত্তি। প্রথমা স্ত্রীরগর্ভে আদৌ পুত্র সন্তান না হওয়ায় রামগোপাল দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন এবং প্রায় ৫২ বৎসর বয়সে এক পুত্র সন্তান লাভ করেন। সন ১৩০২ সালে ৯ই জ্যৈষ্ঠ রামগোপাল ৫৫ বৎসর বয়ঃক্রমে আত্মীয় স্বজনগণকে কাঁদাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ইনি একজন বুদ্ধিমান ও ক্রিয়াবান লোক ছিলেন।

যাহাহউক রামগোপাল রক্ষিতের মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতষ্পুত্র হরিবংশ ঐ সূতার কার্য্য দশমাস কাল চালাইয়া ছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে সূতার

কার্য্যে আনুমানিক ১০০০০।১২০০০ টাকা লাভ হয়। অতঃপর হরিবংশ একক বিধায়ে ঐ কার্য্য তুলিয়া দেন। তৎপরে দিননাথ দাঁ নামক জনৈক লোক ঐ ফারম খুলেন। তিনিও পাঁচ বৎসর কাল ঐ কার্য্য চালাইয়া সন ১৩০৭ সালে তাঁহার উপযুক্ত পুত্রদ্বয়ের মৃত্যুতে ঐ কার্য্য বন্ধ করিয়া দেন।

রামগোপাল রক্ষিতের ভ্রাতুষ্পুত্র হরিবংশ রক্ষিতের জীবনী "মহাজন বন্ধু" হইতে উদ্ধৃত করা গেল।

"৺ ধরণীধর রক্ষিতের এক পুত্র ৺ কেদারনাথ রক্ষিত। কেদারনাথের দুই পুত্র এবং আট কন্যা হয়। তাঁহার দুই পুত্রের নাম ৺ রামগোপাল রক্ষিত এবং ৺ নেপালচন্দ্র রক্ষিত। পরন্তু কন্যাগুলির মধ্যে উপস্থিত কেহই বর্ত্তমান নাই। কেদারনাথ মৃত্যুর পূর্ব্বে উক্ত পুত্রদ্বয়ের হস্তে কুড়ি হাজার টাকা দিয়া যান,—এইরূপ প্রবাদ। তিনি গোবরডাঙ্গায় চিনির কারখানার কর্ম্ম চালাইতেন। তখন চিনিরপটীর কারবার ছিল না। পল্লিগ্রামে কার্য্য করিয়া উপায়ের অবশিষ্টাংশ বিশ হাজার টাকা রাখিয়া যাওয়া, বড় সহজ কথা নহে। পরন্তু গ্রাম মধ্যে তিনি একজন মান্য গণ্য বলিয়াই খ্যাতি প্রতিপত্তি পাইয়াছিলেন।

কেদারনাথ স্বর্গারোহণ করিলে পর, তাঁহার পুত্রদ্বয় ৺ রামগোপাল রক্ষিত এবং ৺ নেপালচন্দ্র রক্ষিত—দুই ভ্রাতায় কিছুদিন পিতার সেই চিনির কারখানা চালাইতে চালাইতে কার্য্যের সৌকার্য্যার্থক কর্ম্ম বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন; কনিষ্ঠ ভ্রাতা উক্ত কারখানা লইয়া থাকিলেন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামগোপাল রক্ষিত মহাশয় চিনিপটীতে আসিয়া, চিনির দোকান খুলিলেন। তখন সামান্য ভাবে কলিকাতায় তাঁহাদের চিনির ব্যবসায়ের প্রারম্ভ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু কর্ম্মক্রমে যেমনি সাধারণের নিকট পরিচিত ও সঙ্গে সঙ্গে চিনির ব্যবসায়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায়, তাঁহাদিগের ক্রিয়াকলাপও তেমনি অপূর্ব্ব শ্রীতে সুশোভিত হইল। এই কারবারে কেবল অনেকের প্রতিপালন নহে, যেন ইহাদের আশ্রিত প্রতিপালন-পুণ্যে ক্রমশঃ ব্যবসায় উজ্জ্বলতর হইয়া জগতে অতুলৈশ্বর্য্যের শুভ ফলের প্রকৃষ্ট প্রমাণ দর্শাইতে লাগিল।

কিছুদিন পরে ব্যবসায়ের প্রসার করিতে ৺ রামগোপাল রক্ষিত মহাশয় সূতাপটীতে এক বৃহৎ সূতার কার্য্য করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে অনেক ক্ষতি

এবং অনেক লাভও হইয়াছিল। উক্ত রক্ষিত মহাশয়ের সূতার দোকানের জনৈক কর্ম্মকর্ত্তা বলেন,—সূতার কার্য্যে,—১২৯৩ সালে ৫,৫০০ ক্ষতি, ১২৯৪ সালে ২৩,০০০ লাভ, ১২৯৫ সালে ৩৫,৫০০ লাভ, ১২৯৬।৯৭।৯৮ সালে ৫৯,০০০ ক্ষতি, ১২৯৯ সালে ৮০,০০০ লাভ, ১৩০১ সালে ১৮০০০ ক্ষতি, ১৩০২ সালের ৯,০০০ লাভ।

যুবক হরিবংশ কলিকাতার আর্য্যমিশনে কিছুদিন পড়িয়াছিলেন। পিতা বহুদিন অগ্রে মারা যান, জ্যেষ্ঠতাত রামগোপাল রক্ষিতের পর ইনি অতুলৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া, ১৩০৩ সালে পিতৃব্যবিয়োগে উক্ত সূতার কার্য্যে লাভ ক্ষতির কালবিচারের সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া, সূতাপটীর কার্য্য তুলিয়া দিয়া, কেবল চিনির কার্য্য এবং গোবরডাঙ্গার পৈতৃক দুইটী চিনির কারখানা নিজের হস্তে রাখিলেন।

৺ নেপালচন্দ্র রক্ষিত।—হরিবংশ বাবুর পিতা, দুই বিবাহ করেন। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর অগ্রে সন্তান হয় নাই, এজন্য "হরিবংশ" পাঠরূপ ব্রতোদ্‌যাপন করিয়া, তৎপুণ্যফলে হরিবংশ বাবুর জন্ম হয়। তাই বলিয়া তিনি তাঁহার পিতার একমাত্র অপত্য নহেন; তাঁহার দুইটী সহোদরা ছিল। এখনও এক বিধবা ভগিনী বর্ত্তমান। তাহার পর, রোগবিশেষে হরিবংশ বাবুর মাতার চক্ষুর্দ্বয় নষ্ট হইয়া যায়, অনেক অর্থব্যয় করিয়াও, তাঁহার চক্ষু রক্ষা পাইল না। স্ত্রী অন্ধ হইল বলিয়া, নেপালচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় আবার বিবাহ করিলেন। কিন্তু এই স্ত্রী লইয়া তাঁহাকে বড় ঘর করিতে হয় নাই; অল্পকাল পরেই তিনি স্বর্গারোহণ করিলেন। উপস্থিত দুই স্ত্রীই বর্ত্তমান! ইনি অপর কোন সৎকার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

৺ রামগোপাল রক্ষিত।—ইহাঁর দুই বিবাহ। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কন্যা হয় বলিয়া, পুত্রার্থে, পুনরায় বিবাহ করেন। এবং বৃদ্ধ বয়সে দ্বিতীয়া যুবতী ভার্য্যার এক পুত্র-সন্তান হয়। উক্ত পুত্রটির বর্ত্তমান বয়স ৬।৭ বৎসরমাত্র। ভগবান্ ইহাঁকে দীর্ঘজীবী করুন। পরন্তু প্রথমপক্ষের স্ত্রীর কন্যার উপস্থিত সন্তান বা ৺ রামগোপাল রক্ষিত মহাশয়ের ছয় দৌহিত্র বর্ত্তমান। ইহাদের সকলকেই জগদীশ্বর মনের সুখে রাখিয়া, দীর্ঘজীবী করুন, ইহাই মঙ্গলময় পরমেশ্বরের নিকট আমরা সর্ব্বদা প্রার্থনা করি।

৺ রামগোপাল রক্ষিত মহাশয় অনেক সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন। অনেক দুঃখীর চক্ষের জল তিনি মুছাইয়াছিলেন; স্বর্গে গিয়াও এখনো তিনি দুঃখের অশ্রুজল মুছিতে বিরত হন নাই;—এখনো তাঁহার ডাক্তারখানায় বৎসর বৎসর শত শত গরিব দুঃখীকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ জন্য কত দরিদ্রের জীবনরক্ষা করা হইতেছে। এই কীর্ত্তিতেই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। তিনি অনেক টাকা ব্যয় করিয়া গোবরডাঙ্গায় ষ্টেশনের নিকট এক সুবৃহৎ দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিয়া দিয়া গিয়াছেন। এই সৎকার্য্যের জন্য একদিন গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর তাঁহার সুখ্যাতি করিয়াছিলেন; এবং অনেক সংবাদপত্রে তাঁহার জয় জয়কার বিঘোষিত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন দুর্গোৎসব ইত্যাদি পূজা পার্ব্বণে তিনি বহু অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন। শত শত ব্রাহ্মণ এক স্থানে বসাইয়া, এক পংক্তিতে ভোজন করাইবার বাসনায়, তিনি এক সুবৃহৎ "হল" নির্ম্মাণ করিয়াছেন। হায়! এখন সেই হলের দিকে চাহিলে, ব্যর্থবোধে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়!

হরিবংশ বাবু পিতৃব্যের সমুদয় কীর্ত্তিই বজায় রাখিয়াছিলেন; একটিও নষ্ট করেন নাই; বরং কিছু কিছু বাড়াইতেছিলেন। ইহাঁর যত্নে হয়দাদপুরে হরিসভা স্থাপিত হইয়াছে; তথায় প্রায় প্রতি বৎসর কলিকাতা হইতে কত সুবক্তা লইয়া গিয়া, বক্তৃতা করাইয়া দেশের লোকদিগকে কত ধর্ম্মকথা, কত মুনি ঋষির কথা শুনাইতেন। নিজেও খুব ধার্ম্মিক ছিলেন। ধনী যুবকেরা নিজের হস্তে বিষয় পাইলে যে পথে সহজে গমন করে, ইনি সে পথে যান নাই। জন্মের পূর্ব্বেই হরিবংশ ইত্যাদি ধর্ম্মক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠানের ফলে যিনি মাতৃ অঙ্কের শোভাবর্দ্ধন ও পিতার আনন্দ-বর্দ্ধন করেন; তাঁহার সে জীবন যে অমৃতময় হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? শুনিয়াছিলাম, হরিবংশ আর্য্যমিশনের গুরু পঞ্চাননের শিষ্য; ইহার সত্য মিথ্যা ভগবান্ জানেন! তবে আমরা তাঁহার শিরে শিখা দেখিয়াছি। ধর্ম্ম-জীবনে যাহা হওয়া প্রয়োজন, তাহা তাঁহাতে ছিল। নামাবলী, মালা, শিখা-ধারণ, হবিষ্যান্ন-ভোজন ইত্যাদি সমুদয় ছিল। শুনিতে পাই, তাঁহার চিনির কারবারে যে সকল গোমস্তা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি শিখা রাখিতেন, তাঁহাদের বেতন অপরাপর গোমস্তার বেতন অপেক্ষা বেশী ছিল।

হরিবংশ বাবু বিখ্যাত ধনী এবং মানী ৺ নীলকমল কোঁচ মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন।

ধর্ম্মাত্মা হরিবংশের দুই পুত্র এবং এক কন্যা বর্ত্তমান; কন্যাটীর বয়স ৭।৮ বৎসর! প্রথম পুত্রটীর বয়স ৫ বৎসর এবং ছোট ছেলেটী প্রায় ২ বৎসরের। স্ত্রী বর্ত্তমান,—অন্ধমাতা বর্ত্তমান! আহা! আজ অন্ধের যষ্টি ভাঙ্গিয়া গেল। অন্ধমাতা এত দিন পার্থীব চক্ষু হারাইলেও, এক হরিবংশের জন্য, তিনি ঐ চক্ষে স্বর্গের পবিত্র আলোক দর্শন করিতেন,—বস্তুতঃ এতদিন তাঁহার যেন চক্ষের তারা ছিল। আজ সেই তারা নষ্ট হইয়াছে—আজ সেই তারা খসিয়া পড়িয়াছে—আজ সেই তারা স্বর্গে উঠিয়াছে! কি সর্ব্বনাশ! আজ হয়-দাদপুরের দিক্ অন্ধকার! এ শোকের শান্তি আর কি হইবে? কাল মসূরিকা বা বসন্তরোগেই তাঁহার প্রাণ বায়ুর শেষ করিল। মঙ্গলময় হরিবংশের বংশরক্ষা করুন!!"

১২৪৬ সালে ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী খাঁটুরা গ্রামে রামকৃষ্ণ রক্ষিতের জন্ম হয়। ইহাঁর পিতার নাম মদনমোহন রক্ষিত্। ইনি সামান্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। মদনমোহনের দুইটী পুত্র ও তিনটী কন্যা। তন্মধ্যে রামকৃষ্ণই সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ। রামকৃষ্ণ ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পিতৃহীন হইয়া চতুর্দ্দিক অমানিশি সম অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। কারণ, তাঁহার পিতা মৃত্যুকালে এক খানি ক্ষুদ্র গোলপাতার ছাউনির শয়ন গৃহ, আর এক খানি রন্ধনশালা মাত্র সম্বল রাখিয়া যান। সুতরাং ভরণপোষণের জন্য তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি ছোট ছোট ভ্রাতা ভগিনী ও জননীর ভরণপোষণের জন্য নিরুপায় হইয়া কয়েকটী টাকা সংগ্রহ করিয়া কড়ির ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তৎকালে সামান্য সামান্য দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয় কড়ির মূল্যে হইত। রামকৃষ্ণ দূরতর প্রদেশস্থিত আপণের দোকানদারদিগের নিকট্ হইতে কাহন দরে কড়ি ক্রয় করিয়া মাথায় করিয়া আনিয়া বাজারে বিক্রয় করিতেন। ইহাতে যাহা লাভ হইত তদ্দারা অতি কষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। এইরূপে ৮।৯ বৎসর অতীত হইলে, গ্রামবাসী মাধবচন্দ্র পাল নামক জনৈক শর্করা ব্যবসায়ী রামকৃষ্ণকে বুদ্ধিমান সুচতুর ও অধ্যবসায়শালী দেখিয়া দয়া করিয়া কলিকাতায় আপন কারখানায়

আনীত করেন। রামকৃষ্ণ বাল্যবয়সে গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষা করিয়া কথঞ্চিৎ পরিমাণে লিখিতে ও হিসাব করিতে পারিতেন। তদ্দর্শনে তিনি রামকৃষ্ণকে বাসা খরচ ছাড়া তিন টাকা মাসিক বেতনে মুহুরির কার্য্যে ব্রতী করিয়া দেন। অতঃপর ইনি ক্রমোন্নতি সহকারে বড় বাজারে ঘৃত ও চিনির দোকান এবং আড়তদারী কার্য্য করিয়া বিশেষ উন্নতি করেন। দেশে এবং বারাশত গ্রামে সাধারণের উপকারার্থ ইনি পুষ্করিণী খনন, বড়ার খালে পাকা সাঁকো ও রাস্তা করিয়া দিয়া তত্রস্থ অধিবাসীগণের বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন। ইনিও খাঁটুরা গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। ইঁহার বাটীতে দোল, দুর্গোৎসব হইত। একবার রামকৃষ্ণ তুলা করিয়া অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। তাহাতে ইনি কুশদহ সমাজের ব্রাহ্মণ কুটুম্ব ও অপরাপর লোক সকলকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া ছিলেন। অধ্যাপক বিদায় ও প্রায় ৩।৪ হাজার কাঙ্গালিকে এক খানি করিয়া বস্ত্র প্রদান করেন। ইনি হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই সমান চক্ষে দেখিতেন। মুসলমানদিগের নিমিত্ত পীরের মসজিদ প্রস্তুত করাইয়া দেন। ইনি সরলচেতা ও ক্রিয়াবান লোক ছিলেন।

প্রামাণিক রক্ষিত বংশে ভজমোহন রক্ষিত নামে জনৈক লোক জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার আদি বাস হয়দাদপুরে ছিল; কিন্তু কোন অসুবিধা বশতঃ ঐ বাটী ত্যাগ করিয়া গয়েশপুর নামক গ্রামে বসবাস করেন। গয়েশপুর নিবাসী রামযাদু রক্ষিত তাঁহার বর্ত্তমান বংশধর। ভজমোহন রক্ষিত সামান্য তেজারতি মহাজনী কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ইনি নিষ্ঠাবান, সরলচেতা ও সাধক লোক ছিলেন। ভজমোহন রক্ষিত সুন্দর সুন্দর গীত রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার সঙ্গীত রচনাশক্তি প্রবল ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার রচিত গান সংগ্রহ করা দূরে থাক, তাঁহার নাম যে ভজমোহন রক্ষিত ছিল এবং তিনি যে এক জন সঙ্গীত রচয়িতা ছিলেন, বর্ত্তমান নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই তাহা জানেন না। অনেক অনুসন্ধানে খাঁটুরাস্থ জনৈক ভদ্র লোকের নিকট হইতে তাঁহার একটি অসম্পূর্ণ গীত সংগ্রহ করা গেল ও নিম্নে সন্নিবেশিত হইল ;—

"শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা।
আহা মরি কে কুমারি অপরূপ ঐ দেখনা॥
পদতলে যেন মড়া, শবরূপ ঐ বৃষারূঢ়া।"

কাশ্যপ গোত্রীয় প্রামাণিক রক্ষিত বংশের জন সংখ্যা।

১ শ্রীশরচ্চন্দ্র রক্ষিত, ২ উমেশচন্দ্র রক্ষিত ৩ বিপিনবিহারী রক্ষিত, ৪ শুই-রাম রক্ষিত, ৫ রামযাদু রক্ষিত, ৬ যোগীন্দ্রনাথ রক্ষিত, ৭ দ্বারিকানাথ রক্ষিত, ৮ গোষ্ঠবিহারী রক্ষিত, ৯ বিষ্ণুপদ রক্ষিত, ১০ রাজ্যেশ্বর রক্ষিত, ১১ মঙ্গলচন্দ্র রক্ষিত, ১২ হরিপদ রক্ষিত, ১৩ বিষ্ণুপদ রক্ষিত, ১৪ সত্যচরণ রক্ষিত, ১৫ হীরালাল রক্ষিত, ১৬ শৈলেশ্বর রক্ষিত, ১৭ হরিচরণ রক্ষিত, ১৮ নিতাইচরণ রক্ষিত, ১৯ চৈতনাচরণ রক্ষিত, ২০ হরিবংশ রক্ষিত, ২১ পূর্ণচন্দ্র রক্ষিত, ২২ যোগীন্দ্র নাথ রক্ষিত, ২৩ কুড়নচন্দ্র রক্ষিত, ২৪ প্রসন্নচন্দ্র রক্ষিত, ২৫ গোপালচন্দ্র রক্ষিত। স্ত্রীলোক ৩২, বালক ১৮, বালিকা ৮, সমষ্টি ৮৩।

বড় রক্ষিত বংশ।

ন্যূনাধিক ১৫০ শত বৎসর অতীত হইল, জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত খাঁটুরা গ্রাম স্থাপিত হয়। ঐ সময় এই গ্রামে একটি ভাল বাজার ও গঞ্জ ছিল। নানাবিধ দ্রব্যাদির দোকান শ্রেণীবদ্ধে শোভা পাইত। দূরদেশ হইতে বহুতর ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ দ্রব্যাদি লইয়া এই স্থানে গমনাগমন করিত। নিত্য বাজার ও প্রত্যহ বহুলোকের সমাগম হইত। এখনও লোকে সেই স্থানকে পুরাতন বাজার কহে। ঐ বাজারের সন্নিকটেই মুনসেফের কাছারি ছিল। এই গ্রাম এককালে অতি সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল। কিন্তু হায় কালের কুটিলচক্রে উহার একণে অতীব শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে। ঐ গ্রামে মণিরাম রক্ষিত নামে এক ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার দুই পুত্র ছিল। একটির নাম বিজয়রাম রক্ষিত ও অপরটীর নাম মহাদেব রক্ষিত। মণিরাম রক্ষিত ধর্ম্মভীরু ও ন্যায়পরায়ণ লোক ছিলেন। যশোহর জেলার অন্তর্গত কোট চাঁদপুরের

নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামে তিনি তেজারতি মহাজনীর কার্য্য করিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় করেন এবং তথায় কতকগুলি প্রজা বসাইয়া আপন নামে ঐ স্থানের নাম "মণিরামপুর" নির্দ্দেশ করেন। তিনি তথায় একটি পুষ্করিণী খনন করাইয়া ছিলেন। মণিরামের প্রথম পুত্র বিজয়রাম ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী কোন একটি গ্রামে তেজারতি মহাজনী করিয়া বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং তিনিও নিজনামে ঐ গ্রামের নাম "বিজয়রামপুর" রাখিয়া পিতৃ অনুকরণে একটি পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করেন। বিজয়রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাদেবও ঐ প্রকার আপন নামানুসারে গ্রামের নাম করণ করিয়া একটি পুষ্করিণী খনন করাইয়া ছিলেন। বিজয়রাম অতি শান্তপ্রকৃতি ও ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। তিনি পরোপকার একটি প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া জানিতেন। গ্রামবাসীর মধ্যে যদি কেহ কখন কোন বিপদে পড়িয়া বিজয়রামের নিকট জানাইতেন, তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের সহস্র কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অগ্রে সেই বিপদাপন্ন ব্যক্তিকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতেন। বিজয়রাম স্বোপার্জ্জিত অর্থে নিজ-বাস ভবনে অনেক ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করিয়া ছিলেন। দীন দুঃখী যখন যে কেহ তাঁহার নিকট আসিত: তিনি তাহাদিগকে উপযুক্ত মত অর্থাদি দিয়া বিদায় করিতেন: কাহাকেও রিক্ত হস্তে ফিরিতে হইত না। আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, ঐ সময় পয়সার প্রচলন ছিল না। তখনকার লোক কড়ির দ্বারা দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করিত। ঐ সময় বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের টাকা প্রচলিত ছিল না। সঙ্গতিপন্ন লোক দিগের গৃহে রামচন্দ্রের এবং আকবর বাদসাহের টাকা দেখিতে পাওয়া যাইত। বিজয়রাম প্রত্যহ দেশস্থ ব্রাহ্মণ-দিগকে বাজার করিবার জন্য যাহার যে পরিমাণ কড়ির আবশ্যক হইত, তাঁহাকে সেই পরিমাণ কড়ি দিতেন এবং প্রতিদিন নিজ বাটীতে ১০।১২ জন করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন। মধ্যে মধ্যে কাঙ্গালী ভোজনও হইত।

এই রূপ প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় যে, এক সময়ে বিজয়রামপুরের গোলাবাটীতে রাত্রে হঠাৎ অগ্নি লাগে, সেই সময় বিজয়রাম খাঁটুরা গ্রামে নিজবাস ভবনে ছিলেন। ঐ গোলাবাড়ীতে পান ও সুপারি ব্যতীত অপরাপর

ঘটনার রাত্রে বিজয়রাম নিজ শয়ন কক্ষে শয়ন করিয়া আছেন, গভীর নিশীথে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যেন, একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মাথার নিকট দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন ;—"বাবা বিজয়! অদ্যরাত্রে তোমার গোলাবাড়ীতে উত্তমরূপ আহারাদি হইয়াছে, কিন্তু আমার মুখশুদ্ধি হয় নাই।" এই স্বপ্ন দেখিয়া সহসা তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি ভয় বিহ্বল চিত্তে উঠিয়া দেখেন যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নাই। সে রাত্রে আর তাঁহার নিদ্রা হইল না। পরদিন প্রাতে বহির্বাটীতে আসিয়া দেখেন, জনৈক ভৃত্য গোলাবাড়ী হইতে অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ লইয়া আসিয়াছে। সেই লোকমুখে গতরাত্রের ঘটনা শুনিয়া বিজয়রাম অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত ও স্তম্ভিত হইলেন এবং অতি উত্তমরূপে ব্রহ্মাগ্নি পূজা দিলেন। প্রচুর পরিমাণে পান ও সুপারি অগ্নিতে আহুতি দিয়া ব্রাহ্মণগণকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। এই ঘটনার কিছু দিন পরে বিজয়রাম নিজ গোলাবাড়ীতে গিয়া সমস্ত গৃহাদি প্রস্তুত করতঃ পূর্ব্বের ন্যায় নানাবিধ দ্রব্যে গোলাপূর্ণ করিলেন। এইরূপে বিজয়রামের ব্যবসাতে এক বৎসরের মধ্যে প্রচুর ধন উপার্জ্জিত হইয়াছিল।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরে এক দিন বিজয়রাম নিজ বাসভবনে নিদ্রা যাইতেছেন, ইতিমধ্যে স্বপ্ন দেখিলেন, একটি পঞ্চমবর্ষীয়া রূপলাবণ্যবতী বালিকা তাঁহার শিরোদেশে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন, "বিজয়!, তোমার কার্য্য কলাপে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। এ কারণ আমি তোমার গৃহে কন্যারূপে থাকিব। তুমি পুরোহিত ডাকাইয়া আমাকে তোমার গৃহে স্থাপিত কর।" এই কথা বলিতে বলিতে বালিকা অন্তর্হিত হইয়া গেল। তৎপর দিবস বিজয়রাম পুরোহিত ডাকাইয়া লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি স্থাপনানন্তর প্রত্যহ নিয়মিতরূপে পূজাদি করিতে লাগিলেন। বিজয়রাম স্বয়ং পাঁচটী সুবৃহৎ ইষ্টক নির্ম্মিত দ্বিতলগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। ঐ সময় এই গ্রামে আর কাহারও ইষ্টক নির্ম্মিত বাটী ছিল না। তাঁহার বাটীর খিড়কীতে তিনি একটি পুষ্করিণী খনন করাইয়া ছিলেন। সেই পুষ্করিণী "তাল পুকুর" নামে খ্যাত ও অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। অদ্য প্রায় দুই বৎসর হইল. বিজয়রামের বংশধর মহানন্দ রক্ষিত ঐ পুষ্করিণীর পুনঃসংস্কার করাইয়াছেন। কেবল মাত্র পূজার

দালানের ভগ্নাবশেষ ভিন্ন আজকাল বিজয়রাম কৃত বাটীর চিহ্নমাত্রও দৃষ্ট হয় না। উপরোক্ত পূজার দালান এক্ষণে মহানন্দ রক্ষিতের আমলে আছে।

বিজয়রামের ছয় পুত্র। জ্যেষ্ঠ মুক্তারাম পিতার ন্যায় ধার্ম্মিক ও ক্রিয়াবান ছিলেন। মুক্তারামও নিজ গোলাবাড়ীর সন্নিকটস্থ স্থান আপন নামানুসারে "মুক্তারামপুর" রাখিয়া তথায় একটি পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। বিজয়রাম পরলোক গমন করিলে তদীয় পুত্র মুক্তারাম দান সাগর করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করেন এবং তাহাতে দম্পতি-বরণ অর্থাৎ একটি ব্রাহ্মণ ও একটি ব্রাহ্মণ কন্যা ক্রয় করিয়া তাঁহাদের বাসোপযোগী গৃহাদি নির্ম্মাণ ও জীবিকার জন্য মাসিক খরচের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাদের আর সন্তান সন্ততি হয় নাই। ব্রাহ্মণ অনুমান ৪০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইহলোক ত্যাগ করেন। ব্রাহ্মণী প্রায় ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। মুক্তারাম নিজ গ্রামের অনতিদূরে বাজে খাঁটুরা নামক স্থানে একটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণী খনন করাইয়া ঐ ব্রাহ্মণীর নামে প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। অদ্যাপি ঐ পুষ্করিণী বর্ত্তমান আছে ও "ঠাকরুণ পুকুর" নামে খ্যাত। অর্থাভাবে ইহার আর সংস্কার হয় নাই। বিজয়রামের সময় হইতে এই বংশাবলী বড় রক্ষিত নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

কোন সময়ে মুক্তারাম রক্ষিত জগন্নাথ ক্ষেত্রে যাত্রা করেন ও তথায় দীন দুঃখীকে প্রচুর পরিমাণে অর্থদান করেন। যাহাতে তাঁহার বংশ পরম্পরায় চিরদিন শ্রীশ্রী ৺ জগন্নাথ দেবের প্রসাদ বাঁধা থাকে, (বাঁধা আটকে) তজ্জন্য মুক্তারাম অনেক ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। একারণ অদ্যাবধি তাঁহার বংশে যে কেহ শ্রীক্ষেত্রে যান, প্রধান পাণ্ডা প্রতিদিন প্রাতঃকালে শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের এক খানি ক্ষীর খণ্ড ভোগ তাঁহার বাসায় পাঠাইয়া থাকেন।

খাঁটুরা গ্রামে বড় রক্ষিত বংশে ডাক্তার অম্বিকাচরণ জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি স্বর্গীয় রামতারণ রক্ষিতের পুত্র। অম্বিকাচরণ বাল্যকালে কয়েক মাস গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষা লাভ করিয়া অত্রত্য গভর্ণমেণ্ট মডেল বঙ্গবিদ্যালয়ে ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন ও মাসিক চারি টাকা করিয়া বৃত্তি

করেন। গ্রামস্থ কতিপয় ব্রাহ্ম যুবকের সহিত অম্বিকাচরণের সৌহার্দ্দ ও তাঁহার ব্রাহ্ম ধর্ম্মে আশক্তি দেখিয়া তাঁহার পিতা ইংরাজী পাঠ বন্ধ করিয়া দেন। পরে ২।১ বৎসর স্বয়ং চেষ্টা করিয়া ও প্রথমে পিতার অমতে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মেডিকেল কালেজের বাঙ্গালা বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ২।৫৲ টাকা বৃত্তি পাইয়া ঐ সনেই উক্ত কালেজে প্রবেশাধিকার লাভ করতঃ তিন বৎসর যথারীতি চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৮৬৫ সালে মার্চ্চ মাসে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কয়েক মাস পরে গভর্ণমেণ্টের চাকরিতে নিযুক্ত হন। প্রথমে ইনি মেদিনীপুরের তমলুক মহকুমার ডিস্‌পেনসারির ভার প্রাপ্ত হন। ইহার পর ইনি টাকি, বসিরহাট, ঝিনাদহ, ডুমকা প্রভৃতি স্থানে সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া কোন সাংসারিক দুর্ঘটনায় অবকাশ প্রাপ্ত না হওয়ায়, কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। ঝিনাদহ অবস্থিতিকালে ইনি "চিকিৎসাতত্ত্ব" নামক মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় পাঁচ বৎসর কাল চলিয়া ঐ কাগজ বন্ধ হয়। অতঃপর ইনি "ভারত ভৈষজ্যতত্ত্ব" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ভারতবর্ষ জাত দেশীয় ঔষধ সকলের বিবরণ ইহাতে লিখিত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ঐ পুস্তকের ৫০ কাপি গৃহীত হয়। তৎপরে ইনি আয়ুর্ব্বেদীয় "সারঙ্গধর" নামক পুস্তকের অনুবাদ বাহির করেন। এবং যথাক্রমে ডাক্তারি মতে "ব্যবস্থা সহচর" "ভিষক সহচর" "পাশ্চাত্য ভৈষজ্যতত্ত্ব" "গার্হস্থ্য চিকিৎসা বিদ্যা" "ম্যালেরিয়া জ্বরের চিকিৎসা" নামক পুস্তক সকল প্রণয়ন করেন। ইতিমধ্যে হোমিওপ্যাথিক মতে "ঔষধ ষোড়শ" "চিকিৎসা বিধান" (ডাক্তার জারের ৪০ বৎসরের বহুদর্শিতা) নামক পুস্তক সকল অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। অতঃপর হোমিওপ্যাথিক "চিকিৎসা-সোপান" ও "স্বাস্থ্যসূত্র" নামক পুস্তকদ্বয় প্রণয়ন করেন। অম্বিকাচরণ গভর্ণ-মেণ্টের চাকরিতে থাকিতে থাকিতে দুইবার ১ম ও ২য় শ্রেণীর দুইটী বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। গভর্ণমেণ্টের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণানন্তর প্রায় ১১ বৎসর কাল স্বগ্রামের ৺ রামগোপাল রক্ষিতের প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয়ে নিযুক্ত থাকেন। পরে কোন কারণ বশতঃ সে কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে ৺ রামকৃষ্ণ রক্ষিতের প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয়ে কার্য্য করিতেছেন।

এই গ্রামে বিশ্বনাথ রক্ষিত নামে জনৈক লোক বাস করিতেন। তাঁহার তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ অক্রূর, মধ্যম উত্তম ও কনিষ্ঠের নাম পুরুষোত্তম। উত্তমচন্দ্র বাল্যাবস্থায় গ্রাম্য পাঠশালে যৎকিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কলিকাতায় হাটখোলায় সেবকচন্দ্র পালের দোকানে কার্য্য শিক্ষা করেন। ক্রমে কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী হইলে উত্তমচন্দ্র নিজে হাটখোলায় ভূষার কারবার করেন। ক্রমে ক্রমে ঐ ব্যবসায়ে সমূহ উন্নতি হয় ও তদর্থে বাটীতে অনেক ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করেন।

খাঁটুরা গ্রামে এই বংশে সিদ্ধিরাম রক্ষিতের জন্ম হয়। ইনি দালালী করিয়া সমৃদ্ধিশালী হয়েন। ইহাঁর বাটীতে প্রতি বৎসরই দোল, দোল, দুর্গোৎসব হইত। ইনি একবার মহাভারত দিয়া অনেক টাকা ব্যয় করেন। খাঁটুরাস্থ নিত্যসমাজের ব্রাহ্মণ কন্যাগণকে রূপার বাউটী প্রদান করেন। ইহাতেও তাঁহার বিপুল অর্থ ব্যয় হয়। এমনি কি এ বংশে ঐ প্রকার দান অদ্যাবধি কেহ করিতে পারেন নাই। সিদ্ধিরাম খাঁটুরাস্থ দেব স্থান চণ্ডীতলায় চণ্ডীদেবীর পিঁড়ি অর্থাৎ ইষ্টক নির্ম্মিত পাকা চত্তর নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইনি ধার্ম্মিক, সচ্চরিত্র ও ক্রিয়াবান্ লোক ছিলেন।

সিদ্ধিরাম প্রমুখ ব্যক্তিগণই এই বংশের কুল গৌরব। ইহাঁরা যে প্রকার ক্রিয়াবান ছিলেন, সেই প্রকার আমরা এই বংশের এক জন বিখ্যাত বলবান লোকের বিষয়-যথা কথঞ্চিৎ লিখিয়া এ প্রস্তাবের পরিসমাপ্তি করিব। খাঁটুরা গ্রামে কাশ্যপ গোত্রীয় বিষ্ণুরাম রক্ষিত নামক জনৈক লোক বাস করিতেন। ইনি অতিশয় বলবান পুরুষ ছিলেন। এই প্রকার জনশ্রুতি আছে যে, পূর্ব্বে এই প্রদেশ সমস্তই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকার ভুক্ত ছিল। তাঁহার তহশীলদারেরা সময়ে সময়ে এখান হইতে খাজনার টাকা আদায় করিয়া সদর কাছারিতে পাঠাইয়া দিত। একদা কয়েক জন বরকন্দাজ পাইক খাজনা লইয়া সদরে যাইবার কালীন বিষ্ণুরাম রক্ষিতের পুষ্করিণীর তীরে বসিয়া রন্ধনাদি করিতেছিল। তাহারা কাষ্ঠ ও কদলী পত্র বিষ্ণুরামের অজ্ঞাতে তাঁহারই বাগান হইতে সংগ্রহ করে। বিষ্ণুরাম ইহা জানিতে পারিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া মহারাজার পাইক ও বরকন্দাজগণকে ডাকিয়া কহেন,

"তোমরা আমাকে না জানাইয়া কেন পাতা কাটিলে ও কাঠ ভাঙ্গিলে?" ইহা শুনিয়া মহারাজার লোক সকল বিষ্ণুরামের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া অকথ্য ভাষায় তাঁহাকে গালাগালি দেয়। বিষ্ণুরামের দেহে যে কেবল অসীম বল ছিল তাহা নহে, তাঁহার সাহসও তদনুরূপ ছিল। যাহাহউক পাইক ও বরকন্দাজ গণের কটূবাক্য অসহ্য হওয়ায়, বিষ্ণুরাম বলপূর্ব্বক তাহাদের নিকট হইতে আদায়ী খাজনার টাকার তোড়া কাড়িয়া লইয়া গৃহে চলিয়া গেলেন। যাইবার কালীন বলিলেন যে, তোরা—যা, মহারাজার টাকা আমি স্বয়ং যাইয়া দিয়া আসিব। পাইক ও বরকন্দাজ গণ এইরূপে বিতাড়িত হইয়া মহারাজার নিকট গিয়া বলিল, "মহারাজ! বিষ্ণুরাম রক্ষিত বলপূর্ব্বক আমাদের নিকট হইতে খাজনার টাকা কাড়িয়া লইয়াছে এবং আমাদের যৎপরোনাস্তি গালি-গালাজ করিয়াছে।" ইহা শুনিয়া মহারাজ বিষ্ণুরামকে ধরিয়া আনিবার জন্য উপযুক্ত লোক সকল পাঠাইলেন। এদিকে বিষ্ণুরাম একটি ভৃত্য সঙ্গে লইয়া ঐ টাকা মহারাজকে দিবার জন্য রাজধানীতে যাইতেছিলেন। পথি-মধ্যে মহারাজের প্রেরিত লোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। বিষ্ণুরাম তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কোথায় যাইতেছ?" তাহাতে জনৈক বরকন্দাজ কহিল, তোমার নামে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা আছে। রাজ সকাশে তোমাকে যাইতে হইবে।" বিষ্ণুরাম কহিলেন, "আমাকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে না। চল আমি মহারাজার নিকটেই যাইতেছি।" রাজকর্ম্মচারীগণ বিষ্ণুরামকে বেষ্টিত করিয়া লইয়া চলিল। বিষ্ণুরাম রাজবাটীতে উপনীত হইয়া কোষাধ্যক্ষের নিকট খাজনার সমস্ত টাকা আমানত করিয়া কহিলেন, "রাজকর্ম্মচারীগণ আমায় অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ দেওয়ায়, ক্রোধে আমি খাজানার টাকা কাড়িয়া লইয়া ছিলাম। এক্ষণে গ্রহণ করুন।" বরকন্দাজ-গণ খাজাঞ্চিকে কহিল, "টাকা কাড়িয়া লওয়ার অপরাধে এই ব্যক্তিকে ধরিয়া আনিয়াছি, এক্ষণে মহারাজ ইহার বিচার করিবেন।" যাহাহউক বলপূর্ব্বক খাজনার টাকা কাড়িয়া লওয়ার অপরাধ প্রমাণ হওয়ায়, মহারাজ বিষ্ণুরামকে কিছুদিনের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন।

ইহার অব্যবহিত পরেই এক দিন মহারাজ অমাত্যবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া বহির্বাটীতে প্রতিমাদি দর্শন করিতেছেন--প্রাঙ্গনে অসংখ্য লোক। ঐ দিন

নবমী তিথী, মহামায়ার শেষ পূজা। ছাগ, মেষ, মহিষ অসংখ্য বলিদান হইয়া গিয়াছে। রক্তে প্রাঙ্গন ভাসিয়া যাইতেছে—বলিদান অন্তে যূপকাষ্ঠ অর্থাৎ হাড়িকাঠ উত্তোলন লইয়া মহা কোলাহল উপস্থিত হইল। কারণ ছাগ ও মেষের ছোট হাড়িকাঠ বিধায় সহজেই উত্তোলিত হইল। কিন্তু মহিষ বলিদানের কাষ্ঠ অত্যন্ত বৃহৎ ও ভূমধ্যে অধিকাংশ ভাগ প্রোথিত থাকায়, তাহা উত্তোলন করা সাধারণ ক্ষমতার বহির্ভূত হইল। সুতরাং তাহা লইয়া প্রাঙ্গনে মহা গোলমাল হইতে লাগিল। ইত্যবসরে বিষ্ণুরাম তথায় উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন যে, "তোমরা অনর্থক কেন এত পরিশ্রম করিতেছ? দেখ আমি তুলিয়া দিতেছি।" বিষ্ণুরামের কথা শুনিয়া আপামর সকলেই বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তখনও বিষ্ণুরামের হস্তদ্বয় শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল। মহারাজ আদেশ করিলে, বিষ্ণুরাম নিজের গলা ঐ হাড়িকাঠে প্রবেশ করাইয়া নিকটস্থ এক ব্যক্তিকে তাহার খিল আঁটিয়া দিতে কহিলেন। আদেশ মাত্রেই ঐ লোক খিল আঁটিয়া দিল। অতঃপর বিষ্ণুরাম সবলে নিজ গলাদ্বারা হাড়িকাষ্ঠের চতুর্দ্দিকে ধাক্কা মারিতে লাগিলেন। এই প্রকারে কিয়ৎক্ষণ ঐ কাষ্ঠ নাড়াইয়া, সোজা হইয়া দাঁড়াইবা মাত্র হাড়িকাষ্ঠ মাটি হইতে উঠিয়া তাঁহার গলদেশে ঝুলিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া মহারাজ ও তাঁহার অমাত্যবর্গ বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইয়া শত মুখে বিষ্ণুরামের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পূজা অন্তে মহারাজ বিষ্ণুরামকে ডাকাইয়া কহিলেন, "তুমি একজন বীরপুরুষ, তোমার কার্য্যকলাপে আমি যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি আমার কর্ম্মচারীর নিকট হইতে খাজনার টাকা কাড়িয়া লইয়া অত্যন্ত অসম সাহসিকের কাজ করিয়াছ। ওরূপ কর্ম্ম আর কদাচ করিও না। তোমাকে এ যাত্রা মুক্তি দেওয়া গেল।" বিষ্ণুরাম মহারাজার নিকট হইতে বিদায় লইয়া পুলকিত মনে বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

বিষ্ণুরাম যে এক জন সাহসী বীরপুরুষ ছিলেন, তাহা তাঁহার কার্য্যের দ্বারাই বুঝা যাইত। কোন সময়ে একটি বিদেশী পালওয়ান বিষ্ণুরাম রক্ষিতের নাম শুনিয়া তাঁহার সাহস ও বল পরীক্ষার্থ খাঁটুরা গ্রামে উপনীত হয়। ঐ সময় বিষ্ণুরাম একটি বট বৃক্ষের ডাল নোয়াইয়া কতিপয় ছাগলকে পাতা

খাওয়াইতেছিলেন। এমন সময় ঐ পালওয়ান তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়! বিষ্ণুরাম রক্ষিতের বাটী কোন স্থানে?" তাহাতে তিনি বলিলেন, "কি আবশ্যক?" আগন্তুক কহিলেন, "আমি শুনিয়াছি যে তিনি এক জন প্রসিদ্ধ বলবান—আমার ইচ্ছা আছে যে, আমি তাঁহার সহিত কুস্তি করিয়া তাঁহার বল পরীক্ষা করি।" ইহা শুনিয়া বিষ্ণুরাম কহিলেন, "আচ্ছা, তুমি এই ডালটি ধরিয়া রাখ, আমি তাঁহাকে ডাকিয়া দিতেছি।" এই কথা বলায় আগন্তুক ঐ ডালটি ধরিলেন, ও যেমন বিষ্ণুরাম ডাল ছাড়িয়া দিলেন, অমনি ঐ পালওয়ান সহিত ডাল উর্দ্ধে উত্থিত হইল এবং তিনি শাখা ধরিয়া ঝুলিতে লাগিলেন। বিষ্ণুরাম কহিলেন, "আমি তাঁহার বাটীর ভৃত্য, আমি এই ডাল ধরিয়া রাখিয়া ছিলাম, কিন্তু মহাশয় ত পারিলেন না, তবে আপনি কেমন করিয়া তাঁহার সহিত কুস্তি করিবেন?" ইহাতে তিনি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া অপ্রতিভ ভাবে কহিলেন, "বুঝিয়াছি তাঁহার সহিত আর কুস্তি করিবার আবশ্যক নাই। আমি চলিলাম।" এই বলিয়া আগন্তুক প্রস্থান করিলেন।

শুনা যায় বিষ্ণুরামের বাটীতে কোন সময়ে ডাকাত পড়িয়াছিল; ঘটনারাত্রে ঐ সময় তিনি এরূপ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন যে, দস্যুদিগের গৃহ প্রবেশ আদৌ অবগত হইতে পারেন নাই। তাঁহার স্ত্রী জাগরিতা হইয়া নিদ্রিত পতিকে বক্ষঃস্থলে উঠাইয়া গৃহের বহির্ভাগে আসিয়াছিলেন। যাহা হউক বিষ্ণুরামের পত্নীও একজন বিখ্যাত বলিষ্ঠা ছিলেন। অতঃপর বিষ্ণুরামের নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় উভয়ে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া নিকটবর্ত্তী এক গৃহস্থের ঢেঁকি শালায় প্রবেশ পূর্ব্বক একটী ঢেঁকি লইয়া দস্যুদিগের প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন। দস্যুগণ বিষ্ণুরামের এইরূপ অলৌকিক ক্ষমতা, ঐ সময়ের অবস্থা ও বিঘূর্ণীত ঢেঁকি অবলোকনে প্রাণ ভয়ে পলায়নপর হইয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিল। এতদ্দেশের মধ্যে এরূপ প্রবাদ শুনা যায় যে, তিনি একজন বিখ্যাত বীরপুরুষ ছিলেন।

আমরা আর একটী প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনী আলোচনা করিয়া বড় রক্ষিত বংশ প্রস্তাবের উপসংহার করিব। খাঁটুরা গ্রামে কেদারনাথ রক্ষিত নামক এক ব্যক্তি বাস করিতেন। ইনি কলিকাতায় সামান্য বেতনে চাকরি করিয়া

জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। কেদারনাথ এক জন উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন। সংগীত বিদ্যা তিনি কাহারও নিকট শিক্ষা করেন নাই। অথচ তাঁহার স্বর এত সুমিষ্ট ছিল যে, যিনি একবার তাঁহার গীত শ্রবণ করিতেন, তিনি প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। একদা শোভাবাজার রাজবাটীতে রাজা নবকৃষ্ণ অথবা রাজা শিবকৃষ্ণের সময়ে বৈঠক খানায় কালওয়াতি গান হইতেছিল। ঐ দিন কেদারনাথের কতিপয় সহচর সংগীত শুনিবার জন্য কেদারনাথকে সঙ্গে লইয়া রাজ বাটীতে যান। কলিকাতাস্থ অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলে গানে মোহিত হইয়া গায়কের প্রশংসা করিতেছেন। কেহ কেহবা বাদ্যকরের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া বাদ্যের প্রশংসা করিতেছেন। এমন সময় কেদারনাথ সঙ্গীগণ সহ তথায় উপস্থিত হইয়া গায়কের পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিলেন। গায়কের গান শেষ হইবামাত্র কেদারনাথের সঙ্গীগণ তাঁহাকে একটী গান করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন। তাহাতে কেদার নাথ কহিলেন, "আমি কি জানি যে, এ সমাজে গান করিব?" গায়ক ইহাদের এই সকল কথোপকথন শ্রবণে কেদারনাথকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহাশয়ের কি সংগীত জানা আছে?" তাহাতে কেদারনাথ কহিলেন, "সামান্য মাত্র জানি।" ইহাতে গায়ক পর্য্যন্ত কেদারনাথকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অতঃপর কেদারনাথ তানপূরা লইয়া গায়ক যে সুরে গান করিতে ছিলেন, তদপেক্ষা উচ্চসুরে তানপুরা বাঁধিয়া গান আরম্ভ করিলেন। তাঁহার গীতে সভাস্থ সকলে মোহিত হইয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এমন কি গায়ক পর্য্যন্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কাহার নিকট সংগীত শিক্ষা করিয়াছেন?" তাহাতে কেদারনাথ কহিলেন. "আমি কাহারও নিকট সংগীত শিক্ষা করি নাই।" তখন গায়ক কহিলেন, "আপনার যেরূপ কণ্ঠস্বর এবং সংগীতের প্রণালী, তাহাতে উপযুক্ত লোকের নিকট শিক্ষা করিলে অত্যল্প কাল মধ্যেই আপনি এক জন বিখ্যাত গায়ক হইতে পারিবেন।" অতঃপর সভাভঙ্গ হইলে তাঁহারা বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। ঐ দিন হইতে কেদারনাথের সংগীত শিক্ষা করিবার ইচ্ছা ক্রমে বলবতী হইতে লাগিল। ইহার কিছুদিন পরে কেদারনাথ কলিকাতার চাকরি পরিত্যাগ করিয়া সংগীত শিক্ষা মানসে

মুরশিদাবাদ নবাব বাটীতে গমন করেন। এবং তথাকার সভার রাজ-কাল-ওয়াতের নিকট উপস্থিত হইয়া বিনীত ও নম্রভাবে তাঁহার নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁহার একাগ্রতা ও উৎসাহ অবলোকনে গায়ক তাঁহাকে পরীক্ষার্থ একটি গান গাহিতে বলেন। গায়কের আদেশ মত কেদারনাথ একটী গান করিলেন। কেদারনাথের গান শুনিয়া গায়ক অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং কহিলেন, "আচ্ছা, তোমাকে আমি যত্নের সহিত সংগীত শিক্ষা দিব, তুমি প্রত্যহ নিরূপিত সময়ে আমার নিকট আসিও। তোমার যে প্রকার রাগ রাগিনী বোধ ও শিক্ষার চেষ্টা দেখিতেছি, তাহাতে ভবিষ্যতে তুমি যে এক জন বিখ্যাত গায়ক হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।" কেদারনাথ ঐ স্থানে কিছুদিন সংগীত শিক্ষা করেন; পরে বাটীতে আর না আসিয়া তথা হইতে বিবেকী হইয়া কোথায় যে চলিয়া যান, এ পর্য্যন্ত তাঁহার আর কোন সংবাদাদি পাওয়া যায় নাই।

বড় রক্ষিত বংশের জন সংখ্যা।

১ শ্রীমহাদেব রক্ষিত ২ ননীগোপাল রক্ষিত ৩ প্রতাপচন্দ্র রক্ষিত ৪ হরিনারায়ণ রক্ষিত ৫ অনন্তরাম রক্ষিত ৬ হরিপ্রসন্ন রক্ষিত ৭ মহাদেব রক্ষিত ৮ পতিরাম রক্ষিত ৯ সতীশচন্দ্র রক্ষিত ১০ লক্ষ্মীকান্ত রক্ষিত ১১ গোবিন্দচন্দ্র রক্ষিত ১২ উপেন্দ্রনাথ রক্ষিত ১৩ ভূপেন্দ্রনাথ রক্ষিত ১৪ গিরীশচন্দ্র রক্ষিত ১৫ মঙ্গলচন্দ্র রক্ষিত ১৬ অম্বিকাচরণ রক্ষিত ১৭ গিরীজাপ্রসন্ন রক্ষিত ১৮ রাধিকাচরণ রক্ষিত ১৯ বিরোজা রক্ষিত ২০ যোগীন্দ্রনাথ রক্ষিত ২১ সত্যেন্দ্রনাথ রক্ষিত ২২ হেমেন্দ্রনাথ রক্ষিত ২৩ ভুপেন্দ্রনাথ রক্ষিত ২৪ শৈলেন্দ্রনাথ রক্ষিত ২৫ নরেন্দ্রনাথ রক্ষিত ২৬ ফটিকচন্দ্র রক্ষিত ২৭ রামচন্দ্র রক্ষিত ২৮ মহেন্দ্রনাথ রক্ষিত ২৯ যজ্ঞেশ্বর রক্ষিত ৩০ হরিদাস রক্ষিত ৩১ গৌরহরি রক্ষিত ৩২ মহানন্দ রক্ষিত ৩৩ যজ্ঞেশ্বর রক্ষিত ৩৪ অন্নদাচরণ রক্ষিত ৩৫ অমূল্যচরণ রক্ষিত ৩৬ কালীচরণ রক্ষিত ৩৭ শরচ্চন্দ্র রক্ষিত ৩৮ অভিলাস রক্ষিত ৩৯ হরিদাস রক্ষিত ৪০ অতুলকৃষ্ণ রক্ষিত ৪১ সুরোনাথ রক্ষিত ৪২ বিহারীলাল রক্ষিত ৪৩ কার্ত্তিকচন্দ্র রক্ষিত ৪৪ হারাণচন্দ্র রক্ষিত। স্ত্রীলোক ৩৮, বালক

দস্তাল রক্ষিত বংশ।

মারীভয় বর্গীর হাঙ্গামা প্রভৃতি কতকগুলি কারণে সপ্তগ্রাম প্রদেশস্থ তাম্বুলীগণ নদীয়ার অধীন কুশদ্বীপ সমাজান্তর্গত আমীরপুর পরগণায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। তন্মধ্যে রক্ষিতদিগের কয়েকটি বিভিন্ন বংশ ছিল। তাঁহারা খাঁটুরা, হয়দাদপুর ও গোবরডাঙ্গায় বসতি স্থাপন করেন। ঔপনিবেশিকগণের মধ্যে ভবানীপ্রসাদের বংশে বোধ করি মণিরাম আদি পুরুষ।

ইহাঁরা যৎকালে কলিকাতায় বাণিজ্যে লিপ্ত হন, তখন ইউরোপ ভারতবর্ষ হইতে চিনি গ্রহণ করিতেন। গাজীপুর অঞ্চল হইতে বিস্তর চিনি কলিকাতায় আনীত হইত। অযোধ্যারামের পৌত্র রামকুমার, নন্দকুমার ও কাশীনাথ ভ্রাতৃত্রয় বর্ত্তমান বড়তলা ষ্ট্রীট ও কটন ষ্ট্রীটের মধ্যস্থলে কার্য্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ স্থান রামকুমার রক্ষিতের লেন নামে খ্যাত। বড়তলা ষ্ট্রীট ও শ্যামাবাইয়ের গলির সংমিলন স্থলে পশ্চিম দিকে রামবল্লভের পুত্র রামধন ও ভবানীপ্রসাদ কার্য্য করিতেন। সেকালে ধারে খরিদ করিয়া নগদ টাকায় বিক্রয় করিতে পারা যাইত। ভবানীপ্রসাদ একদা লক্ষ টাকার চিনি ক্রয় করিয়াছিলেন।

ভবানীপ্রসাদ রক্ষিত দানের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার হয়দাদপুরস্থ বাটী পাকা করিবার জন্য কয়েকবার ইষ্টক প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। প্রতিবারে কানাইনাটশালবাসী ব্রাহ্মণগণ তদ্দ্বারা আপনাপন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া ফেলেন। এক দিন কোন ব্রাহ্মণ ভবানীপ্রসাদের নিকট হইতে স্বর্ণ কণ্ঠমালা গ্রহণ করিয়া পরিধান করিলে, কেহ কহিলেন, "আপনাকে বেশ দেখাইতেছে।" পরিধানকারী ব্রাহ্মণ কণ্ঠমালা প্রত্যর্পণ করিতে চাহিলে ভবানী প্রসাদ নিষেধ করিয়া কহিলেন, "যাহাতে আপনাকে বেশ দেখাইয়াছে, তাহা আমি আর লইব না।" নব্য স্মৃতিকার রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের বংশধর বেজুয়াডাঙ্গা নিবাসী গুরুদেব কন্যাভার গ্রস্ত হইয়া রামধন রক্ষিতের নিকট উপস্থিত হইলে ৫০৲ টাকা পাইবার জন্য লিপি পান। ভবানীপ্রসাদ তদর্শনে কহিলেন, "আমি অগ্রজের আদেশ অবহেলা করিব না। কেবল মাত্র একটী

শূন্য বৃদ্ধি করিয়া দিতেছি"। খাঁটুরাবাসী এক অধ্যাপকের সহধর্ম্মিনী অপরাহ্নে কহিলেন, "বিদ্যার্থীগণকে কল্য আহার দিবার জন্য সামগ্রীর অভাব হইয়াছে"। শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ চিন্তাকুল হইলেন; সায়ংকাল উপস্থিত, কোন উপায় স্থির করিতে পারিতেছেন না, এমন সময় ভবানীপ্রসাদ প্রেরিত দ্রব্য সম্ভার অযাচিত ভাবে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

ভবানীপ্রসাদের কনিষ্ঠ শম্ভুচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ১২২০ সালে ২৪ সে মাঘ জন্ম গ্রহণ করেন। কৈশোর কালে তাঁহার পিতৃ বিয়োগ হওয়ায় তিনি খাঁটুরা গ্রামে মাতুল আশ্রয়ে বাস করিতে বাধ্য হন। ১২৫৫ সালের ১০ই মাঘ কলিকাতাস্থ বর্ত্তমান কটন ষ্ট্রীটে ১৫৩/১ সংখ্যাত গৃহে ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মাতামহের অন্যতর দৌহিত্রী তনয়ের মধ্যে অগ্রজ অপেক্ষা কনিষ্ঠ হীনবুদ্ধি হইলেও মাতৃভক্তিতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অতএব তিনি কর্ত্তব্য পরায়ণ হইতে পারিবেন, এই জ্ঞান করিয়া বিষয় কর্ম্মের ভার নবীনচন্দ্র রক্ষিতের প্রতি অর্পণ করতঃ ১২৬৩ সালের শ্রীপঞ্চমীতে সপরিবারে নৌকাযোগে কাশীযাত্রা করেন। নবীনচন্দ্রের কর্তৃত্ব কালে ব্যবসায়ের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্রের পুত্র শ্রীদুর্গাচরণ ১২৬১ সালে ২৪ সে আশ্বিন খাঁটুরায় জন্ম গ্রহণ করিয়া কাশীধামে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ১২৭৮ সালে মনুসংহিতা পাঠকালে বৈশ্যোচিত ভূতি উপাধি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন।

খাঁটুরা গ্রামে রামকুমার রক্ষিত নামে এক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা দুই সহোদর। জ্যেষ্ঠ রামকুমার, কনিষ্ঠ কাশীনাথ। রামকুমার বাল্যাবস্থায় গ্রাম্য পাঠশালে যৎকিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিক্ষা করতঃ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কলিকাতা বড়বাজার চিনি পটীতে চিনির ব্যবসায় করেন। ঐ ব্যবসায়ে রামকুমার অল্পদিনের মধ্যেই যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া স্বনামে জমিদারী ক্রয় করেন। এবং তদুৎপন্ন অর্থে অনেক ক্রিয়া কলাপও করিয়া ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ কাশীনাথও হাউসে চিনির দালালী করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করেন। ইনিও ক্রিয়াবান লোক ছিলেন। [illegible]

সৎচরিত্রবান ছিলেন। অদ্যাপি বড়বাজার চিনিপটী রামকুমার রক্ষিতের লেন নামে খ্যাত।

সন ১২৪৯ সালে খাঁটুরা গ্রামে গণেশচন্দ্র রক্ষিতের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম প্রেমচাঁদ রক্ষিত। বাল্যাবস্থায় গণেশচন্দ্র পিতৃমাতৃহীন হইয়া মাতুল আশ্রয়ে বাস করেন। মাতুল ৺ রামসেবক পাল। মাতুলালয়ে থাকিয়া গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্তির পর ১৮৫৫ খৃঃব্দে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক স্থাপিত খাঁটুরা আদর্শ বঙ্গবিদ্যালয়ে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন পরে কলিকাতায় সংস্কৃত কালেজে ভর্ত্তি হন। ঐ সময় তাঁহার মাতুলের অবস্থা ভাল ছিল; কিন্তু তাঁহার পঠদ্দশাতেই মাতুলের অবস্থা মন্দ হওয়াতে ইঁহাকে কালেজ ছাড়িতে হইল। তৎপরে ২।৩ বৎসরকাল কলিকাতা "হিন্দু দাতব্য বিদ্যালয়ে" অর্থাৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে বাঙ্গালা শিক্ষকের কার্য্য করেন। পরে ইংরাজি ১৮৬৪ খৃঃব্দে মেডিকেল কালেজে ভর্ত্তি হন। তথায় বিনা বেতনে অধ্যয়ন তদতিরিক্ত পাঁচ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইতে লাগিলেন। ১৮৬৭ সালে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত হন। ইনি ৩১ বৎসরকাল প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়া দুই বৎসর যাবৎ পেন্‌সন্ লইয়া জন্মভূমিতে বাস করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত গণেশচন্দ্রের দ্বিতীয়া কন্যা সরলাবালা রক্ষিত। সন ১২৭৮ সালে ২০শে জ্যৈষ্ঠ উড়িষ্যার অন্তর্গত কেন্দ্রাপাড়া নামক স্থানে সরলার জন্ম হয়। প্রথমতঃ পিতার নিকট থাকিয়া ইনি বাঙ্গালা শিক্ষা করেন। পরে তাঁহার বয়স যখন ৭।৮ বৎসর, তখন কলিকাতার "বেথুন স্কুলে" ভর্ত্তি হন এবং প্রতি বৎসরই প্রশংসার সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। এইরূপে নিজের যত্নে অতি অল্পদিনের মধ্যে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হন। ইনি সংস্কৃতে বি, এ, অনার লাভ জন্য পদ্মাবতী মেডেল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে বাঁকিপুর "বোর্ডিংবালিকা বিদ্যালয়ের" প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত হন। ঐ বিদ্যালয় তত্রত্য ডিঃ মাজিষ্ট্রেট বাবু প্রকাশচন্দ্র রায় ও তদীয় সহধর্ম্মিনী কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। কিছুকাল পরে কলিকাতার ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ের লেডি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হন। এই খানে ৩।৪ বৎসর কাল কর্ম্ম করিয়া সম্প্রতি ঢাকার ইডেন ফিমেল

স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। অদ্যাবধি বিবাহ করেন নাই। কুমারী অবস্থায় আছেন এবং স্বীয় বেতনের দ্বারা সহোদরা ভগ্নীগণের বিদ্যাশিক্ষা ও প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রক্ষিতের স্ববৃত্ত ও দৈনন্দিন বিবরণ হইতে উদ্ধৃত।

ইংরাজী ২০শে জানুয়ারি ১৮৭৮।

"পূর্ব্ব পুরুষের বাসস্থান্ দেখিতে উৎসুক হইয়া আমার প্রপিতামহ রামবল্লভ রক্ষিতের দৌহিত্রীর নিকট গেলাম। তিনি অতিশয় বৃদ্ধা, সে পর্য্যন্ত যাইতে অসমর্থ হইলেন না। প্রতিবেশী এক গোপ স্ত্রীকে সঙ্গে দিলেন। তাহারও বয়স অধিক। সেও ঐ বাটীর সুদিন দেখিয়াছে। ইদানীং হয়দাদপুরের সেই স্থানে শ্রীযুক্ত সৃষ্টিধর কোঁচের আম্র কানন হইয়াছে। কচিৎ এক খণ্ড প্রক্ষিপ্ত ইষ্টক দৃষ্টিগোচর হইল। গোপবধূ সে নিবাসের একটি চিহ্ন দেখাইল। এক সময় কতকগুলি নারিকেল পিতামহের "দাবায়" রাখা হয়। একটি ফল নলে পড়ে। তাহা হইতে গাছ বাহির হয়। এই সেই নারিকেল বৃক্ষ, পুরাতন কাহিনী স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য একমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। পিতামহের বাটী ইষ্টক নির্ম্মিত ছিল না। খড়ুয়া ঘরের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। পথ প্রদর্শক দেখাইতে লাগিল; এই স্থানে তোমার পিতামহের, এই স্থানে তোমার জ্যেষ্ঠ পিতামহের গৃহ ছিল ইত্যাদি। আমার পিতা এবাটীতে বাস করিতে পান নাই। জ্যেষ্ঠ পিতামহের পুত্র ঠাকুরদাস রক্ষিত মহাশয় তাঁহাকে সকল বিষয়ে বঞ্চিত করিয়া ছিলেন। বামড়ের তীরে একখানি আম্র কাঁঠালের বাগান দেখাইল, এক্ষণ উহা হয়দাদপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রামগোপাল আশের সম্পত্তি। পিতা কহিয়াছেন, তাঁহার পিতৃহস্ত রোপিত সেই বাগানে বহু কাঁটাল বৃক্ষ আছে। কিন্তু ঠাকুরদাস রক্ষিতের গুণে তাহার ফল "খাজা" কি "নেয়ো" জানিতে পারেন নাই।

ঠাকুরদাস রক্ষিত মহাশয় ৮৲ আট টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি দিতেন। তাহাতেই পিতা, পিতামহী প্রভৃতির ভরণ পোষণ কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। সেই

টাকাও যথা সময়ে পাইতেন না। তজ্জন্য বাবা মহাশয়কে তাঁহার মাতৃ-ষ্বসা সহ কলিকাতায় আসিতে হইত। শোভাবাজারে দরমার ঘর ভাড়া করিয়া থাকিতে হইত। এক এক দিন শোকে ক্রন্দন করিতেন, হায়! জগদীশ্বর কি করিলে? আটটী করিয়া টাকার জন্য কলিকাতা পর্য্যন্ত আসিতে হয়। পিতার অপ্রাপ্ত ব্যবহার অবস্থায় জ্যেঠা মহাশয় (ঠাকুরদাস রক্ষিত) কলিকাতাস্থ কয়েক খানি পৈতৃক বাটী বিক্রয় করেন। তজ্জন্য পরে কিছু টাকা পিতাকে দেওয়া হয়। তদ্দারায় চিনির চালিনী কর্ম্ম করেন। দুই তিন খানি নৌকা ডুবিয়া যাওয়ায় পিতাকে সর্ব্বস্বান্ত করে। কোন আত্মীয় কহেন, নৌকা ডুবিয়াছে তাহাতে ক্ষতি কি? উমেশ রক্ষিত তুমি ডুবিয়া "যাও"। তিনি সে পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া চাকরি আরম্ভ করিলেন। ভগবতী দাদার পিতা বিশ্বনাথ দে মহাশয়ের নিকট নিযুক্ত হইলেন। পরাধীনতার কষ্ট সহ্য হইত না; এজন্য তৎস্থানে কাঠের সিন্দুকের উপর শুইয়া অশ্রুপাত করতঃ ভাবিতেন, অহো! বাটীতে মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ৮৲ আট টাকা পাঠাইতে পারি, এমন সঙ্গতিও নাই। চাকরি ত্যাগ করিয়া লাল সুতা ও ষ্ট্যাম্প বিক্রয় প্রভৃতি ইতঃস্ততঃ বহু ব্যবসা অবলম্বন করিলেন। কিন্তু ভাগ্য প্রসন্ন হইল না। মুদিখানার কর্ম্মে তাঁহার অত্যন্ত ঘৃণা ছিল। এজন্য সে ব্যাপার করেন নাই। একদা কোন স্বজনের পীড়িত অবস্থা দেখিতে গিয়াছিলেন। সেখানে কেহ কহিলেন, জাতীয় ব্যবসার অবলম্বন করিয়া যদি প্রাণান্ত হয়, তথাপি ভিন্ন ব্যবসা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। তাহাতে চৈতন্যোদয় হইল। নানা উপায়ে ৩৫০ তিনশত পঞ্চাশ টাকা সংগ্রহ করিলেন। কিন্তু উহা গৃহ প্রস্তুত কার্য্যে ব্যয়িত হইয়া গেল। ভগবতীচরণ দে মহাশয়ের ভগ্নী শ্রীমতি সুখদার নিকট ১৫০৲ দেড়শত টাকা ও শোভাবাজারে শ্রীযুক্ত মধুসুদন পালের নিকট ২০০৲ দুই শত টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এই ৩৫০৲ সাড়ে তিন শত টাকা মূলধন লইয়া বাণিজ্যে ব্রতী হইলেন। বৎসরের পর বৎসর অতীত হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে এইবার ভাগ্য লক্ষ্মী মুখ তুলিয়া চাহিতে লাগিলেন। পিতৃদেব কহেন, "আমি যে সম্পত্তিটী পাই, তাহাকে কঠিন গ্রন্থীদ্বারায় আবদ্ধ করিতে ইচ্ছা হয়। "অন্ন চিন্তা কি ভয়ঙ্কর!" তাহা আমি জ্ঞাত আছি। আমার বংশে যেন সে কষ্ট কাহাকেও সহ্য করিতে না হয়।"

উমেশচন্দ্র রক্ষিতের ১২৫৫।৫৬ সালের লভ্য নির্ণয় পত্র হইতে উদ্ধৃত।

যাহাকে দেয়—

১। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ও
মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

২। যাদবচন্দ্র দত্ত ও
মুক্তারাম দত্ত।

৩। বিজয়চন্দ্র ঘটক ও
গঙ্গাধর সাধু খাঁ।

৪। রামচরণ মাড়য়ারি ও
শিবচরণ মাড়য়ারি।

৫। রামগতি কুণ্ডু ও
সৃষ্টিধর আশ।

৬। কার্ত্তিকচরণ দে ও
ভুবনমোহন কুণ্ডু।

৭। রামনারায়ণ সিংহ।

৮। বেণীমাধব বসু
উগ্রকণ্ঠ সাধু খাঁ ও
শিবচন্দ্র নাগ।

৯। উত্তমচন্দ্র রক্ষিত ও
যজ্ঞেশ্বর কুণ্ডু।

১০। রামসেবক পাল ও
ক্ষেত্রমোহন রক্ষিত।

১১। সুখদাময়ি দেব্যা।

১২। সুখদাময়ি দাসী।

যাহাকে দেয়—

১৩। গোবিন্দচন্দ্র রক্ষিত।

১৪। নবীনমণি দাসী।

১৫। মধুসূদন পাল।

১৬। গোপীমোহন সেন ও
শ্যামাচরণ সেন।

১৭। নিবারণচন্দ্র আশ।

১৮। দর্পনারায়ণ দাঁ।

১৯। লক্ষ্মীনারায়ণ আশ
সুবলচন্দ্র দে ও
ভুবনমোহন রক্ষিত।

২০। গিরিধর দত্ত।

২১। ঈশ্বরচন্দ্র শেট ও
ষষ্ঠীচরণ শেট।

২২। রামরতন রক্ষিত ও
রামতারণ রক্ষিত।

২৩। হারাণচন্দ্র আশ।

২৪। হারাণচন্দ্র কুণ্ডু
গোলকচন্দ্র দত্ত ও
উমেশচন্দ্র কুণ্ডু।

২৫। দ্বারকানাথ আশ
সীতানাথ আশ ও
মহেন্দ্রনাথ আশ।

যাহাকে দেয়—	যাহার নিকট প্রাপ্য—
২৬। ঈশ্বরচন্দ্র কুণ্ডু ও ঠাকুরচরণ কুণ্ডু।	১। শ্যামা চরণ দাঁ।
২৭। শ্যামাচরণ দাঁ।	২। মহাদেব সা ও নগ্গুণ সা।
২৮। নিবারণচন্দ্র কুণ্ডু।	৩। রামচন্দ্র আশ ও অভয়াচরণ কোঁচ।
২৯। রামসেবক রক্ষিত ও রামগোপাল আশ।	৪। দিননাথ চেল।
৩০। চন্দ্রমণি দাসী ও পূর্ণচন্দ্র রক্ষিত।	৫। রামনারায়ণ পাল ও বদনচন্দ্র পাল।
৩১। ব্রজমোহন দত্ত।	৬। হরিশ্চন্দ্র সাহা ও অদ্বৈতচরণ সাহা।
৩২। সাধুচরণ সিংহ ও রঘুনাথ সিংহ।	৭। রামধন চেল ও বিশ্বনাথ চেল।
৩৩। গোপীমোহন সেন।	৮। গুরুচরণ দে ও গোঁসাই দাস দে।
৩৪। উগ্রকণ্ঠ সাধু খাঁ ও শিবচন্দ্র নাগ।	৯। আনন্দচন্দ্র পাল ও চিন্তামণি দত্ত।
৩৫। বেণীমাধব বসু ও গঙ্গাধর সাধু খাঁ।	১০। রঘুনাথ কুণ্ডু ও পুরুষোত্তম কুণ্ডু।
৩৬। ক্ষেত্রমোহন বসু ও তারাচাঁদ পাল।	১১। তারিণীচরণ ঘোষ।
৩৭। মঙ্গলচন্দ্র আশ।	১২। রামসেবক সেন ও চন্দ্রকুমার দে।
৩৮। ব্রজমোহন দত্ত।	১৩। রামগোপাল সেন।
৩৯। বৃন্দাবন সেন ও তামাক ওয়ালা।	১৪। রামকল্প রক্ষিত ও কালীপদ রক্ষিত।
৪০। নবীনচন্দ্র রক্ষিত।	১৫। গোপীনাথ দাস উড়ে।
৪১। শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।	১৬। উমেশচন্দ্র সেন ও রামচন্দ্র সেন।
৪২। রাজীবলোচন রক্ষিত।	
৪৩। রাধানাথ মিত্র।	
৪৪। বৈদ্যনাথ রজক।	

যাহার নিকট প্রাপ্য—

১৭। গোবিন্দচন্দ্র দে ও
নবকৃষ্ণ ঘোষ।

১৮। বৈকুণ্ঠনাথ পাল ও
রামসেবক পাল।

১৯। কৃষ্ণমোহন পাল ও
উমেশচন্দ্র পাল।

২০। ঈশ্বরচন্দ্র কুণ্ডু।

২১। কাশীনাথ পাল।

২২। রামসেবক পাল ও
ভগবতীচরণ দে।

২৩। রাইচরণ চেল ও
নরোত্তম রক্ষিত।

২৪। পাঁচকড়ি ভট্টাচার্য্য ও
শ্যামাচরণ রক্ষিত।

২৫। মহেশচন্দ্র কোঁচ ও
যাদবচন্দ্র রক্ষিত।

২৬। উমাচরণ পাল ও
কেদারনাথ পাল।

২৭। হারাণ আশ ও
গোপাল আশ।

২৮। রামনারায়ণ শেঠ ও
বিশ্বনাথ শেঠ।

২৯। ঠাকুরদাস আশ।

৩০। মদনমোহন সাধুখাঁ ও
নবকৃষ্ণ সাধুখাঁ।

৩১। দিননাথ দত্ত ও
হরিশচন্দ্র রক্ষিত।

যাহার নিকট প্রাপ্য—

৩২। স্বরূপচন্দ্র রক্ষিত ও
উমাচরণ রক্ষিত।

৩৩। শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩৪। কেদারনাথ রক্ষিত।

৩৫। রাজীব লোচন রক্ষিত।

৩৬। প্রাণকৃষ্ণ সেন
রাধাকৃষ্ণ সেন ও
জীবনকৃষ্ণ সেন।

৩৭। কৃষ্ণহরি লাল মদক ও
রামগোপাল সেন মদক।

৩৮। কৃষ্ণহরি মদক।

৩৯। কৃষ্ণহরি নাগ ও
কালীকুমার দাস।

৪০। প্রসন্নচন্দ্র রক্ষিত।

৪১। শ্রীনাথ দত্ত ও
বটকৃষ্ণ রক্ষিত।

৪২। বৃন্দাবন সেন ও
মহেশচন্দ্র সেন।

৪৩। তারককুণ্ডু ও
হরিমোহন দে।

৪৪। বলরাম দে ও
বৃন্দাবন দে।

৪৫। বৈকুণ্ঠ পাল ও
মধুসূদন পাল।

৪৬। ভাগবত চেল ও
যদুনাথ চেল।

৪৭। নিত্যানন্দ ঘোষ।

যাহার নিকট প্রাপ্য—

৪৮। পুরুষোত্তম পাল।
৪৯। রামব্রহ্ম চট্টো ও
ভুবনমোহন বসাক।
৫০। নবীনচন্দ্র রক্ষিত।
৫১। দিননাথ দাস মদক।
৫২। গোপীমোহন পাল ও
মহেন্দ্রনাথ আশ।
৫৩। প্রেমচাঁদ রক্ষিত
গগণচন্দ্র রক্ষিত ও
নীলমণি রক্ষিত।
৫৪। রামকমল দাস মদক ও
অক্ষয়দাস মদক।
৫৫। ভোলানাথ দে ও
দিগম্বর সরকার।
৫৬। নবকুমার দে।
৫৭। পাঁচকড়ি মল্লিক ও
নিমচাঁদ মল্লিক।
৫৮। রামকুমার সিংহ।
৫৯। রামসেবক রক্ষিত।
৬০। লক্ষ্মণচন্দ্র আড্ডী।
৬১। মাধবচন্দ্র নাগ মদক।
৬২। হরিদাস আশ।
৬৩। ঠাকুরদাস সরকার
দিগম্বর সরকার ও
যদুনাথ সরকার।
৬৪। বংশীধর রক্ষিত ও
শ্যামাচরণ সেন।

যাহার নিকট প্রাপ্য—

৬৫। পিতাম্বর দে ও
নিলমণি পালিত।
৬৬। হারাধন সরকার কুণ্ডু
রামচন্দ্র কর ও
লক্ষ্মণচন্দ্র কর।
৬৭। মিঃ বোরণ সাহেব ও
প্রেমচাঁদ সরকার।
৬৮। প্রসন্নকুমার সেন ও
জগমোহন শ্রীমানি।
৬৯। রামকল্প রক্ষিত।
৭০। কালীকুমার রক্ষিত।
৭১। কালীকুমার দত্ত।
৭২। রাজচন্দ্র পাল।
৭৩। রাজচন্দ্র রক্ষিত
বলভদ্র রক্ষিত ও
কৃষ্ণমোহন রক্ষিত।

নগদা খাতা।

১। নেকচাঁদ বাবু ও
মাণিকচাঁদ বাবু।
২। শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়।
৩। ভীমজি ঠাকুর।
৪। তারাচাঁদ বাবু ও
ধরমচাঁদ বাবু।
৫। পার্ব্বতীচরণ রক্ষিত।
৬। শ্রীনিবাস কুণ্ডু।

নগদা খাতা।

৭। বৃন্দাবন অধিকারী ও
মহেশচন্দ্র অধিকারী।

৮। চোখমল ও
গুলাপচাঁদ।

৯। নন্দরাম ও
প্রতাপ মল।

১০। শিবচন্দ্র দাস।

১১। গুরুচরণ হালদার।

১২। হনুমান হালুয়াই ও
বিহারী হালুয়াই।

১৩। তারাচাঁদ দে ও
হরিমোহন দে।

১৪। কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়।

১৫। কমলাকান্ত সিংহ।

১৬। আনন্দচন্দ্র পাল।

নগদা খাতা।

১৭। রামচাঁদ বাবু ও
স্বরূপসুখ বাবু।

১৮। বংশীবদন নন্দী ও
হলধর মজুমদার।

১৯। যদুনাথ দত্ত।

২০। অক্ষরচন্দ্র বাবু ও
প্রতাপমল বাবু।

২১। গোবর্দ্ধন বাবু।

২২। হারাণচন্দ্র আশ।

২৩। সুবলচন্দ্র বাবু।

২৪। প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ।

২৫। সুমের সিং ও
দামোদর।

২৬। মধুসূদন পাত্র।

২৭। ভোলানাথ বাবু দালাল।

১২৬১ অব্দে পণ্য দ্রব্যের মূল্য।

(প্রতি মণ।)

দ্রব্য	মূল্য
কাশীর চিনি ...	৬॥০,৮৲
সরেশ দোবরা চিনি	১০৲—৯৸০
মাজারি চিনি ...	৬৸০
খাঁড় ...	৩৴০
জ্বালানী ঘৃত ...	১৫৲
মাজারি ঘৃত ...	১৫॥৴০
গাওয়া ঘৃত ...	১৯॥০
নারিকেল তৈল ...	১১॥০,৮।৴০
লবণ ...	৩॥০
মধু ...	৪॥০
বাটাচিনি ...	৪৲
গরপেটে চিনি ...	৫৸৴০
দোবরা চিনি ...	৭॥০, ৮৲,
দলুয়া চিনি ...	৫৸০, ৫৴০

খেজুরে পাকা চিনি	৬॥৵১০	মুঙ্গের ঘৃত	১৭৷৵,২০॥৵১৫
কাশীর দোমা চিনি	৫৲	মাজারি ভৈঁসা ঘৃত ...	১৬৷৵০
মাজারি দলুয়া ...	৫॥১	ভৈঁসা ঘৃত ...	১৮৲
নরম দলুয়া ...	৪।০, ৪৷৵০	চৌপল ঘৃত ...	১৭।০
বোম্বাই খাঁড় ...	৩।০	কৌরঙ্গ ঘৃত ...	১৬॥০
নাথপুরে ঘৃত ...	১৭৷৵০		

আকবরের সময়।

দিল্লীর দর।

খৃঃ অব্দ ১৫৫৬ হইতে ১৬০৫।

(প্রতি মণের মূল্য)

গম ...	।০	বেসম ...	॥০
যব ...	৵০	তৈল ...	২৲
চাউল	॥০ হইতে ২৲	ঘৃত ...	২॥৵০
কলাই দাল ...	।৵০	গোল মরিচ ...	১৭॥০
মুগের দাল ...	।৶০	চিনি ...	৩৶০
বুটের দাল ...	।৵৯	গুড় ...	১।৵০
মটর দাল ...	।০	দুগ্ধ ...	॥৵০
ময়দা	।৵০ হইতে ॥০	দধি ...	।৶০

দ্রব্যের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহাতে সাধারণে বিবেচনা করেন, পূর্ব্বকালে লোক অতি সুখে জীবন যাপন করিতেন, এক্ষণে আমরা কষ্ট পাইতেছি, বাস্তবিক তাহা নহে। দ্রব্যের মূল্য আপেক্ষিক। যে পদার্থের দ্বারা বিনিময় করা হয়, কোন প্রকারে তাহা প্রচুর সংগৃহীত হইলে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হয়। তাহার বিপরীতে মূল্যের হ্রাস হইয়া থাকে। এক্ষণে টাকা সস্তা হইয়াছে, এজন্য পূর্ব্বকাল অপেক্ষা দ্রব্যাদি মহার্ঘ হইয়াছে।

বংশবৃক্ষ।

হরিরাম রক্ষিত।
দামোদর
মণিরাম
দীনবন্ধু
রমানাথ
বাণেশ্বর
শিবরাম
রামসুন্দর
কালীকুমার
শ্যামাচরণ
শ্রীঅক্ষয়কুমার
হরিদাস
শ্রীমন্মথ
* চাঁদ
অযোধ্যারাম
মুক্তারাম
ভৈরবচন্দ্র
রামবল্লভ
সহস্ররাম
রামধন
ভবানীপ্রসাদ
শম্ভুচন্দ্র
ঈশ্বরচন্দ্র
শ্রীউমেশচন্দ্র
গিরিশচন্দ্র
৺রাজেশ্বর
শ্রীদুর্গাচরণ
শ্রীঅশোক
শ্রীপ্রবোধ
শ্রীসুবোধ
রামকুমার
কাশীনাথ
রামতারণ
শ্রীমাণিক
বনমালী
মাণিকচন্দ্র
কৃষ্ণ
রামসুন্দর
সূর্য্য
গোপীমোহন
শ্রীযদুনাথ
শ্রীরাজেশ্বর
শ্রীকুঞ্জবেহারী
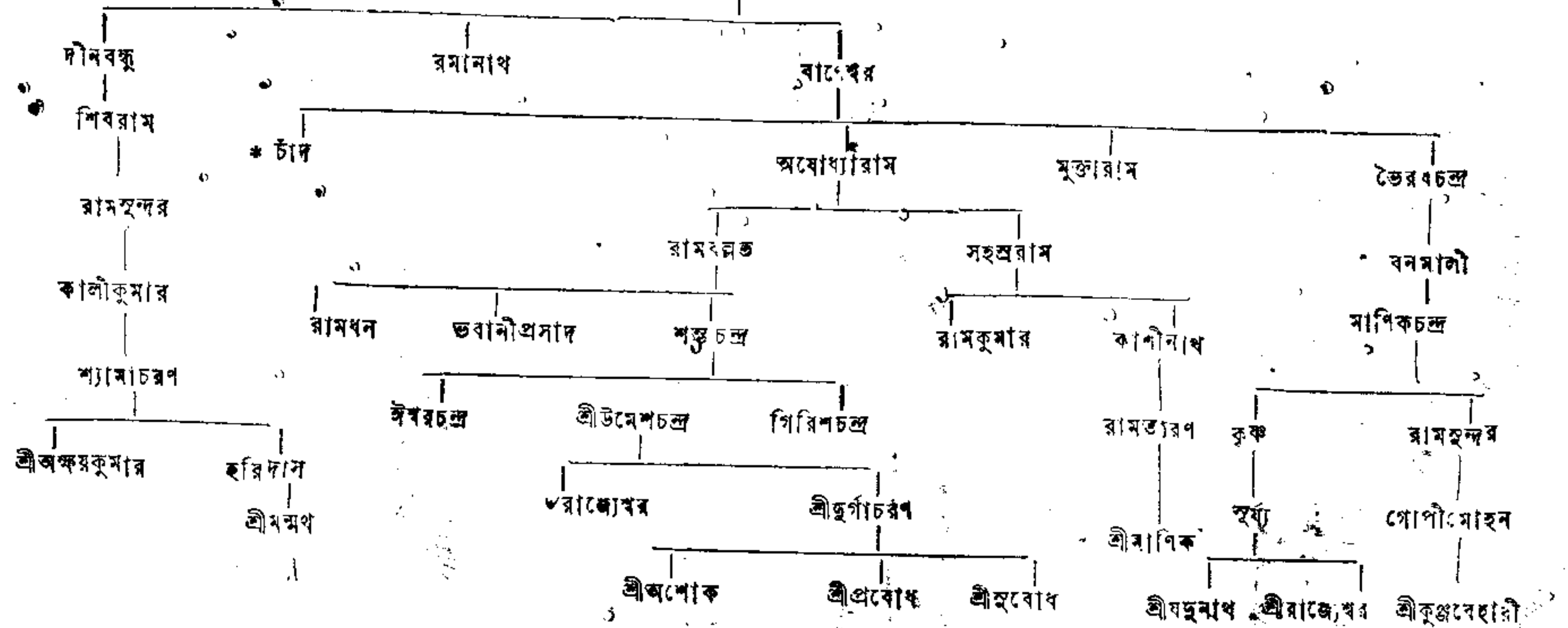
দম্বাল রক্ষিত বংশের জন সংখ্যা।

১। শ্রীউমেশচন্দ্র রক্ষিত ২ দুর্গাচরণ রক্ষিত ৩ অশোকচন্দ্র রক্ষিত ৪ সহায়রাম
রক্ষিত ৫ কালীপ্রসন্ন রক্ষিত ৬ মতিলাল রক্ষিত ৭ হরিদাস রক্ষিত ৮ গৌরহরি
রক্ষিত ৯ আশুতোষ রক্ষিত ১০ হরিনারায়ণ রক্ষিত ১১ রামনারায়ণ রক্ষিত
১২ কুঞ্জবিহারী রক্ষিত ১৩ দিননাথ রক্ষিত ১৪ ললিতমোহন রক্ষিত ১৫ লাল-
মোহন রক্ষিত ১৬ বিশ্বেশ্বর রক্ষিত ১৭ কালীকুমার রক্ষিত ১৮ মাণিকচন্দ্র
রক্ষিত ১৯ মন্মথনাথ রক্ষিত ২০ অক্ষয়কুমার রক্ষিত ২১ অতুলকৃষ্ণ রক্ষিত
২২ *, ২৩ জটে ২৪ গণেশচন্দ্র রক্ষিত ২৫ সুরেশচন্দ্র রক্ষিত ২৬ গোপালচন্দ্র
রক্ষিত ২৭ পঞ্চানন রক্ষিত ২৮ হরিদাস রক্ষিত ২৯ যদুনাথ রক্ষিত ৩০ রাজ্যে-
শ্বর রক্ষিত ৩১ রামচন্দ্র রক্ষিত ৩২ উমাচরণ রক্ষিত ৩৩ হীরালাল রক্ষিত ৩৪
অধরচন্দ্র রক্ষিত ৩৫ হরিচরণ রক্ষিত ৩৬ পতিরাম রক্ষিত ৩৭ গোবর্দ্ধন রক্ষিত
৩৮ হরিদাস রক্ষিত ৩৯ নবকুমার রক্ষিত ৪০ ৺বিহারিলাল রক্ষিতের পুত্র।
স্ত্রীলোক ৪০, বালক ২৪ এবং বালিকা ২১। সমষ্টি ৮৫।

শাণ্ডিল্য রক্ষিত বংশ।

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় কালীবর রক্ষিতের প্রপিতামহের নাম তোতারাম
রক্ষিত। ইনি এক জন খুব উপস্থিত সৎবক্তা ছিলেন। একদা গোবরডাঙ্গার
প্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্তবাবু খেলারাম মুখোপাধ্যায়-তাঁহাকে কোন কারণ বশতঃ
আহ্বান করেন। পূজনীয় জমীদার—তাহাতে ব্রাহ্মণ এইহেতু তথায় যাইলে
প্রজাদিগের রীতি আছে, জমীদারকে নজর দিতে হয়। কিন্তু তোতারাম তৎ-
কালীন নজর দিতে অক্ষম হওয়ায় কৌশল পূর্ব্বক জমীদার মহাশয়কে সন্তোষ
করিবার জন্য নিম্ন লিখিত বক্তৃতা করিয়া সভাস্থ সকলের মনোরঞ্জন করিয়া
ছিলেন। তোতারামকে দেখিয়া জমীদার মহাশয় কহিলেন, "এস তোতারাম!"
তোতারাম জোড় হস্তে কহিলেন ;—

"কি দিয়ে পূজিব রাঙ্গাপায়।
জল দিয়ে পূজি যদি মীন আছে তায়॥
কি দিয়ে পূজিব রাঙ্গাপায়।

পুষ্পদিয়ে পূজি যদি, ভ্রমর মধু খায়॥
কি দিয়ে পূজিব রাঙ্গাপায়।
দুগ্ধ দিয়ে পূজি যদি, বাছুর পিয়ায়॥
কি দিয়া পূজিব রাঙ্গাপায়।
মন দিয়া পূজি যদি, মন নাহিক তায়॥
কি দিয়া পূজিব রাঙ্গা পায়।

এই কথা বলিয়া তোতারাম স্থির হইলে, কতিপয় সভ্যের মধ্যে এক জন কহিলেন,—"তোতারাম! টাকা দিয়া পূজা কর।" তৎক্ষণাৎ তোতারাম উত্তর করিল;—

টাকা দিয়া পূজি যদি, খাদ আছে তায়।
কি দিয়া পূজিব রাঙ্গাপায়॥

ইহা শুনিয়া সভাস্থ সকলে হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন; "বা! তোতারাম! ভাল বক্তৃতা করিয়াছ।"

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় রক্ষিত বংশের জন সংখ্যা।

১ শ্রীহরিপদ রক্ষিত ২ খগেন্দ্রনাথ রক্ষিত ৩ চণ্ডীচরণ রক্ষিত ৪ কালীবর রক্ষিত ৫ বিষ্ণুপদ রক্ষিত ৬ যোগীন্দ্রনাথ রক্ষিত। স্ত্রীলোক ১৩, বালক ৪, বালিকা ৬, সমষ্টি ২৯।

কাশ্যপ পাল বংশ।

বর্ত্তমান গোপালচন্দ্র পালের পূর্ব্ব পুরুষ শোভারাম পাল বর্গীর হাঙ্গামায় ভীত হইয়া সপ্তগ্রাম হইতে খাঁটুরায় আসিয়া বাস করেন। ইহাঁদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা তেজারতি ও মহাজনী কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ইহাঁদের পূর্ব্ব পুরুষ ১ম, শোভারাম, শোভারামের পুত্র অনন্তরাম, অনন্তরামের

পুত্র গঙ্গাধর। গঙ্গাধরের তিন পুত্র কালীবর, রামরতন ও উমাচরণ। রাম-রতনের পুত্র বর্ত্তমান গোপাল ও অধর। উমাচরণের পুত্র বর্ত্তমান যদুনাথ পাল। গঙ্গাধর পাল তেজারতি ও মহাজনী করিয়া উন্নতির পরিবর্ত্তে ঐ কার্য্যে তিনি নিঃস্ব হইয়া পড়েন। তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় মধ্যম পুত্র রাম-তারণ পিতৃবিয়োগে নিঃসহায় হইয়া অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়া ছিলেন। কি করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন, এই ভাবনায় তাঁহাকে বড়ই অস্থির করিয়াছিল। পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রামরতন কলিকাতায় বটতলায় তাঁহার মাতুল ৺কাশীনাথ পাল মহাশয়ের দোকানে সামান্য বেতনে চাকরিতে প্রবৃত্ত হয়েন। কিছুদিন ঐ স্থানে কার্য্য করিয়া তৎপরে কলিকাতা বড়বাজারে হারাণচন্দ্র আশের পণ্যশালায় প্রবেশ করেন। অতঃপর স্ত্রী ও ৩টী নাবালক পুত্র রাখিয়া ইনি পরলোক গমন করেন। কার্য্য শিক্ষার জন্য গোপালচন্দ্র উমেশচন্দ্র রক্ষিতের বাণিজ্যশালায় অতি অল্প বয়সে প্রবিষ্ট হন। নিদাঘকালের মধ্যাহ্নে যৎকালে সহযোগী কর্ম্মচারীগণ নিদ্রা যাইতেন, গোপাল ও ফটিকচন্দ্র রক্ষিত তখন ক্রয়কারীর প্রতীক্ষায় কালক্ষেপ করিতেন। খরিদদার দেখিলে গোপাল সর্ব্বাগ্রে যাইয়া দ্রব্য মনোনীত করাইতে যত্নবান্ হইতেন। পরে বুঝাগেল, তিনি সত্ত্বাধিকারীর জন্য নহে, নিজের উন্নতির পথ পরিষ্কৃত করিবার জন্যই পরিশ্রমে অনুরাগী ছিলেন। শিক্ষার্থী যদি শ্রম বিমুখ হয়, কৃতবিদ্য হইবার আশা থাকে না। গোপাল পরিশ্রমী ছিলেন, এই জন্য এক্ষণে তিনি স্বয়ং পণ্যশালা স্থাপন করিয়া ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কাশ্যপ গোত্রীয় পাল বংশের জন সংখ্যা।

১ শ্রীযদুনাথ পাল, ২ হরিদাস পাল, ৩ রামচন্দ্র পাল, ৪ গৌরহরি পাল, ৫ মতিলাল পাল, ৬ পঞ্চানন পাল, ৭ গোপাল চন্দ্র পাল, ৮ গিরীজাপ্রসন্ন পাল, ৯ কুড়নদাস পাল, ১০ অধর চন্দ্র পাল, ১১ পাঁচকড়ি পাল, ১২ প্রিয়নাথ পাল, ১৩ হাজারিলাল পাল, স্ত্রীলোক ১০, বালক ৪, বালিকা ৬, সমষ্টি ৩৩।

মধুকৌল্য-পালবংশ।

মধুকৌল্য গোত্রীয় রামচন্দ্র পাল নামক জনৈক ব্যক্তি খাঁটুরা পাল পাড়ায় বাস করিতেন। ইনি এক জন উৎকৃষ্ট চিকিৎসক ছিলেন। "অবধৌত" মতে ইনি চিকিৎসা করিতেন। প্রতি বৎসর অষ্টমী পূজার দিন রামচন্দ্র সমস্ত রোগের ঔষধ প্রস্তুত করিতেন। ঐ ঔষধ এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত চলিত। ইনি হরিতাল, অভ্র প্রভৃতি ভস্ম করিতে জানিতেন। তাঁহার এক প্রকার অমোঘ জ্বর বটিকা ছিল। যে প্রকার জ্বর হউক না কেন, ২।৪ দিন তাঁহার সেই বটিকা সেবন করিলে রোগী জ্বর হইতে এক কালীন আরোগ্য লাভ করিত। তিনি বহুতর কঠিন পীড়াগ্রস্ত রোগীকে চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করিয়াছিলেন। এইরূপ জন শ্রুতি আছে যে রামচন্দ্র কতকগুলি রোগীকে মৃত্যু-মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া ছিলেন। তাঁহার চিকিৎসা প্রণালী উত্তম ছিল। তিনি যে কেবল চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন তাহা নহে, অনেক সর্পদষ্ট রোগীকেও তিনি ঔষধ ও মন্ত্র প্রয়োগে আরোগ্য করিতেন। এতদ্ভিন্ন তিনি ভূত, ডাইন, নব প্রসূত শিশুর পেঁচো পাওয়া প্রভৃতি মন্ত্র বলে আরোগ্য করিতে পারিতেন। চিকিৎসা করিয়া ইনি এতদ্দেশে বিশেষ যশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। চিকিৎসা ও মন্ত্রাদি ব্যতীত তাঁহার আরো একটি অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। তাঁহার বন্ধু বান্ধব সময়ে২ তাঁহার দৈবশক্তি পরীক্ষার্থ এক-স্থানে বসিয়া তাঁহার নিকট হইতে কেহ বা এলাচ, কেহ বা লবঙ্গ এই প্রকার নানাজনে বিবিধ দ্রব্যের প্রার্থনা করিত। রামচন্দ্রও তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে বসিয়াই প্রার্থিত দ্রব্য যোগবলে আনাইয়া দিতেন। তাঁহার এই অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া সকলেই সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইত। ইনি সরলচেতা শান্ত-প্রকৃতি ও নিরহঙ্কারী লোক ছিলেন।

এই বংশের আদিপুরুষ প্রহ্লাদ চন্দ্র পাল নামক জনৈক ব্যক্তি ১১২৭ সালে (বর্গীর হাঙ্গামার পরে) সপ্তগ্রাম হইতে আসিয়া খাঁটুরা গ্রামে বাস করেন। ইহাঁরি পুত্র যাদবেন্দু পাল। যাদবেন্দুর সাত পুত্র, তন্মধ্যে হরিচরণের পৌত্র রামগতি পাল। বংশীধরের পিতা জগন্নাথ, জয়পুর ও অন্য ২ হাটে গরুর পৃষ্ঠে সুতার ছালা বোঝাই করিয়া লইয়া যাইতেন, এবং ঐ সুতা বাজারের দোকান-

দারদিগকে দিয়া তৎপরিবর্ত্তে কাপাস তুলা লইতেন। এবং গ্রামে গ্রামে যাঁহারা চরকায় সূতা কাটিতেন, তাঁহাদের নিকট ঐ তুলা দিয়া চরকাজাত সূতা লইতেন। এইরূপ বিনিময় ব্যবসায় দ্বারা যাহা কিছু উপার্জ্জন হইত, তদ্দ্বারা অতি কষ্টে কোন প্রকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ক্রমে ক্রমে ঐ ব্যবসায় দ্বারা যৎসামান্য অর্থ রাখিয়া ইনি পরলোক গমন করেন। পিতার মৃত্যু হইলে ঐ অর্থ লইয়া প্রথমে বংশীধর কলিকাতা বটতলায় হরচন্দ্র দে নামক তিলী বংশীয় জনৈক ব্যক্তির সহিত অংশে একটি সামান্য বিলাতী সূতার দোকান করেন। এই স্থলে বলা আবশ্যক যে, তৎকালীন বিলাত হইতে সূতার আমদানী এই প্রথম। অতঃপর বংশীধর ঐ সূতার কারবারে কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিলে তদীয় পুত্র দ্বারিকানাথ পাল ও ভ্রাতপ্পুত্র রাম সেবককে বড়বাজারে বিলাতি সূতার একটি ভাল রকম কারবার করিয়া দেন। এই কারবার আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পরে অর্থাৎ সন ১২৪৫ সালে বংশীধরের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর বটতলার দোকান বন্ধ হইল। বড়বাজারের দোকান প্রবল হইল।

বংশীধরের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে মার্কিণের সহিত ইংরাজ দিগের যে একটি যুদ্ধ হয়, তাহাতে আমেরিকার তুলা ম্যানচেষ্টারওয়ালারা না পাওয়ায়, তৎকালীন ম্যানচেষ্টারের সূতার কল বন্ধ হয়। এই কারণে কলিকাতায় সূতার আমদানী না হওয়ায় বাজার বিশেষ তেজ হয়। তৎকালে ইহাঁরা বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করতঃ ঐ সূতার দোকানের সঙ্গে গরপেটে চিনির একটি কার্য্য আরম্ভ করেন।

উপরোক্ত মার্কিন যুদ্ধের সময় যথেষ্ট লাভবান হওয়ায়, ধনপিপাসায় প্রপীড়িত হইয়া ঐ তেজ বাজারে আমদানী সূতা চড়াদরে যথেষ্ট পরিমাণে খরিদ করেন। ঐ সূতা খরিদের অব্যবহিত পরেই মার্কিন যুদ্ধের অবসান হয় এবং কলিকাতায় বহুল পরিমাণে সূতা আমদানী হইতে আরম্ভ হয়। এই কারণে তাহার পর বৎসরেই ইহাঁরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িলেন।

পূর্ব্বে এতদ্দেশে চরকাজাত সূতা প্রচলিত ছিল। কিন্তু বিলাতী সূতা আমদানী হওয়ায় চরকাজাত সূতার ব্যবহার দিন দিন হ্রাস হইতে লাগিল।

বংশীধরের পূর্ব্ব পুরুষেরা চরকাজাত সুতার মোটা কাপড় ব্যবহার করিতেন। এখনকার ন্যায় তখন বাবুগিরির প্রচলন ছিল না। মোটা কাপড় ও তদুপযুক্ত উত্তরীয়, বৃষ্টি ও আতপ-তাপ নিবারণের জন্য গোল পাতার ছাতি ব্যবহৃত হইত। এইরূপ বেশে ইহাঁরা গো পৃষ্ঠে ছালা বোঝাই করিয়া গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রৌদ্রে, প্রবল বর্ষায় ও শীত কালের হিমানীতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সচ্ছন্দ মনে মাঠে মাঠে গ্রামে গ্রামে হাটে হাটে পণ্যদ্রব্য লইয়া ভ্রমণ করিতেন।

বুদ্ধির প্রখরতা সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় যে, এই পাল বংশের জগন্নাথ প্রভৃতি অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গের সহিত একত্রে হাট করিতে গিয়া কাহার কোন্ "বেগুন" চিনিয়া লইবার জন্য পরস্পর পৃথক ২ চিহ্ন দিয়া বেগুন দগ্ধ করিতেন। এই কারণে ঐ সময় হইতে ইহাঁদিগকে "বেগুনদাগা" পাল বলে।

বংশীধর পরোপকারী লোক ছিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রতিবেশী মণ্ডলীর বাটীতে যাইয়া প্রত্যেক বাটীর তত্ত্বাবধান লইতেন এবং যদি কাহারও সংসার নির্ব্বাহের টাকা আসিতে বিলম্ব হইত বা জমীদারের খাজনা প্রদানে অক্ষম হইয়া পীড়িত হইত, বংশীধর জানিতে পারিলে, নিজ হইতে টাকা কর্জ্জ দিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতেন। বংশীধরের বাটীতে পরিবারও অল্প ছিল না। দুইবেলায় অন্যূন ১৫০ বা ২০০ শত লোকের পাত পড়িত। ভ্রমণকারীগণ খাঁটুরার রাজ পথে তৎপ্রতিষ্ঠিত বৃহৎ পুষ্করিণী অদ্যাপি পল্লীশোভা বৃদ্ধি করিতেছে দেখিতে পাইবেন।

বংশীধর যে সময় সূতার কারবার করিয়া বৎসরেক কাল মধ্যে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করেন, তৎপূর্ব্বেই তাঁহার পুত্র দ্বারিকা নাথের মৃত্যু হয়। রাম সেবক বৈষয়িক বুদ্ধি প্রভাবে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া অনুমান ১২৬৩ সালে মৃত্যু মুখে পতিত হন। তদীয় সহোদর ভ্রাতা কান্তি চন্দ্র ঐ বিষয় সম্পত্তির প্রধান কর্ত্তা হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং ইনিই তেজি দরে সুতা কিনিয়া সর্ব্বস্বান্ত হন। কান্তি চন্দ্রের জ্যেষ্ঠা বিধবা কন্যা শ্রীমতি স্বরস্বতী সেন কিছুদিন বেথুন কালেজে শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। বামারচনাবলীতে তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করায় স্বজাতীয় গণ তাঁহার মায়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। বংশীধরের পুত্র কি পৌত্র কেহই

বর্ত্তমান নাই। যে সংসারে প্রত্যহ ১৫০।২০০ শত পাতা পড়িত, কালের কুটিল গতিতে আজ সেই সংসারে বংশীধরের দুইটী ভ্রাতুষ্পুত্র ভিন্ন আর কেহই নাই। ইহঁাদের একজনের নাম শ্রীনিবাস পাল ও অপরের নাম কৃষ্ণহরি পাল!

এই বংশে গৌরীচরণের পৌত্র রামগতি পাল। রামগতির তিনপুত্র। দয়াল, ঈশ্বর ও কেদার। রামগতি অতি নিঃস্ব ছিলেন। কিন্তু ইহাঁর ব্যবসায় বুদ্ধি তীক্ষ্ণ থাকায়, খাঁটুরা গ্রাম নিবাসী কালীকুমার দত্তের সহিত শূন্যবকরায় গোবরডাঙ্গা, চাঁড়ুড়িয়া প্রভৃতি স্থানে নানাবিধ কারবার খুলেন। কারবারের উন্নতির অবস্থায় কোন কারণ বশতঃ উভয়ের মনোমালিন্য ঘটায়, রামগতি উক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, চন্দন পুর নিবাসী ৺ রামসুন্দর মিশ্র মহাশয়ের অর্থ সাহায্যে নিজে স্বনামে নানাস্থানে নানাপ্রকার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। এই ব্যবসায়ে তিনি তাঁহার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। ক্রমশঃ কার্য্যের উন্নতি হওয়ায় প্রচুর পরিমাণে অর্থাগম হইতে থাকে।

সন ১২৫৯ সালের আশ্বিন মাসে রামগতি তিন পুত্র ও ঐ সকল ব্যবসায় অক্ষুন্ন রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ইহাঁর মৃত্যুর পর তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র কেদার নাথ সমস্ত ব্যবসায়ের কর্ত্তা হইয়া তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রভাবে গরপেটে চিনি বিলাতী সুতা, তিসি, লৌহ ও রিফাইন সোরার কারখানা ইত্যাদি নানা প্রকার ব্যবসায় প্রবলভাবে চালাইয়া বিলক্ষণ অর্থ উপার্জ্জন ও যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

সন ১২৭১ সালে সূতার বাজার অত্যন্ত হ্রাস হওয়ায় ক্ষতিপূরণে কেদারনাথ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়েন। নিঃস্ব অবস্থায় অনুমান ৩০ বৎসর জীবিত থাকিয়া সন ১৩০১ সালে পরলোক গমন করেন। এক্ষণে তাঁহার দুই পুত্র বর্ত্তমান আছেন। জ্যেষ্ঠ জানকী নাথ ও কনিষ্ঠ যদুনাথ। জানকীনাথ মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। স্বগ্রামে এক্ষণে ইনি চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেছেন।

মধুকৌল্য গোত্রীয় পাল বংশের জন সংখ্যা।

১ শ্রীহরিপদ পাল ২ সত্যহরি পাল ৩ রামচন্দ্র পাল ৪ রাজেন্দ্র নাথ পাল ৫ অমূল্যকৃষ্ণ পাল ৬ শরচচন্দ্র পাল ৭ কালীচরণ পাল ৮ মন্মথ নাথ পাল ৯ প্রমথ নাথ পাল ১০ সত্যচরণ পাল ১১ রামচন্দ্র পাল ১২ অম্বিকা চরণ পাল ১৩ কৃষ্ণহরি পাল ১৪ ভূতনাথ পাল ১৫ খগেন্দ্র নাথ পাল ১৬ দণ্ডীবর পাল ১৭ মানিক চন্দ্র পাল ১৮ ক্ষেত্র মোহন পাল ১৯ জানকী নাথ পাল ২০ প্রিয়নাথ পাল ২১ নারান চন্দ্র পাল ২২ হরিদাস পাল ২৩ যদুনাথ পাল ২৪ ননী গোপাল পাল ২৫ হরিদাস পাল ২৬ বিপ্রদাস পাল ২৭ কার্ত্তিক চন্দ্র পাল ২৮ পঞ্চানন পাল ২৯ নলিনী কান্ত পাল ৩০ মানিক চন্দ্র পাল ৩১ উপেন্দ্র নাথ পাল ৩২ শ্রীগোপাল পাল ৩৩ শ্যামাচরণ পাল ৩৪ মহানন্দ পাল ৩৫ ষষ্টিবর পাল ৩৬ গোষ্ঠ বিহারী পাল ৩৭ হৃদয় ভূষণ পাল ৩৮ শশীভূষণ পাল ৩৯ রামেশ্বর পাল ৪০ পার্ব্বতী চরণ পাল ৪১ শ্রীনিবাস পাল ৪২ উপেন্দ্রনাথ পাল ৪৩ ইন্দ্রভূষণ পাল ৪৪ নিবারণ চন্দ্র পাল ৪৫ পঞ্চানন পাল। স্ত্রীলোক ৬১, বালক ২৩, বালিকা ১৫, সমষ্টি ১৪৪।

শাণ্ডিল্য পাল বংশ।

এইরূপ প্রবাদ আছে যে, উপরোক্ত পালবংশ সপ্তগ্রাম হইতে আসিয়া খাঁটুরায় বাস করেন। রামজয় পালের বাটীতে খোরাকি ধান্যের জন্য কয়েকটী গোলা ছিল এবং ব্যবসায়ের জন্য খাঁটুরার অন্তর্গত সলো নামক স্থানে ১৭৫ কি ১৮০টী গোলা ছিল। খাঁটুরা গ্রামে সাতবার অগ্নিদাহ হয়। দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় বারের অগ্নিদাহে তাঁহার অপরাপর গোলাগুলি পুড়িয়া যায়। কেবল মাত্র একটি সুপারির গোলা রক্ষা পায়। তৎকালে রামজয় পাল স্থানান্তরে ছিলেন। বাটীতে আগমনকালে পথিমধ্যে একটী ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হয়। রামজয় পাল প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন. "ঠাকুর! কোথায় গমন করিয়াছিলেন?" তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, "খাঁটুরা গ্রামে রামজয় পালের বাটীতে গিয়াছিলাম ও তথায় পরিতোষ পূর্ব্বক মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়া আসিতেছি; কিন্তু মুখ শুদ্ধি হয় নাই।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ আপন গম্য স্থানে

গমন করিলেন। রামজয়ও ব্রাহ্মণের বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া বাটীতে আসিয়া দেখিলেন যে, অগ্নিতে সমস্তই ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে, কেবল মাত্র সুপারির গোলায় অগ্নি স্পর্শ হয় নাই। তখন বুঝিতে পারিলেন যে, পথিমধ্যে যে ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনিই সাক্ষাৎ অগ্নি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বেশী ব্রহ্মা। অতএব যখন তিনি বলিয়াছেন যে মুখ শুদ্ধি হয় নাই, তখন আর কেবল মাত্র সুপারির গোলা রক্ষা করিয়া লাভ কি? এই ভাবিয়া রামজয় পাল স্বহস্তে সুপারির গোলায় অগ্নি প্রদান করিয়া দাহ করিলেন। সন্ধিপুরের গোবর্দ্ধন রক্ষিত ও বড় রক্ষিত বংশের বিষ্ণুরামের বাটীতে ব্রহ্মা সুপারির গোলা ভক্ষণ করিতে পারেন নাই। বিনা অনুমতিতে আহার চলে, না পাইলে ক্রোধ করা অন্যায় নহে। পান সুপারি গ্রহণ সম্মানের চিহ্ন। বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে সৌজন্যের হানি হয়, এই জন্য অগ্নিদেবকে নররূপ গ্রহণ করিতে হয়। তিনি ধনবান ও তেজারতি ও মহাজনী কার্য্য ছিল বলিয়া কতিপয় দস্যু একত্রিত হইয়া তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হয়। কিন্তু তাঁহার কোন দ্রব্যাদি বা ধন লইয়া যাইতে সমর্থ হয় নাই। তাহার কারণ সলো গ্রাম নিবাসী গোলাম সর্দ্দার নামে জনৈক মুসলমান পুরাতন বাজার ও তাঁহার বাটী চৌকী দিত। যৎকালে দস্যুগণ বাজার লুণ্ঠন করিতে থাকে, ঐ সময় গোলাম সর্দ্দার চৌকিতে বাহির হয় ও দস্যুগণকে জিজ্ঞাসা করে "তোরা কে?" দস্যুরাও তদুত্তরে বলে যে, "তোর বাবারা।" এই প্রকার বচসায় গোলামের সহিত দস্যুদিগের অস্ত্রক্রীড়া আরম্ভ হইল। ইত্যবসরে রামজয় পালের বাটীস্থ পরিজনবর্গ ও দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত হয়। পরে দস্যুদল হইতে একটী সড়কী আসিয়া গোলাম সর্দ্দারের উরুদেশ ভেদ করিল। গোলাম যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া হস্তদ্বারা সড়কী উৎপাটন করিয়া নিকটস্থ একটী পচা পুষ্করিণী মধ্যে পড়িল এবং নিজ বস্ত্রদ্বারা আঘাত স্থান দৃঢ়রূপে বন্ধন করিল। মদন নামে গোলামের একটী ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল, সেও ঐ চৌকিদারী কার্য্য করিত। গোলাম পুষ্করিণী হইতে উঠিয়া মদনকে বলিল, "সশস্ত্রে বাজারের উত্তর সীমা রক্ষা কর। সাবধান, দস্যুরা যেন বাজার হইতে এক কপর্দ্দকও লইতে না পারে। আমি দক্ষিণ দিক হইতে পুনরায় ইহাদিগকে আক্রমণ করি।" মদন তাহাই করিল। দস্যুরা ক্রমশঃ বাজার ছাড়িয়া রামজয় পালের বাটীর

মধ্যে পতিত হইল। কিন্তু পূর্ব্বাহ্নেই দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত হইয়াছিল। সুতরাং দস্যুগণ কি করিবে এই প্রকার চিন্তা করিতেছে, ইত্যবসরে গোলাম ও মদন উভয়ে পুনর্ব্বার দস্যুদল দলনে প্রবৃত্ত হইল। প্রথমে দস্যুগণ বীরভাবে আসিয়াছিল, শেষে ভীরুতা অবলম্বন করিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করে। দুই তিন জন দস্যুকে মদন একেবারে কাটিয়া ফেলে; গোলামও দুই তিন জনকে শমন সদনে পাঠাইয়া ছিল। পর দিন থানার জমাদার ঘটনাস্থলে আসিয়া দস্যুগণের মৃতদেহ, গোলাম, মদন ও আরও কতিপয় লোককে জেলায় চালান দেয়। গোলাম সর্দার এই দুঃসাহসিক কার্য্যের জন্য গভর্ণমেণ্ট হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

রামজয় পালের বাটীতে প্রতি বৎসর বর্ষাদি পূজা হইত। ঐ সময় সমাজস্থ প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইতেন। এবং সভাধিবেশন হইয়া পঞ্চায়েতের ন্যায় সমাজভুক্ত লোক সকলের দোষ গুণ বিচার পূর্ব্বক দোষীর দণ্ড এবং গুণের পুরস্কার প্রদত্ত হইত।

বৈশাখী পূর্ণিমায় বর্দ্ধমান, হুগলি ও বৈঁচি সম্প্রদায়ে যে কুলপূজা হইয়া থাকে, তাহার নাম বৎসরাদি। পাঁচড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রামলাল রক্ষিত মহাশয় লিখিয়াছেন, উপরোক্ত পূজা সকলের বাটীতে হয় না। দেয়ের দে ও দয়াল রক্ষিতের বাটীতে মহামায়ীকে প্রসন্ন করিবার জন্য এই সময় বলিদান পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। চুণের ভাঁড়, কাতারি, জাঁতি ও পান, জাতীয় বৃত্তির সহায় স্বরূপ বলিয়া শিব দুর্গার নিকট উপস্থিত করা হয়। বৈঁচি হইতে আগত কালীচরণ দত্তের বংশসম্ভূত খাঁটুরা নিবাসী ব্রজমোহন দত্ত মহাশয় কহিয়াছেন, তাঁহাদের বাটীতে ঐ প্রকার চুণের ভাঁড় ও কাতারি দিবার নিয়ম আছে। ইহাতে এই সূচনা হইতেছে যে, বঙ্গদেশীয় তাম্বুলিরা উত্তর পশ্চিমের পানের খিলি ব্যবসায়ী তাম্বুলি হইতে অভিন্ন জাতি। বঙ্গদেশে আসিয়া ~~খিলির~~ ব্যবসায় ত্যাগ করতঃ অন্য পণ্য দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছেন।

রামজয় পালের পৌত্র দুর্গারাম পাল এক জন তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। ইনি কখনও কাহারও চাকরি স্বীকার করেন নাই। সামান্য ব্যবসায় দ্বারা কোনরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। যৎকালে খাঁটুরার বাজার অগ্নি লাগিয়া ভস্মসাৎ হয়, ঐ সময় গোবরডাঙ্গার প্রবল জমীদার কালীপ্রসন্ন

বাবু ঐ বাজার উঠাইয়া গোবরডাঙ্গায় স্থাপিত করেন। তৎপরে দুর্গারাম নিজ বাস ভবনের সম্মুখে এক দিনের মধ্যে দোকান ঘর প্রস্তুত করিয়া ঐ দোকানে কার্য্য আরম্ভ করেন। অত্রস্থ ত্রিলোকচন্দ্র আশের সহিত বাগানের জমী সম্বন্ধে বিবাদ হওয়ায়, দুর্গারাম স্বয়ং রাত্রির মধ্যে ৬০।৭০ হস্ত দীর্ঘ এবং ৪ হস্ত প্রস্থ এক পয়ঃ-প্রণালী খনন করাইয়া নিজ জমীর স্বত্ব প্রতিপন্ন করেন। তিনি এক জন সাহসী ও বলবান পুরুষ ছিলেন। পরোপকারেও তিনি যথাসাধ্য রত থাকিতেন। কোন পরিচিত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে যদি সৎকারের লোকাভাব হইত, দুর্গারাম জানিতে পারিলে সতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অন্যের সাহায্য উপেক্ষা করিয়া তৎক্ষণাৎ একাকী ঐ শবদেহ সৎকার করিয়া আসিতেন।

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় পাল বংশের জন সংখ্যা।

১ শ্রীরাজ্যেশ্বর পাল ২ রাসবিহারী পাল ৩ বঙ্কুবিহারী পাল ৪ রামদুলাল পাল ৫ রামগোপাল পাল ৬ রামহরি পাল ৭ গণেশচন্দ্র পাল ৮ কার্ত্তিকচন্দ্র পাল ৯ প্রহ্লাদচন্দ্র পাল ১০ নবীনচন্দ্র পাল ১১ বিষ্ণুপদ পাল ১২ হরিহর পাল ১৩ জয়গোবিন্দ পাল ১৪ রামচাঁদ পাল ১৫ মাণিকচন্দ্র পাল ১৬ শৈলেশ্বর পাল ১৭ সহায়নারাণ পাল ১৮ হরিদাস পাল ১৯ রাখালচন্দ্র পাল ২০ নারায়ণচন্দ্র পাল ২১ সুরেন্দ্রনাথ পাল ২২ খগেন্দ্রনাথ পাল ২৩ বিনোদবিহারী পাল ২৪ পঞ্চানন পাল ২৫ নগেন্দ্রনাথ পাল ২৬ শরচ্চন্দ্র পাল ২৭ সত্যচরণ পাল ২৮ মাণিকচন্দ্র পাল। স্ত্রীলোক ৩২, বালক ৬, বালিকা ৪। সমষ্টি ৭০

দাঁ বংশ।

একদা নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভ্রমণার্থ স্বদলে বহির্গত হইয়া বাঁকড়া গ্রামে উপনীত হন। ঐ সময় ঐ স্থানের অধিবাসী ভুবনেশ্বর দাঁ ও বেচারাম রক্ষিত নামক দুই ব্যক্তি সবিশেষ যত্ন সহকারে রাজার এবং অমাত্য-বর্গের পরিচর্য্যা করেন। প্রস্থান কালীন মহারাজ তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া

জিজ্ঞাসা করেন যে, "আমাদিগের পরিচর্য্যায় আপনাদিগের কত ব্যয় হইয়াছে বলুন এবং আমার নিকট হইতে তাহার মূল্য গ্রহণ করুন।" ইহাতে ভুবনেশ্বর দাঁ ও বেচারাম রক্ষিত বিনীত ভাবে করযোড়ে কহেন, "মহারাজ! আমরা অতি সামান্য ব্যক্তি, আমাদের সাধ্য কি যে মহারাজের পরিচর্য্যা করি! যাহা হউক তজ্জন্য আমরা এক কপর্দ্দকও প্রার্থনা করি না।" ইহাতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই জমিদারী কাহার?" তদুত্তরে তাঁহারা কহিলেন, "এই জমিদারী মহারাজের, কিন্তু হবিবৎ খাঁ পাঠান চৌধুরির পত্তনীতে আছে।" রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই কথা শুনিয়া উপরোক্ত মুসলমান পত্তনীদারকে ডাকাইয়া তাঁহার নিকট হইতে ঐ পত্তনীস্বত্ব খারিজ করিয়া দিয়া, বেচারাম রক্ষিতকে ১০ বিঘা ১৪ কাঠা এবং ভুবনেশ্বর দাঁকে ৬ বিঘা, একুনে ১৬ বিঘা ১৪ কাঠা জমী উভয়কে প্রদান করেন। ইহার সনন্দ সন ১১৭১ সালে বৈশাখ মাসে গৃহদাহে ভস্মীভূত হয়। রাজ প্রদত্ত সনন্দের সত্যতা ও নষ্টের বিষয় সন ১২০৯ সালে ২৯ সে অগ্রহায়ণ তারিখে যশোহরের কালেক্টর কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে।

নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রদত্ত

সনন্দের নিদর্শন।

(পূর্ব্বার্দ্ধ)

শ্রীচরণ—

খাজনা আখার

R. K. D. A. C.

শ্রীকালাচাঁদ দাঁ।
শ্রীজনার্দ্দন দাঁ।
শ্রীরামকুমার দাঁ।
শ্রীহারাণ দাঁ।
সাং বাঁকড়া।
খাঁটুরা।

নং ৩০৯৭২। হকিকত্

তয়দাদ্ বাজে জমী দাখিল কাছারি কালেক্টারি—

জেলা যশোহর সন ১২০৯ সাল অগ্রহায়ণ।

সনন্দ দত্ত বিনাম।	সনন্দ গৃহীতার নাম।	দখলিকারের নাম।	দখলিকারের সহিত সম্বন্ধ।	সাকীন নাম	যে গ্রামে জমী।	তায়দাদ জমি।
হবিয়ত খাঁ পাঠান চৌধুরি।	ভুবনেশ্বর দাঁ।	কালাচাঁদ। জনার্দ্দন দাঁ।	অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র	বাঁকড়া। ও খাঁটরা।	বাঁকড়া। আলিপুর।	৬/০

(অপরার্দ্ধ)

পরগণার নাম।	সনদের সন তারিখ।	যাহার নাম নাই তাহার হকিকত	জমীর নাম।
হোসেনপুর	স্মরণ নাই।	সন ১১৭১ সালে বৈশাখ মাসে গৃহ দাহিতে সনন্দ খোয়া গিয়াছে।	খাস দখল। মহাত্রান।

শ্রীরামকুমার।
মোং বাঁকড়া।

যাহা হউক ১২৩৯ সালে ২ রা আশ্বিন তারিখে বেচারাম রক্ষিত মহারাজ প্রদত্ত ঐ ১০ বিঘা ১৪ কাঠা জমী রামসুন্দর দাঁকে বিক্রয় করিয়া বাঁকড়া হইতে বসবাস উঠাইয়া লন। ইনি বর্ত্তমান শশীভূষণ দাঁর পিতামহ। প্রথমে ইনি সুখচর পানিহাটী গ্রামে তুলা ও তৎপরে চিনির ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এবং ১২৩৫ সালের কিছু পূর্ব্বে এই রামসুন্দর দাঁ কর্ত্তৃক প্রথম তেজারতি কার্য্য আরম্ভ হয়। রামসুন্দর দাঁর মৃত্যুর পর তৎপুত্র রামরাম দাঁ ঐ কার্য্য চালাইয়া আসিতে ছিলেন। কিন্তু প্রায় ২০ বৎসর হইল তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ কার্য্য একেবারে বন্ধ হয়। ভুবনেশ্বর দাঁর এক পুত্র কালাচাঁদ, তৎপুত্র রামকুমার, তৎপুত্র জনার্দ্দন, তৎপুত্র হারাণ, তৎপুত্র রামসুন্দর, তৎপুত্র রামরাম এবং তৎপুত্র বর্ত্তমান শশীভূষণ দাঁ।

গোবরডাঙ্গা গ্রামে রামলোচন দাঁ নামক এক ব্যক্তি বাস করিতেন। ইনিও ভুবনেশ্বর দাঁর বংশসম্ভূত। রামলোচনের দুই পুত্র, প্রথম দর্পনারায়ণ ও দ্বিতীয় পীতাম্বর। দর্পনারায়ণ বাল্যাবস্থায় কিছুদিন গ্রাম্য পাঠশালায় লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কলিকাতায় একটী মুদিখানার দোকান খুলেন। অপেক্ষাকৃত অর্থ সঞ্চয় হইলে, বড়বাজার চিনিপটীতে ঘৃত চিনি বিক্রয়ের কার্য্য আরম্ভ করেন। ক্রমশঃ ঐ ব্যবসায়ে লাভ হইতে থাকে; এই প্রকারে কিছু দিন গত হইলে দর্পনারায়ণ তদীয় পুত্র উত্তম চন্দ্রের প্রতি ব্যবসায়ের ভারার্পণ করতঃ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। উত্তম চন্দ্রও পিতার আদেশ মত সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। দর্পনারায়ণ সচ্চরিত্র ও মিতব্যয়ী লোক ছিলেন। দর্পনারায়ণের মৃত্যু হইলে উত্তম চন্দ্র বিশেষ যত্ন ও উদ্যম সহকারে কার্য্য করিয়া অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। উত্তম চন্দ্রের পুত্র দীননাথ; দিননাথ বয়োপ্রাপ্ত ও কার্য্যক্ষম হইলে উত্তম চন্দ্র ১২৭০ সালে উপযুক্ত পুত্রের হস্তে কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। পিতার ন্যায় উত্তমচন্দ্রও চরিত্রবান্ ও মিতব্যয়ী লোক ছিলেন। দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পর উত্তমচন্দ্র গোবরডাঙ্গার বাস ভবন ত্যাগ করিয়া কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বরাহনগর পাল পাড়ায় বসবাস করেন।

সন ১২৯৯ সালে ২ রা শ্রাবণ তারিখে উত্তমচন্দ্র পুত্র, পৌত্র, আত্মীয়, স্বজন রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার সৎপুত্র দিননাথ বিশেষ দক্ষতার

সহিত কাজ কর্ম্ম চালাইয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু অসুস্থতা নিবন্ধন কয়েক বৎসর হইল তাঁহার ভাগিনেয়ের হস্তে দোকানের কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছেন। ভাগিনেয়ও দক্ষতার সহিত উক্ত দোকানের কার্য্য চালাইতেছেন।

খাঁটুরা গ্রামের উপকণ্ঠেস্থিত হয়দাদপুর নামক স্থানে ঠাকুরদাস দাঁ নামক জনৈক ব্যক্তি বাস করিতেন। ইনি ভুবনেশ্বর দাঁর বংশোদ্ভব। ইহাঁরা তিন সহোদর ছিলেন। জ্যেষ্ঠের নাম রামসেবক, মধ্যম ঠাকুরদাস, কনিষ্ঠ নাটু-মোহন। ইহারই পূর্ব্ব পুরুষ প্রথমে বাঁকুড়া হইতে আসিয়া তিপুল নামক স্থানে বাস করেন। কিন্তু তাঁহার বাটীতে ডাকাতি, চুরি এবং ১২৬৮ সালের দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত ও তাঁহার আত্মীয় স্বজন অনেকে স্থানান্তরিত এবং মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায়, তিনি তিপুলের বাস উঠাইয়া হয়দাদপুরে আসিয়া বসবাস করেন। ঠাকুরদাস সর্প দংশন হইতে আরোগ্য হইবার মন্ত্র ও ঔষধ, পৃষ্ঠাঘাতের ঔষধ ও নানা প্রকার ক্ষত রোগের ঔষধ জানিতেন। ইনি অনেক সর্পদষ্ট রোগীকে মন্ত্রবলে ও অপরাপর ব্যাধি-গ্রস্ত ব্যক্তিকে ঔষধ প্রয়োগে আরোগ্য করিতেন।

ক্রমে ক্রমে যখন ঠাকুরদাসের অবস্থাহীন হইয়া ছিল, সেই সময় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নাটুমোহন তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র রক্ষিত মহাশয়ের দোকানে চাকরিতে প্রবৃত্ত হন এবং কলিকাতায় বাস করিতে থাকেন। এক দিন ঠাকুরদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমন্ত পিতাকে কহেন যে, তিনি সর্পদংশনের মন্ত্র ও ঔষধ শিক্ষা করিতে অভিলাষী; তাহাতে তাঁহার পিতা কহেন যে, "তোমাদের দ্বারা দরিদ্রের বা অপরের উপকার কদাচ হইবে না। কারণ যদি কোন দরিদ্র ব্যক্তি বিপদাপন্ন হইয়া রাত্রিকালে তোমাকে ডাকিতে আইসে, তাহা হইলে কি তুমি তাহাদের বাটীতে যাইবে? তৎকালে বোধহয় কখনই যাইতে স্বীকার করিবে না। কিন্তু সেই সময়ে যদি সেই স্থানে না যাও, তাহা হইলে তোমায় গুরুতর পাপে লিপ্ত হইতে হইবে। অতএব বাপু! ও বিদ্যা শিক্ষা করিবার কোন আবশ্যক নাই।" ইনি সন ১২৮২ সালে ১৯শে পৌষ দিবা ৭ ঘটিকার সময় স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজন রাখিয়া ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁহার ব্যবহৃত কতকগুলি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

পাঠকগণের নিকট অনুরোধ তাঁহারা যেন ইহাতে বিরক্ত না হন। রোগী

াসের দ্বারা ব্যাধি মুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং ওঝা বাক্যের অর্থের প্রতি ন দৃষ্টি রাখিবেন ?

১। অস্ত কন দন্তের কথা, কেন দন্ত নাড়ো মাথা
শিব দুর্গা সকল দেবের বড় কেন দন্ত নড় চড়,
অস্ত দন্ত প্রাণের ভাই কেহ না কাকে ছেড়ে যাই।
যদি না শিগ্‌গীর ছেড়ে যাও, শিব দুর্গার মাথা খাও
দোহাই ধর্ম্মের॥

২। ঘর বন্ধন, দোর বন্ধন, বন্দে পীড়ের পাড়।
চৌষট্টি ডাকিনী বন্দন দিয়ে নহার হাড়॥
কার আজ্ঞে—কামরূপ কামিক্ষের আজ্ঞে
রাজা শ্রীরামের আজ্ঞে, হাড়িঝির আজ্ঞে
শিগ্‌গীর লাগ্‌গে।

৩। উচ্চঘাট নিচুপানি, তাইত্তে আছে জল কুমারী,
জল কুমারী তোরে বলি, অমুকির আট বিচ,
ষোল পাজর এনে দিস্ মোরে না যদি এনে দিস্
দোহাই ধর্ম্মের লাগে তোরে
কার আজ্ঞে হাড়িঝির আজ্ঞে
শিগ্‌গীর লাগ্‌গে।

৪। কোলেল কাথা, আলেক সাই,
ইহার পর আর নাই।
রাম নাথ, বদ্দিনাথ, গোরক্ষ নাথ মহাশয়,
আমার দেহের মুস্কিল করো ক্ষয়॥
তুমি আল্লা তুমি পীর তুমি নাস্ত করো স্থির
জের আল্লা জনার আল্লা মুস্কিল আসান করো আল্লা
ঠাকুর গুরু জোমরয়, দেহের মুস্কিল করো ক্ষয়॥

৫। জাগ জাগ মা সত্তপতি জাগ।
যে কর্ণে লাগাই মা সেই কর্ণে লাগ॥
চেতন চৈতন্য গুরু ধন, পূর্ব্ব মুখে অমূল্য রতন,

গাঞ্জী সনাতন, নিজ নাথ নিরঞ্জন
তোন কলো পঞ্চতোক হক নাম নিরঞ্জন।

দোহাই মুরসিদ॥

৬। 'কাল কথিনে অতীত বাস,
চলিতার্থ চলন্ত সহ, মনের মুস্কিল আছিল কয়,
আমি ধরিতো শ্রীগুরু পায়
আমার বাক সিদ্ধি হক।

দোং মুরসিদ॥

৭। কালা কল্পতরু, কালা তুই জগতের গুরু
জগত জুড়ে দেয় দেখা, অনানের গুরু মুরসিদ
তুই সতি দোং মুরসিদ।

৮। কালার অন্ত কালী, গইন কালা
অমক্ষিণ নিমকালা, কালা তুই জগতের আলা
দোং মুরসিদ।

৯। তনকালা মন কালা রাত্র কালা দিন কালা
চন্দ্র কালা সূর্য্য কালা আগুন কালা পাক কালা
ও কালা সো কালা কেশ কালা বেশ কালা
টাইনি কালা বার কালা, আগে কালা পাছে কালা
হেরে কালা আঁখির পুতলি কালা, কালামুক্ত মণি
কালা তোর শয়নে আমি শক্তির আসন টানি।
কালা তোর নামের গুণে কালা তোর হক্ক নাম
জগতে যে জানে, ও থানে লক্ষ কালার আসন
টানি কালা তোর লক্ষ নামের টাইনি চলিত
দোং মুরসিদ।

১০। কালার অশন, কালার বসন,
কালার সিংহাসন।
আমায় উদ্ধার করো কালা নিরঞ্জন॥

১১। খাথের অশন, থাপ্তের বসন

থাথের সিংহাসন। আমার উদ্ধার
কর মা তারিণী, নিজ হইতে নিরাঞ্জন [দোং মুরসিদ।

১২। কালা তুই জগতের বালা, কালা তুই নিরঞ্জন মণি কালা
তোর নাম শুনি মুরসিদের শরণে কালা তোর
আসন টানি। দোং মুরসিদ॥

১৩। নিরাঞ্জন নিরময় তোমার নাম ছিল।
তুমি যে ঘরে থাক কালাগে স্থল
কালাগে ফিরে তাহার ঘর না হয় প্রাপ
আল্লা তার লেখে মান পেকমবরের
হাতে ঢাল আল্লা হাতে তরয়াল
মার বা কত কাট পেন্ন করে থান ২
(দোহাই) দোং কেতব চাঁদ খেপা চাঁদ॥

১৪। পুবে উদয় ভানু পছিমতে যায়
আমায় উদ্ধার কর লাল ভানু
দিননাথ দোং বিন্দুবিবি দোং
খেপা চাঁদ কেতপ চাঁদ দোং শুকি চাঁদ
(দোহাই) দোং পেয়ার সাহা ফিকির॥

১৫। হে আল্লা হে আল্লা আল্লা
আমায় কর নিস্তার দোং

১৬। আমায় নৈরাশ সিদ্ধি করিলেন মহাপ্রভু।
চৌষট্টি বোদ্দি সঙ্গে লয়ে ছাড়বিতো ছাড় নহে
পয়জার বয় মাং উড়াইয়া দিব পোকলাল
গোঁসাইয়ের অঙ্গে দোং ফকির ঠাকুর দোং
মদন দাস ঠাকুর দোং বেড়িসাহা দোং চুরিমজ

১৭। চমৎকার শ্রীগুরু ব্রহ্ম বল মাধব লোচনালের
অঙ্গে প্রভু নিত্যানন্দ তুমি চারি যুগের সার
চৈতন্য গোঁসাই তুমি শক্তি দোং ফকির
ঠাকুর দোং মালিদাস ঠাকুর দোং বোড়সহ॥

১৮। লায়ে লাহা এলেল্লা মহাম্মদ রসুল আল্লা
হক্কের হাকিম আল্লা বিচ মোল্লা
তিরকুল গো আল্লা ব্যাসন ছুরা উক্ষ
চাল দোরাই লক্ষ কালা
যাথা সুলতান মুস্কিল আসান
দোং বেডিসাহা।

১৯। কেস্থরে কেস্থরে ধরল ছাতি
কেস্থরের মাথায় মারি লাতি
কেস্থরে তুলে করিলাম ফোঁটা
কেস্থরে যদি পাড়ে রা ও আমকো ও
সভাশুদ্ধ যদি কাতে রাং৵ঈশ্বর মহাদেবের
জটে পাকা চুল বাম পা কার আজ্ঞে
কামরূপ কামিক্ষের আজ্ঞে হাড়িঙ্গী আজ্ঞে
শীঘ্র লাগ ঃ।

২০। শ্রীগুরু সত্যনারায়ন সত্য মহা প্রভু সত্য এই দেহেতে
কর স্থিতি দেহে কর মুক্তি শতি মা সত্তি ফকির সত্তি
এই দেহের আপত কর মুক্তি প্রভু নিত্যানন্দ
প্রভু চৈতন্য দরদি দরবেনা আমার আপত
কর মুক্তি। দোহাই।

ঠাকুর দাসের ছয়টী পুত্র হয়। তন্মধ্যে বর্ত্তমান জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমন্ত নানা প্রকার কার্য্য করিয়া পরিশেষে সৃষ্টিধর কোঁচের অর্থ সাহায্যে আনুমানিক ৫০০০।৭০০০ টাকা মূলধন লইয়া সন ১২৯১ সালে ২৪ সে ফাল্গুন তারিখে নিজনামে বড়বাজার চিনিপটীতে একটী ঘৃত চিনির কারবার খুলেন। এই ব্যবসায়ে ক্রমশঃ উন্নতি হইয়াছে। শ্রীমন্ত বাবুর ব্যবসা বুদ্ধি অতি প্রবল। কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া মৃদঙ্গারের খনির অংশীদার হইয়াছিলেন। সেই সময় হইতে ইউরোপে মৃদঙ্গার নিঃশেষিত হইবার সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় বঙ্গের কয়লার খনি স্বর্ণ খনিতে পরিণত হয়। ৮ বৎসরের মধ্যে অষ্টগুণ অঙ্গারের বাণিজ্য বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। একটী নূতন স্থানে কার্য্য আরম্ভ

করিবার মানসে ভূমী গ্রহণ করিয়া তৎস্থান অনুপযোগী বিবেচিত হওয়ায় এক সময় ইনি ৩৫০০০ হাজার টাকা মূল্যে বিক্রয় করা শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া ছিলেন। এক্ষণে সেই স্থান ইংলণ্ডীয় বণিকগণকে ৩।০ সাড়ে তিন লক্ষ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়া দাঁ মহাশয় স্বকীয় অংশে লক্ষাধিক টাকা পাইয়াছেন। সপ্তগ্রামী তাম্বুলী সমাজে অধুনা ইনি একজন উদীয়মান্ বণিক।

মধুকৌল্য গোত্রীয় দাঁ বংশের জন সংখ্যা।

১ শ্রীদিননাথ দাঁ ২ হরিপদ দাঁ ৩ জ্যোতিন্দ্র নাথ দাঁ ৪ নাটুমোহন দাঁ ৫ আশুতোষ দাঁ ৬ ইন্দ্র ভূষণ দাঁ ৭ শ্রীমন্ত দাঁ ৮ অরবিন্দ দাঁ ৯ অনিলকান্ত দাঁ ১০ কালী কৃষ্ণ দাঁ ১১ হরিমোহন দাঁ ১২ পঞ্চানন দাঁ ১৩ সত্যচরণ দাঁ ১৪ বেনীমাধব দাঁ ১৫ শশীভূষণ দাঁ। স্ত্রীলোক ১৬, বালক ৬ এবং বালিকা ৮ সমষ্টি ৪৫।

কুণ্ডু বংশ।

১৫০ বৎসরের কিঞ্চিদধিক হইল রাম রাম কুণ্ডুর জন্ম হয়। মসলন্দপুরে তাঁহার গোলাবাড়ি ছিল এবং তেজারতি ও মহাজনী কার্য্যও ছিল। অদ্যাপি মসলন্দপুরে তাঁহার স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ একটি পুষ্করিণী বিদ্যমান আছে এবং ঐ পুষ্করিণী "কুণ্ডু পুষ্করিণী" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তিনি যে সাতিশয় শান্ত ও শিষ্ট ছিলেন, তাঁহারি জীবনী আলোচনা করিলে এমন প্রমাণ পাওয়া যায়। গোবরডাঙ্গার ব্রাহ্মণ পল্লীমধ্যে তাঁহার বাস ছিল এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মণ গৃহস্থের সহিত তাঁহার সাতিশয় সদ্ভাব ও সম্পর্ক ছিল। তৎকালে সাধারণের প্রায় পাকা বাসস্থান ছিল না। সুতরাং পূজার জন্য রাম রামের যে বিখ্যাত চণ্ডী মণ্ডপ ছিল, উক্ত চণ্ডীমণ্ডপে পল্লীস্থ যাবদীয় ব্রাহ্মণ প্রত্যহ সমাগত হইয়া গল্পাদি করিতেন। ঐ চণ্ডীমণ্ডপ "রাম রামের মণ্ডপ" বলিয়া খ্যাত। প্রত্যহ প্রাতঃকালে অনুন ৪০।৫০ জন প্রতিবাসী ব্রাহ্মণ এক-

একটী গাড়ু লইয়া উপরোক্ত মণ্ডপে সমবেত হইতেন। তাঁহারা প্রাতঃকৃত্য সমাধনান্তর মণ্ডপে বসিয়াই দন্ত ধাবনা করিয়া যমুনায় স্নানার্থ বহির্গত হইতেন। সেই সময়ে তাঁহাদের উচ্চ আকাঙ্খার উদ্রেক না হওয়ায়, তাঁহারা নিশ্চিন্তে ও নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতেন। কোন বিষয়েই তাঁহারা অভাব অনুভব করিতে পারিতেন না। ক্ষেত্রে ধান্য ও পুষ্করিণীতে মৎস্য জন্মিত—অপরাপর ক্রেয় দ্রব্য সাতিশয় সুলভ থাকায় সংসারিক চিন্তা তাঁহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিতে পারিত না। প্রত্যহ বাজার হইতে দ্রব্যাদি আনয়নার্থ কয়েকটী পয়সার প্রয়োজন হইত। এ প্রকার জনশ্রুতি আছে যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উপরোক্ত অভাব নিবারণ জন্য রাম রাম নিজ চণ্ডীমণ্ডপে বস্তা করিয়া রাশীকৃত কড়ি রাখিয়া দিতেন। কারণ তথন বাজারে পয়সা অপেক্ষা কড়ির প্রচলন অধিক ছিল। ঐ কড়ি বিতরণের জন্য যে কোন সতন্ত্র লোক নিযুক্ত থাকিত তাহা নহে. ঐ সকল ব্রাহ্মণেরাই যাহার যাহা আবশ্যক লইয়া যাইতেন। তাঁহারা এরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন যে, আবশ্যকের অতিরিক্ত এক কপর্দ্দকও অধিক লইতেন না। সচরাচর ৩।৪ পণ কড়ি হইলেই বাজারে সংস্থান হইত। এই প্রকারে তাঁহারা ঐ মণ্ডপে বসিয়া শাস্ত্রালোচনা, পাঠ ও ক্রীড়াদিতে নিরুদ্বেগে রত থাকিতেন। রাম রাম চারি পুত্র, এক কন্যা ও ৩৬টী পৌত্র ও দৌহিত্র রাখিয়া জ্যৈষ্ঠমাসে দশহরার দিবসে প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণ দিগের পদধুলি ও আত্মীয় স্বজনগণের নিকট বিদায় লইয়া সজ্ঞানে গঙ্গাযাত্রা করেন।

রাম রামের কনিষ্ঠ পুত্র ভবানী শঙ্কর পিতার ন্যায় শান্ত, শিষ্ট ও নির্ব্বিরোধী লোক ছিলেন। কেননা পিতৃবিয়োগের অত্যল্পকাল মধ্যেই ভ্রাতৃগণ বিষয়াদি বিভাগ করিয়া পৃথক হন। শুনা যায় যে এই সময়ে ভ্রাতৃগণের মধ্যে কেহ বঞ্চনা করায় অন্য ভ্রাতা তাঁহাকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করেন যে, তুই যেমন আমাদিগকে ভুলাইয়া লইলি, তেমনি তোর বংশে যেন ভোলা অর্থাৎ পাগল পুত্র জন্মে। পরিণামে ইহার প্রত্যক্ষ ফলও দেখা গিয়াছে। ভ্রাতাদিগের সহিত বিষয় বিভাগ ও অভিসম্পাতের মধ্যে ভবানী শঙ্কর থাকিতেন না। ২।৩ বৎসর বয়স্ক এক মাত্র পুত্র হারাণ চন্দ্রকে নিঃস্ব অবস্থায় রাখিয়া ৩০।৩২ বয়সে ইনি জীবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পত্নী অর্থাৎ হারাণ চন্দ্রের দুঃখিনী জননীর পরবর্ত্তী জীবনে অত্যাশ্চর্য্য ইষ্টভক্তি ও অসীম

দানশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। এমন কি সন্ধ্যা বন্দনাদির পর তিনি একাদিক্রমে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল প্রণাম করিতেন। তজ্জন্য তাঁহার কপালে একটী চিহ্ন হইয়াছিল। অতঃপর ঐ একমাত্র পুত্রের জীবনের সৌভাগ্য লাভ হইয়াছিল। তাহা যে তাঁহার মাতৃ পুণ্যের ফল, লোকে ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ করে না।

হারাণ চন্দ্র কুমহাশয়ের গ্রাম্য পাঠশালায় ১১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যা শিক্ষা করেন। পাঠশালা ত্যাগ করিয়াই তিনি দারপরিগ্রহ করেন। ১৩ বৎসর বয়ঃক্রমকালে অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হন। সর্ব্ব প্রথমে গোবরডাঙ্গার বাজারে কোন আত্মীয়ের মুদিখানা দোকানে কার্য্য আরম্ভ করেন। তাঁহার অজ্ঞাত ভবিষ্যত জীবনের সৌভাগ্য তাঁহাকে এরূপ আকর্ষণ করিতে লাগিল যে, তিনি রাজধানী কলিকাতা নগরে আসিয়া অপেক্ষাকৃত উন্নত ব্যবসায়ে ইচ্ছুক হইলেন। এমন কি তাঁহার জননী এ বিষয়ে অসম্মতা হইলেও পুত্র হারাণচন্দ্র সত্বরেই কলিকাতা আসিয়াছিলেন। ঐ দিন কলিকাতা বটতলায় কোন আত্মীয়ের মুদিখানা দোকানে রাত্রি যাপন করেন। পরদিন প্রাতঃকালে ঐ দোকানের কর্ত্তা তাঁহাকে সেই স্থানে থাকিতে অনুরোধ করেন। অতি অল্পদিন সেই কার্য্য করিয়া বড়বাজার চিনিপটীতে কোন স্বজনের নিকট অপেক্ষাকৃত উচ্চবেতনে নিযুক্ত হন। কিছুকাল পরে তাঁহার শ্যালক ৺গোলক চন্দ্র দত্তের সহিত এক যোগে ৩৬৲ টাকা মাত্র মূলধন লইয়া ঘৃত চিনির ব্যবসায় আরম্ভ করেন। যখন হারাণ চন্দ্র অপেক্ষাকৃত উন্নতি জনক কার্য্যের প্রসার বৃদ্ধি করিবার অভিলাষ করিলেন, তখন তাঁহার অংশীদার বাধা দেওয়ায় উভয়ের কার্য্য সতন্ত্র হইয়া যায়। ইহাতে ভাগ্যবান হারাণচন্দ্রের সৌভাগ্য পথ যেন উন্মুক্ত হইল। ঘৃত চিনির ব্যবসায় সত্ত্বেও দুই একটি অপরাপর উন্নতি জনক ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। বাউড়িয়া সুতার কল কন্‌ট্রাক্ট লইয়া এক বৎসরের মধ্যেই ন্যুনাধিক এক লক্ষ টাকা লাভবান্ হন। এই কার্য্যের প্রারম্ভেই বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা দেখিয়া তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণ বলিয়াছিলেন যে, "হারাণ কুণ্ডু যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছে, উপস্থিত বৎসরের ক্ষতিপূরণেই তাহা শেষ হইবে।" ইহা শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—"আমার দাঁড়িপাল্লা ত কেহ লইবে না।" এই ঘটনার কিছুদিন পরে তাঁহার যে মোকামী গরূপেটে চিনি-

খরিদের কার্য্য ছিল, তাহাতে একটী অভাবনীয় ঘটনার দ্বারা এক বৎসরের মধ্যেই প্রচুর লাভবান্ হইলেন। বৎসরের প্রথমে চিনির গ্রাহক না থাকায়, দর অত্যন্ত কম হয়। মোকামে চিনি খরিদ একেবারেই বন্ধ থাকে। খেতোয়াল অর্থাৎ চিনি প্রস্তুতকারী মোকামের গোমস্তাকে চিনি খরিদ করিবার জন্য উত্তেজনা করে; কারণ ফসলের প্রথমে মাল পড়িয়া থাকিলে অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। কিন্তু মোকামী গোমস্তা বিনা আদেশে চিনি খরিদ করিতে পারেন না। অবশেষে চিনি প্রস্তুতকারীগণ অত্যন্ত কমদরে বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করিল। হারাণ চন্দ্রকে ধনবান করাইবার জন্যই যেন গোমস্তা গোলক চন্দ্র সরকার অবাধ্য হইলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই বিনা অনুমতিতে প্রায় লক্ষটাকার চিনি খরিদ করিলেন। সত্বরেই সমস্ত চিনি কলিকাতায় আসিয়া পৌছিল। অল্পদিন পরেই চিনির গ্রাহক বাহির হওয়ায় প্রচুর লাভবান্ হইলেন। কিন্তু ঐ গোমস্তা বিনানুমতিতে এরূপ অসম সাহসিক কার্য্য করায় তাঁহাকে কার্য্যে রাখিতে অমত করিয়াছিলেন। ইহাতে এই প্রকাশ পায় যে, তিনি দুরাকাঙ্খা পরায়ণ হইয়া অর্থোপার্জ্জনে অভিলাষী ছিলেন না। প্রশান্ত ভাবে উমেশচন্দ্র ও দ্বারিকা নাথ নামক উপযুক্ত দুই পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া বিলাতি বস্ত্রের ব্যবসায় আরম্ভ করতঃ বহুধন উপার্জ্জন করিয়া ছিলেন। কার্য্য কালে একবার ক্ষতি গ্রস্ত হইয়া ছিলেন। তাহাতে হারাণচন্দ্র গোবরডাঙ্গার বাস পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিলেন ও সময় বুঝিয়া পুত্রকে কহিলেন, বস্ত্রের আগন্তুক যত গাঁইট যাহার নিকট ক্রয় করিতে পারা যায় গ্রহণ কর। পরে যৎকালে গৃহীত বস্ত্র প্রাপ্ত হইলেন তদ্বিক্রয়ে পূর্ব্বক্ষতিও পূরণ হইয়া গেল। তখন বৈদশিক বস্ত্রের ব্যবসায় রহিত করিয়া দিলেন। হল রাইট সাহেব কর্ত্তৃক গৃহীত শর্করা তুলা দণ্ডে পরিমাণ করিবার কালে যখন প্রতি বস্তায় ১৲ টাকার অধিক লভ্য প্রাপ্তির আশা রহিল না, তখন কহিলেন, "কোন কিছু নয়" আর গরপেটিয়ার ব্যবসায় করিব না। হারাণচন্দ্র যেমন একদিকে ধনোপার্জ্জন করিয়াছেন, তেমনি ঐ ধনের যথেষ্ট সদ্ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি বার মাসে তের পার্ব্বন দ্বারা গোবরডাঙ্গা গ্রামটীকে সদা উৎসবময় করিয়া রাখিতেন।

প্রথম বৎসর দোললীলা উপলক্ষে আতস বাজি পুড়ান হয়। ময়রাকাক্ষ

বিস্তৃত স্থানে উহা সমাধা হইয়াছিল। আগের ক্রীড়ার কিছু পূর্ব্বে তত্রস্থ রামচন্দ্র সেন আপত্তি করিলেন যে, আমাদিগের কারখানার নিকট বাজি পুড়ান হইবে না। এই সংবাদ বাটীতে হারাণচন্দ্রের নিকট পৌঁছিল। তিনি ব্যস্ত হইয়া উক্ত স্থানে আসিয়া কহিলেন, "ও চন্দর! খাতা কয়খানা নিয়ে বাহিরে এস।" অর্থাৎ বাজি পোড়াইবার জন্য যদি তোমাদের কিছু ক্ষতি হয় আমি তাহা পূরণ করিব। তাঁহার কথায় কেহ আর কোন আপত্তি করিতে সাহস করিল না এবং নির্ব্বিঘ্নে বাজি পোড়ান হইয়া গেল।

পূজা, পার্ব্বন, পুরাণ পাঠ ও নৈমিত্তিক দান দ্বারা হারাণচন্দ্র সোপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যয় করিতেন। মাতৃশ্রাদ্ধে ন্যূনাধিক ১৪০০০ চতুর্দ্দশ সহস্র টাকা ব্যয় করেন। এমন কি যে কুশদহ সমাজে ১৪০০ শত ঘর ব্রাহ্মণের বাস, তাঁহাদের সকলের সন্তুষ্টি ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালোচিত সংস্কার ও রুচি অনুসারে যদিও একই প্রকারের কার্য্যের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান দ্বারা অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, সোপার্জ্জিত ধন ব্যয়ে ঈদৃশ মুক্ত হস্ততা তাঁহার জীবনের বিশেষত্বঃ! হারাণচন্দ্রের জীবনীর আদ্যোপান্ত গুণের বিষয় বর্ণিত হইলেও তাঁহার জীবনে যে মানবোচিত দোষ ও দুর্ব্বলতা ছিল না, এমন বলা যায় না। কিন্তু কোন গুরুতর অখ্যাতির প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহার কার্য্যের আরম্ভ হইতেই সৌভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন ছিলেন। তবে শেষ জীবন অর্থাৎ মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উমেশচন্দ্র ও দ্বারিকানাথ নামক উপযুক্ত পুত্র দ্বয়ের মৃত্যুতে শোক, তাপে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। বর্ত্তমান একমাত্র কনিষ্ঠ পুত্র গিরীশচন্দ্র যথা সময়ে ব্যবসা কার্য্য কিছু মাত্র শিক্ষা না করায়, হারাণচন্দ্রের দেহান্তে তাঁহার ধন সম্পত্তি গিরীশচন্দ্রের দ্বারা রক্ষা হওয়া সম্বন্ধে জনৈক বিচক্ষণ প্রতিবাসী বিলক্ষণ সন্দেহ করিয়া ছিলেন। একজন তাঁহাকে একখানি সুকৌশল পূর্ণ উইল পত্র প্রস্তুত করিতে বলেন; যাহাতে গিরীশচন্দ্র সহসা কোন ধন সম্পত্তি নষ্ট করিতে না পারেন। কিন্তু হারাণচন্দ্র রোগে ও শোকে এতই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, সে সম্বন্ধে কিছুই করিলেন না। হারাণচন্দ্র অন্তিম শয্যায় পড়িয়া দূর সম্পর্কীয় ভ্রাতুষ্পুত্র কালাচাঁদকে এই আদেশ করেন, ঘৃত চিনির দোকানের উপযুক্ত মূলধন রাখিয়া যাহা উদ্ধৃত থাকে, নগদ টাকা করিয়া আমার নিকট উপস্থিত কর। আমি

গিরীশের সম্মুখে রাখিয়া দিয়া যাইব। হারাণচন্দ্রের মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে কালাচাঁদ কলিকাতা হইতে গোবরডাঙ্গার বাস ভবনে ১৩৬ তোড়া (এক লক্ষ ছত্রিশহাজার) টাকা আনিয়া দিলেন। সর্ব্ব সমেত কিঞ্চিদধিক দুই লক্ষ টাকার সম্পত্তি হারাণচন্দ্র গিরীশচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। দেহ-ত্যাগের ৪ চারি দিবস পূর্ব্বে পালকীযোগে কলিকাতায় আসিয়া গঙ্গা-লাভ করেন।

হারাণচন্দ্রের পরলোক গমনে তাঁহার এক মাত্র কনিষ্ঠ পুত্র সমুদায় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন। গিরীশচন্দ্র সম্পত্তির চতুর্থ অংশ পিতৃ শ্রাদ্ধে ব্যয় করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু দেশস্থ আত্মীয় স্বজন এই অসম্ভব কথায় অমত প্রকাশ করায়, তাঁহাদের ব্যবস্থা মত দ্বাবিংশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে বিশেষ সমারোহে পিতৃশ্রাদ্ধ নির্ব্বাহ হয়। তদনন্তর তিনি নিজে উপার্জ্জন-শীল নহেন বিবেচনা করিয়া উত্তমরূপে বিষয়ের সুব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা করেন। পিতা কেবল অর্থ দিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন, কিন্তু কি করিয়া তাহা রক্ষা করিতে হয়, শিক্ষা দিতে পারেন নাই। কিন্তু গিরীশের ভবিষৎ ভাগ্য এমন কর্ম্ম সূত্রে আকর্ষণ করিল যে, অতি অল্পকাল মধ্যে সমুদায় বিষয় সম্পত্তি হীন হইয়া পড়িলেন; যেহেতু, "যৌবনং ধন সম্পত্তি প্রভুত্বমবিবেকতা, একৈব তদনর্থায় কিমু যত্র চতুষ্টয়ম্॥" যৌবন, ধন, প্রভুত্ব ও অবিবেকতা এই চারটীর মধ্যে কোনটীরই তাঁহার জীবনে অভাব ছিল না। যাহা হউক এ সময়ে তিনি ভয়ঙ্কর জীবন সংগ্রামে পতিত হইলেন। ঈদৃশ অবস্থায় মস্তিষ্কের বিকৃতি অথবা জীবনান্ত হওয়াই সম্ভব। যে ব্যক্তি আজীবন সুখের ক্রোড়ে লালিত হইয়া আসিয়াছিলেন, সহসা এ প্রকার অবস্থান্তর হওয়া কতদূর যে মর্ম্মভেদী, তাহা ভুক্ত ভোগী ভিন্ন কে বুঝিবে?

গিরীশচন্দ্র পিতৃ শ্রাদ্ধ অন্তে লক্ষাধিক নগদ মুদ্রা কিরূপে রক্ষা হইবে ভাবিয়াছিলেন। কলিকাতা মহানগরীর ইংরাজ পল্লী চৌরঙ্গি প্রভৃতি স্থানে স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন; তাহার আয় মাসিক ৪০০ চারি শত টাকা অধিক হইয়াছিল। শ্যামবাজারে একটি সোরা রিফাইনের কল করেন। নিজে ব্যবসা কার্য্যে অনভিজ্ঞ প্রযুক্ত কর্ম্মচারীগণের উপর সমস্তই নির্ভর থাকিত। এক বৎসর কার্য্যান্তে চতুর্দ্দশ সহস্র টাকা ক্ষতি হইল। ঐ সময়েই বেল-

গেছিয়ায় পাঁচ হাজার টাকায় এক খানি বাগান খরিদ করেন। বাগানের ভগ্নাবস্থার পরিবর্ত্তন হেতু অনেক অর্থ ব্যয় হয়। অতঃপর উল্টাডিঙ্গিতে চাউ-লের আড়ত করেন। ইহাতেও দুই বৎসরের মধ্যে পঁচিশ হাজার টাকা ক্ষতি হয়। এই সময় হইতে গিরীশচন্দ্র অত্যন্ত চঞ্চলমতি ও ক্রোধপরায়ণ হইলেন। বেলগেছিয়ার বাগানে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। অনেক গুলি কুসঙ্গী আসিয়া জুটিল। বিষয় বুদ্ধিহীন সরল বিশ্বাসী গিরীশচন্দ্র কুটিল কপট সঙ্গীদিগের স্বার্থ সাধনের দুরভিসন্ধি না বুঝিয়া অত্যল্পকাল মধ্যেই সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। প্রথম জীবনে সুরাপায়ীদিগের প্রতি তাঁহার বিশেষ ঘৃণা ছিল। কিন্তু এক্ষণে কুসঙ্গীদিগের চক্রান্তে ঐ সকল দোষে লিপ্ত হই-লেন। এইরূপে নানা বিষয়ে ও অপরিমিত দানাদিতে ৫।৬ বৎসরের মধ্যে সমস্ত সম্পত্তি হারাইলেন। তাঁহার এই অবস্থা অদৃষ্ট বশতঃ ঈশ্বরেচ্ছায় হই-য়াছে, এই বিশ্বাস করিয়া সুস্থির হইলেন। সংসারের ভাল মন্দ কোন বিষয়েই তাঁহার মনোযোগ ছিল না। আপন ভাবে বিভোর থাকিতেন। যৌবনকাল হইতে সঙ্গীতের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। সেতার বাজাইতে পারি-তেন। তৎকালে সঙ্গীত বিদ্যার আলোচনার সঙ্গে কোন একটি মাদক সেবন যেন প্রচলিত প্রথা ছিল। তাহার মধ্যে গঞ্জিকা সেবন প্রধান। ইনিও এই কুঅভ্যাসে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। ইহার অপকারিতা তাঁহার জীবনে বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। গিরীশচন্দ্র জীবনের শেষ ভাগে অধিক রাত্রি জাগরণ করিয়া ইষ্ট দেবতার নাম গান ও সাধন ভজন করিতেন; ইহাতেই দুঃখের ক্লেশ ভুলিয়া আনন্দে অবস্থান করিতেন। তাঁহার চারি পুত্র ও এক কন্যা। তন্মধ্যে তিন পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া অনুমান ৫৪ বৎসর বয়সে ১২৯৮ সালের ২০শে ফাল্গুন তারিখে গোবরডাঙ্গার বাস ভবনে প্রাণত্যাগ করেন।

গিরীশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগীন্দ্রনাথের জীবনে কি সূত্রে বিষয় বাসনা রহিত হইয়া ধর্ম্মজীবন লাভের আকাঙ্খা উপস্থিত হয়, তিনি নিজ মুখে যে প্রকার কহিয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ হইল। "আমার পরিবর্ত্তিত জীবনের নিগূঢ় কথা বলিতে গেলে বাল্যজীবনের বিষয় উল্লেখ না করিলে প্রবন্ধ অসংলগ্ন হয়। সুতরাং সংক্ষেপে তাহা উল্লেখ করিতেছি;—

"আমার জীবন বৃত্তান্ত আমাকে বলিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে জীবনদাতা বিধাতাকে স্মরণ হয়। আমার জীবন বৃত্তান্তের যদি নামকরণ করিতে হয়, তবে পাপীর জীবনে ভগবানের লীলা বলা যাইতে পারে। ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে জন্মপরিগ্রহ করিয়া অবস্থা উচিত ভাবে লালন পালনে বঞ্চিত হই নাই। কিন্তু শিক্ষানুরাগ বিহীন পিতা মাতা দ্বারা কোন প্রকার সৎশিক্ষা প্রাপ্ত হই নাই। বরঞ্চ পল্লীগ্রামে বাসহেতু প্রতিবাসী বালকগণের কুসঙ্গে যথেচ্ছাচারীর ন্যায় বিচরণ করিতাম। আমাদের ন্যায় ব্যবসায়ী পরিবারে গুরু মহাশয়ের পাঠশালার শিক্ষাই যথেষ্ট ছিল। যদিও সময়ে সময়ে কলিকাতায় থাকা হইত। তৎকালে ইংরাজি স্কুলে সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণীতে কয়েকবার প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম, কিন্তু উহার অধিক শিক্ষা আর কিছুই হইল না। ১২৭৮ সালে পিতা সম্পত্তি হীন হইয়া কলিকাতা হইতে গোবরডাঙ্গার বাস ভবনে আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। আমি পৈত্রিক দোকান (যাহা বর্ত্তমানে জ্ঞাতি খুল্লতাত কালাচাঁদের নিজস্ব হইয়াছিল) ঐ দোকানে কালাচাঁদের স্নেহ ও যত্নে ব্যবসা কর্ম্ম শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তৎকালে আমার বয়স ১২ বৎসর মাত্র। ঐ সময়ে পরলোকগত রামসেবক পালের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীষষ্ঠীবর পাল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত আমার বিবাহ হয়। কালাচাঁদের দোকানে কার্য্য শিক্ষায় প্রবেশ করিয়া অবস্থা বিপর্য্যয়ে অত্যন্ত কষ্টকর হইতে লাগিল। কিন্তু সহসা মনের এমন পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল যে, অল্পদিন মধ্যে কার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করিলাম। প্রায় দশ বৎসর কাল এই দোকানে কার্য্য করিলাম। কালাচাঁদের মৃত্যুর পর আমারও আর ঐ স্থানে কার্য্য করিতে ইচ্ছা রহিল না। ১২৮৯ সালে ২৭শে অগ্রহায়ণ রামকৃষ্ণ রক্ষিতের সহিত আংশিকভাবে এক নূতন কারবার আরম্ভ করিলাম। কার্য্যে আশার অতীত ফল লাভ হইল। ধন প্রাপ্তিতে তাদৃশ তৃপ্তিবোধ হয় নাই। অন্য কিছুর অভাব বোধে অন্তরে সর্ব্বদা অশান্তি অনুভব করিতাম। সংসারে অত্যন্ত অশান্তি ছিল। ধনে সে অশান্তি নিবারিত হইল না। ১২৯২ সালের মধ্যে জীবনে সেই অশান্তির অনুভূতি অত্যন্ত ঘনীভূত হইল। ১২৮৫ সালে অগ্রহায়ণ মাসে আমার ত্রয়োদশবর্ষীয়া পত্নী একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া চলৎশক্তি হীন ও চির অকর্ম্মণ্যা হইয়াছিলেন।

এজন্য আমার পুনরায় বিবাহ দিবার জন্য পরিবারবর্গ উৎসুক ছিলেন। ১২৯১ সাল হইতে বিবাহের আন্দোলন কিছু অধিক হইয়াছিল। বিবাহ বিষয়ে যখন আমি চিন্তা করিতাম, তখন অন্তরে কে যেন বলিত, "তোমার যদি হইত. অর্থাৎ তুমি যদি স্ত্রীর ন্যায় চিররুগ্ন হইতে, তাহা হইলে তিনি তোমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেন?" তখন আমি মানস চক্ষে দেখিলাম, যেন আমি প্রকৃতই রুগ্ন এবং আমার ভার্য্যা আমার সেবা শুশ্রূষার জন্য আত্ম-সুখ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। ইহা দেখিয়া হৃদয়ে কি এক নূতন সুখের অনুভব করিলাম। আবার হৃদয়ে বিবেক বাণী হইল;—"সুখ পাস্‌না, সুখ কাহাকে বলে? শান্তি কাহাকে বলে? এই দ্যাখ, বাসনা ত্যাগ কেমন সামগ্রী!" হৃদয় আনন্দে ভাসিল—অদম্য উৎসাহে মন জাগিল। সংকল্প বাঁধিল, কামনা ত্যাগ করিব। কিছুদিন ধরিয়া এই ভাব স্রোতের প্রবাহ চলিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে বিষয়, সংসার, সমাজ ও জাতীয়তার বন্ধন ছেদন করি-বার জন্য জীবন সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সংগ্রামে জয় লাভ করিয়া মুক্তভাবে তত্ত্বানুসন্ধান ও তল্লাভের জন্য আমার জীবনকে প্রবৃত্ত করিলাম। অতঃপর ধর্ম্ম সাধনের সঙ্গে ঐ রুগ্না স্ত্রীকে সঙ্গিনী করিয়া স্বহস্তে তাঁহার যথাযোগ্য সেবা করিয়া যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছি। তিনিও বিকলাঙ্গিনী হইয়া আপনাকে সৌভাগ্যশালিনী বলিয়া নিজ মুখে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কেহ এমন বিবেচনা করিতে পারেন, যোগীন্দ্র ব্রাহ্ম হইয়াছেন, তাঁহার বিব-রণ এই পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত হয় নাই। কিন্তু তিনি মতান্তর গ্রহণ করিলেও তাঁহার শরীর পরিবর্ত্তিত হয় নাই এবং অব্রাহ্ম পত্নীর কথাই বলি-য়াছেন। এক্ষণে যোগেন্দ্রের ধর্ম্মের মাদকতা বিলুপ্ত হইয়াছে। বিষয় কর্ম্মের জন্য লালায়িত। যাহা ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা কি আর মিলে?

কালাচাঁদ কুণ্ডু নির্ধন অবস্থায় বাল্যজীবন অতিবাহিত করিয়া যৌবনের প্রারম্ভে জ্ঞাতি খুল্লতাত হারাণচন্দ্র কুণ্ডুর অনুগ্রহভাজন হন। ব্যবসায় কার্য্যে যত্ন ও পরিশ্রমশীল দেখিয়া হারাণচন্দ্র তাঁহাকে ঘৃত চিনির দোকানে কার্য্য শিক্ষা দেন। কালে ইনি হারাণচন্দ্রের ঘৃতের আড়তের প্রধান কর্ম্মচারী হন। হারাণচন্দ্রের মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি কালাচাঁদকে এই আড়তের অংশীদার করিয়া যাহাতে ঐ ব্যবসায় রক্ষা হয় তাহা অনুরোধ করিয়া যান। হারাণ

কুণ্ডু চিনিপট্টীতে সর্ব্ব প্রথমে ঘৃতের আড়তদার হইয়াছিলেন। ভদ্রেশ্বর নিবাসী রাধাকৃষ্ণ দে প্রভৃতি তাঁহার বেপারি ছিলেন। যখন হারাণচন্দ্রের পুত্র গিরীশচন্দ্র কারবারের মূলধন বাহির করিয়া লইতে লাগিলেন, তখন কালাচাঁদ নিবারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ১২৭৭ সালে কালাচাঁদ স্বনামে ঘৃতের আড়তদারী কার্য্য আরম্ভ করেন। ছয়সাত বৎসরের মধ্যে ইনি বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন। তদনন্তর তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্র শ্রীরামচন্দ্র কুণ্ডুর সহিত বিষয় সম্বন্ধে মনোবিবাদ চলিতে থাকে; কৌশল ক্রমে শ্রীরামচন্দ্র একদিনে ৩০,০০০ টাকা বাহির করিয়া লয়েন। ইহার পর একটী উৎকট রোগে ও মনোকষ্টে কালাচাঁদের দেহ ভগ্ন হয়। দুই বৎসরের অধিক কাল পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত থাকেন। এবং উপরোক্ত রোগেই তিনি ৫৬ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। কালাচাঁদের যখন অনুমান ২৫ বৎসর বয়ঃক্রম, তখন তাঁহাকে যক্ষারোগ অধিকার করে। বোধ হয় তিনি এই রোগাক্রমনে দেহের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন; সেই হেতু সর্ব্বদা পরমেশ্বরের নাম লইতেন। রামপ্রসাদের পদাবলী তাঁহার অতি প্রিয় ছিল। ব্যবসায়ের ভিতরে ধর্ম্মভীরুতা তাঁহার বিশেষরূপ ছিল। ব্যবসায়ীর অনুপযোগী বিলাসিতা, ও কদাচারীতার প্রতি তিনি বিরক্ত ছিলেন। অর্থোপার্জ্জন করিয়া কিছু কিছু সৎকার্য্যও করিয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে গোবরডাঙ্গার যমুনাকূলে শবদাহের ঘাট নির্ম্মাণ ও বিষ্ণুপুর গ্রামে পুষ্করিণী খনন এই দুই কীর্ত্তি দ্বারা বহুলোকের স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

সপ্তর্ষি গোত্রীয় কুণ্ডু বংশের জন সংখ্যা।

১ শ্রীকেদার নাথ কুণ্ডু ২ হরিপদ কুণ্ডু ৩ যোগজীবন কুণ্ডু ৪ নারান দাস কুণ্ডু ৫ হরিনারাণ কুণ্ডু ৬ নারানপদ কুণ্ডু ৭ যুগোল কিশোর কুণ্ডু ৮ মানিক চন্দ্র কুণ্ডু ৯ অমূল্য চরণ কুণ্ডু ১০ ননীগোপাল কুণ্ডু ১১ ভুবনমোহন কুণ্ডু ১২ অম্বিকা চরণ কুণ্ডু ১৩ রামচন্দ্র কুণ্ডু ১৪ গোপাল চন্দ্র কুণ্ডু ১৫ নন্দলাল কুণ্ডু ১৬ কার্ত্তিক চন্দ্র কুণ্ডু ১৭ মানিক চন্দ্র কুণ্ডু ১৮ যোগীন্দ্র নাথ কুণ্ডু ১৯ বিনয় কৃষ্ণ কুণ্ডু ২০ বিনোদ বিহারী কুণ্ডু ২১ শশীভূষণ কুণ্ডু ২২ সত্যচরণ কুণ্ডু

২৩ শ্রীরামচন্দ্র কুণ্ড ২৪ প্রকাশ চন্দ্র কুণ্ড ২৫ সুবোধ চন্দ্র কুণ্ড ২৬ সুরেন্দ্র নাথ কুণ্ড ২৭ হরিচরণ কুণ্ড ২৮ উপেন্দ্র নাথ কুণ্ড ২৯ রাধালচন্দ্র কুণ্ড ৩০ যদুনাথ কুণ্ড। স্ত্রীলোক ৩৯, বালক ১১, বালিকা ১২, সমষ্টি ৯২।

চেল বংশ।

সপ্তগ্রাম প্রদেশ হইতে বর্গীর হাঙ্গামায় ৺কামদেব চেল গোবরডাঙ্গায় আইসেন। তাঁহার সহিত তাঁহার পুত্র মহাদেবও আইসেন। মহাদেবের পুত্র পরশুরাম, তৎপুত্র গোকুল এবং তৎপুত্র মঙ্গলচন্দ্র চেল। ইনি ১১৯৫ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। উপরোক্ত কয় পুরুষের মধ্যে মঙ্গলচন্দ্র খ্যাতনামা ও ক্রিয়াবান্ লোক ছিলেন এবং ইনিই স্বকৃত গুড় চিনির কারবার ও দোকান করিয়া অর্থ সংগ্রহ করেন। প্রথমে এই বংশে দোল, দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি ক্রিয়া কলাপ ইঁহারই দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলচন্দ্রের মাতৃ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে কুশদহ সমাজের ৯০০ শত ঘর ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাহাতে আনুমানিক ১২ হাজার টাকা ব্যয় হয় ও মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল।

তৎকালীন হয়দাদপুরের জমীদার হবিবল হোসেন কুশদহবাসী অনেক ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মোত্তর জমী আটক অর্থাৎ মালের সামিল করায় একদা ব্রাহ্মণগণ মধ্যাহ্নকালে সকলে একত্র হইয়া ঐ জমীদার সকাশে গমন করেন এবং একবাক্যে জমীদারকে আশীর্ব্বাদ করতঃ যাহাতে ব্রহ্মোত্তর জমী সমস্ত খোলসা হয়, তজ্জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করেন। কিন্তু জমীদার মহাশয় ব্রাহ্মণদিগের কাতরতায় কর্ণপাত না করিয়া কেবল এই মাত্র বলিলেন, "আচ্ছা, ব্রাহ্মণদিগের কেমন আশীর্ব্বাদের জোর, আমার একটি সন্তান হউক দেখি? অথবা অভিসম্পাতে আমায় ভস্ম করুন দেখি? যদি ইহা হয়, এই দণ্ডেই ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মোত্তর জমী সমস্ত ছাড়িয়া দিব, নচেৎ কোন মতেই ছাড়িব না।" ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ ভগ্ন অন্তঃকরণে হতাশ হইয়া সেই মধ্যাহ্নকালে নিজ নিজ বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। ঘটনার অব্যবহিত পরে অর্থাৎ ১২৬০ সালে মঙ্গলচন্দ্র চেলের মাতৃ শ্রাদ্ধ দিবসে ব্রাহ্মণগণ সকলে সমবেত হইয়া মঙ্গলচন্দ্রকে বলিলেন, "আমরা তোমার নিকট বিপদগ্রস্ত হইয়া

এই প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। আমাদের এই বিপদ হইতে তোমায় উদ্ধার করিতে হইবে। নচেৎ আমাদের আর কোন উপায় নাই।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণগণ সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক মঙ্গলচন্দ্রের নিকট বলিলেন, আরও তাঁহারা কহিলেন যে, তোমার বাটীতে এই কার্য্য উপলক্ষে আমরা যে সামাজিক বিদায় পাইব, তাহা লইব না। কিন্তু আমাদিগকে এ যাত্রা রক্ষা চাই।" মঙ্গলচন্দ্র হবিবলের সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা আমি যথা সাধ্য চেষ্টা দেখিব, কিন্তু আমি আপনাদের নিকট প্রতিশ্রুত হইতে পারিতেছি না। তবে চেষ্টা দেখিব, যতদূর আমার দ্বারা হয় করিব।" এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণমণ্ডলী সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

শ্রাদ্ধ অন্তে মঙ্গলচন্দ্র বিশেষ চেষ্টা ও উদ্যোগ সহকারে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া অধিকাংশ ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মোত্তর জমী খালাস করিয়া দিয়াছিলেন। যাঁহারা ব্রহ্মোত্তর জমীর তায়দাদ দেখাইতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা জমী ফেরত পাইয়াছিলেন এবং যাঁহারা তায়দাদ দেখাইতে পারিলেন না, তাঁহারা জমীও ফেরত পাইলেন না। যাহাহউক মঙ্গলচন্দ্র পরোপকারী ও দেশ-হিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অনেক প্রকার ব্যবসায় করিয়া বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া যান। সন ১২৬৫ সালে ৭০ বৎসর বয়সে মঙ্গলচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করেন। ইহাঁর মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকৃষ্ণ ঐ সমস্ত ব্যবসায়ে অপরিমিত লোকসান দিয়া একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়েন। এই ঘটনার ৫।৭ বৎসর পরেই রামকৃষ্ণের মৃত্যু হয়। এক্ষণে মঙ্গলচন্দ্রের পুত্র যদুনাথ বর্ত্তমান। ইহাঁদের অবস্থা এক্ষণে অতীব শোচনীয়।

এই বংশে গঙ্গাধর চেল নামক এক ব্যক্তি হরদাদপুরে বাস করিতেন। তিনি ৺ রামচন্দ্র কোঁচের জ্যেষ্ঠ জামাতা ছিলেন। শ্বশুরালয়ে প্রথমে ইনি গোমস্তাগিরী কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। কিছুদিন পরে গোবরডাঙ্গায় নিজে চিনি ও গুড়ের কারখানা করেন। ইহাঁর তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ রাসবিহারী মধ্যম অটল-বিহারী ও কনিষ্ঠ মাণিকচন্দ্র। রাসবিহারী শৈশবাবস্থা হইতে মাতুল আশ্রয়ে লালিত পালিত হয়েন। তাঁহার মাতুল সৃষ্টিধর কোঁচের যত্নে ও স্বীয় অধ্যবসায়ে ইংরাজি-লেখা পড়া শিক্ষা করেন। সৃষ্টিধর অন্যান্য ভাগিনেয়দিগের অপেক্ষা ইহাঁকে অধিকতর ভাল বাসিতেন। রাসবিহারী বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এ, পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হইয়া দুই বৎসর কাল আইন অধ্যয়ন করেন। এবং এই সময়ে হাই-কোর্টের উকীল বাবু অম্বিকাচরণ বসু মহাশয়ের আপিসে আর্টিকেল ক্লার্কের কার্য্য শিক্ষা করিয়া আইন পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হন। কিছুদিন পরে রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরের সুপারিসে তিনি মুন্সেফিতে প্রবেশের এক খানি নিয়োগ পত্র পান। কিন্তু তাঁহার মাতুল মহাশয় সে কার্য্য করিতে না দিয়া তাঁহাকে একটী প্যাটের বেলারি কার্য্য করিয়া দেন। ঐ ফারমের নাম দেওয়া হইয়াছিল "চেল, পাল, এণ্ড কোং।" প্রথম বৎসরে রাসবিহারী বাবু ঐ কার্য্যে বিস্তর টাকা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েন। কিন্তু তাহার পর তিনি বিশেষ উদ্যম সহকারে কার্য্য করিয়া ২।৩ বৎসরের মধ্যেই সমস্ত ক্ষতিপূরণ করেন এবং তাহাতে কিছু লাভও হয়। মাল ভাল হওয়ায় বিলাতে "চেল পাল এণ্ড কোং" ট্রেড মার্ক বিশেষ প্রচলিত হইয়াছিল। অদ্যাবধি ঐ মার্কা ভাড়া চলিতেছে। বাৎসরিক ৫০০০।৬০০০ পর্য্যন্ত ভাড়া পাওয়া গিয়া থাকে। রাসবিহারী স্বদেশানুরাগী ও সরলচেতা লোক ছিলেন। সন ১৩০৫ সালে ১৮ই ফাল্গুন তারিখে ইনি পরলোক গমন করেন।

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় চেল বংশের জন সংখ্যা।

১ শ্রীউপেন্দ্রনাথ চেল ২ উত্তম চন্দ্র চেল ৩ মানিক চন্দ্র চেল ৪ নন্দলাল চেল ৫ দ্বিজবর চেল ৬ হরিনাথ চেল ৭ যদুনাথ চেল। স্ত্রীলোক ১১, বালক ১১ এবং বালিকা ৬ সমষ্টি ৩৫।

কর্ণমুণি সেন বংশ।

কর্ণমুনি বা কর্ণপুরে সেন বংশে বাসুদেব সেন নামক জনৈক ব্যক্তি সপ্তগ্রাম হইতে সর্ব্ব প্রথমে খাঁটুরায় আসিয়া বসবাস করেন। ইঁহারই প্রপৌত্র প্রাণকৃষ্ণ সেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ধান্যের ব্যবসা ও মহাজনীর কার্য্য করেন এবং এই ব্যবসায়ে ক্রমে বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী হন। গ্রামের মধ্যে তাঁহার বিলক্ষণ প্রতাপ ছিল। তিনি সত্যনিষ্ঠ ও ধর্ম্মানুরাগী লোক ছিলেন। প্রথমতঃ প্রাণকৃষ্ণের বাটী খাঁটুরার উত্তর পাড়ায় ছিল। ঐ বাস ভবন ভট্টপল্লী নিবাসী

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের জমীতে নির্ম্মিত হয়। মধ্যে ২ গোবরডাঙ্গার জমীদার বাবুদিগের সহিত বিবাদ বিসম্বাদ হওয়ায়, প্রাণকৃষ্ণ ঐ বাসভবন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং জামদানি নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। এই বাটীতে তাঁহার একখানি মুদিখানার দোকান ছিল। জমীদার বাবুদিগের বাটী হইতে বৎসর ২ পানের জমা অর্থাৎ তাম্বুল বিক্রয়ের ক্ষমতা প্রদত্ত হইত। যিনি জমা লইতেন, তিনি ভিন্ন অপর কেহ ঐ ব্যবসা করিতে পাইত না। এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত ঐ ব্যবসা তাঁহার একচেটিয়া থাকিত।

একদা প্রেমচাঁদ তেলি নামক জনৈক ব্যক্তি জমীদার বাবুর বাটী হইতে পানের জমা ধার্য্য করিয়া লইয়াছিল। সুতরাং গ্রামের মধ্যে প্রেমচাঁদ ব্যতীত অপর কেহ পান বিক্রয় করিতে পাইত না। একদিন ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে প্রাণকৃষ্ণ সেন জামদানির নিজ দোকান হইতে ১০।১৫ টাকার পান বিক্রয় করেন। এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া প্রেমচাঁদ জমীদার বাবুর নিকট প্রাণকৃষ্ণের নামে অভিযোগ উপস্থিত করে। কালীপ্রসন্ন বাবু তৎকালীন গোবরডাঙ্গার জমীদার ছিলেন। তিনি পূর্ব্ব হইতেই প্রাণকৃষ্ণকে বিশেষরূপ জানিতেন যে, তিনি একজন দুর্দ্দান্ত সাহসী বীর পুরুষ। যাহাহউক অভিযোগ উপস্থিত হইলে, কালীপ্রসন্ন বাবু ১০।১২ জন লাঠিয়াল ও ১০।১২ জন সড়কীওয়ালার প্রতি আদেশ দেন যে, প্রাণকৃষ্ণকে শীঘ্র লাঠির আগায় করিয়া আমার সম্মুখে হাজির কর। এই কথা শুনিবামাত্র পাইকগণ সকলে স্বদলে প্রাণকৃষ্ণকে ধরিয়া আনিবার জন্য গমন করিল। প্রাণকৃষ্ণ লোকমুখে এই সংবাদ পাইয়া নিস্তব্ধ ভাবে বহির্বাটীতে বসিয়া আছেন, ইত্যবসরে জমীদার প্রেরিত পাইকগণের কোলাহল শুনিয়া ত্বরিত পদে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া এক খানি তীক্ষ্ণধার খড়্গ হস্তে তাহাদের সম্মুখীন হইলেন, এবং বলিলেন, "তোরা আমায় ধরিয়া লইবার জন্য আসিয়াছিস্, আচ্ছা কাহার কত ক্ষমতা দেখি আয়।" এই বলিতে ২ প্রাণকৃষ্ণ রোষ কষায়িত লোচনে তীক্ষ্ণধার খড়্গ লইয়া পাইকগণের প্রতি ধাবিত হইলেন। পাইকগণ এই ভীষণ ব্যাপার অবলোকনে প্রাণভয়ে যে যেদিকে পাইল পলায়ন করিল। জমীদার বাবু পাইকগণের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া প্রাণকৃষ্ণকে প্রকারান্তরে জব্দ করিবার জন্য বহুবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন; কিন্তু কিছুতেই প্রাণকৃষ্ণকে জব্দ

করিতে পারেন নাই। অতঃপর জমীদার বাবুর দেওয়ান শিবনারাণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মধ্যস্থ হইয়া এই বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দেন। মহাজনী কার্য্যের জন্য অনেক ইতর লোক প্রাণকৃষ্ণের বাধ্য ছিল। এবং তাঁহার আদেশ মত চলিত। কখন কোন কারণ বশতঃ লোকের আবশ্যক হইলে ঘুণাক্ষরে সংবাদ পাইবামাত্র খাতকেরা দলে ২ তাঁহার নিকট আসিত। প্রাণকৃষ্ণের একটী মহৎ গুণ ছিল—তিনি শরণাগত রক্ষক ছিলেন। প্রতিবাসী দিগের মধ্যে, এমন কি যদি তাঁহার কোন শত্রুও বিপদাপন্ন হইয়া শরণাগত হইত, তাহা হইলে তিনি অর্থের দ্বারা হউক, বা যে কোন প্রকারে হউক, শরণাগত ব্যক্তিকে বিপন্মুক্ত করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। এক পক্ষে যেমন তিনি দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন, পক্ষান্তরে তেমনই পরোপকারী ছিলেন। ইহার বহু পরিবার ছিল। প্রত্যহ দুই বেলায় প্রায় ৬৪।৬৫ খানি পাতা পড়িত। অজন্মা বশতঃ শস্যাদি না হওয়ায়, প্রাণকৃষ্ণ মহাজনী কার্য্যে পরিশেষে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন। এতৎসহ অপরাপর ব্যবসায়ও সুচারুরূপে না চলায়, ক্রমশঃ অবনতি হইতে থাকে। সন ১২৫০ সালে প্রাণকৃষ্ণ ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতষ্পুত্র চন্দ্রকান্ত সেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ-তাত মহাশয়ের পরিত্যক্ত বিষয় সম্পত্তি-সমস্তই নষ্ট করিয়া ছিলেন। বর্ত্ত-মান তাঁহার একটি ভ্রাতষ্পুত্র কার্ত্তিক চন্দ্র সেন সামান্য একটী কাপড়ের ব্যবসায় ও একটী মুদিখানার দোকান করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

সন ১২৫৩ সালে ফাল্গুন মাসে সহরতলী বরাহনগর পালপাড়ায় গঙ্গাধর সেনের জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম ৺মধুসূদন সেন। গঙ্গাধর সেন যখন মাতৃগর্ভে ঐ সময়েই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। যাহাহউক অত্যন্ত শোকের সময়েই গঙ্গাধর জন্ম পরিগ্রহ করেন। মধুসূদন সেনের ৩ পুত্র ও ৪ কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র বিপ্রদাস, মধ্যম গোপালচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ গঙ্গাধর। মধুসূদন সামান্য চাকরী দ্বারা কোন প্রকারে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। গঙ্গাধর বাল্য-কালে বিদ্যাশিক্ষার্থ পালপাড়ার পাঠশালে প্রেরিত হন, অর্থাভাবে গঙ্গাধরের তাদৃশ লেখা পড়া শিক্ষা ঘটে নাই। অগত্যা তিনি চিনিপটীর খ্যাতনামা মহাজন ৺ উত্তম চন্দ্র দাঁ মহাশয়ের দোকানে শিক্ষা নবিশ ভাবে কার্য্য আরম্ভ করেন। গঙ্গাধর বাল্যাবধি প্রতিভাশালী এবং পরিশ্রমী ছিলেন। অল্পদিন

মধ্যে বালক গঙ্গাধর সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। এই সময় হইতে ইঁহার দুই টাকা মাসিক বেতন নির্দ্ধারিত হয়। ক্রমে এই গদীতে দুই টাকা হইতে দশ টাকা পর্য্যন্ত বেতন বৃদ্ধি হইয়াছিল। কিছুদিন পরে দাঁ মহাশয়ের মৃত্যু হইলে ঐ দোকানের কর্ম্মচারীদিগের সহিত তাঁহার মনো-মালিন্য ঘটে। অতঃপর তিনি ঐ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া উক্ত চিনি-পটীতেই বিখ্যাত ধনী ও মহাজন শ্যামাচরণ রক্ষিত মহাশয়ের ঘৃত চিনির কারবারে প্রবিষ্ট হন। এই দোকানে ইনি অনেক দিন পর্য্যন্ত কার্য্য করেন। এই খানে অবস্থান কালে ইনি অনেক খেলা খেলিয়াছিলেন। গঙ্গাধরের বয়স যখন ২০।২৫ বৎসর, তখন গঙ্গাধর সেন স্বীয় অবস্থার হীনতা প্রযুক্ত তাম্বুলি ও অন্যান্য সভ্য সমাজের অবজ্ঞেয় পণ্য বিবাহে ৩০০৲ টাকা পণে দরিদ্র পূর্ণচন্দ্র রক্ষিতের অপূর্ণ তৃতীয়বর্ষীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু অবস্থা লোকের চিরদিন সমান থাকে না। ঐ শ্যামাচরণ রক্ষিতই নিঃস্ব গঙ্গাধরের সৌভাগ্য পথের প্রদর্শক। তিনি শ্যামাচরণ বাবুর কারবারে নিযুক্ত হইয়া স্বীয় অধ্যবসায়ে তাঁহার ব্যবসার বিশেষ উন্নতি করেন এবং স্বীয় সৌভাগ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসারও বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়। ইহাতে শ্যামাচরণ বাবু গঙ্গাধরকে আপনার ব্যবসায়ে ৶০ তিন আনা অংশীদার নিযুক্ত করেন। এই সময় হইতে গঙ্গাধরের সাংসারিক অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন হয় এবং এরূপ উদ্যমের সহিত কার্য্য আরম্ভ করেন যে, মহাজন সমাজে তাঁহার বিশেষ-খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। এইরূপে কয়েক বৎসর কার্য্য করিবার পর, শ্যামাচরণ রক্ষিতের অপরাপর কর্ম্মচারী-গণের সহিত গঙ্গাধরের কার্য্যের মত ভেদ ঘটে, এই হেতু তিনি ঐ ফারমের অংশ পরিত্যাগ করিয়া আপনার ভগ্নীপতি উমাচরণ কুণ্ডু মহাশয়ের সহযোগে চিনিপটীতে "উমাচরণ কুণ্ডু ও হরিদাস কুণ্ডু" নামে এক খানি ঘৃত চিনির দোকান খুলেন। ইহার কয়েক মাস পরেই চিনিপটীতে আগুন লাগিয়া কয়েকখানি দোকান ও তৎসহ গঙ্গাধর বাবুর দোকান খানিও ভস্মসাৎ হয়। ইহাতে তাঁহার বিশেষ ক্ষতি হয়। অতঃপর উমাচরণ বাবুর সহিত একত্রে কয়েক বৎসর কার্য্য করিবার পর উভয়ের কার্য্যে মতভেদ হওয়ায়, তিনি তাঁহার অংশের সমস্ত দেনা পাওনা

চুক্তি করিয়া চিনিপটী হইতে স্থানান্তরিত হন এবং ময়দাপটীতে স্বনামে কার্য্য আরম্ভ করেন। অর্ডার সপ্লাই ও কন্‌ট্রাক্টরি তাঁহার কার্য্য ছিল। বহুদিন ঐ কার্য্য করায়, রাজ সরকারে গঙ্গাধরের যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। কমিসারিয়েট বিভাগে অপরাপর কন্‌ট্রাক্টর অপেক্ষা গঙ্গাধরের বিশেষ সম্মান ছিল। এক বৎসর গঙ্গাধর কমিসারিয়েট বিভাগে চাউলের কন্‌ট্রাক্ট লয়েন। কিন্তু সেই বৎসরেই ভারতে দারুণ দুর্ভিক্ষ হওয়ায়, গঙ্গাধরকে সমূহ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। পূর্ব্বাহ্নে অনেকেই গঙ্গাধর বাবুকে ঐ ঠিকা ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন; কিন্তু গঙ্গাধর কাহারও কথা না শুনিয়া প্রকৃতই মহাজনোচিত, উচ্চ অন্তঃকরণের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার এই ব্যবহারে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ১৫০০ দেড় হাজার টাকা প্রদান করেন। গঙ্গাধর এক জন স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। ইনি যে কার্য্যে হস্তার্পণ করিতেন, সুশৃঙ্খলায় তাহা সম্পন্ন হইত। তাঁহার নিকট কোন কার্য্যই অসাধ্য বলিয়া বোধ হইত না। অতিরিক্ত পরিশ্রমে অল্প বয়সেই গঙ্গাধরের হাঁফানির পীড়া জন্মে। অনেক চিকিৎসায় ইনি সুস্থ থাকিতেন বটে, কিন্তু শীতকালে রোগের কিছু বৃদ্ধি হইত। গঙ্গাধর এতদূর ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন যে, সাধু-সেবা তাঁহার জীবনের একটী মহৎ ব্রত ছিল। অনাথ দীন দরিদ্র প্রতিপালনে তিনি মূর্ত্তিমান অবতার স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা পরদুঃখে কাতর থাকিত। কেহ কোন রূপ দুঃখ জানাইলে, অমনি তাঁহার অন্তঃকরণ কাঁদিয়া উঠিত এবং যথাসাধ্য তাহার দুঃখ মোচনে যত্ন করিতেন। ইহাঁর নিকট যাচ্ঞা করিয়া কাহাকেও রিক্ত হস্তে ফিরিতে হইত না। গঙ্গাধর নিজে বিশেষ রূপ শিক্ষিত না হইলেও তিনি একজন বিদ্যোৎসাহী পুরুষ ছিলেন। বহু সংখ্যক বিদ্যার্থী বালককে তিনি অন্ন বস্ত্রাদি প্রদান করিয়া আপনার বিদ্যোৎসাহিতার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। গঙ্গাধর অত্যন্ত দরিদ্র বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া বাল্যাবধি অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া ছিলেন। অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও বাল্যকষ্টের কথা এক দিনের জন্য বিস্মৃত হন নাই। তিনি সর্ব্বদা সামান্য পরিচ্ছদে সময় কাটাইতেন। গঙ্গাধর অত্যন্ত অমায়িক লোক ... তাঁহার প্রশংসা করিলে তিনি অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে ...

প্রার্থনা করিতেন। ইনি ১২৯৯ সালে মাঘী পূর্ণিমায় ৺ কাশীধামে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। ৺ তারকনাথ জীউর চন্দন পুষ্করণীতে যাত্রীগণের সুবিধার জন্য চাঁদনি ঘাট বাঁধাইয়া দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত জলাশয় দান, ব্রাহ্মণ বিবাহ, কন্যাদায় ও মাতৃ পিতৃ শ্রাদ্ধে গঙ্গাধরের দান নিত্য কর্ম্ম ছিল। বরাহনগরে নিজ বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ উপলক্ষে অনেক অর্থ ব্যয় করেন। নানাদেশ হইতে অধ্যাপক পণ্ডিত মণ্ডলীকে যথারীতি বিদায় করিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। গঙ্গাধর বড়ই সদালাপী ও মিষ্টভাষী ছিলেন। ইনি ১৩০৬ সালে ১৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে জ্বর রোগে মৃত্যু মুখে পতিত হন। তাঁহার চারি পুত্র ও চারি কন্যা। চিনিপটীর প্রসিদ্ধ মহাজন সত্যপ্রিয় কোঁচ মহাশয়ের কন্যার সহিত গঙ্গাধরের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ পাঁচকড়ি সেনের শুভ বিবাহ হয়। সৃষ্টি-ধর কোঁচ মহাশয়ের অন্য এক দৌহিত্রীর সহিত মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ প্রিয়নাথ সেনের শুভ বিবাহ হয়। ৺ কাশীধামে তাঁহার দুর্গোৎসব হয় এবং বরাহ-নগরের বাটীতে জগদ্ধাত্রী ও অন্নপূর্ণা পূজা হইয়া থাকে। গঙ্গাধর মৃত্যুকালে চারি লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া যান ও সম্পত্তির তৃতীয়াংশ দেবস্ব করিয়া স্থাপিত দেব সেবার জন্য সুবন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন।

তিনি অনেক সৎকর্ম্ম করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে একটি স্বার্থ ছিল। গঙ্গাধর কহিতেন, অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিলে প্রতি প্রসবের জন্য কিঞ্চিৎ সদ্ব্যয় করা উচিত। ইহাতে তাঁহার মাতুল পুত্র কহিয়াছিলেন, আমি শুনিয়াছি, পাপ পুণ্য জমা খরচ করিয়া মিটান যায় না। দুষ্কর্ম্ম ও সৎকর্ম্মের ফল পৃথকভাবে গ্রহণ করিতে হয়। গঙ্গাধরের সম-সাময়িককালে রামকৃষ্ণ রক্ষিত জন্মভূমিতে দুর্গোৎসবে যেমন ব্যয় করিতেন, ইনি কাশীতে পূজায় তদ্রূপ অর্থ ব্যয় করা দূরে থাকুক, কার্পণ্য প্রদর্শন করিতে ত্রুটী করেন নাই। তিনি কহিতেন, যদি ব্যয় লাঘব না হইবে, তবে কাশীতে আসিয়া পূজা করা কেন? কৃষ্ণ ভাবিয়াছিলেন, ধর্ম্ম কার্য্যও একটি ব্যবসায়। পুণ্য সঞ্চয় করা ইহার উদ্দেশ্য। যদি অল্প ব্যয়ে তাহা সমাধা করিতে পারা যায়, অধিক ব্যয় করা অনাবশ্যক। বিত্তশাঠ্য যে দোষাবহ, তাহা জানিতেন না। দুঃখার্জ্জিত ধন পর জন্মে পাইবেন বলিয়া ইহ জন্মে ব্যয় করা উত্তম

ব্যবসায় বটে। তাহাতে সমাজের ও উপকার আছে। কুশদ্বীপ সমাজে কুটুম্ব দিগকে গঙ্গাধর বাবু ও কৃষ্ণ বাবু উত্তম দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন।

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় সেন বংশের জন্ম সংখ্যা।

১ শ্রীপাঁচকড়ি সেন ২ প্রিয়নাথ সেন ৩ অটলবিহারী সেন ৪ হরিপদ সেন ৫ পার্ব্বতীচরণ সেন ৬ কার্ত্তিকচন্দ্র সেন। স্ত্রীলোক ১২, বালক ২, বালিকা ১, সমষ্টি ২১।

কাশ্যপ সেন বংশ।

এই বংশে কাশীনাথ সেন নামক জনৈক লোক জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পত্নীর নাম কন্যা কুমারি। বাতুলতা নিবন্ধন গ্রামস্থ সকলেই ইহাকে কন্যা পাগ্‌লী বলিয়া সম্বোধন করিত। যদিও ইনি বাতুল ছিলেন, তথাপি ইহাঁর জীবনে জ্বলন্ত পতি ভক্তি দেদীপ্যমানা ছিল। কন্যা পাগলিনী পতির তৃপ্ত্যর্থ দূরস্থ জমীদারদিগের বাটী হইতে মধ্যে মধ্যে ভাল ভাল দ্রব্যাদি আনিয়া পতিকে প্রদান করিতেন। বয়োধিকা ও পাগলিনী বলিয়া অনেকে ইহাঁকে দর্শন করিয়া ভীত হইত। গৃহ প্রাঙ্গণে কন্যা-পাগলিনী একটী পেঁপে বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন। ঐ বৃক্ষের প্রতি তাঁহার অসীম যত্ন ছিল। এক দিন শীতকালে বৃদ্ধ কাশীনাথ মৃত্যুমুখে পড়িবার উপক্রম হইল,—গ্রামস্থ সকলে সমবেত হইয়া বৃদ্ধ কাশীনাথকে গোবরডাঙ্গাস্থ যমুনাতীরে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। (এ স্থলে উল্লেখ আবশ্যক যে, বর্ত্তমান সেন বংশের আদি পুরুষগণ প্রায় সকলেই বয়ঃপ্রাপ্ত ও সজ্ঞানে জীবলীলা সংবরণ করেন।) বৃদ্ধ কাশীনাথের মৃত্যুর পূর্ব্বেও সম্যক জ্ঞান ছিল। গৃহ প্রাঙ্গণে অন্তর্জলির স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ স্থান গৃহ হইতে কিছু দূরে ও তথায় ছায়া থাকায়, বৃদ্ধ কাশীনাথ আত্মীয় স্বজনকে ডাকিয়া আরও কিছু সন্নিকটে অথচ রৌদ্রে ঐ স্থান নির্দ্দিষ্ট করিতে কহিলেন। যাহাহউক তাঁহার পত্নী

কন্যা পাগলিনী এতাবৎকাল অনুপস্থিত থাকায় এই সকল বিষয় কিছুই পরিজ্ঞাত ছিলেন না। আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি গৃহ প্রাঙ্গণে কোলাহল করিতেছে, ইত্যবসরে সহসা কন্যা পাগলিনী তথায় উপস্থিত হইলেন ও প্রাঙ্গণে জনতা দেখিয়া ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিলেন এবং স্বামীর নিকটস্থ হইয়া কহিলেন, "বলি ও কর্ত্তা! তোমার অভিপ্রায় কি? তুমি কি মনে করিয়াছ যে, আমাকে বিধবা করিয়া অগ্রে প্রস্থান করিবে? তা হবে না।" এই বলিয়া কন্যা পাগলিনী সত্বর গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বারে অর্গল বন্ধ করিলেন এবং এক খানি নূতন শাড়ি পরিধান করিয়া তৈল, সিন্দুর, চিরুণী ও দর্পণ লইয়া বেশবিন্যাসে মনোযোগী হইলেন। প্রতিবেশীবর্গ গবাক্ষ দিয়া কন্যা পাগলিনীর ব্যবহার দেখিয়া বিস্মিত হইল। দেখিতে দেখিতে কন্যা পাগলিনীর বেশ বিন্যাসের সহিত তাঁহার জীবনেরও পরিসমাপ্তি হইল। কথিত আছে, ঐ সময়েই তাঁহার সাধের পেঁপে গাছটী ভগ্ন হইয়া ভূমিসাৎ হয়। তৎশব্দে পার্শ্বস্থ প্রতিবেশীবর্গের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছিল, "একি! কন্যা পাগলীর ঘাড় ভাঙ্গিয়া পড়িল না কি?" যাহাহউক ঐ বৃক্ষ পতনের সঙ্গে সঙ্গে কন্যা পাগলিনীর দেহেরও পতন হইয়াছিল এবং পতির পরিবর্ত্তে অগ্রে পতিব্রতার দেহ সৎকারার্থ যমুনাতীরে নীত হইয়াছিল।

খাঁটুরা গ্রামে রতন সেন ও গোরাচাঁদ সেন নামক দুই সহোদর বাস করিতেন। উভয়েই তেজারতি কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। রতন সেন তাঁহার নিজবাটীর একটী গৃহে কতিপয় প্রতিবেশীর সহিত গোপনে জুয়া খেলিতেন। ইহাতে ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত পণ রাখা হইত। জমীদার সরকারে পাছে এই খেলার বিষয় প্রকাশ পায়, তজ্জন্য জমীদার বাটীর পাইক ও বরকন্দাজদিগের সহিত গোপনে বন্দোবস্ত থাকিত। যাহাহউক একদা গোবরডাঙ্গার জমীদার খেলারাম বাবু এই জুয়াখেলার সংবাদ পাইয়া রতন সেনকে ধরিয়া আনিবার জন্য দুই জন মুসলমান পাইককে আদেশ করেন। তাহারা রতন সেনের নিকট আসিয়া জমীদারের আদেশ জ্ঞাপন করে। তাহাতে রতন সেন কহেন যে, "এখন আহারাদির সময়, এসময় যাইতে পারিব না; বৈকালে হউক অথবা কল্য প্রাতে হউক বাবুর সহিত আমি সাক্ষাৎ করিব। তোমরা এখন যাও।" কিন্তু ঐ পাইকদ্বয় রতন

সেনের কোন কথা না শুনিয়া তাহাকে তদ্দণ্ডেই বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে ও রতনকে দুই একটি কটূ বাক্য কহে। রতন সেন তখন ক্রোধে অধীর হইয়া ঐ পাইকদ্বয়কে ধরিয়া ভয়ানক প্রহার করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, "তোরা জানিস্‌না কার সঙ্গে লাগিয়াছিস্? তোদের অল্পে ছাড়িব না। তোদের শুকরের রক্ত খাওয়াইয়া তবে ছাড়িয়া দিব।" প্রহারিত পাইকদ্বয় করযোড়ে রতন সেনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল ও তাঁহার বিরুদ্ধে জমীদার বাবুর নিকট কোন অভিযোগ আনিবে না, ইহাও শপথ করিয়া অঙ্গীকার করিল। রতন সেন দেখিলেন আর অধিক প্রহার করিলে মৃত্যুর সম্ভাবনা। এই ভাবিয়া রতন সেন ঐ পাইকদ্বয়কে ছাড়িয়া দিলেন। তাহারা মুক্তি লাভ করিয়া জমীদার বাবুর নিকট গমন করিয়া আদ্যোপান্ত ঘটনা জ্ঞাপন করিল। জমীদার বাবু পাইকদ্বয়কে এরূপ প্রহার করিয়াছে শুনিয়া আপনাকে অবমানিত জ্ঞানে ক্রোধান্বিত হইয়া চারি জন উপযুক্ত লাঠিয়ালকে হুকুম দিলেন যে, "এই দণ্ডে রতন সেনকে আমার সম্মুখে হাজির কর।" আজ্ঞামাত্র লাঠিয়াল চতুষ্টয় রতন সেনের বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইল। রতন সেন তৎকালে বহির্বাটীতে পাদচারণ করিতেছিলেন। রতনকে দেখিয়া লাঠিয়ালগণ জমীদারের হুকুম জ্ঞাপন করিয়া কহিল, "রতন বাবু! তোমাকে এখনই আমাদের সহিত যাইতে হইবে, ইহাতে যদ্যপি অমত কর, বলপূর্ব্বক এখনই তোমাকে ধরিয়া লইয়া যাইব।" এই কথা শুনিয়া রতন সেন ত্বরিত পদে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া এক খানি তীক্ষ্ণধার তরবারি হস্তে বহির্বাটীতে আসিলেন এবং ঐ লাঠিয়ালদিগকে কহিলেন যে, "আমি স্বইচ্ছায় যাইব না। তোমরা বলপূর্ব্বক আমাকে কেমন করিয়া লইয়া যাইবে যাও দেখি? তোমাদের কতদূর ক্ষমতা দেখা যাউক। তবে যদি তোমরা আমাকে একেবারে মারিতে পার, তাহা হইলে লইয়া যাইতে পারিবে, নচেৎ আমি জীবিত থাকিতে তোমরা কখনই লইয়া যাইতে পারিবে না।" এই বলিয়া রতন সেন ঘন ঘন তরবারি চালনা করিতে লাগিলেন। এই ভীষণ কাণ্ড দেখিয়া লাঠিয়াল চতুষ্টয় প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। লাঠিয়ালগণ জমীদার বাবুর নিকট যাইয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিল। জমীদার বাবু সমস্ত শ্রবণ করিয়া কিছুক্ষণ নীরবে রহিলেন, পরে স্বহস্তে এক খানি পত্র

লিখিয়া সামান্ত একটি লোক দ্বারা ঐ পত্র খানি পাঠাইয়া দিলেন। পত্র পাইবামাত্র রতন সেন জমীদার বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। জমীদার বাবুকে কিছু টাকা প্রণামী দিয়া তিনি এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান আছেন, এমন সময় খেলারাম বাবু বলিলেন, "কি রতন! এখন তোমার কোন বাবা রাখে?" এই কথা শুনিয়া রতন নির্ভীকচিত্তে উত্তর করিল, "রতন কি তার কোন উপায় স্থির না করিয়া আসিয়াছে?" তাহাতে বাবু কহিলেন, "রতন কি উপায় স্থির করিয়া আসিয়াছ?" ইহাতে রতন কহিল, "দেখুন আপনি আমাকে প্রহার করিবার জন্য এখনই কাহাকে হুকুম দিবেন, কিন্তু সে হুকুম তামিল করিতে না করিতেই আমি হাঁসিল করিয়া বসিব, এই উপায় স্থির করিয়া আসিয়াছি।" এই কথা বলিতে বলিতে রতন নিজ আলখাল্লা জামার মধ্য হইতে এক খানি তীক্ষ্ণধার ভুঁজালে বাহির করিল। ভোঁজালে দেখিয়া বাবু কহিলেন, "দেখি তোমার কেমন ভোঁজালে।" রতন বিনা বাক্য ব্যয়ে তখনই ভুঁজালে খানি বাবুর হস্তে দিলেন। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই অস্ত্র তুমি কোথায় পাইলে?" রতন উত্তর করিল, "আমি কলিকাতায় ক্রয় করিয়াছি।" জমীদার বাবু কহিলেন, "এই বীর যদি তোমায় জব্দ করি, এখন কে তোমায় রক্ষা করে?" এই কথা শুনিবামাত্র রতন গম্ভীর স্বরে উত্তর করিল, "আপনি এ ভাবিবেন না যে, অস্ত্র খানি হস্তগত করিয়াছেন বলিয়া আমাকে জব্দ করিবেন—যতক্ষণ এই দেহে বাহুদ্বয় থাকিবেক, ততক্ষণ কেহই কোন প্রকারে আমায় জব্দ করিতে পারিবে না।" জমীদার বাবু রতনের সাহসের প্রশংসা করিয়া ঐ অস্ত্র খানি প্রত্যর্পণ করিলেন এবং কহিলেন, "দেখ এরূপ জুয়াখেলা তোমাদের ন্যায় লোকের কর্ত্তব্য নহে। আরও দেখ এই খেলাতে লোকে সর্ব্বস্বান্ত হয়। একারণ আমি তোমাকে বার বার নিষেধ করিতেছি, পুনরায় ও খেলা খেলিও না।" রতনও বাবুর নিকট স্বীকার করিয়া আসিল যে, আর কখনও জুয়া খেলিব না। গোরাচাঁদ ও রতন উভয়েই সরলচেতা, মিতব্যয়ী ও সাহসী ছিলেন।

গোয়াড়িভাঙ্গায় শম্ভুচন্দ্র সেন নামক জনৈক ব্যক্তি বাস করিতেন। পুত্রের নাম রামকৃষ্ণ সেন। পিতা পুত্রে তাদৃশ সদ্ভাব ছিল না। অথচ যে বিশেষ রূপ শত্রুতা ছিল তাহাও নহে। জমীদার বাবুর বাটীতে উভয়েরই যাতায়াত

ছিল এবং জমীদার মহাশয় উভয়কেই ভাল বাসিতেন। কোন সময় শম্ভু-চন্দ্র সেন সংকল্প করিয়া বাটীতে হরিবংশ কথা দিয়াছিলেন। আপন বাটীতে সংকল্পিত হরিবংশ পাঠ হওয়াতে তৎপুত্র রামকৃষ্ণ সেই স্থানে যাইতেন না বা লোক জনকে অভ্যর্থনা করিতেন না। ইহাতে তাঁহার পিতা বিশেষ দুঃখিত হইয়া একদা জমীদার মহাশয়ের বাটীতে গিয়া বলেন, "যে আমি হরিবংশ কথা দিতেছি, কিন্তু আমার পুত্র একবারও সে স্থানে যায় না অথবা ভদ্র লোকদিগকে অভ্যর্থনা করে না; ইহাতে আমি বড়ই দুঃখিত। আপনারা যদি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়।" ইহার কয়েক দিন পরে এক দিন জমীদার মহাশয় রামকৃষ্ণকে ডাকাইয়া কহিলেন, "ওহে রামকৃষ্ণ! তোমার পিতা এমন মহৎকার্য্য করিতেছেন, কিন্তু তুমি সে স্থানে যাও না অথবা তাঁহার কোন সাহায্য কর না কেন?" ইহাতে রামকৃষ্ণ কহেন যে, পিতাও যেমন একটী মহৎকার্য্য করিতেছেন, তেমনি আমিও একটী ভাল কার্য্য করিবার মনস্থ করিতেছি। যাহা করিব, অবশ্য আপনি পরে জানিতে পারিবেন।" এই কথা বলিয়া রামকৃষ্ণ বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে একদিন রামকৃষ্ণ জমীদার মহাশয়কে দুই টাকা প্রণামী দিয়া গললগ্নীকৃতবাসে কহিলেন, "মহাশয় আমি যে মহৎকার্য্যের কল্পনা করিয়াছি, তাহার সময় উপস্থিত। এক্ষণে আপনার অনুমতি পাইলে একবার গয়াক্ষেত্রে গমন করি। কারণ লোকে এরূপ কহে যে, অপুত্রক ব্যক্তি পুত্রকামনা করিয়া হরিবংশ কথা দিয়া থাকে। ইহা যে মহৎকার্য্য সন্দেহ নাই, আমারও সংকল্পিত মহৎকার্য্য এই, গয়াধামে গিয়া একটী পিণ্ড গদাধরের পাদপদ্মে প্রদান করি।" ইহাতে জমীদার মহাশয় কহিলেন, "বল কি? পিতা বর্ত্তমানে পিণ্ড দিবে?" তখন রামকৃষ্ণ কহিলেন, "পুত্র বর্ত্তমানে যখন পিতা পুত্রার্থে হরিবংশ দিতে পারেন, তখন পিতা বর্ত্তমানে পুত্র পিতার তৃপ্ত্যর্থ গয়ায় পিণ্ড দিতে না পারিবে কেন?" এই কথায় সভাস্থ সকলেই হাস্য করিতে লাগিলেন ও জমীদার বাবু রামকৃষ্ণকে কহিলেন, "রামকৃষ্ণ বেশ বলেছ।"

অবলাকান্ত সাহিত্যসেবী হইয়া কুশদহের সপ্তগ্রামী সমাজে কাশ্যপ গোত্রীয় সেন বংশের আদর বৃদ্ধি করিয়াছেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ওভারসিয়ার হইবার জন্য কিছু দিন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইহা রুচি-

ক্ষর না হওয়ায় বাঙ্গালায় স্কুলপাঠ্য পুস্তক রচনায় মনোনিবেশ করেন। কাম-ধেনুকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তদ্দারা ছয় বৎসর বার্ষিক দশ হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু দুষ্ট স্বরস্বতী তাঁহার স্কন্ধে আরূঢ়া হওয়ায়, কাম-ধেনুকে পলায়ন-পর হইতে হইল।

কাশ্যপ গোত্রীয় সেন বংশের জন সংখ্যা।

১ শ্রীঅবলাকান্ত সেন ২ হরিচরণ সেন ৩ আশুতোষ সেন ৪ ভোলানাথ সেন ৫ রজনীকান্ত সেন ৬ যতীন্দ্রনাথ সেন ৭ বৃন্দাবন বিহারী সেন ৮ রাস-বিহারী সেন ৯ হরিবিহারী সেন। স্ত্রীলোক ১৬ বালক ২ বালিকা ০ সমষ্টি ২৭।

কপিলর্ষি দে বংশ।

খাঁটুরা ও শান্তিপুরে এই বংশের বাস। তন্মধ্যে শান্তিপুরের অবশিষ্ট দে বংশের পূর্ব্ব পুরুষ গণেশচন্দ্র দে। গণেশচন্দ্রদের পুত্র শম্ভুচন্দ্র। শম্ভুচন্দ্রের পুত্র দাতারাম। দাতারামের দুই পুত্র, রামজীবন ও ভগীরথ। রামজীবনের তিন পুত্র, উমাপ্রসাদ, মহাদেব ও চন্দ্রকুমার। ভগীরথের দুই পুত্র, পার্ব্বতী-চরণ ও ঈশ্বরচন্দ্র। পার্ব্বতীচরণের পুত্র ক্ষেত্রমোহন। ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র সাতকড়ি। ক্ষেত্রমোহনের দুই পুত্র, প্রসন্ন কুমার ও বসন্ত কুমার।

গণেশচন্দ্র দে বর্গীয় হাঙ্গামায় ভীত হইয়া সপ্তগ্রাম হইতে স্বজাতি ও বিভিন্ন জাতি প্রতিবেশীগণকে সঙ্গে লইয়া নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুর নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। প্রথমতঃ যেখানে আসিয়া তিনি বাটী প্রস্তুত করিয়া ছিলেন, সেই বাটী প্রায় ১০০ একশত বৎসর হইল গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। অতঃপর তাঁহারপ্রপৌত্র রামজীবন ও ভগীরথ ঐ বাটীর অনতিদূরে একটী বাটী প্রস্তুত করান। এক্ষণে সেই বাটীতে তাঁহার বংশধরেরা বাস করিতেছেন। গণেশচন্দ্র শান্তিপুরে আসিয়া তেজারতি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ঐ কার্য্যে ক্রমশঃ তিনি উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ও

পৌত্রেরাও ঐ ব্যবসায় করিতেন। ইহার প্রপৌত্র রামজীবন ও ভগীরথ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কলিকাতায় আসিয়া বড়বাজার ময়রাপটীতে একটি ঘৃত চিনির ব্যবসায় করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই গভর্ণমেণ্ট আপিসে ঘৃত চিনির সরবরাহের কার্য্য প্রাপ্ত হন। ক্রমে ঐ কার্য্যে বিশেষ উন্নতি হয়। রামজীবন ও ভগীরথ উভয়েই বিশেষ ক্রিয়াবান্ ছিলেন। পূজাদি কর্ম্মোপলক্ষে ইহারা ব্রাহ্মণ ও অধ্যাপকদিগকে যথাযোগ্য বার্ষিক দান এবং গ্রামস্থ সমস্ত শ্রেণীর লোককে সাদরে আহ্বান করিতেন। এইজন্য গ্রামে তাঁহাদের নাম ও খ্যাতি যথেষ্ট হইয়াছিল। ইহারা বিস্তর ভূসম্পত্তি করিয়াছিলেন। ইহাদের শেষাবস্থায় কলিকাতার ব্যবসায় বিশেষরূপ ক্ষতি হওয়ায়, একেবারে কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। রামজীবনের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র চন্দ্রকুমার তাঁহার ভগ্নীপতি বরাহনগর নিবাসী রামসেবক সেনের সহিত অংশে ইংরাজটোলায় একখানি ভাল রকম মুদিখানার দোকান করেন। কিছু দিন পরে রামসেবক সেন ঐ দোকান ছাড়িয়া দেন। তৎপরে চন্দ্রকুমার ঐ দোকান নিজে চালাইয়া সচ্ছলে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। চন্দ্রকুমারের পিতা রামজীবন যে সমস্ত ভূসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা সন ১২৬৪।৬৫ সালে নদীয়ার মহারাজার সহিত জমী জমা সূত্রে মোকর্দ্দমা হওয়ায়, যাবতীয় ভূসম্পত্তি ঐ রাজার হস্তগত হয়। প্রায় ২৫।২৬ বৎসর গত হইল চন্দ্রকুমার ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ভগীরথের পুত্র পার্ব্বতী চরণ পিতার মৃত্যুর পর কাশীনাথ রক্ষিতের সহিত আংশিক ভাবে হাউসে দালালী করিতেন। তৎপরে পার্ব্বতীর পুত্র ক্ষেত্রমোহন কিছু দিন তাঁহার শশুর ব্রজমোহন পালের সহিত দালালী করিয়া কলিকাতায় শ্যামলাল ঠাকুরের চট্টগ্রাম প্রভৃতি মফঃস্বল স্থানের জমীদারিতে নায়েবী কার্য্যে নিযুক্ত হন। প্রায় ২০।২২ বৎসর গত হইল উপরোক্ত জমীদারির অন্তর্গত স্থান সমূহ জলপ্লাবনে নষ্ট হওয়ায়, ক্ষেত্রমোহন উক্ত চাকরি পরিত্যাগ করতঃ জীবনের অবশিষ্ট কাল বাটীতে থাকিয়া তেজারতি ও নীলকুঠির কার্য্য করিয়াছিলেন। সন ১৩০৫ সালে ইনি পরলোক গমন করেন।

খাটুরায় দে বংশে ভগবতী চরণ ইদানীং প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি সাকার উপাসক হইলেও ব্রাহ্মবিদ্বেষী ছিলেন না। বরং কন্যা ও জামাতৃদ্বয়ের

প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট দেখা যাইত। তিনি কলিকাতার ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া গোবরডাঙ্গায় শর্করা প্রস্তুত কার্য্যে জিবীকার উপায় করিয়া লইয়া ছিলেন। এক্ষণে আর সে দিন নাই। এই গোবরডাঙ্গায় বিদেশীয় চিনি সুলভ বলিয়া মিষ্টান্নকারের জন্য আনীত হইয়া বিক্রীত হইতেছে। ইউরোপে শর্করা উৎপন্ন হইত না, তজ্জন্য রাজন্যগণ কৃষকদিগকে বিটমূল উৎপাদন করিবার জন্য সাহায্য দিবার প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। ফরাসীরা প্রতি টন চিনিতে ৪ পাউণ্ড ১০ শিলিং বাউণ্টি দিয়া থাকেন।

কপিলর্ষি গোত্রীয় দে বংশের জন সংখ্যা।

১ শ্রীপ্রসন্নকুমার দে ২ বসন্তকুমার দে ৩ রাধাহরি দে ৪ রতিনাথ দে ৫ সুনীলচন্দ্র দে ৬ সুধীরচন্দ্র দে ৭ সুশীলচন্দ্র দে ৮ সুরেশচন্দ্র দে ৯ গোপালচন্দ্র দে ১০ গৌরহরি দে ১১ নিতাইচরণ দে। স্ত্রীলোক ১১, বালক ৬, বালিকা ৫, সমষ্টি ৩৩।

কাশ্যপ দে বংশ।

এই বংশে শান্তিপুরে বহু লোক ও খাঁটুরায় কয়েকটী পরিবার বিদ্যমান ছিলেন। এক্ষণে কেবল মাত্র একটী বয়স্ক পুরুষ বংশধর আছেন। ইহারা চাকুলের দে। হরিদাস কলিকাতায় পুস্তকের ব্যবসায় করেন।

কাশ্যপ গোত্রীয় দে বংশের জন সংখ্যা।

১ শ্রীহরিদাস দে, স্ত্রীলোক ৩, বালক ২, সমষ্টি ৬।

অপরিচিত জ্ঞাতি।

যাহারা আপনাদিগকে বর্ণিত বংশাবলীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া জ্ঞাত নহেন, তাঁহাদিগকে অপরিচিত জ্ঞাতি নামে অভিহিত করা গেল। ইহাদিগের সংখ্যা ৮৩। যথা;—

(১)

সেন।

কাশ্যপ গোত্রীয় শ্রীহারাণচন্দ্র সেন, তুলসীচরণ সেন ও সালগ্রাম সেন, স্ত্রীলোক ২, সমষ্টি ৫।

(২)

পাল।

মধুকোল্য গোত্রীয় শ্রীহরিচরণ পাল, পঞ্চানন পাল। স্ত্রীলোক ৩, এবং বালক ১, সমষ্টি ৬।

(৩)

পাল।

৺ ঝড়ুমোহন পালের পুত্র শ্রীহিরালাল পাল। স্ত্রীলোক ১। সমষ্টি ২।

(৪)

পাল।

স্ত্রীলোক ৬।

(৫)

রক্ষিত।

কাশ্যপ গোত্রীয় ১। শ্রীভোলানাথ রক্ষিত, ২। পঞ্চানন রক্ষিত, ৩। ষষ্ঠীচরণ রক্ষিত, ৪। মতিলাল রক্ষিত, ৬। আদ্যনাথ রক্ষিত, ৭। বিনয়-কৃষ্ণ রক্ষিত, ৮। যোগজীবন রক্ষিত, ৯। বটুকচন্দ্র রক্ষিত, স্ত্রীলোক ৫, এবং বালিকা ৪, সমষ্টি ১৮।

(৬)

রক্ষিত।

১। শ্রীরামতারণ রক্ষিত। স্ত্রীলোক ১। সমষ্টি ২।

(৭)

রক্ষিত।

১। পাঁচু রক্ষিত। স্ত্রীলোক ১। সমষ্টি ২।

(৮)

রক্ষিত।

১। শ্রীহরিচরণ রক্ষিত।

(৯)

রক্ষিত।

১। শ্রীঅমূল্যচরণ রক্ষিত। স্ত্রীলোক ২, বালক ১, সমষ্টি ৪।

(১০)

রক্ষিত।

১। শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রক্ষিত ২। উদয়চন্দ্র রক্ষিত। স্ত্রীলোক, বালক ১ এবং বালিকা ২। সমষ্টি ৮।

(১১)

রক্ষিত।

১। শ্রীরাখালদাস রক্ষিত ২। ননীগোপাল রক্ষিত। স্ত্রীলোক ৩, বালক ২। সমষ্টি ৭।

(১২)

রক্ষিত।

স্ত্রীলোক ৭।

(১৩)

অজ্ঞাত উপাধি।

স্ত্রীলোক ২১।

জন সংখ্যা।

১৩০৭ সালে ভাদ্র মাসে গণিত।

	পুরুষ	স্ত্রীলোক	বালক	বালিকা	সমষ্টি।
শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ১ম দত্ত বংশ	৩৩	৩৬	১২	১১	৯২
শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ২য় দত্ত বংশ	৮	৯	৪	৩	২৪
শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ৩য় দত্ত বংশ	৭	৯	৪	৪	২৪
শাণ্ডিল্য গোত্রীয় আশ বংশ	৪১	৪৮	১৯	১৫	১২৩
মধুকোল্য গোত্রীয় কোঁচ বংশ	১০	১৫	১২	১০	৪৭
কাশ্যপ গোত্রীয় প্রামাণিক রক্ষিত বংশ	১০	১০	৭	৪	৩১
কাশ্যপ গোত্রীয় বড় রক্ষিত বংশ	৪৫	৩৮	১৫	৫	১০৩
কাশ্যপ গোত্রীয় দয়াল রক্ষিত বংশ	৪০	৪০	২৩	২১	১২৪
শাণ্ডিল্য গোত্রীয় রক্ষিত বংশ	৬	১৩	৪	৬	২৯
কাশ্যপ গোত্রীয় পাল বংশ	১৩	১০	৪	৬	৩৩
মধুকোল্য গোত্রীয় পাল বংশ	৫১	৬১	২০	১৫	১৪৭
শাণ্ডিল্য গোত্রীয় পাল বংশ	২৯	৩২	৬	৪	৭১
মধুকোল্য গোত্রীয় দাঁ বংশ	১৫	১৬	৬	৮	৪৫
সপ্তর্ষি গোত্রীয় কুণ্ড বংশ	৩৫	৩৯	৭	১২	৯৩
শাণ্ডিল্য গোত্রীয় চেল বংশ	৮	১১	১০	৬	৩৫
শাণ্ডিল্য গোত্রীয় কর্ণপুরের সেন বংশ	৬	১২	২	১	২১
কাশ্যপ গোত্রীয় সেন বংশ	৯	১৬	২	০	২৭
কপিলর্ষি গোত্রীয় দে বংশ	১১	১১	৬	৫	৩৩
কাশ্যপ গোত্রীয় চাকুলের দে বংশ	১	৩	২	০	৬
অপরিচিত জাতি	২১	৫২	৪	৬	৮৩
	৩৯৯	৪৮১	১৬৯	১৪৬	১১৯১

প্রকৃত পক্ষে জন সংখ্যা এতদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক হইবে।

সম্পূর্ণ।